মানুষের জ্ঞান ও ভাবকে বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত করিবার যে একটা প্রচুর সুবিধা আছে, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেই সুবিধার দ্বারা মনের স্বাভাবিক শক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে বুদ্ধিকে বাবু করিয়া তোলা হয়।

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতের একটা mission আছে, একটা গৌরবময় ভবিষ্যৎ আছে ; সেই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী আমরাই। নূতন ভারতের মুক্তির ইতিহাস আমরাই রচনা করছি এবং করব। এই বিশ্বাস আছে বলেই আমরা সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারি, অন্ধকারময় বর্তমানকে অগ্রাহ্য করতে পারি, বাস্তবের নিষ্ঠুর সত্যগুলি আদর্শের কঠিন আঘাতে ধূলিসাৎ করতে পারি।

— সুভাষচন্দ্র বসু

Any system of education which ignores Indian conditions, requirements, history and sociology is too unscientific to commend itself to any rational support.

— Subhas Chandra Bose

Price : Rs. 225.00

Published by : Netaji Subhas Open University, 1 Woodburn Park, Kolkata–700 020 and
Printed at : Calcutta Repro Graphics, 36/8B Sahitya Parishad Street, Kolkata-700 006

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

STUDY MATERIAL

EPA

PAPER II
MODULES 5 - 8

ELECTIVE PUBLIC ADMINISTRATION HONOURS

প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমত কোনো বিষয়ে সাম্মানিক (honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণ ক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোনো শিক্ষার্থীও এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হ'তে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার

উপাচার্য

ষষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ : মার্চ, 2013

ভারত সরকারের দূরশিক্ষা পর্ষদের বিধি অনুযায়ী এবং অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations and financial assistance of the
Distance Education Council, Government of India.

পরিচিতি

বিষয় : ঐচ্ছিক জন-প্রশাসন (দ্বিতীয় পত্র) **সাম্মানিক স্তর**

পাঠক্রম ঃ EPA 02 : 5-8

	রচনা	সম্পাদনা
একক 24	অধ্যাপক দেবাশিস চক্রবর্তী	অধ্যাপক অমিয় চৌধুরি
একক 25	অধ্যাপক দেবাশিস চক্রবর্তী	অধ্যাপক অমিয় চৌধুরি
একক 26	অধ্যাপক দেবাশিস চক্রবর্তী	অধ্যাপক সমীরেন্দ্র নাথ রায়
একক 27	ঐ	ঐ
একক 28	ঐ	ঐ
একক 29	ঐ	ঐ
একক 30	অধ্যাপক দেবাশিস চক্রবর্তী	অধ্যাপক সমীর রায়

ঘোষণা

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

অধ্যাপক (ড.) দেবেশ রায়
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

EPA — 2

জনপ্রশাসনের

ঐচ্ছিক পাঠক্রম

পর্যায়

5

একক 18 ❑ প্রাক্-স্বাধীন ভারতবর্ষে সাংবিধানিক বিকাশের ধারা ঃ ১৮৫৮-১৯০৯ ৯ – ২৬

একক 19 ❑ প্রাক্-স্বাধীন ভারতবর্ষে সাংবিধানিক বিকাশের ধারা ঃ সংস্কার আইন, ১৯০৯ ও ১৯৩৫ সালের মধ্যবর্তী সময়কাল ২৭ – ৪৯

একক 20 ❑ প্রাক্-স্বাধীন ভারতবর্ষে সাংবিধানিক বিকাশের ধারা ঃ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ৫০ – ৬২

একক 21 ❑ প্রাক্-স্বাধীন ভারতবর্ষে সাংবিধানিক বিকাশের ধারা ঃ ১৯৩৫-১৯৪৭ ৬৩ – ৮১

পর্যায়

6

একক 22 ❑ ভারতে নতুন সংবিধান রচনার উদ্যোগ ৮৫ – ৯৮

একক 23 ❑ ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ৯৯ – ১১৪

একক 24 ❑ অধিকার, কর্তব্য, রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি ১১৫ – ১৩৫

একক 25 ❑ সংবিধান সংশোধন ১৩৬ – ১৪৪

পর্যায়

7

একক 26	❑	রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদ	১৪৭ – ১৭০
একক 27	❑	আইনসভা	১৭১ – ২০৩
একক 28	❑	রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্য মন্ত্রিপরিষদ	২০৪ – ২২০
একক 29	❑	রাজ্য আইনসভা	২২১ – ২৪৯

পর্যায়

8

একক 30	❑	সুপ্রিমকোর্ট ঃ গঠন ও ভূমিকা	২৫৩ – ২৬৮
একক 31	❑	বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা	২৬৯ – ২৮২
একক 32	❑	হাইকোর্ট ঃ গঠন ও ভূমিকা	২৮৩ – ২৯৪
একক 33	❑	অধস্তন বিচারালয় (শাসন বিভাগ ও বিচারবিভাগের পৃথকীকরণ)	২৯৫ – ৩০৬

পর্যায় ৫ ঃ ভূমিকা

এই পর্যায়ে ভারতবর্ষে সাংবিধানিক বিকাশের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস শিক্ষার্থী পাঠকের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। এই ইতিহাস সাধারণভাবে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের শেষ একশো বছরের ইতিহাস হলেও স্বাধীন ভারতের সংবিধান ও প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশে এই সময়কালের গুরুত্ব অপরিসীম। ভারতের বর্তমান সংবিধান ও শাসনব্যবস্থার প্রকৃতি বুঝতে গেলে ব্রিটিশ শাসনের এই শেষ একশো বছরের বিবর্তনের ধারাটিকে অত্যন্ত গভীরভাবে অনুসরণ করা দরকার; কারণ ওই ঐতিহাসিক সময়কালের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ঘটনা ও শক্তিসমূহ শুধুমাত্র ভারতের জাতীয় চেতনা ও জাতীয় আন্দোলনের উন্মেষে সহায়তা করেছে তাই নয়, স্বাধীনতা, স্বরাজ, স্বায়ত্তশাসন ও সংবিধান সম্পর্কে ভারতবাসীর মনে এক নতুন প্রত্যয় জাগিয়ে তুলেছে। স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক ও প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান ব্রিটিশ শাসনতান্ত্রিক নীতি ও সংস্কারের ক্রমবিবর্তিত রূপ হিসাবে কীভাবে আত্মপ্রকাশ করল বর্তমান পর্যায়ের বিভিন্ন এককের আলোচনা থেকে শিক্ষার্থী পাঠক তা জানতে পারবেন।

এই পর্যায়ের এককগুলি বিষয়বস্তু নিম্নরূপ

১৮তম এককে ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের আলোচনা স্থান পেয়েছে। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধের পর ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ব্রিটিশ বণিক মূলধনের প্রতিনিধি হিসাবে ভারতে এসে ক্রমশ রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করে। ১৭৭৩ সাল থেকে কোম্পানির ভারত শাসন ব্যাপারে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট নিয়ন্ত্রণী ক্ষমতা ব্যবহার করলেও ১৮৫৮ সালে ভারত শাসনভার কোম্পানির হাত থেকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাতে হস্তান্তরিত হল। ১৯৫৮ থেকে ১৯০৯—এই সময়কালের মধ্যে ভারত শাসনের জন্য যে সব বিধিব্যবস্থা রচিত হয়েছে, নির্বাচন ও আইনসভা সম্প্রসারণের যে ব্যবস্থা হয়েছে এই এককে তার বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ভারত শাসনের ক্ষেত্রে যে এই সময় থেকেই একটি নতুন ধারা সূচিত হল শিক্ষার্থী পাঠক সে বিষয়ে অবহিত হবেন।

১৯তম এককে প্রাক্-স্বাধীন ভারতবর্ষে ১৯০৯ থেকে ১৯৩৫ এই সময়কালের শাসনসংস্কার ও ভারত শাসনের ধারাটির বিবরণ দেওয়া হয়েছে। ১৯০৯ সালের মন্টফোর্ড শাসনসংস্কার ও ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন এই সময়ের দুটি উল্লেখযোগ্য শাসনতান্ত্রিক পদক্ষেপ। রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে এই সময়টি ঐতিহাসিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

২০তম এককে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের উপর একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ আছে। ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার ভিত্তি প্রস্তুতে এবং ভারতীয় সংবিধান ও শাসনব্যবস্থার রূপদানে এই আইনের বিশেষ প্রভাব ছিল। গণপরিষদের সদস্যরা, বিশেষতঃ সংবিধান খসড়া কমিটির সদস্যরা ভারতীয় সংবিধানের জন্য নতুন তথ্য বা উপাদানের কথা ভাবলেও ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অভিজ্ঞতার উপর দাঁড়িয়েই সংবিধানকে রূপদানের কথা বিবেচনা করেছেন।

২১তম এককে স্বাধীনতার পূর্ববর্তীকালের শেষ দশ-বারো বছরের শাসনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতির পরিচয় পেশ করা হয়েছে। প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা গঠন, পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাব, ভারত ছাড়ো আন্দোলন, ক্রীপস প্রস্তাব, ক্যাবিনট মিশন পরিকল্পনা, অ্যাটলবি ঘোষণা, মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা, ক্ষমতা হস্তান্তর, ভারত বিভাগ এবং ভারতীয় স্বাধীনতা আইন—নানা ঘটনা ও ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে কীভাবে এক স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের সৃষ্টি হল এবং শুরু হল এক নতুন ভারতের পদযাত্রা এই একক পাঠ করলে শিক্ষার্থী পাঠক সে সম্পর্কে এক ধারণা লাভ করতে পারবেন।

একক ১৮ ❑ প্রাক্‌-স্বাধীন ভারতবর্ষে সাংবিধানিক বিকাশের ধারা ঃ ১৮৫৮-১৯০৯

গঠন

১৮.০ উদ্দেশ্য
১৮.১ প্রস্তাবনা
১৮.২ মূল আলোচনা
১৮.২.১ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন ও ব্রিটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ আগমনের পটভূমি
১৮.৩ ১৮৫৮ সালের ভারত শাসন আইন
১৮.৪ ১৮৬১ সালের ভারতীয় পরিষদ আইন
১৮.৫ ১৮৬১ ও ১৮৯২-এর মধ্যবর্তী সময়ে রাজনৈতিক, প্রশাসনকি ও রাজনৈতিক অগ্রগতি
১৮.৬ ১৮৯২ সালের ভারতীয় পরিষদ আইন ঃ সাধারণ বৈশিষ্ট্য
১৮.৭ সারাংশ
১৮.৮ অনুশীলনী
১৮.৯ উত্তরমালা
১৮.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১৮.০ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করলে আপনি

- ১৮৫৭ সালের পর থেকে প্রায় ৫০ বছরের অধিককাল সময়ের ভারতের রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক বিবর্তনের গতিটি জানতে পারবেন।
- কীভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য শাসনের রূপ পরিবর্তিত হল এবং ব্রিটিশরাজের প্রত্যক্ষ শাসন প্রতিষ্ঠিত হল সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- ১৮৫৮ সালের পর থেকে যে সব আইনগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা আগামী ৫০ বছরে ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ করেছে তার বৈশিষ্ট্য ও রাজনৈতিক তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন।
- এই সময়ের রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারাটি বিচার করতে পারবেন।

১৮.১ প্রস্তাবনা

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক পালা বদলের সূচনা করে। ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দীর্ঘকালের শাসনের অবসান ঘটে। ইতিপূর্বে নিয়ন্ত্রণকারী আইন ও বিভিন্ন সনদ আইনের মাধ্যমে কোম্পানীর ক্ষমতাকে ব্রিটিশ রাজশক্তির নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হলেও কোম্পানির শাসনে ছেদ ঘটেনি। সিপাহী বিদ্রোহ কোম্পানির শাসনের দুর্বলতাকে প্রতিপন্ন করে। ভারতবর্ষে কোম্পানির শাসনের বিরুদ্ধে। জনমত সংগঠিত হয়। বিষয়টি নিয়ে ইংলন্ডেও আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং ব্রিটিশ শাসকের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। ১৮৫৮ সালের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে ভারতের শাসনভার কোম্পানির হাত থেকে সরাসরি ব্রিটিশ রাজশক্তির হাতে অর্পণ করা হল। বর্তমান পাঠের প্রথম অংশে কোম্পানির শাসন কীভাবে এবং কোন্ পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ রাজশক্তির হাতে

হস্তান্তরিত হল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এরপর ১৮৫৮ সালের ভারত শাসন আইনের বৈশিষ্ট্য ও এই আইনের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক তাৎপর্য আলোচনা করা হয়েছে। শিক্ষার্থী পাঠক লক্ষ্য করবেন এই সময় থেকে কীভাবে ভাইসরয় রানির পক্ষে শাসনকার্য পরিচালনার সর্বময় অধিকর্তা হলেন, ভারত সচিবের হতে সমস্ত ভারতের শাসন বিভাগীয় দায়িত্ব ন্যস্ত হল এবং ভারত পরিষদ নামে একটি সংস্থা সৃষ্টি করে ভারতের ইংরেজ সরকারের প্রত্যক্ষ শাসনের এক নব প্রশাসনিক শৃঙ্খলা সৃষ্টি হল। ইংরেজ সরকার ১৮৫৮ সালের আইনকে ভারত শাসনের উৎকর্ষমূলক বিধিব্যবস্থা বলে চিহ্নিত করেছে।

এই এককের মূল আলোচনার পরবর্তী অংশে ১৮৬১ থেকে ১৮৯১ এবং ১৮৯২ থেকে ১৯০৯ সালের পূর্ব পর্যন্ত ব্রিটিশ ভারতীয় পরিষদীয় আইনের বিবর্তন ও রূপ সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু সাধারণ ধারণা দেওয়া হয়েছে। গভর্নর জেনারেলের পরিষদের এক সদস্যবিশিষ্ট পরিষদ কেমনভাবে ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হল, আইনসভা ও আইন প্রণয়নের পদ্ধতিতে এই পর্বে কি পরিবর্তন এল প্রসঙ্গত সেই আলোচনাই এই এককে গুরুত্ব লাভ করেছে। আলোচনার শেষ অংশে লর্ড কার্জনের বঙ্গ বিভাগ ও তাকে কেন্দ্র করে যে রাজনৈতিক আন্দোলনের বিস্তার ঘটেছে সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বের ইতিহাস দিয়েই মূল আলোচনা শুরু হয়েছে।

১৮.২ মূল আলোচনা

১৮.২.১ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন ও ব্রিটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ শাসনের পটভূমি

ভারতবর্ষে সাংবিধানিক বিবর্তনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক্‌চিহ্ন হিসাবে গণ্য করা যায় সেই সময়টিকে যখন প্রাচ্য দেশে ব্যাবসায়িক সনদের অধিকার নিয়ে ইংরেজ বণিক-মূলধনের প্রতিনিধি হিসাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারতবর্ষে আসে। ১৬০৭ থেকে ১৭০৭ এই একশো বছর বাণিজ্যিক স্বার্থ সুরক্ষিত করতে কোম্পানি প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলা, সামরিক ও বিচার ক্ষমতা প্রয়োগ এবং ব্যবসায়িক সুযোগ-সুবিধার পরিপূর্ণ সদ্ব্যহার করার কাজে ব্যস্ত থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতে রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে কোম্পানি ক্রমশ দেশীয় রাজনীতিতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে। বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা ও মুনাফার স্বার্থেই নিজস্ব ব্যাবসায়িক এলাকা ও কারখানার আশেপাশে প্রশাসনিক, সামরিক ও বিচার ক্ষমতাকে ব্যবহার করার যে অভিজ্ঞতা কোম্পানি লাভ করেছে সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েই এক সময় কোম্পানি ভারতে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠায় উদোগী হল। মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙন, দেশীয় রাজাদের ক্ষমতা বিরোধ এবং অবশ্যই নিজস্ব কূটনৈতিক ও সামরিক শক্তি কোম্পানিকে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছে। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে কোম্পানির হাতে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ভারতে ইংরেজ তথা কোম্পানির রাজত্বের সূচনা করে। এই সময় থেকেই ব্যবসায় একচেটিয়া অধিকার ও এদেশের আর্থিক সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার সুযোগ-সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে শুরু হল কোম্পানির রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা।

> **প্রান্তলিপি ঃ** ১৬০০ সালে রানী প্রথম এলিজাভেত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে রাজকীয় সনদ প্রদান করে প্রাচ্যে ব্যবসায়ের অধিকার দেন। ১৬০৭ সালে ভারতে আসার পর কোম্পানি নিজের বাণিজ্যিক অধিকার সুরক্ষিত করতে রাজকীয় সনদ বলে সামরিক বিচারক্ষমতা লাভ করে। ১৬৬১, ১৬৬৯, ১৬৭৮, ১৬৮৩, ১৬৯৮ সালের সনদ বলে একচেটিয়া আর্থিক বাণিজ্যিক অধিকারের সঙ্গে নিজের এলাকায় প্রশাসনিক, সামরিক ও বিচারক্ষমতা ব্যবসারের সুযোগ লাভ কোম্পানিকে পরোক্ষে এদেশে রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তারের সুযোগ করে দেয়।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোর্ট অব ডাইরেক্টর (Court of Directorate) প্রাথমিকভাবে কারখানা প্রশাসন, আইন ও বিচারের সীমিত ক্ষমতা নিজের এলাকায় ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছে রানির সনদ ও দেশীয় রাজাদের সঙ্গে

বোঝাপড়ার ভিত্তিতে। পরবর্তীকালে ব্যাবসায়িক ও সরকারি কার্যাবলি পরিচালনায় কোম্পানি অধিকৃত এলাকায় (কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী) গভর্নরের কাউন্সিল গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেয়েছে। ১৭৬৫ সালে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভের মধ্য দিয়ে কোম্পানির আঞ্চলিক সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। বাণিজ্যিক গোষ্ঠীর আঞ্চলিক ক্ষমতা ক্রমশ প্রসারিত হল এবং বাড়তে লাগল ক্ষমতার চরম অপব্যবহারের ঘটনা। পীড়ন, পোষণ ও লুণ্ঠনের মাধ্যমে রাজনৈতিক আধিপত্য প্রসারিত হলেও প্রশাসন ও ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে কোম্পানির শাসনের ভারসাম্য নষ্ট হল। দেওয়ানি অধিকার লাভের মধ্য দিয়ে কোম্পানি যে শাসনাধিকার লাভ করেছে, দেশে দ্বৈত শাসনের যে ধারা সৃষ্টি হয়েছে ভারতবর্ষে তা কোনও অনুকূল প্রভাব ফেলে নি। শুধু ভারতীয়রাই নয় কোম্পানির শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা গেল ইংলন্ডেও। অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith), জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill)-এর মতো উদার চিন্তাবিদ এবং শিল্পবিপ্লবের যুগে আবির্ভূত উদীয়মান শিল্পগোষ্ঠী কোম্পানির শাসনের বিরোধিতা শুরু করেন। দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাবশালী নতুন শিল্পগোষ্ঠী ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উপর চাপ সৃষ্টি করে কোম্পানির অধিকার খর্ব করার জন্য। ১৭৭৩ সাল থেকেই ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভরত শাসন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ শুরু করে।

১৭৭৩ সালের নিয়ন্ত্রণী আইন (Regulating Act) বা ১৭৮৪ সালে গঠিত ক্ষুদ্র পার্লামেন্টীয় সংস্থা বোর্ড অব কন্ট্রোল (Board of Control), ১৭৯৩ থেকে ১৮৫৩ সালে প্রবর্তিত বিভিন্ন সনদ আইনের (The Charter Acts) মাধ্যমে কোম্পানি শাসনের উপর ব্রিটিশ পার্লামেন্ট যে বিধিনিষেধ বা নিয়ন্ত্রণ জারি করেছে তাতে এটিই প্রমাণিত হয়েছে কোম্পানির শাসনের উপর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের আর আস্থা নেই এবং কোম্পানি নিছক একটি প্রশাসনিক সংস্থার (An Administrative Organization) অধিক কিছু নয়। ১৮৫৩ সালের পর থেকে আইন পরিষদ (Legislative Council) ব্যবস্থার সৃষ্টি একই সঙ্গে এদেশে পার্লামেন্টীয় শাসনের বিবর্তন ও কোম্পানির শাসনের অবসানের পথ প্রশস্ত করেছে। ১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং অ্যাক্টের মধ্য দিয়ে ভারতে লিখিত ও নিয়মতান্ত্রিক শাসনের সূচনা হল। ১৭৮৪ সালের পিটের ভারত শাসন আইন (Pitt's India Act), বোর্ড অব কন্ট্রোল, গোপন কমিটি (Committee of Secrecy) ইত্যাদির মধ্য দিয়ে পার্লামেন্টীয় শাসনের যে এক অস্পষ্ট ধারা সৃষ্টি করে, ১৮৫৩ সালের পর প্রতিষ্ঠিত আইন পরিষদ সেই শাসনের ক্ষেত্রে একটি নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। কোম্পানি শাসনে শোষণ-পীড়নের মাধ্যমে, জনবিরোধী আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে শাসনক্ষমতা বিস্তারের যে চেষ্টা ছিল তার পরিণতি হিসাবে দেখা দিয়েছিল শিল্পসঙ্কট, দারিদ্র্য, কৃষক বিদ্রোহ, কোম্পানির শাসনের এই প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হতে এবং ভারত শাসনের ক্ষেত্রে একটি নতুন ধারার সূচনা করতে শাসন, আইন ও প্রশাসনে আধিপত্যের এক নতুন কৌশলের সূচনা করে ব্রিটিশ শাসক। শাসন সংস্কার, পার্লামেন্টীয় নীতির উদ্ভাবন একটি সুনির্দিষ্ট, সুস্পষ্ট শাসন ও প্রশাসনের ধারা সৃষ্টি করে।

প্রান্তলিপি ঃ এই যুগে কৃষক বিদ্রোহগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল ফারায়েজ বিদ্রোহ, চোয়াড় বিদ্রোহ, নদীয়া ও ময়মনসিংহ জেলায় কৃষক বিদ্রোহ এবং সিধু-কানুর নেতৃত্বে সাঁওতাল বিদ্রোহ। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই এই বিদ্রোহগুলি সংঘটিত হয়েছিল।

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পর কোম্পানির শাসন সম্পর্কে ব্রিটিশ রাজের মোহ কেটে যায়। সিপাহী বিদ্রোহের সূচনা ও প্রসার ব্রিটিশ শাসককে ভারত শাসনের সমস্ত পরিস্থিতিকে নতুন করে বিচার-বিবেচনা করতে বাধ্য করে। কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটিয়ে ব্রিটিশ শাসকের সরাসরি শাসন এবং উৎকৃষ্ট বিধিব্যবস্থার মাধ্যমে ভারতবর্ষকে নতুনভাবে পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ব্রিটিশ সরকার। ১৮৫৮ সালের ভারত শাসন আইনের (The Government of India Act, 1858) মধ্য দিয়ে এই পালাবদলের সূচনা হয়। পরবর্তী পাঠে এই আইনটির বৈশিষ্ট্য ও প্রশাসনিক তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করব।

১৮.৩ ১৮৫৮ সালের ভারত শাসন আইন

১৭৭৩ সালের নিয়ন্ত্রণী আইন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাসে প্রথম বিধিবন্ধ সংসদীয় আইন হিসাবে পরিচিত হলেও ১৮৫৮ সালের ভারত শাসন আইন ভারতে পার্লামেন্টীয় ও প্রশাসনিক পদ্ধতির প্রসারে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। ব্রিটেনে হুইগ ও টোরী (The Whigs and the Tories) দুটি রাজনৈতিক দলই একমত হয়েছে ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন ব্রিটিশ শাসকের বৃহত্তর স্বার্থেই আর কাম্য নয়। কোম্পানির মতো একটি বাণিজ্যিক সংস্থা ও তার প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের হাতে ভারতের শাসনভার না রেখে ব্রিটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ শাসন এবং অবশ্যই এক উৎকৃষ্ট শাসনপ্রণালী প্রবর্তন করা দরকার। প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছে ১৮৫৩ সালের সনদ আইনের (The Charter Act of 1853) মধ্য দিয়ে। একটি সম্পন্ন হল ইংলন্ডের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লর্ড পামারস্টোনের (Lord Palmerstone) উদ্যোগে কমন্সসভায় উত্থাপিত একটি বিলের মাধ্যমে। ১২ ফ্রেব্রুয়ারি ১৮৫৮ সালে উত্থাপিত এই বিলটিতে প্রস্তাব করা হল ৮ সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিষদের (Council) সহায়তায় ভারতের শাসন ও প্রশাসনের দায়িত্ব নেবেন একজন রাষ্ট্রপতি। রানির পক্ষে ভাইসরয় নামে পরিচিত এই রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বেই ভারতের শাসনকার্য পরিচালিত হবে। অবশ্য পামারস্টোন সরকারের নেতৃত্বে বিলটি শেষপর্যন্ত আইনসভায় পাশ হয় নি। বিলটির দ্বিতীয় পাঠ পর্যায় অতিক্রান্ত হবার পরে পামারস্টোন মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করে। লর্ড ডার্বির (Lord Derby) মন্ত্রীসভায় অর্থমন্ত্রী (Chancellor of Edchequer) ডিসরেলী (Disraeli) একটি সংশোধিত বিল উত্থাপনের চেষ্টা করে সমর্থন পান নি। শেষপর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সভাপতি লর্ড স্ট্যানলে যে বিলটি উত্থাপন করেন সেটি পাশ হয় এবং ১৮৫৮ সালের আইন নামে পরিচিত হয়।

লর্ড পামারস্টোনের বক্তব্য ছিল কোম্পানি শাসিত পূর্বের সরকারী ব্যবস্থা পরিচালনার দিক থেকে অত্যন্ত অসুবিধাজনক ও কষ্টসাধ্য এক ব্যবস্থা (".....I venture to think that the arrangement so made was a most inconvenient and most cumbrous arrangement" Lord Palmerstone)। দায়িত্বশীল রাজনীতি ও প্রশাসনের নিয়ম মেনে এই ব্যবস্থা চলেনি। পার্লামেন্ট, জনমত বা রানি কোনও সংস্থার কাছেই দায়িত্বশীল ছিল না কোম্পানির প্রশাসন। পরিচালক, নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ এবং গভর্নর-জেনারেল—এই তিন পরিচালন কর্তৃপক্ষের মধ্যে ক্ষমতা বিভাজন কর্তব্য পালনে বিলম্ব সৃষ্টি করেছে সঠিক কোন নীতি বা ব্যবস্থা গ্রহণও সম্ভবপর হয় নি। বাধা ও নিয়ন্ত্রণের জটিল ব্যবস্থা, কোম্পানির এলাকায় ক্যাবিনেটের সঠিক নিয়ন্ত্রণের অভাব শাসনের মূল উদ্দেশ্যকেই ব্যাহত করেছে। নতুন আইনবলে ব্রিটিশ রাজশক্তির হাতে ভারত শাসনভার হস্তান্তরিত হবে এবং রানির এই প্রশাসন (Crown administration) হবে প্রকৃত দায়িত্বশীল প্রশাসন। নতুন ব্যবস্থা হবে রানির কাছে দায়িত্বশীল একক কর্তৃত্বসম্পন্ন এক সরকারি ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার পরিচালনায় থাকবেন রাণির দায়িত্বশীল মন্ত্রীবর্গ যাঁরা পার্লামেন্টের সদস্য, পার্লামেন্টের কাছে দায়বন্ধ এবং একইসঙ্গে যাঁরা কার্য নির্বাহের জন্য জনমতের কাছেও দায়িত্বশীল। পামারস্টোনের বিলে বর্তমান ব্যবস্থার পরিবর্তন চাওয়া হয়নি, প্রচলিত প্রশাসনিক সংগঠনের পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। ভারত বিষয়ক ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে যে সরকারি সংবাদ বা নির্দেশ (Despatch) পাঠানো হবে তাতে পরিচালকের কোর্ট নয়, নবগঠিত বোর্ড ও পরিষদের সভাপতির স্বাক্ষর থাকবে। এই নতুন ব্যবস্থা ভারতের জনসাধারণ ও নৃপতিবর্গের মধ্যেও একটি ভালো ধারণা সৃষ্টিতে সাহায্য করবে। রানির কাছে সরকারি ব্যবস্থার হস্তান্তর ভারতের উপর ইংলন্ডের নৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাবকেও সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করে তুলবে বলে পামারস্টোন আশা প্রকাশ করেছেন।

বাধা বা বিলম্ব হলেও, পামারস্টোন সরকারের পতন হলেও বিলটির যথার্থতা অনুভব করে পরবর্তীকালের ব্রিটিশ সরকার বিলটিকে আইনে পরিণত করেছে। এবার আসুন এই নতুন ভারত শাসন আইনের বৈশিষ্ট্যগুলি কী বা এই আইনের অভিনবত্ব কী সে বিষয়ে আমরা আলোকপাত করি।

১৮৫৮ সালের ২ আগস্ট প্রণীত আইনটিকে ভারত শাসনের উৎকৃষ্ট বিধিব্যবস্থা (An Act for the Better Government of India) বলে বর্ণনা করা হল। শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে এই আইনটি যে সব সংস্কারের প্রস্তাব করেছে সেগুলি হল ঃ

(১) কোম্পানি অধিকৃত ভারতীয় ভূখণ্ডে এখন থেকে কোম্পানির কোনও অধিকার থাকবে না, এই ভূখণ্ডের সব ক্ষমতার অধিকারী হবেন রানি (Her Majesty) আইনগতভাবে ভারত পরিচিত হবে মহামান্যা রানির ভূখণ্ড (.....for the purposes of this Act India shall mean the territories vested in Her Majesty) নামে এবং রানির নামেই পরিচালিত হবে ভারতবর্ষ। কোম্পানির নামে প্রাপ্ত রাজস্ব, দান বা পাওনা রানির নামেই গ্রহণ করা হবে।

(২) কোম্পানির নিয়ন্ত্রণী পর্ষদ আর থাকবে না। শাসন পরিচালনার সব দায়িত্বই এখন থেকে রানির। কোম্পানি অধনীস্থ প্রতিরক্ষা বাহিনীর উপরও রানির পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল।

(৩) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বা তার পরিচালকবর্গের কোর্ট বা স্বত্বাধিকারীদের কোর্ট এতকাল যে সব আর্থিক বা প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেছে এখন থেকে নতুন আইন সৃষ্ট ভারত সচিবের (Secretary of State) হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত হল। ভারত সচিব এবং অধীনস্থ সচিবের বেতন ও ভাতাদি ধার্য হবে ভারতবর্ষে প্রাপ্ত রাজস্বের উপর।

(৪) ভারত পরিষদ (The Council of India) নামে সৃষ্ট একটি ১৫ জনের সংস্থা ভারত সচিবকে শাসন পরিচালনায় সাহায্য করবে। এই আইন প্রণয়ন হবার ১৪ দিনের মধ্যে বিদায়ী পরিচালকমণ্ডলীর সভা বা কোর্ট নব নিযুক্ত ভারত পরিষদের ৭ জন সদস্যকে নির্বাচিত করবে এবং বাকি আটজনকে নিযুক্ত করবেন রানির পক্ষে সরকার। ভারতবর্ষে কমপক্ষে দশ বছর বসবাস করেছেন বা কাজ হবার যোগ্য হবেন। পদাধিকারীরা অসদাচরণের কারণে পদচ্যুত হতে পারেন। পার্লামেন্টে বসার বা ভোট দেবার অধিকার তাদের নেই। তাদের লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে পদত্যাগ করার অধিকার আছে। এঁদের বেতন ও ভাতাও নির্ধারিত।

(৫) ভারতে পাঠানোর জন্য কোনও নির্দেশ বা যোগাযোগ বা ইংলন্ডে প্রস্তাবিত কোনও নির্দেশ ভারত সচিব পরিষদের সভায় পেশ করবেন সকল সদস্যকে অবগত করার জন্য। সকল সদস্যেরই তাঁদের মতামত সভার কার্যবিবরণী পুস্তকে নথিভুক্ত করার অধিকার থাকবে।

(৬) ভারত পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করবেন ভারত সচিব। প্রশাসনিক কোনও জরুরি বা গোপন বিষয়ে সভার সঙ্গে পরামর্শ না করে সচিব এককভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। পরিষদের সদস্যরা যদি ভারত সচিবের কোনও সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন, তাঁদের মতামত কার্যবিবরণীতে নথিভুক্ত করেন, সেক্ষেত্রে ভারত সচিব সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের বিরোধিতা করার কারণ কার্যবিবরণীতে নথিভুক্ত করতে পারেন।

(৭) গভর্নর-জেনারেল, গভর্নর-জেনারেলের কাউন্সিলের সদস্য, বিভিন্ন প্রেসিডেন্সির গভর্নর ইত্যাদিরা রানির আদেশ বলেই নিযুক্ত হবেন। প্রেসিডেন্সির কাউন্সিলের সদস্যদের, কাউন্সিলের সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতিতে নিয়োগ করবেন ভারত সচিব। প্রদেশ বা অন্য অঞ্চলের লেফটেন্যান্ট গভর্নরকে নিয়োগ করবেন রানির অনুমোদন নিয়ে গভর্নর জেনারেল। ভারত সচিব রানির আদেশক্রমে ভারতীয় রাষ্ট্র কৃত্যক কর্মচারীদের নিয়োগ করবেন। স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনীর কর্মচারীদের সরাসরি নিয়োগ করবেন রানি। ভারতীয় কৃত্যকের নিয়োগ ও কার্য সংক্রান্ত নিয়মকানুন ভারতসচিব (স-পরিষদ ভারত সচিব) স্থির করবেন।

(৮) কোম্পানির সম্পত্তি এই আইন বলে রানির সম্পত্তি বলে গণ্য হবে। সমস্ত ব্যয় স-পরিষদ সচিবের নিয়ন্ত্রণাধীন। স-পরিষদ সচিব পার্লামেন্টে আয়-ব্যয়ের বাৎসরিক হিসাব পেশ করবেন। ভারতে সংঘটিত বিরোধ, যুদ্ধ ইত্যাদির ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে।

(৯) এই আইনে গভর্নর-জেনারেল, স-পরিষদ গভর্নর-জেনারেল ইত্যাদিদের ক্ষমতার কথাও বলা হয়েছে। গভর্নর-জেনারেলের অনুপস্থিতিতে কাউন্সিলে বয়স্ক সাধারণ সদস্যকে সহ-সভাপতি নিযুক্ত করে তার নেতৃত্বে সভা চালানো যেতে পারে একথাও আইনে বলা আছে। স-পরিষদ ভারত সচিবের নালিশ জানানোর এবং তার বিরুদ্ধে পরিষদের সদস্যদের নালিশ করার সুযোগ বা ব্যবস্থাও এই আইনে আছে। কোম্পানির সন্ধি, চুক্তি ইত্যাদি এর পর থেকে রানির ক্ষেত্রে অবশ্য পালনীয়।

১৮৫৮ সালের ১৫ জুলাই লর্ড সভায় প্রদত্ত ভাষণে নবগঠিত সরকারের প্রধানমন্ত্রীর লর্ড ডার্বি পামারস্টোনের বিলটির বিরোধিতা করে কোম্পানির শাসনকে যথার্থ ও যোগ্য শাসন বলে ঘোষণ করে যে সংশোধনী এনেছেন সেটি ব্রিটিশ পার্লামেন্ট অগ্রাহ্য করেছে। হুইগ এবং টোরী উভয় দলই শেষপর্যন্ত রানির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর, উচ্চপদস্থ অফিসারের মাধ্যমে ভারত শাসন, মন্ত্রীর পরামর্শ সভা হিসাবে পরিষদ গঠন ইত্যাদির ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করে। তবে কাউন্সিলের গঠন পদ্ধতি নিয়ে পামারস্টোনের আইনে যা বলা হয়েছে বর্তমান সরকার তার সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করে। কাউন্সিল ও ভারত সচিবের সম্পর্ক নিয়েও পূর্ববর্তী সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে বর্তমান সরকার একমত হয় নি।

শেষ পর্যন্ত ১৮৫৮ সালের ১ নভেম্বর রাজকীয় ঘোষণা (The Queen's Proclamation) জারি হয়। ঘোষণায় কোম্পানির শাসনভার রানি গ্রহণ করেন এবং লর্ড ক্যানিংকে (Lord Canning) ভারতের প্রথম ভাইসরয় ও গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত করে রানির পক্ষে তাঁকে ভারতের শাসনভার গ্রহণের দায়িত্ব দেওয়া হয়। একজন প্রধান ভারত সচিবের (Principal Secretary of State) মাধ্যমে রানি ও ভাইসরয়ের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার কথা বলা হয়। ঘোষণায় বলা হয়, কোনও রকম ভূখণ্ড বিস্তারের ইচ্ছা রানির সরকারের নেই তবে উপনিবেশের উপর কোনও আগ্রাসন বা রানির অধিকারের উপর আঘাত সহ্য করা হবে না। দেশীয় রাজ্যের রাজাদের অধিকার মর্যাদা ও সম্মানকে শ্রদ্ধা করা হবে। আমাদের সংকল্প হল জাতিধর্ম নির্বিশেষে যোগ্যতা অনুসারে ভারতীয়দের সরকারি কাজে নিযুক্ত করা। (".....We have resolved....to take up on Ourselves the Governance of the terrirories in India heretofore administered in trust for us by the Honourable East India Company.....We do hereby constitute and appoint....Viscount Canning, to be Our first Viceroy and Governor-General in and over Our said Territories and to administer the Government thereof in Our name, and generally to act in Our name, and on Our behalf....

.....We desire no extension of our present territorial Possessions....

.....We shall respect the Rights, Dignity, and Honour of Native Princes as Our own....

And it is our further will that....Our subjects, of whatever Race or Creed, be freely and impartially admitted to offices in Our service.....")

এবার আসুন, ভারত শাসন আইনের (১৮৫৮) তাৎপর্য নিয়ে আমরা সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকার ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার তুলনায় ১৮৫৮ সালের ভারত শাসন আইনে প্রতিষ্ঠিত নতুন ব্যবস্থা অবশ্যই অগ্রগতির সূচক। মালিকদের সভা (Court of Proprietors) ও পরিচালকদের সভা (Court of

Directors) ছিল অনিয়ন্ত্রিত প্রশাসনিক সংস্থা। বাণিজ্যিক সংস্থা বাণিজ্য ও মুনাফার কাজে সিদ্ধহস্ত হলেও সরকার বা প্রশাসন চালনোর কাজে একেবারেই অভিজ্ঞ ছিল না। জনসংযোগের অভাব, কল্যাণমূলক আইন ও কার্যকলাপের অনুপস্থিতি, দমনমূলক ও নিপীড়নমূলক প্রশাসন কোনও ভাবেই গণমুখী হতে পারে না। নিয়ন্ত্রণী আইনের (১৭৭৩, ১৭৮১, ১৭৮৪) মধ্য দিয়ে বা সনদ আইনের (১৭৯৩, ১৮১৩, ১৮৩৩, ১৮৫৩) মধ্য দিয়ে কোম্পানির শাসনকে নিয়ন্ত্রণ করার একটা প্রচেষ্টা হলেও এইসব আইনের মাধ্যমে একধরনের আপস রফার ব্যবস্থা হয়েছে মাত্র। এই আইনসমূহ ভারতের শাসনপ্রণালীতে কেন্দ্রিভূত শাসনের এক প্রবণতা সৃষ্টি করেছে, সারা দেশে একই ধরনের এক আইনিব্যবস্থা চালু করেছে। কোম্পানিকে রানির প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য করা হলেও বা কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলীতে রানির মনোনীত ব্যক্তিদেরস্থান হলেও, ভারতীয়দের কোম্পানির শাসন বা আইন ব্যবস্থার কোনও প্রতিনিধিত্ব ছিল না। ১৮৫৮ সালের আইন প্রচলিত শাসন পদ্ধতিতে ছেদ ঘটিয়েছে; ভারত শাসনের ক্ষেত্রে কোম্পানির একচ্ছত্র অধিকারের সমাপ্তি ঘটিয়ে দায়িত্বশীল শাসনের সূচনা করেছে। সরকারিভাবে এই আইনের তাৎপর্য হল ঃ

(১) সরকারি সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলি পূর্বের তুলনায় প্রতিনিধিমূলক এবং অবশ্যই সংগঠিত।

(২) স-পরিষদ ভারত সচিব ক্যাবিনেট শাসনের একটি নতুন ধারা সৃষ্টি করেছে। নিয়ন্ত্রণ, সমন্বয় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল শাসন, পার্লামেন্টীয় রীতি ও পদ্ধতির এক নব পরিমণ্ডল রচিত হয়েছে। ভারত সচবি, স-পরিষদ সচিব ও ইংলন্ডের সরকার—এই তিনটি স্তরের মধ্যে সংযোগ, সহযোগিতা, আনুগত্য ও দায়িত্ব পালনের আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা অবশ্যই অভিনব।

তবে ১৮৫৮ সালের ভারত শাসন আইন কার্যক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করতে ব্যর্থ হয়েছে। ভারত সচিবের নেতৃত্বে পরিচালিত শাসন গণমুখী শাসনের নজির সৃষ্টি করতে পারে নি। এদেশের মানুষের কল্যাণ বা উন্নতির স্বার্থে কোনও ব্যবস্থা গৃহীত হয় নি। জনসংযোগ বা দায়িত্বশীল শাসনের পরিবর্তে আমলাতান্ত্রিক শাসন ও ভারত সচিবের একাধিপত্যই চোখে পড়েছে। ভারত সচিব কোম্পানির বণিক ও ব্যাবসায়িক স্বার্থের উচ্ছেদে সমর্থ হলেও নতুন শিল্প-গোষ্ঠী ও শিল্পপুঁজির শাসন ও শোষণের হাতিয়ারে রূপান্তরিত হয়েছেন। ১৮৫৮ সালের আইনে ভারত সচিব ও স-পরিষদ ভারত সচিব সৃষ্টির ব্যবস্থা ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্য শাসনের এক কূটকৌশল মাত্র। ভারত সচিব, স-পরিষদ ভারত সচিব, গভর্নর-জেনারেল কোম্পানি আমলের পরিচালকমণ্ডলীর সভা বা নিয়ন্ত্রণী পর্ষদের চেয়ে গণতান্ত্রিক ও দায়িত্বশীল একথা বলা হলেও পার্লামেন্টীয় রীতি বা মানুষের প্রতি দায়িত্ব বা নয়, শিল্প-পুঁজিপতি ও ঔপনিবেশিক শাসনের স্বার্থরক্ষাই ছিল এদের প্রধান দায়িত্ব। রানির ঘোষণায় এদেশের উন্নতি ও সামাজিক বিকাশের জন্য অভ্যন্তরীণ শান্তি ও উৎকৃষ্ট সরকার উপহার দেবার বা দায়িত্ব পালনের যে অঙ্গীকার করা হয়েছে সেই প্রতিশ্রুতি পালন করা সম্ভব হয় নি প্রশাসনিক কর্তব্যকর্মে শিথিলতা এবং অবশ্যই শাসন পরিচালনার অদূরদর্শিতার কারণে।

তবে ১৮৫৮ সালের পরবর্তীকালে ভারতের সাংবিধাকি শাসনের ইতিহাসে পরিবর্তন ও রূপান্তরের একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে সেটা বোঝা যায় ব্রিটিশ সরাকর প্রবর্তিত প্রশাসনিক ও আইনগত সংস্কারগুলির মধ্য দিয়ে। ১৮৬১ সালের ভারতীয় পরিষদীয় আইন (The Indian Councils Act, 1861) এক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। আসুন, এবার আমরা এই পরিষদীয় আইনের বিষয়বস্তু ও বিশেষত্ব সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করি।

১৮.৪ ১৮৬১ সালের ভারতীয় পরিষদ আইন

ভারতীয় পরিষদ আইনের তিনটি উল্লেখযোগ্য দিক হল ঃ (১) প্রশাসনে ভারতীয়করণের এক গতি সঞ্চারিত করা (২) প্রশাসনে বিকেন্দ্রীকরণের নীতিকে গুরুত্বদান এবং (৩) ইংলন্ডের আইনসভার ধাঁচে এদেশেও আইনসভার এক ব্যবস্থাকে রূপদান। এই আইনের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হল ঃ

(১) গভর্নর-জেনারেলের কার্যনির্বাহী পরিষদে আইন বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন অতিরিক্ত সদস্য নিযুক্ত হবেন। কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যসংখ্যা ৪ থেকে বেড়ে হবে ৫।

(২) গভর্নর-জেনারেল তাঁর কার্যনির্বাহী পরিষদের কার্যপরিচালনার নিয়মকানুন রচনার অধিকার পেলেন। তাঁর অনুপস্থিতে সভার কার্যপরিচালনার জন্য একজন কাউন্সিলর নিয়োগের ক্ষমতাও তিনি পেলেন। নতুন আইন অনুসারে দপ্তর বা বিভাগীয় ব্যবস্থাও (Departmental System) চালু হল।

(৩) গভর্নর-জেনারেল তাঁর কার্যনির্বাহী পরিষদে ন্যূনতম ৬ ও সর্বাধিক ১২ জন সদস্য মনোনয়নের ক্ষমতা পেলেন। এঁদের কার্যকাল হবে দু'বছর। এই সদস্যদের মধ্যে অন্তত অর্ধেক সদস্য হবেন বেসরকারি ও ভারতীয়।

(৪) পরিষদের কাজ শুধু আইনগত ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে। শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণের কোনও ক্ষমতা এই পরিষদের নেই। কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, প্রস্তাব উত্থাপন বা বাজেট সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনার ক্ষমতা পরিষদের নেই।

(৫) গভর্নর-জেনারেলের আইনগত ক্ষেত্রে বিশেষ অধিকার থাকবে। কোনও বিলে সম্মতি দেওয়া, মহামান্য রানির অনুমতির জন্য কোনও বিল সংরক্ষণ করা, বিল উত্থাপনে সম্মতিদান, জরুরি অবস্থায় অস্থায়ী আইন জারি করার (৬ মাসের জন্য এই বিল বলবৎ হবে) ক্ষমতা গভর্নর-জেনারেলের থাকবে।

(৬) এই আইন গভর্নর-জেনারেলকে নতুন প্রদেশ গঠনের অধিকার দিয়েছে।

(৭) এই আইনে বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির স-পরিষদ গভর্নরদের আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ক্ষমতা দিয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আইন প্রণয়নের আগে গভর্নর-জেনারেলের পূর্ব অনুমতি নেবার ব্যবস্থা এক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক।

(৮) বাংলা, পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের জন্য আইন পরিষদ গঠনের অধিকারও এই আইন গভর্নর-জেনারেলকে দিয়েছে।

(৯) গভর্নর-জেনারেল এই আইনবলে বোম্বাই ও মাদ্রাজের কার্যনির্বাহী পরিষদে সর্বনিম্ন ৪ ও সর্বাধিক ৮ জন সদস্য নিয়োগ করতে পারবেন। এঁদের মধ্যে অন্তত অর্ধেক বেসরকারি ও ভারতীয় হবেন। এই দুই প্রেসিডেন্সির কার্যনির্বাহী পরিষদেরকাজকর্ম কেন্দ্রীয় পরিষদের মতো শুধুমাত্র আইনগত ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকবে। প্রাদেশিক কাউন্সিলে গৃহীত বিল প্রথমে প্রদেশের গভর্নর ও পরে গভর্নর-জেনারেলের অনুমোদনসহ পাশ হবে।

নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ১৮৬১ সালের আইন গুরুত্বপূর্ণ। নিতান্ত সীমাবদ্ধ হলেও আইন প্রণয়নে ভারতীয়দের অংশগ্রহণের সুযোগ এসেছে। ভারতীয় প্রতিনিধিরা নৃপতি, উচ্চবিত্ত এবং শিক্ষিত শ্রেণির প্রতিনিধি হলেও বা তাদের কোনও কার্যকর ক্ষমতা না থাকলেও আইনের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করার অধিকার তাঁদের ছিল। প্রশাসনিক ও

দায়িত্বশীল গণতন্ত্রের প্রচার প্রক্রিয়া যে ১৮৬১ সাল থেকেই শুরু হয়ে যায় তার বড় প্রমাণ হল ওই একই বছরে বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার সংগঠিত হল; প্রাদেশিক স্তরে আর্থিক ক্ষমতা বিভাজন ও বণ্টনের প্রক্রিয়া শুরু হল এবং সবচেয়ে বড় কথা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার প্রসারে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের তরফে বিশেষ উদ্যোগ লক্ষ্য করা গেল। ১৮৬১ সালের পরবর্তীকালের এই অগ্রগতি সম্পর্কে শিক্ষার্থী পাঠকের কিছু ধারণা হবে পরবর্তী অংশের আলোচনা থেকে।

১৮.৫ ১৮৬১ ও ১৮৯২-এর মধ্যবর্তী সময়ের সাংবিধানিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতি

প্রান্তলিপি ঃ প্রিভি কাউন্সিল হল নির্মাণ যুগে (একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে) রাজাকে পরামর্শ দেবার জন্য গঠিত একটি ক্ষুদ্র সভা। এই সভা বিচার, বিচার-সংক্রান্ত প্রশ্নে রাজাকে পরামর্শ দান করত। রায় দেবার অধিকার না থাকলেও আপিল বিচারের ক্ষমতা সভার ছিল।

১৮৬১ সালে পরিষদ আইনের পাশাপাশি ভারতীয় হাইকোর্ট আইন (The Indian High Courts Act, 1861) পাশ করে ইংরেজ সরকার এদেশের বিচারব্যবস্থার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার সাধন করতে প্রয়াসী হয়। এই আইন পূর্বে সুপ্রিমকোর্ট, সদর দেওয়ানি আদালত (Sudder Dewani Adalat), সদর নিজামত আদালত (Sudder Nizamat Adalat) ইত্যাদির বিলুপ্তি ঘটিয়ে হাইকোর্টের অধীনে সারা দেশে সমরূপ বিচারব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করেছে। হাইকোর্ট হল সর্বোচ্চ বিচারসংস্থা। এর অধীনে কলকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই ইত্যাদি প্রদেশের বিচারালয় থাকবে। ভারতের বিচারালয় ইংলন্ডের প্রিভি কাউন্সিলের (Privy Council) কর্তৃত্ব দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকবে। প্রিভি কাউন্সিলের বিচার ১৮৪৪ সালের একটি আইন দ্বারা পুনর্গঠিত হয়েছে। ছোট ছোট রাজ্যের বিচার সংক্রান্ত দায়িত্ব বিচার বিভাগীয় কমিশনারের (Judicial Commissioner) হাতে থাকবে। হাইকোর্টের মতোই এদের ক্ষমতা। ১৮৬৫-১৮৭৩ এই বছরগুলিতে দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত (Civil and Criminal Courts) সংক্রান্ত আইনও একটি সুনির্দিষ্ট গতি লাভ করেছে।

ভাইসরয় বা গভর্নর-জেনারেলের শাসন বিভাগীয় পরিষদের অধীনস্থ আইন প্রণয়ন সংস্থা, আইন প্রণয়নমূলক কমিটি, পরামর্শদান সভা, প্রধানত সরকারি প্রতিনিধিদের সভা নানাভাবে আইন পরিষদের ভূমিকাকে লঘু করার চেষ্টা হলেও এটা ঘটনা এই আইন পরিষদেই ছিল ভবিষ্যৎ ভারতীয় পার্লামেন্টের মূল বা অণু (nucleus)। ১৮৬২ সাল থেকে ১৮৮৮ এই দীর্ঘ ২৬ বছর কলকাতা এবং সিমলায় মিলিত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইনের প্রস্তাব করেছে এই সভা। প্রতি বছর গড়ে অন্তত ১৬টি অধিবেশনে মিলিত হওয়া এবং ২৩টির মতো আইন পাশ করার খতিয়ান একথা প্রমাণ করে আইনসভার কাজকর্মে তৎপরতা ছিল। আইনের লিপিবন্ধকরণ এবং সরলীকরণের প্রক্রিয়াটি যে রানির অধীনস্থ ভারতীয় প্রশাসনের আমল থেকেই শুরু হয়ে গেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। অপ্রয়োজনীয় আইনকে বিলুপ্ত করে নতুন আইন সংযোজন ও আইনের সুসংবন্ধকরণও ছিল আইন পরিষদের উদ্দেশ্য। ১৮৬২ থেকে ১৮৬৯—এই সাত বছর ভারত সরকারের আইন সদস্য ও পরামর্শদাতা ছিলেন স্যার হেনরী মেইন (Sir Henry Maine)। এই পর্যায়ে আইনের ক্ষেত্রে যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে এবং কার্যকারিতা, বোধগম্যতায় ও ব্যাপকতায় ভারতের আইন যে সমস্ত প্রতিযোগিতার ঊর্ধ্বে সে কথা এই বিশেষজ্ঞ আইনবিদ স্বীকার করেছেন। ("In force, intelligibility and in comprehensiveness the Indian Codes stand against all competition."—Henry Maine)

১৮৬২ থেকে ১৮৯২ এই তিরিশ বছরে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ আইনগত

সংস্কারের প্রস্তাব এসেছে। ফৌজদারি পদ্ধতি, বিচার পদ্ধতি, প্রকাশনা ও সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ, যুদ্ধ, বন্দি, স্থানীয় শাসন, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, পাঞ্জাব, মাদ্রাজের স্থানীয় শাসন ও আদালতব্যবস্থা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রস্তাব আইনসভায় অনুমোদিত হয়েছে। শুল্ক আইন, লবণ আইন, পেশা ও বৃত্তিগত লাইসেন্স, কারখানা আইন, যানবাহন আইন, কাগজী মুদ্রা আইন, ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত আইন, কৃষি ও ভূমি রাজস্ব সংক্রান্ত আইন এই পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক প্রস্তাব যা আইনসভায় অনুমোদিত হয়েছে। বিবাহবিধি, শিশুকন্যা হত্যা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সাম্মানিক ডিগ্রি দেবার ব্যবস্থা, বন্যজন্তু হত্যা ইত্যাদি সামাজিক ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রণী আইন গ্রহণ করা হয়েছে। শুধু নতুন আইন নয়, পুরানো আইনের সংশোধনে আইনসভার তৎপরতা উল্লেখযোগ্য।

স্থানীয় শাসনের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে ১৮৭০ সালে লর্ড মেয়োর প্রস্তাব এই পর্বে আইনের গণতন্ত্রীকরণের উল্লেখযোগ্য নজির। লর্ড মেয়ো (Lord Mayo) স্থানীয় স্বার্থ, সেবা তদারকী এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনকার্যে অর্থ বরাদ্দের গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের অপরিহার্যতার কথা বলেন। স্থানীয় শাসন এদেশের মানুষ ও ইউরোপীয়দের ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টিতেও সাহায্য করবে বলে তিনি মনে করেন। মেয়োর প্রস্তাবমতোই ১৮৭০ সালে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা এদেশে চালু হয়। বোম্বাই, কলকাতা ও মাদ্রাজে মিউনিসিপ্যাল সংস্থায় (Municipal Council) অর্ধেক সদস্য নির্বাচিত হবেন বলে ১৮৭২, ১৮৭৬ ও ১৮৭৮ সালের আইনে প্রস্তাব করা হয়। গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রে মাদ্রাজে ১৮৬৩ সালের শিক্ষা আইন (The Education Act, 1863), বাংলার চৌকিদারি পঞ্চায়েত ব্যবস্থা (Chowkidari Panchayat, 1870), ১৮৮২ সালে রিপনের প্রস্তাব (Repon's Resolution of 1882) কতকগুলি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। রিপনের প্রস্তাবকে সামনে রেখেই বঙ্গদেশে ১৮৮৫ সালে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন পাশ হয়। সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অগ্রগতির পাশাপাশি এই পর্বে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে। প্রদেশে অর্থনৈতিক ক্ষমতার হস্তান্তরের প্রস্তাব করে লর্ড মেয়ো প্রদেশের হাতে প্রাদেশিক স্বার্থে ব্যয় করার কিছু অধিকার দেবার কথা বলেছেন। কেন্দ্রীয় অনুদানের প্রস্তাবও মেয়ো করেছেন। পরবর্তীকালে ১৮৭৭ সালে লর্ড লিটন (Lord Lytton), ১৮৮২ সালে লর্ড রিপনও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব করেন।

> **প্রান্তলিপি ঃ** রিপনের প্রস্তাবে বলা হয়েছে স্থানীয় সরকারে শুধুমাত্র প্রশাসনিক উন্নয়নের স্বার্থেই নয়, রাজনৈতিক ও জনপ্রিয় শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রয়োজন। নিজেদের সরকারের অংশগ্রহণের ব্যাপারে ভারতীয়দের শিক্ষিত করে তোলা দরকার।

১৮৭০-১৮৯২ এই পর্বে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। এই পর্বে প্রশাসনিক ও সাংবিধানিক অগ্রগতির উৎস এবং ফলাফল দু'ভাবেই রাজনৈতিক অগ্রগতিকে ব্যাখ্যা করা চলে। রামমোহন ইত্যাদিরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উদারবাদ ও শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের যে দাবি করেছিলেন তার ফলশ্রুতি হিসাবেই এই পর্বের আইনগুলির প্রসার ঘটেছে, জাতীয় আন্দোলনের নেতারা একথা স্বীকার করেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বিচার পদ্ধতির সংস্কার, সাংবিধানিক সরকারের প্রচলন, দায়িত্বশীল শাসন, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রসার, ক্ষমতা-স্বতন্ত্রীকরণের ব্যবস্থা, শিক্ষার প্রসার সব কিছুই এই পর্বের রাজনৈতিক অগ্রগতির সূচক। ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবে জাতীয় আন্দোলনের যে সূচনা হয়েছিল, জাতীয় কংগ্রেসের উদ্ভব ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তা সংগঠিত রূপ ধারণ। ১৮৮৫ সালে ভারতের জাতীয় সংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। একজন অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ, লর্ড অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম, কংগ্রেসের (A. O. Hume) প্রতিষ্ঠায় বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ছিলেন উমেশচন্দ্র বনার্জী (W. C. Bonnerjea)। দাদাভাই নওরোজী, রাসবিহারী ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, উমেশচন্দ্র বনার্জী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃবর্গ জাতীয় কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে

সাংবিধানিকভাবে সংগঠিত করতে চেয়েছেন। ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে রাজনৈতিক যে সব প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় তার মধ্যে অন্যতম ছিল—সেনাবাহিনীর ব্যয় কমানো, ১৮৬১ সালের আইন পরিষদে নির্বাচিত প্রতিনিধি গ্রহণ ও অন্যান্য শাসন সংস্কারের দাবি এবং ভারতে রাষ্ট্র কৃত্যক পরীক্ষা গ্রহণ।

এই পর্যায়ে বঙ্গীয় প্রেস আইনের বিলোপ (Vernacular Press Act, 1878-82), ফৌজদারি পদ্ধতি সংশোধনী বিল (যা ইলবার্ট বিল নামে পরিচিত), বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন (The Bengal Tenancy Act, 1883-85), ভারতীয় অপরাধ আইন (Indian Penal Code, 1891) ইত্যাদির উপর গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক হয়েছে; পরিষদে মনোনীত ভারতীয়রা (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজন্যবর্গ বা তাদের প্রতিনিধি) বিতর্কে অংশ নিয়েছেন। বিতর্কের মান বা বিতর্কের বিষয়বস্তু থেকে একথা প্রতীয়মান হয় সে যুগে পার্লামেন্টীয় পদ্ধতি ও ব্যবস্থাদির প্রসার ঘটেছে, অভিজ্ঞ ও গণতান্ত্রিক চিন্তার সমাবেশ ঘটেছে।

১৮৫৮ ও তার পরবর্তীকালের ঘটনা পরম্পরাই ১৮৯২ সালের পরিষদীয় সংস্কারের পিছনে কাজ করেছেন বলে সংবিধান বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। পরিষদীয় সংস্কারের দাবি এসেছে ইংরাজি শিক্ষিত ভারতীয় নেতৃবর্গের কাছ থেকে, দেশীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ ও প্রচারের মাধ্যমে বিভিন্ন সংগঠিত সংস্থার দাবি ও আবেদনের সূত্রে ও অন্যান্য নানা ক্ষেত্র থেকে। নানা বিতর্ক, চাপ ও প্রভাব শেষপর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারের নতুন পরিষদীয় আইন প্রণয়নে বাধ্য করে। এলফিনস্টোন (Elphinstone), বেন্টিঙ্ক (Bentinck), মেটকাফ (Metcalfe) এবং মেকলের (Macaulay) উদার চিন্তা ও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে হেনরী সেমোর (Henry Seymour), উইলিয়াম হান্টার (William Hunter), জন ম্যালকম (John Malcolm), লর্ড রিপন (Lord Ripon) ইত্যাদিরা চেয়েছেন ভারতে উদার পার্লামেন্টীয় শাসনের এক ধারা প্রবর্তিত হোক। অন্যদিকে লর্ড লিটন (Lord Lytton), লর্ড ডাফরিন (Lord Dufferin), লর্ড সলস্‌বেরী (Lord Salisbury), জি. এন. কার্জন (G. N. Curjon), ইত্যাদিরা প্রতিনিধিমূলক ব্যবস্থা ও সাংবিধানিক শাসনের এই প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করে বক্তব্য রেখেছেন। ভারতে প্রতিনিধিমূলক শাসনের উপযুক্ততা নিয়ে এঁরা প্রশ্ন তুলেছেন। ইউরোপীয় ধাচের সাংবিধানিক ব্যবস্থা ভারতের মতো বিরাট জনবহুল দেশের পক্ষে সুবিধাজনক নয়, প্রতিনিধিমূলক সরকার প্রাচ্যদেশের পথ নয়, কংগ্রেসের হল ভারতীয়দের একটি ক্ষুদ্র অংশের মতো, ভারতে নির্বাচনের নীতি বা পদ্ধতি বিষয়ে সাধারণ দরিদ্র মানুষ অজ্ঞ; এইসব চুক্তিতে পরিষদীয় আইনের বিরোধিতা করা হয়েছে।

প্রান্তলিপি ঃ সোমপ্রকাশ, অমৃতবাজার পত্রিকা, সমাচার চন্দ্রিকা, রাজশাহী সমাচার ইত্যাদি পত্রিকায় পরিষদীয় সংস্কারের প্রশ্নে বিভিন্ন বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। সৈয়দ আহমদ খান, দাদাভাই নওরোজী, লালমোহন ঘোষ, উমেশচন্দ্র বনার্জী, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, মদনমোহন মালব্য পরিষদীয় সংস্কারের প্রশ্নে সরব ছিলেন। ব্রিটিশ ভারতীয় সভা, মিরাট সভা, ভারতসভা এবং কংগ্রেসও এ ব্যাপারে সংগঠিত প্রস্তাব এনেছে।

প্রান্তলিপি ঃ এই পর্যায়ে লর্ড লিটনের উগ্র সাম্রাজ্যবাদ ও দমননীতির চাপে ভারতে পরিষদীয় আইন ও সাংবিধানিক রাজনীতির গতি প্রায় স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ, অস্ত্র আইন পাশ করে ভারতীয়দের নিরস্ত্র করা, ভারতে তুলাবস্ত্রের ব্যবসাকে কঠিন প্রতিযোগিতার মধ্যে ফেলা—এগুলি প্রতিক্রিয়া- শীল ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্রিটিশ শাসনের পরিচয়। এই সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে প্রবল অসন্তোষ ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে।

বিরোধতা হলেও শেষপর্যন্ত ১৮৯২ সালে পরিষদীয় আইন সংশোধিত ও পরিমার্জিতরূপে পেশ হয়েছে। ১৮৬৬ সালে নথিভুক্ত লর্ড ডাফরিনের পর্যবেক্ষণ আইন পরিষদের সংস্কার, উদারীকরণ এবং ভারতীয়দের এক্ষেত্রে সহযোগিতার বিষয়ে ইতিবাচক ধারণা দেয়। ১৮৮৮ সালে ভারত সচিবকে পাঠানো কার্যবিবরণী পুস্তকে ডাফরিন জানান, ব্রিটিশ সরকারের দায়িত্বে শিথিলতা কাম্য নয়, ভারতীয়দের প্রশাসনে আরও বেশি করে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকা উচিত এবং ভাইসরয়ের আইন পরিষদ ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের এলাকা সম্প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন। প্রশাসনিক উদারীকরণের উপযুক্ত সময় উপস্থিত। পার্লামেন্টীয় এবং সাংবিধানিক সরকারীব্যবস্থা এদেশে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব

নয়, তবে ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবীদের প্রশাসনে প্রভাব বিস্তারের সুযোগ থাকা উচিত। লর্ড ডাফরিন নিযুক্ত কমিটি নানা আলাপ-আলোচনার পর ১৮৬১ সালের ভারতীয় পরিষদীয় আইনের সংশোধনী হিসাবে ১৮৯২ সালের আইনটিকে পেশ করে। মূল আলোচনার শেষ অংশে এই আইনটির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় শিক্ষার্থী পাঠক পাবেন।

১৮.৬ ১৮৯২ সালের ভারতীয় পরিষদ আইন ঃ সাধারণ বৈশিষ্ট্য

১৮৯২ সালের ভারতীয় পরিষদ আইনকে বলা হল 'An Act to Amend the Indian Councils Act, 1861', অর্থাৎ এই আইনটি হল ১৮৬১ সালের পরিষদ আইনের সংশোধনী। এই সংশোধনী আইনের বিশেষত্ব হল ঃ

(১) এই আইনে গভর্নর-জেনারেলের আইন পরিষদে অতিরিক্ত সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। পরিষদের সদস্য সংখ্যা কমপক্ষে ১০ ও সর্বাধিক ১৬ করা হয়। বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য সংখ্যা বাড়িয়ে করা হয় ন্যূনতম ৮ ও সর্বাধিক ২০। ১৬ জনের আইন পরিষদে বেসরকারি সদস্যের সংখ্যা হবে ২০।

(২) বাংলার গভর্নর কাউন্সিলে (Lieutenant Governors) ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যার পরিষদে স-পরিষদ গভর্নর-জেনারেল সদস্য নিয়োগ করবেন প্রয়োজনীয় ঘোষণা মারফত। বাংলার ক্ষেত্রে ২০ জন এবং অযোধ্যা ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের জন্য ১৫ জন সদস্য মনোনীত হবেন।

(৩) আইন পরিষদে সদস্য মনোনয়নের ব্যাপারে নিয়মকানুন স-পরিষদ গভর্নর-জেনারেল স-পরিষদ ভারত সচিবের অনুমোদন নিয়ে স্থির করবেন।

(৪) সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে সংশোধিত আইনে যে ব্যবস্থার কথা বলা হয় তা হল (ক) মনোনীত অতিরিক্ত সদস্যদের মধ্যে ৬ জনের বেশি সরকারি সদস্য থাকবেন না; (খ) বেসরকারি সদস্যদের মধ্যে বাংলা, মাদ্রাজ, বোম্বাই ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের স্থানীয় আইন পরিষদ থেকে ১ জন করে ৪ জনকে এবং বণিকসভা ১ জনকে নির্বাচিত করবে; (গ) বাকি সদস্যদের গভর্নর-জেনারেল কাজের ও প্রতিনিধিত্বের সুবিধা অনুসারে মনোনীত করবেন; (ঘ) কোনও পদ শূন্য হলে ওই পদে উপযুক্ত সংস্থা প্রতিনিধি মনোনয়নের জন্য গভর্নর-জেনারেলকে সুপারিশ করবেন; (ঙ) প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলিতে পরোক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা আছে। জেলা বোর্ড, পৌরসভা, বিশ্ববিদ্যালয়, বণিক ও শিল্পপতিদের সভা প্রাদেশিক আইন পরিষদে বেসরকারি সদস্যদের নাম সুপারিশ করবেন এবং এই সুপারিশের ভিত্তিতে গভর্নর-জেনারেল প্রদেশের আইন পরিষদে বেসরকারি সদস্যদের মনোনীত সুপারিশের ভিত্তিতে গভর্নর-জেনারেল প্রদেশের আইন পরিষদে বেসরকারি সদস্যদের মনোনীত করবেন; (চ) বেসরকারি সদস্যদের স্থানীয় আইন পরিষদে মনোনয়নের জন্য সুপারিশ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটের ভিত্তিতে হবে, বণিকসভার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বণিকসভায় নিয়ম মেনে এই সুপারিশ হবে; (ছ) স্থানীয় আইন পরিষদে সদস্য মনোনীত হবার সাধারণ যোগ্যতা হল প্রদেশে বসবাসের যোগ্যতা; (জ) দুমাসের মধ্যে গভর্নর-জেনারেলকে মনোনীত সদস্যের নাম সুপারিশ না করা হলে গভর্নর-জেনারেল যে অঞ্চল বা শ্রেণি থেকে সদস্য মনোনীত হবার কথা সংশ্লিষ্ট অঞ্চল বা শ্রেণি থেকে সদস্য মনোনয়ন করবেন; (ঝ) গভর্নর-জেনারেল সুপারিশ করা কোন ব্যক্তিকে আইন পরিষদে মনোনীত করতে রাজি না হলে, তাকে পুনারায় মনোনয়নের অনুরোধ জানানো হবে।

(৫) এই আইনে পরিষদের কাজ সম্পর্কে সাংবিধানিকভাবে কোনও পরিবর্তন নেই। কাউন্সিল তথা পরিষদের সভার কাজ সংক্রান্ত কিছু উল্লেখযোগ্য সংশোধন আছে। স-পরিষদ গভর্নর-জেনারেল পরিষদের বাজেট ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ইত্যাদির ক্ষেত্রে আলোচনা করবেন লিখিত ও ঘোষিত আইন মেনে। কাউন্সিলের

সভায়, কোনও প্রস্তাব পেশ বা আর্থিক আলোচনার বা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে ভোট দাবি করা, অর্থাৎ সভাকে বিভক্ত করার কোনও অধিকার সদস্যদের নেই। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে স-পরিষদ গভর্নর-জেনারেল স-পরিষদ ভারত সচিবের অনুমোদন নেবেন এবং এক্ষেত্রে পরিষদের সদস্যদের বিষয়টি সংশোধনের অধিকার নেই।

(৬) এই আইনে বাজেট বিতর্ক, প্রশ্ন জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে নিয়মাবলি স্থির করা হয়েছে। প্রতি বছরে বাজেট উপস্থিত ও ব্যাখ্যা এবং বাজেটের কপি সদস্যদের বিতরণ করা হবে। অর্থমন্ত্রী উত্থাপিত বাজেট বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন। সভাপতির পর্যবেক্ষণও সিদ্ধান্তমতো বাজেট আলোচনা শেষ হবে। তিন দিন আগে নোটিশ, প্রশ্নটি জানিয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসার অনুমতি কোনও সদস্যকে নিতে হবে। প্রশ্নের মধ্যে তথ্য জানার অধিকার থাকবে, সমালোচনা বা নিন্দা থাকবে না। সভাপতি যে কোনও প্রশ্নই কারণ না জানিয়েই বাতিল করে দিতে পারেন। ৩ দিনের সময়সীমা কমিয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসার অধিকার সভাপতিই দিতে পারেন। প্রশ্নের উত্তরের উপর কোনও আলোচনা চলবে না।

(৭) আইনগত প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে বর্তমান আইন পূর্বের আইনকেই অনুসরণ করেছে এবং এ ব্যাপারে সংশোধনী এসেছে ১৮৯৭ সালের পরে; তবে সংশোধিত নিয়মে তেমন কোনও বিরাট পরিবর্তন ছিল না। বিল উত্থাপনের জন্য বিলের বিবরণ, উদ্দেশ্য ও যুক্তিসহ নকল (Copy) সচিবের কাছে পাঠাতে হবে। বিল আইনে পরিণত হবার আগে বিলের প্রস্তাব প্রকাশিত ও আলোচনা হবে ইংরাজিতে এবং বাংলায়। কমিটি সমস্ত মতামত ও পরামর্শ বিবেচনা করবে। বিলের ব্যাপারে সব মতামতই গ্রহণের চেষ্টা হবে। বিলটি পাশ হবার পর কার্যে পরিণত হবার আগে ইংরাজি ও বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হবে।

(৮) আইন পরিষদের বিভাগীয় কাজকর্মে সচিব মুখ্য দায়িত্ব নেবেন। তাঁকে সাহায্য করবেন অধস্তন সচিব ও উপসচিব। দপ্তর বা বিভাগের সরকারি কর্মীদেরও আইনগত ও প্রশাসনিক ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব আছে।

নতুন আইন অনুসারে পরিষদের যে বিস্তার ঘটেছে তাতে পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের মতোই মনোনীত সদস্যরাও যথেষ্ট গুরুত্বলাভ করেছেন। বলা হয়, এই সদস্যরা যেন সাংবিধানিক বিরোধী দলের সবাই তাঁদের ভূমিকা পালন করেছেন; বিতর্ক, আলোচনা ইত্যাদির গুরুত্ব বেড়েছে, মানও বেড়েছে। সরকারি সদস্যদের অবশ্য সভার সরকারি আজ্ঞা বা আদেশ (Mandate) মেনেই চলতে হয়েছে।

নতুন আইনের কিছু সীমাবদ্ধতা অবশ্যই ছিল। ভারতীয়রা এই আইনবলে অধিক ক্ষমতা পায় নি। বেসরকারী সদস্যদের আইনের প্রস্তাবকে প্রভাবিত করার কোনও ক্ষমতা ছিল না। সদস্যদের আলোচনার অধিকার থাকলেও প্রস্তাব পেশ বা ভোটাভুটির অধিকার ছিল না। সুতরাং, পরিষদের কাজকর্মে ভারতীয়করণ (Indianization) অথবা গণতন্ত্রীকরণ (Democratization) কোনটিই তেমনভাবে ঘটেনি। সরকারি দসদ্যরা আজ্ঞাতত্ত্বের (Mandate Theory) দ্বারা আবদ্ধ ছিলেন। ভারতীয়দের মধ্যে বণিকসভা বা কংগ্রেস নেতৃত্বের ক্ষুদ্র অংশেরই আইন পরিষদের কাজকর্মে বিতর্কের সুযোগ ছিল। বণিকসভা বা কংগ্রেস সমগ্র জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে একথা সকলে স্বীকার করেন না। প্রাদেশিক আইন পরিষদের ক্ষমতাও ছিল একান্তই আনুষ্ঠানিক। লর্ড কার্জন বিলটিকে ‘বিরাট আইন’ (Great Measure) বলে স্বীকার করেননি। সদস্যসংখ্যা বাড়লেও আইন সংস্থার কর্মতৎপরতা বেড়েছে বা সরকারি নীতিতে দায়িত্বশীলতার প্রকাশ পেয়েছে একথা বলা যাবে না। সোজা কথায়, সংখ্যায় বা পরিমাণে আইনসভার কলেবর বাড়লেও গুণগতভাবে আইনসভার মর্যাদা বাড়েনি। বিভিন্ন সংবাদপত্রে সংশোধনী আইন প্রাথমিকভাবে প্রশংসা পেলেও শেষপর্যন্ত আইনটির বিরুদ্ধে নিন্দাই হয়েছে বেশি। বিলটি সম্পর্কে দৈনিক সমাচারচন্দ্রিকা, বঙ্গবাণী,

সুবোধ সিন্ধু, হিন্দী প্রতাপ প্রভৃতি পত্রিকায় বিরূপ সমালোচনা হয়েছে। বিলটি সম্পর্কে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবর্গও তেমন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেননি।

তবে বিলটি যে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে একটি নবযুগের সূচনা করেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ১৮৬১ সালের আইনের চেয়ে এটি অবশ্যই সামান্য হলেও উন্নতির সূচক। নির্বাচন নীতি, বাজেট আলোচনা, বিতর্ক ইত্যাদি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার এক আভাস সন্দেহ নেই। পরামর্শদান সভা থেকে বিতর্কসভায় উত্তরণ আইনসভার বিবর্তনের এক উল্লেখযোগ্য দিক্‌চিহ্ন। বিলটি প্রবর্তিত হবার আগে ও পরের কুড়ি বছর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, বুদ্ধিজীবী সমাজে যে আলোড়ন হয়েছে, শিক্ষা, আইন-আদালত, যোগাযোগ, স্থানীয় শাসন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগত যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, ব্রিটিশ শাসক ও ভারতীয় জনগণের মধ্যে আদান-প্রদানের যে গতি এসেছে তা এককথায় অভূতপূর্ব। তবে ১৮৫৮ থেকে ১৮৯২ এই বছরগুলিতে আইনসভার কাজকর্মে যে তীব্রগতি ছিল, ১৮৯২ থেকে ১৯০৯—এই বছরগুলিতে সেই গতি ছিল না। পুরোনো আইনের পরীক্ষা, সংশোধন ইত্যাদির কাজ নতুন আইনসভায় যতটা হয়েছে তুলনামূলকভাবে নতুন আইন গ্রহণের কাজ হয় নি। রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক বিলগুলিতে সংশোধন যা হয়েছে প্রগতিশীলতার মানদণ্ডে সেগুলির কোনও স্থান নেই। ভারতীয় অপরাধ আইন, সরকারি গোপনীয়তা আইন, রাজদ্রোহী সভা বিরোধী আইন, সংবাদপত্র আইন, সমবায় ঋণ সমিতি আইন, পাঞ্জাব ভূমি হস্তান্তর আইন, ভারতীয় খনি আইন, বিশ্ববিদ্যালয় আইন কোনও ক্ষেত্রেই নতুন আইনিব্যবস্থা প্রগতিশীল ছিল না। ভারতীয় অপরাধ আইন, রাজদ্রোহী সভা বিরোধী আইন, সংবাদপত্র আইন, ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন ইত্যাদির উপর পরবর্তীকালে সভায় যে বিতর্ক হয়েছে তা থেকে প্রতীয়মান হয় আইনগুলি প্রকৃতিতে নিপীড়নমূলক ছিল। ভারতের রাজনৈতিক মহলে সংশোধনগুলি নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। ভারতের জাতীয় আন্দোলনে চরমপন্থী ও সন্ত্রাসবাদী ধারার সূচনা হয়েছে ব্রিটিশ শাসনের এই নিপীড়নমূলক ও প্রতিক্রিয়াশীল আইনি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া হিসাবেই। ইংরেজ সরকারের প্রত্যক্ষ শাসনে ভারত শাসনের বিধিব্যবস্থার উৎকর্ষ হবে, দায়িত্বশীল শাসনের এক প্রকৃত পরিবেশ সৃষ্টি হবে এই ধারণা যে কার্যকরী রূপ পায় নি অন্তত দুটি ক্ষেত্রে এর সমর্থন পাওয়া যায়। আপনি ইতিপূর্বেই লক্ষ্য করেছেন, প্রতিনিধিমূলক শাসন এদেশে সম্প্রসারিত হোক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের সমর্থক কোনও কোনও শাসক সেটা চান নি। লর্ড লিটনের সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের যুগে (১৮৭৬-৮০) ব্রিটিশ সরকারের উদার শাসননীতি ও পরিষদীয় রীতি আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। এই ঔপনিবেশিক শাসননীতিই অন্য রূপে ফিরে এল বিংশ শতকের প্রথম দশকেই। লর্ড কার্জন ভারতীয় পরিষদ বিল সম্পর্কে বা ভারতে দায়িত্বশীল শাসন সম্পর্কে প্রথম থেকেই বিরূপ ছিলেন। ভারতবর্ষে ৭ বছরের ভাইসরয় হিসাবে শাসনকালে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য শাসনের স্বার্থে ভারতের সাংবিধানিক শাসনের গতিকে রুদ্ধ করা। ১৮৯১ সাল থেকেই বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব ব্রিটিশ শাসকের প্রশাসনিক কর্মসূচিতে ছিল। কার্জন ভাইসরয় হিসাবে এই প্রস্তাবকে কার্যকর করেন। ভাইসরয় হিসাবে তিনি শুধুমাত্র ভারতীয় প্রশাসনের নেতাই ছিলেন না, শাসনের সর্বক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার এক নজির সৃষ্টি করেছিলেন তিনি। প্রতিটি বিভাগ, বিভাগীয় কর্মচারী, পরিষদ, প্রাদেশিক পরিষদকে তিনি নিজের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণে আনতে চেয়েছেন। পরিষদের শাসন, স্বায়ত্তশাসন, ভারতীয়দের শাসনে অংশগ্রহণ—সব কিছুই তাঁর আমলে মিথ্যা প্রমাণিত হয়। স্বেচ্ছাচার, অসঙ্গতি, অদূরদর্শিতা, কর্মচারী ও আমলাদের সম্পর্কে অবিশ্বাস, এদেশের শিক্ষিত শ্রেণির সঙ্গে বিরোধ, জনগণের অধিকার ও আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে সহানুভূতির অভাব কার্জনকে ভারতীয়দের কাছে অপ্রিয় করেছে। গোখলে কার্জনের শাসন ও প্রশাসন নীতির মধ্যে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের ছায়া দেখেছেন।

কার্জনের বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব ছিল আসলে প্রশাসনিক সুবিধার নামে এদেশের জাতীয় আন্দোলনের গতিকে

দুর্বল করে দেওয়া। সাংবিধানিক শাসনের নামে ব্রিটিশ সরকার যে সংস্কার করেছে জাতীয় কংগ্রেসের এক শ্রেণির নেতৃবর্গের কাছে তা তেমন গুরুত্বলাভ করে নি। তিলকের (B. G. Tilak) নেতৃত্বে স্বরাজ ও স্বায়ত্তশাসনের দাবি উঠেছে। ১৮৯৫ সালের কংগ্রেসের অধিবেশনেই স্বরাজের পক্ষে দাবি তোলেন তিনি। ব্রিটিশ সরকারের স্বাস্থ্য ও জন নিরাপত্তা নীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে ঔপনিবেশিক শাসকের কোপদৃষ্টিতে পড়তে হয়েছে তাঁকে। প্রধানত তিলকের নেতৃত্বে বিপ্লবী আন্দোলনের প্রসারকে রুদ্ধ করতেই কার্জনের বঙ্গবিভাজনের প্রস্তাবকে আইনে রূপ দেওয়া হল। বঙ্গবিভাজনের প্রতিবাদেই শুরু হল স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলন। ১৯০৬ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে স্বদেশি বয়কট ও স্বরাজের প্রস্তাব গৃহীত হল। সর্বভারতীয় মুসলিম লিগ গঠন, পৃথক নির্বাচন মণ্ডলী ও আইনসভায় মুসলিম প্রতিনিধিত্বের দাবি এবং এই সঙ্গে চরমপন্থী কংগ্রেস আন্দোলনের বিস্তার ব্রিটিশ শাসকের সামনে শাসন ওসংস্কারের ক্ষেত্রে এক নতুন ধরনের সম্ভাবনা ও সুযোগ সৃষ্টি করে। লর্ড মিন্টো এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগালেন বিভেদ ও শাসনের (Divide and Rule) নীতি গ্রহণ করে। লর্ড মর্লে মিন্টোকে মুসলিম দাবির সমর্থনে ব্রিটিশ সরকারের সহানুভূতির কথা জানালেন। ১৯০৭ সালের স্থানীয় সরকারের কাছে ভারত সরকারের সংস্কারের ইচ্ছা জানিয়ে সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি হল। লর্ড মিন্টো প্রতিনিধিমূলক সরকারের ধারণাকে এদেশে সমর্থন না করলেও লর্ড মর্লে পৃথক প্রতিনিধিত্বের দাবিকে সামনে রেখে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে আইন পরিষদে সংস্কারের এক প্রস্তাব নিয়ে এলেন। ১৯০৮ সালের এই প্রস্তাবে, সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি, নির্বাচন, বাজেট আলোচনায় স্বাধীনতা এবং ভাইসরয়ের কার্যনির্বাহী পরিষদে একজন ভারতীয় সদস্য গ্রহণের নীতি সমর্থন পেল। ১৯০৭ সালের ১২ সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ সরকার ভারতে প্রচলিত সরকারি ব্যবস্থা ও বিভিন্ন স্তরের সরকারের সম্পর্কে খতিয়ে দেখবার জন্য এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে উন্নতি বিধানের জন্য রয়্যাল কমিশন (Royal Commission) গঠন করে। কমিশন কেন্দ্রমুখী শাসনের প্রবণতা কমিয়ে এদেশে বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে কিছু সুপারিশ করে। ১৯০৯ সালে কমিশনের সুপারিশ পেশ হয় এবং এবং এর কিছুকাল পরেই ১৯০৯ সালের মে মাসে মর্লে-মিন্টো সংস্কারের ভিত্তিতে ভারত শাসন আইন কার্যকর হয়।

১৮.৭ সারাংশ

ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল ১৮৫৮ থেকে ১৯০৮ এই দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের সময়কাল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে ইংলন্ডের ব্রিটিশ সরকার সরাসরি ক্ষমতা নিজ নিয়ন্ত্রণে এনেছে। ১৮৫৮ সালের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রশাসনে এক পরিবর্তন এসেছে। শাসন ও আইনের ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট বিধিব্যবস্থার সূচনা হল। স-পরিষদ ভারত সচিবের পদ সৃষ্টি করে এর মাধ্যমেই রাজশক্তির ক্ষমতা প্রয়োগ করা হল। ভারত সচিবকে সাহায্য করার জন্য সৃষ্টি হল ভারত পরিষদ। ভারত সচিবকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে দায়িত্বগুলি রাখার ব্যবস্থা হল। আইন প্রণয়ন পদ্ধতিতে গণতান্ত্রীকরণের ব্যবস্থা হয়েছে। তবে এই আইন কতটা গণতান্ত্রিক বা আমলাতান্ত্রিক ছিল, আইন প্রণয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কতটা প্রগতিশীল ছিল তা নিয়ে বির্তক আছে।

এই ঐতিহাসিক পর্বেই ১৮৬১ সালের ভারতীয় পরিষদ আইন ও ১৮৯২ সালের সংশোধিত ভারতীয় পরিষদ আইন পাশ হয়েছে। ১৮৬১ সালের আইনে আইন পরিষদে বেসরকারি সদস্য নেওয়ার ব্যবস্থা হয়; বিভিন্ন প্রদেশিক আইনসভা সৃষ্টি করা হয়। এই আইনে গভর্নর-জেনারেলকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয় ও প্রেসিডেন্সিগুলির স-পরিষদ গভর্নরদের সীমিত ক্ষমতা দেওয়া হয়। ১৮৬১ সালে একটি আইনের মাধ্যমে বিচারব্যবস্থার সংস্কার হয়;

কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭০ সালের পরে স্থানীয় শাসনের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটে। এক্ষেত্রে লর্ড মেয়ো, লর্ড রিপন ইত্যাদিরা প্রধান প্রবক্তা ছিলেন। আইনসভার পদ্ধতিগত ক্ষেত্রে, বিতর্কের ক্ষেত্রে এই পর্বে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে।

১৮৯২ সালের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে ক্ষমতা ও আয়তনের দিক থেকে কেন্দ্র ও প্রদেশগুলির আইনসভার সম্প্রসারণ ঘটে, বেসরকারি সদস্যের মধ্যে কোনও কোনও ক্ষেত্রে পরোক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়, বাজেট ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা এবং আইনগত প্রক্রিয়ায় কিছু পরিবর্তন ঘটে। এই আইন বলে সাংবিধানিক বা শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে কোনও মৌলিক পরিবর্তন ঘটে নি; কিছু সংশোধনী এসেছে মাত্র এরকম অভিযোগ এসেছে। প্রগতিশীলতার বিচারেও এই আইন উত্তীর্ণ হয় নি। ১৮৫৮ সালের পরবর্তীকালের পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন এসেছে তার মধ্যে অন্যতম হল জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম এবং চরমপন্থী আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদের সূচনা। লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলন এই সময়কালের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

১৮.৮ অনুশীলনী

(১) সঠিক উত্তর বেছে নিয়ে বাক্যটি সম্পূর্ণ করুন ঃ

(ক) ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে ১৮৫৮ সালের ভারত শাসন আইনটি প্রথণ উত্থাপন করেন। (i) লর্ড পামারস্টোন (ii) লর্ড ডার্বি (iii) লর্ড ক্যানিং।

(খ) ১৮৫৮ সালের (i) ১ নভেম্বর (ii) ১৫ জুলাই (iii) ১২ ফেব্রুয়ারি ভারত ক্ষমতা হস্তান্তরের রাজকীয় ঘোষণা জারি হয়।

(গ) ১৮৫৮ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে ভারত পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করবে (i) গভর্নর-জেনারেল (ii) ভারত সচিব (iii) গভর্নর।

(ঘ) ভারতীয় পরিষদ আইন প্রথম পাশ হয়েছে (i) ১৮৫৮, (ii) ১৮৬১, (iii) ১৮৯২ সালে।

(ঙ) ১৮৯২ সালের ভারতীয় পরিষদ আইন একটি (i) নিয়ন্ত্রণী আইন (ii) সংশোধনী আইন।

(চ) ভারতে স্থানীয় শাসনের ক্ষেত্রে প্রথম উদ্যোগী হন। (i) লর্ড ডাফরিন (ii) লর্ড মেয়ো (iii) লর্ড রিপন।

(ছ) ১৮৬১ সালের ভারতীয় পরিষদ আইন অনুসারে গভর্নর-জেনারেলের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যসংখ্যা ছিল (i) ৭ (ii) ৪ (iii) ৫ জন।

(জ) ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় (i) ১৮৭০ (ii) ১৮৮৫ (iii) ১৮৭৬ সালে।

(ঝ) বিচারব্যবস্থার সংস্কারের উদ্দেশ্যে ভারতে হাইকোর্ট আইন পাশ হয় (i) ১৮৫৮ (ii) ১৮৬১ (iii) ১৮৮২ সালে।

(ঞ) সরকারি কাজকর্মে বেসরকারি সদস্য ও ভারতীয়দের অংশগ্রহণের সুযোগ প্রসারিত হয়েছে। (i) ১৮৬১ (ii) ১৮৬৩ (iii) ১৮৯২ সালের ভারতীয় পরিষদ আইনে।

(২) নীচের প্রশ্নগুলি একটি বা দুটি বাক্যে উত্তর দিন ঃ

(ক) ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটেছে কোন্ বছরে?

(খ) কোন্ ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে কোম্পানির শাসনের অবসান এবং ব্রিটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ শাসন প্রবর্তিত হয়?

(গ) ভারত সচিবের দায়িত্ব কী ছিল?

(ঘ) ভারত পরিষদ কী?

(ঙ) ১৮৯২ সালের ভারতীয় পরিষদ আইনে গভর্নর জেনারেলের কার্যনির্বাহী পরিষদে কতজন অতিরিক্ত সদস্য বাড়ানোর প্রস্তাব হয়?

(চ) কোন্ ইংরেজ ভারতের জাতীয় কংগ্রেস গঠনে উদ্যোগ নিয়েছিলেন? ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি কে ছিলেন?

(৩) সংক্ষেপে (অনধিক ৫০ বাক্যে) নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন ঃ

(ক) ১৮৫৮ সালের ভারত শাসন আইনের তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

(খ) ভারতে বিচার বিভাগীয় সংস্কারের উপর কিছু লখুন।

(গ) ভারতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার উপরে একটি টীকা লিখুন।

(ঘ) ১৮৬১ সালের ভারতীয় পরিষদ আইনের অভিনবত্ব কী সংক্ষেপে লিখুন।

(ঙ) ১৮৯২ সালের ভারতীয় পরিষদ আইনের তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

(৪) অনধিক ১৫০টি বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন ঃ

(ক) ১৮৫৮ সালের ভারত শাসন আইনের বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(খ) ১৮৬১ সালের ভারতীয় পরিষদ আইনের অভিনবত্ব বিচার করুন।

(গ) ১৮৯২ সালের ভারতীয় পরিষদ আইনের বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করুন। আপনি কি মনে করেন এই আইন ১৮৬১ সালের ভারতীয় পরিষদ আইনের তুলনায় অগ্রগতির সূচক?

১৮.৯ উত্তরমালা

(১) (ক) ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে ১৮৫৮ সালের ভারত শাসন আইনটি প্রথম উত্থাপন করেন লর্ড পামারস্টোন।

(খ) ১৮৫৮ সালে ১ নভেম্বর ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের রাজকীয় ঘোষণা জারি হয়।

(গ) ১৮৫৮ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে ভারত পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করবেন ভারত সচিব।

(ঘ) ভারতীয় পরিষদ আইন প্রথম পাশ হয়েছিল ১৮৬১ সালে।

(ঙ) ১৮৯২ সালের ভারতীয় পরিষদ আইন একটি সংশোধনী আইন।

(চ) ভারতে স্থানীয় শাসনের ক্ষেত্রে প্রথম উদ্যোগী হন লর্ড মেয়ো।

(ছ) ১৮৬১ সালের ভারতীয় পরিষদ আইন অনুসারে গভর্নর-জেনারেলের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যসংখ্যা ছিল ৫ জন।

(জ) ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৫ সালে।

(ঝ) বিচারব্যবস্থার সংস্কারের উদ্দেশ্যে ভারতে হাইকোর্ট আইন পাশ হয় ১৮৬১ সালে।

(ঞ) সরকারি কাজকর্মে বেসরকারি সদস্য ও ভারতীয়দের অংশগ্রহণের সুযোগ প্রসারিত হয়েছে ১৮৯২ সালের ভারতীয় পরিষদ আইনে।

(২) (ক) ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটেছে ১৮৫৮ সালে।

(খ) ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ বা মহাবিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে কোম্পানির শাসনের অবসান এবং ব্রিটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ শাসন প্রবর্তিত হয়।

(গ) ১৮৫৮ সালের ভারত শাসন আইন বলে ভারতের শাসনকার্য পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের যাবতীয় দায়িত্ব ছিল ভারত সচিবের।

(ঘ) ভারত পরিষদ হল ভারত সচিবের পরামর্শ সভা। পরবর্তীকালে ভারতীয় পরিষদ আইন বলে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয়স্তরে এর ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

(ঙ) অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম ভারতের জাতীয় কংগ্রেস গঠনে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ছিলেন উমেশ চন্দ্র বনার্জী।

১৮.১০ গ্রন্থপঞ্জি

1. Anil Chandra Banerjee: *Indian Constitutional Documents* Vol. II. 1858-1917 (1948).
2. Parmatma Sharan: *The Imperial Legislative Council of India,* 1861-1920 (1961).
3. M. M. Singh: *From Raj to Republic A Retrospect* (1972).
4. J. C. Johari: *Indian Government and Politics,* Vol-I (1996).
5. A. B. Keith: *Constitutional History of India,* 1860-1935 (1937).

একক ১৯ ❑ প্রাক্-স্বাধীন ভারতবর্ষে সাংবিধানিক বিকাশের ধারা ঃ সংস্কার আইন, ১৯০৯ ও ১৯৩৫ সালের মধ্যবর্তী সময়কাল

গঠন

১৯.০ উদ্দেশ্য
১৯.১ প্রস্তাবনা
১৯.২ মূল আলোচনা
১৯.৩ ১৯০৯ সালের আইনের (মর্লে-মিন্টো শাসন সংস্কার) বৈশিষ্ট্য
১৯.৪ ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলন ও ব্রিটিশ সাংবিধানিক ব্যবস্থা ঃ ঘাত-প্রতিঘাত
১৯.৫ ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য
১৯.৬ ১৯১৯ ও ১৯৩৫ সালের মধ্যবর্তী বছরগুলির রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংস্কারের গতিপ্রকৃতি ও ক্রিয়া-প্রক্রিয়া
  ১৯.৬.১ অহিংস অসহযোগ আন্দোলন
  ১৯.৬.২ পরবর্তী ঘটনাবলি
  ১৯.৬.৩ সাইমন কমিশন
  ১৯.৬.৪ সর্বদলীয় সম্মেলন ও মতিলাল নেহেরু কমিটি রিপোর্ট
  ১৯.৬.৫ মুসলিম লীগের ১৪ দফা দাবি
  ১৯.৬.৬ লাহোর কংগ্রেস
  ১৯.৬.৭ আইন অমান্য আন্দোলন
  ১৯.৬.৮ প্রথম গোলটেবিল বৈঠক
  ১৯.৬.৯ গান্ধী-আরউইন চুক্তি
  ১৯.৬.১০ দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক
  ১৯.৬.১১ দ্বিতীয় পর্যায়ে আইন অমান্য
  ১৯.৬.১২ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা
  ১৯.৬.১৪ তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক ও শাসন সংস্কারের শ্বেতপত্র
১৯.৭ সারাংশ
১৯.৮ অনুশীলনী
১৯.৯ উত্তরমালা
১৯.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১৮.০ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করলে আপনি

- ১৯০৯ থেকে ১৯৩৫ সালের পূর্ববর্তী সময়ের ভারতের রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক ইতিহাসের গতিটি সনাক্ত করতে পারবেন।
- এই পর্বের বিভিন্ন শাসন সংস্কারগুলির বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারবেন।
- জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই পর্বে যে নতুন গতি সঞ্চারিত হয়েছিল সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

১৯.১ প্রস্তাবনা

ভারতের রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক শাসনের ইতিহাসে একটি ঘটনাবহুল অধ্যায় হল ১৯০৯ সালের সংস্কার আইন থেকে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের মধ্যবর্তী সময়কালটি। এই পর্বে একদিকে যেমন পরিষদীয় কার্যাবলি, সাংবিধানিক সংস্কার ও দায়িত্বশীল শাসনের সম্প্রসারণ ঘটে অন্যদিকে ভারতের জাতীয়তাবলি আন্দোলন ও রাজনীতির ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব গতির সঞ্চার হয়। মর্লে-মিন্টো শাসন সংস্কার (১৯০৯) সম্পর্কে আলোচনার মধ্য দিয়েই শুরু হবে এই এককের পাঠের পরিক্রমা। পরিষদীয় শাসনের সম্প্রসারণে এই সংস্কারের প্রভাব কতটা সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর এই পর্বের রাজনৈতিক আন্দোলন ও কংগ্রেসের রাজনীতি বিষয়ে শিক্ষার্থী পাঠকের ধারণা সৃষ্টির জন্য এই পর্বের কিছু রাজনৈতিক ঘটনাবলির দিকে আলোকপাত করা হবে। হোমরুল আন্দোলন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে মহাত্মা গান্ধীর (M. K. Gandhi) আবির্ভাব ভারতীয় রাজনীতির গতিপথ বদলে কী ভূমিকা নিয়েছে শিক্ষার্থী পাঠক সে সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু ধারণা লাভ করতে পারবেন। ইংরেজ সরকার আপসমূলক ব্যবস্থা হিসাবে মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন, বঙ্গভঙ্গ রোধ ইত্যাদির ব্যবস্থা করলেও কুখ্যাত রাওলাট আইন (Rowlatt Act, 1919) প্রবর্তন করে দমন ও নিপীড়নের যে প্রশাসনিক ধারা সৃষ্টি করেছে তার প্রতিক্রিয়া হয়েছে মারাত্মক। এর বেদনাময় পরিণতি জালিয়ালওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড। নবনিযুক্ত ভারত সচিব লর্ড মন্টেগু (Lord Montagu) ও তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড চেমসফোর্ড (Lord Chelmsford) ভারত শাসনের ক্ষেত্রে উদার ও সংস্কারমূলক আইনের প্রস্তাব নিয়ে এলেও এই পর্যায়ে গান্ধীজির নেতৃত্বে এক ব্যাপক গণ আন্দোলনের সৃষ্টি হল। মূল আলোচনার পরবর্তী অংশে মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইন (Montagu Chelmsford Reform Act) বা ভারত শাসন আইন, ১৯১৯ (The Government of India Act, 1919) এবং ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নতুন ধারা অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের (Non-Violent Non-Co-operation Movement) সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসের এই পর্বের অন্যান্য দৃষ্টি আকর্ষণসূচক ঘটনা হল কংগ্রেস নেতৃত্বে ভাঙন, বামপন্থী ও সমাজবাদী আন্দোলনের সূচনা, মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা (Meerut Trial), মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে সর্বদলীয় সম্মেলন ও শাসন সংস্কারের দাবি (১৯২৮), কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে পূর্ব স্বাধীনতার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত (১৯৩০) এবং গান্ধীজির নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলনের (Civil Disobedience Movement) বিস্তার। বর্তমান পাটে প্রতিটি ঘটনাবলির সঙ্গে শিক্ষার্থী পাঠক পরিচিত হবেন পর্যায়ক্রমে। জাতীয় আন্দোলনের গতিকে প্রশমিত করতে এই পর্বে ব্রিটিশ সরকার শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করে। সাইমন কমিশন (Simon Commission), গোলটেবিল বৈঠক (Round Table Conference), ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা (Communal Award) এই পর্যায়ে ব্রিটিশ সরকারের সংস্কার ও শাসননীতির কিছু বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টা। শাসন সংস্কার ও দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই সব প্রচেষ্টা সাময়িক ও আশু সমাধানের অধিক কিছু হয় বলেই ভারতবাসীর মনে এগুলি কোনও ভাবেই প্রভাব ফেলতে পারে নি। তবে এইসব বিক্ষিপ্ত ও সাময়িক সমাধান থেকেই ব্রিটিশ সরকার পরবর্তীকালের বৃহত্তর ও ব্যাপক শাসন সংস্কার ও রাজনৈতিক সমাধানের পথ খুঁজে পেয়েছে এবং ভারত শাসনের ক্ষেত্রে একটি অন্তিম পদক্ষেপ গ্রহণের পথে অগ্রসর হবার প্রেরণা পেয়েছে বলা যেতে পারে। ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫ (Government of India Act, 1935) ব্রিটিশ সরকারের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের অগ্রগতির সর্বশেষ নির্দেশক স্তম্ভ (Milestone। বর্তমান পাঠের আলোচনা শেষ হয়েছে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের পরবর্তীকালের ঘটনা-প্রবাহ ও শাসনতান্ত্রিক উদ্যোগগুলির বর্ণনা ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে।

১৯.২ মূল আলোচনা

১৮৯২ সালের ভারত শাসন সংশোধনী আইন বা তার পরবর্তীকালের সরকারি শাসন ও প্রশাসননীতি ভারতীয়দের সন্তুষ্ট করতে পারে নি এবং জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বের একটা বড় অংশ কার্জনের বঙ্গ বিভাজন নীতির বিরুদ্ধে তীব্র গণসংগ্রাম গড়ে তুলে এদেশে ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের এক নতুন পদ্ধতির সূচনা করেছেন পূর্ববর্তী এককের শেষ অংশের আলোচনায় সে সম্পর্কে আপনি কিছু জেনেছেন। স্বরাজ ও স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে সামনে রেখে বালগঙ্গাধর তিলক (B. G. Tilak), লালা লাজপৎ রায় (Lala Lajpat Rai), বিপিন চন্দ্র পাল (Bipin Chandra Pal) ইত্যাদিরা যে গণসংগ্রাম গড়ে তুলেছেন কার্জন, মর্লে-মিন্টোর প্রতিক্রিয়াশীল শাসননীতি তাকে বানচালের চেষ্টা করেছে। কংগ্রেসের মধ্যে মডারেটদের তোষণ করে সাম্প্রদায়িকতা ও ভেদের নীতিকে আহ্বান করে ১৯০৯ সালে ব্রিটিশ সরকার সাংবিধানিক সংস্কারের এই আইন প্রবর্তন করে। এই আইন মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন নামে পরিচিত। এই আইন স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে বিলম্বিত করার এক সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টামাত্র। সংস্কারের কিছু কিছু প্রস্তাব থাকলেও ভারতে সংসদীয় শাসন প্রতিষ্ঠান কোনও নিশ্চয়তা নেই লর্ড মিন্টো বা লর্ড মর্লে তাঁদের বক্তব্যে সে কথা বুঝিয়ে দিয়েছেন। লর্ড মিন্টো স্পষ্টই জানিয়েছেন ব্রিটিশ প্রশাসনের স্থায়িত্বের উপরই ভারতের নিরাপত্তা ও কল্যাণ নির্ভরশীল এবং পরিবর্তনশীল অবস্থাকে না বুঝলে ব্রিটিশ প্রশাসনের স্থায়িত্ব আসতে পারে না। তবে এর অর্থ এই নয় ভারতে পাশ্চাত্যের প্রতিনিধিমূলক শাসনের ধারণা প্রযোজ্য, (''I am no advavocate of 'representative Government for India' in the Western sense of the term.'' Lord Minto), ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর এদেশের আইনসভার জনপ্রতিনিধিত্ব কোনওটিই তিনি পছন্দ করেন নি। লর্ড মর্লের বিশ্বাস ছিল প্রশাসনের দক্ষতা নির্ভর করে কতটা সুবিধা ব্রিটিশ সরকার দেশজ অধিবাসীদের দিতে পারবে তার উপর। ভারতীয় প্রশাসনের সংস্কার তিনি চান কিন্তু এদেশের প্রতিনিধিমূলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় তাঁর সায় নেই।

এবার আসুন আমরা দেখি মর্লে-মিন্টো প্রস্তাবে ভারতে শাসন সংস্কারের কী ব্যবস্থাপত্র ছিল।

১৯.৩ ১৯০৯ সালের আইনের (মর্লে-মিন্টো শাসন সংস্কার) বৈশিষ্ট্য

মর্লে-মিন্টো শাসন সংস্কারের পিছনে দুটি প্রধান শক্তি ছিল—শাসন ও আইনি সংস্কারের জন্য জাতীয় কংগ্রেসের তীব্র চাপ এবং ব্রিটেনের রক্ষণশীল সরকারের শাসন সংস্কারের প্রতি অনীহা। ১৮৯২ সালের পর শাসন সংস্কারের ক্ষেত্রে অগ্রগতি তেমন হয়নি অথচ লর্ড কার্জনের আমলে বহু ক্ষেত্রেই এমন সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে যা ব্রিটিশ শাসনের অধোগামী চরিত্রেরই প্রকাশ বলে মনে হয়েছে। কার্জনের আমলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন, কলিকাতা কর্পোরেশন আইন, সরকারি গোপনীয়তা আইন এবং অবশ্যই বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা ভারতবাসীর মনে যে আঘাত ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে মর্লে-মিন্টো সংস্কারের প্রস্তাব তাকে উপশম করার এক সরকারি প্রয়াস। লর্ড মর্লে এই সংস্কার প্রস্তাবকে ১৮৬১ এবং ১৮৯২ সালের পরিষদ আইনের সুরক্ষিত প্রসার (Well guarded expansion of Principales recognised in 1861 and 1892) বলে বর্ণনা করেছেন। এই আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল ঃ

(১) আইন পরিষদ ও প্রশাসনে ভারতীয়দের আরও বেশি করে সংযুক্ত করা। এই উদ্দেশ্যে আইন পরিষদের আয়তন বৃদ্ধি করা হয়। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে সদস্যসংখ্যা ১৬ থেকে বৃদ্ধি করে করা হয় অনধিক ৬০। বোম্বাই, মাদ্রাজ, বাংলা, সংযুক্তপ্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যার আইন পরিষদে সদস্যসংখ্য বাড়িয়ে করা হয় অনধিক ৫০। পঞ্জাব, ব্রহ্মপ্রদেশ ও আসামের প্রাদেশিক পরিষদে সদস্যসংখ্যা বাড়িয়ে করা হয় অনধিক

৩০। এছাড়াও আইনসভায় পদাধিকার বলে (ex-officio) সদস্য গ্রহণের ব্যবস্থা হয়। আইন পরিষদের সদস্যরা নতুন আইন বলে তিন শ্রেণির মধ্য থেকে আসবেন—(ক) মনোনীত সরকারি কর্মচারী (খ) মনোনীত বেসরকারি সদস্য এবং (গ) নির্বাচিত সদস্য।

(২) কেন্দ্রীয় (সর্বোচ্চ) আইন পরিষদে (Imperial Legislative Council) ৩৭ জন সরকারি ও ৩২ জন বেসরকারি সদস্য থাকবেন। সরকারি সদস্যদের মধ্যে ২৮ জন গভর্নর-জেনারেলের মনোনীত এবং বাকি ৯ জন হবেন পদাধিকার বলে সদস্য। বেসরকারি ৩২ জন সদস্যের মধ্যে ৬ জন গভর্নর-জেনারেল মনোনীত এবং বাকিরা নির্বাচিত হবেন।

(৩) এই আইন নির্বাচনের নীতিকে গুরুত্ব দিয়েছে এবং নির্বাচনে বিভিন্ন শ্রেণি ও সম্প্রদায়ের সুষ্ঠু প্রতিনিধিত্বের নীতিকে সমর্থন করেছে। বেসরকারি সদস্য হিসাবে মুসলমান সম্প্রদায়, বণিকসভা, জমিদার প্রভৃতির সম্প্রদায় বা স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব এবং বিশ্ববিদ্যালয়, জেলা বোর্ড, পৌরসভা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিনিধি পাঠানোর ব্যবস্থা হয়। প্রতিনিধিত্বের পৃথক পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়।

(৪) কেন্দ্রীয় পরিষদে সরকারি সদস্যরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও, প্রাদেশিক পরিষদে মনোনীত ও নির্বাচিত সদস্য মিলিয়ে বেসরকারি সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। মাদ্রাজ আইন পরিষদে বেসরকারি সদস্য ছিলেন ২৬, সরকারি ২১।

(৫) আইন পরিষদগুলির কার্যাবলিরও সম্প্রসারণ ঘটেছে এই আইনে। সদস্যদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা অনুরূপক প্রশ্ন (Supplementary Questions) করার ক্ষমতা ছিল। জনস্বার্থ বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপনেরও ক্ষমতা তারা পেয়েছে। প্রস্তাবগুলির উপর ভোট নেবার ব্যবস্থাও স্বীকার করা হয়। সরকারি আয়-ব্যয় সম্পর্কে প্রস্তাব উত্থাপন এবং ভোট নেবার ব্যবস্থা ছিল।

(৬) শাসন পরিষদগুলি (Executive Council) সম্পর্কেও কিছু নতুন ব্যবস্থা নেওয়া হয়। স-পরিষদ ভারত সচিব মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এর শাসনপরিষদের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করার ক্ষমতা পান (সংখ্যা বেড়ে ২ থেকে ৪ হয়)। বাংলার ক্ষেত্রে ভারত সচিবের অনুমোদন সাপেক্ষে স-পরিষদ গভর্নর-জেনারেল ৪ সদস্য বিশিষ্ট শাসনপরিষদ গঠনের অধিকার পাবেন বলা হয়।

(৭) এই আইনে গভর্নর-জেনারেলের শাসনপরিষদ গঠন ও এই পরিষদে ভারতীয়কে সদস্য হিসাবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত হয়।

১৯০৯ সালের মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন পরিষদের গঠন ও কাজের ক্ষেত্রে সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করেছে, সদস্য গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্বাচন ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দিয়েছে, বিভিন্ন শ্রেণি ও স্বার্থের আইনসভায় প্রতিনিধিত্বের নীতিকে কার্যকর করেছে এবং ভাইসরয়ের শাসন পরিষদে ভারতীয় সদস্য নেবার ব্যবস্থা করেছে—এই সব কারণে অবশ্যই সাংবিধানিক গণতন্ত্রের একটি নজির সৃষ্টি করেছে। কিন্তু কতকগুলি কারণে এই আইন সমালোচনারও সম্মুখীন হয়েছে ঃ

(১) সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচন প্রথা বিভেদমূলক; (২) নির্বাচনের গতি সীমাবদ্ধভাবে প্রযুক্ত হয়েছে। নারীদের ভোটাধিকারের সুযোগ ছিল না। নির্বাচন পদ্ধতি ছিল পরোক্ষ; (৩) প্রাদেশিক আইনসভার বেসরকারি সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার নীতি একান্ত আনুষ্ঠানিক। বেসরকারি সদস্যরা একজোটে কাজ করতে পারবেন না, শ্রেণিগত ও সাম্প্রদায়িক নির্বাচনের পদ্ধতির ব্যবস্থা রেখে ইংরেজ সরকার সেটা

সুনিশ্চিত করেছে। ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে প্রাদেশিক আইন পরিষদের সিদ্ধান্তকে বাতিল করার ক্ষমতা সরকারের ছিল। মনোনীত সরকারি ও বেসরকারি সদস্যরা সদাশয় ইংরেজ স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের (Benevolent Despotism) স্বার্থে একযোগেই কাজ করতেন। (৪) আইনসভায় ভোটাভুটির ব্যবস্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কার্যকর হয়নি। অনেক সরকারি ব্যয়ই ভোটযোগ্য বিবেচিত হত না। ভোটের ফলাফলকে সরকার স্বীকারও করেনি। আইন পরিষদের ক্ষমতা সাময়িক; বৈদেশিক ও প্রাদেসিক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হত না।

একথা সত্য কার্জনের ভারত রাষ্ট্র থেকে নতুন এই আইন অবশ্যই প্রস্তাবের (Departure) সূচনা করে। কিন্তু পরিষদীয় সামান্য কিছু সুবিধা দিয়ে এবং সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলীর ব্যবস্থা করে একদিকে বিভেদ ও শাসননীতিকে যেমন এই নীতি প্রশ্রয় দিয়েছে, অন্যদিকে স্বায়ত্তশাসনের মূল দাবি থেকে ভারতবাসীর দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতে চেয়েছে। শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন শুধুমাত্র সাংবিধানিক সুবিধা সৃষ্টি করেই সম্ভব নয়; এর ফলে কিছু উচ্চবিত্ত ও রক্ষণশীল শ্রেণি ও সংস্থাকে পাশে পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু এর ফলে সমগ্র জনগণের কাছে শাসকের দায়িত্বশীলতা হয় না। গোখেলের মতো কোনও কোনও নেতা এই আইনের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানালেও বা কংগ্রেসের নরমপন্থী মহলে এই আইনের প্রশংসা হলেও সামগ্রিকভাবে মুসলিমদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী, মুসলিমদের দুটি ভোটের অধিকার, ভোটের পদ্ধতি, সংখ্যাগরিষ্ঠতার নীতি ইত্যাদির প্রবল বিরোধিতা করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই পরিষদীয় নিয়মের ত্রুটি, অসঙ্গতি, অসাম্য স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্ন নিয়ে আবার রাজনৈতিক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে।

এবার আসুন আমরা দেখি এই সময়ের রাজনৈতিক আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি ব্রিটিশ সরকারের সাংবিধানিক ব্যবস্থার ক্রিয়া-প্রক্রিয়াটি (Interaction) কেমন ছিল; ভারতীয় রাজনীতির উপর তা কী প্রভাব ফেলেছে।

১৯.৪ ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলন ও ব্রিটিশ সাংবিধানিক ব্যবস্থা ঃ ঘাত-প্রতিঘাত

১৯০৯ সালে মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন পাশ হবার পরবর্তী দশ বছর ভারতীয় রাজনীতির প্রবাহটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যসূচক। এই সংস্কার আইন স্বায়ত্তশাসনের দাবি মেটাতে পারেনি। কংগ্রেসের সরকারি নেতৃত্বের মনে এই আইনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ থাকলেও, ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সাংবিধানিক পন্থার বাইরে তাঁরা কখনোই যেতে চান নি। জাতীয় কংগ্রেসের বিভিন্ন অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে সমালোচনা হলেও ব্রিটিশ সরকারের সাংবিধানিক ও উদার নীতির প্রশংসাই হয়েছে বেশি। কংগ্রেসের সরকারি গোষ্ঠী আন্দোলনের পথ পরিহার করে সাংবিধানিক সংস্কারের দাবি জানিয়েছে এবং ব্রিটিশ সরকারের অধীনেই স্বায়ত্তশাসন আসুক এটাই চেয়েছে। চমরপন্থী গোষ্ঠী অবশ্য ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্দে প্রত্যক আন্দোলনের পথেই চলেছে। বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রস্তাবিত স্বদেশি ও বয়কটের আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়নি। স্বরাজের দাবি অব্যাহত থেকেছে। স্বদেশি আন্দোলনের নেতারা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আত্মনির্ভরশীলতা, ত্যাগ, আত্মশক্তির বিকাশ ইত্যাদির শিক্ষা দিয়েছেন এবং দেশে জাতীয় শিক্ষার প্রসার হোক এটা চেয়েছেন। প্রতিরোধ সংগ্রামের হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে জনসভা, শিক্ষা ও সরকারি কার্যালয় বয়কট, প্রচারপত্র প্রকাশ, স্বদেশি দ্রব্য উৎপাদন ও ব্যবহার, হিন্দু মেলা, স্বদেশ সেবা সমিতি ও জাতীয় শিক্ষা পরিষদ। আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী না হলেও ব্রিটিশ শাসক শেষপর্যন্ত বঙ্গভঙ্গ রদ করে (১৯১১)।

শাসন সংস্কার বা বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের গতিকে রুদ্ধ করলেও স্তব্ধ করতে পারেনি। আন্দোলনের গতি ভিন্নমুখী হয়েছে মাত্র। হোমরুল আন্দোলন ও হোমরুল লিগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রীমতি অ্যাণী বেশান্ত (Annie Basant) স্বরাজ ও স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনকে নবরূপ দান করলেন। আয়ারল্যান্ডবাসীর আত্মত্যাগ ও স্বাদেশিকতার আদর্শে ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করে জাতীয় চেতনার এক নতুন উন্মাদনা সৃষ্টি করেছেন তিনি। এই আন্দোলনে কংগ্রেসের নরমপন্থী-চরমপন্থী উভয়েরই সমর্থন পেয়েছেন তিনি। বিপরীতভাবে বলা যায়, এই আন্দোলনের মাধ্যমে কংগ্রেসের উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে এক বোঝাপড়ার পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন তিনি। ব্রিটিশ সরকারও এই আন্দোলনের ধারায় প্রভাবিত হয়। সাংবিধানিক সংস্কারের প্রশ্নে কংগ্রেস ও সরকার কাছাকাছি আসে।

প্রান্তলিপি ঃ জাতীয় কংগ্রেসের সরকারি নেতা গোপালকৃষ্ণ গোখলে, মদনমোহন মালব্য ইত্যাদিরা পরিষদীয় আইন-কানুন, অধিবেশন, কাজকর্ম ও পদ্ধতিগত প্রশ্নেই মাথা ঘামিয়েছেন। শাসন বিভাগ আইন বিভাগের সম্পর্ক, ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ও ভারতীয় পরিষদের অবস্থান, বর্তমান সাংবিধানিক ব্যবস্থার বাইরে তাঁরা কিছু ভাবেন নি।

তবে স্বদেশি বা হোমরুল আন্দোলন নয়, এই পর্বে ভারতের জাতীয় আন্দোলন সাময়িকভাবে হলেও সন্ত্রাসবাদ ও বিপ্লববাদের চেহারা নেয়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন যখন স্থিমিত বা অস্তমিত তখন চরমপন্থী আন্দোলনের একটি গোষ্ঠী বিপ্লববাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ব্রিটিশ শাসননীতি ও কর্মপদ্ধতি, আর্থিক শোষণ ও কূটকৌশলের বিরুদ্ধে আবেদন-নিবেদন বা শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে আন্দোলন চালালে সাফল্য আসবে না, চাই বৈপ্লবিক পন্থা, হিংসাত্মক পদ্ধতি ও গোপন কৌশল—সশস্ত্র পথেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ ঘটাতে হবে। ষড়যন্ত্র, গুপ্ত হত্যা, অস্ত্র তৈরি ও সংগ্রহ এবং সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের অপশাসনের জবাব দিতে সৃষ্টি হল গুপ্ত সমিতির। অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর ছিল এই বৈপ্লবিক শক্তির সংগঠন। বাঘাযতীন, রাসবিহারী বসু, অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষ, মানবেন্দ্রনাথ রায়, উপেন্দ্রনাথ দত্ত, সাভারকার ভ্রাতৃদ্বয়, ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকী, কানাইলাল দত্ত ইত্যাদিরা ছিলেন এই আন্দোলনের সক্রিয় সদস্য। শুধু দেশেই নয়, দেশের বাইরে লালা হরদয়ালের (Lala Hardayal) গদ্দর পার্টি (Gaddar Party) সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনকে প্রসারিত করেছে।

স্বদেশি, হোমরুল বা সন্ত্রাসবাদী ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয় আন্দোলনের রূপ যাই হোক না কেন ব্রিটিশ সরকার শুধু সাংবিধানিক সংস্কার আর শাসনতান্ত্রিক সুবিধা বিতরণের নীতিতে আস্থাশীল ছিল না। নরমপন্থী, চরমপন্থী বা বিপ্লবী সব গোষ্ঠীর বিরুদ্ধেই প্রয়োজনে পুলিশী বা নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা নিতে তারা বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে নি। শাসন বা শোষণের কৌশলে কোম্পানির আমল থেকে বর্তমান ব্রিটিশ সরকার যে কোনও অংশে কম ছিল না তার বড় প্রমাণ কার্জনের আমলের স্বৈরতান্ত্রিক শাসন নীতি। ১৯১৯ সালে কুখ্যাত রাওলাট আইন প্রণয়ন করে বর্তমান ব্রিটিশ সরকার আবার পমরাণ করেছে এদেশের জাতীয় আন্দোলনকে রুদ্ধ করতে দমন-পীড়নই তাদের সবচেয়ে বড় শক্তি। রাওলাট আইনের (Rowlatt Act, 1999) মাধ্যমে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হল, বিনা বিচারে আটক ও নানা প্রতিরোধমূলক শাস্তিদানের ব্যবস্থা নেওয়া হল, সরকারি পুলিশি ও সামরিক সংগঠনকে কাজে লাগানো হল আন্দোলনকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেবার জন্য। রাওলাট আইনকে ব্যবহার করার চরম ও অত্যন্ত নিষ্ঠুর পরিণতি হল পঞ্জাবের অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড।

এই পর্বেই ভারতের রাজনীতিতে গান্ধীজির প্রবেশ এবং গণআন্দোলনের সূচনা হয়। ইতিমধ্যেই ভারতে এসে (৯ জানুয়ারি ১৯১৫) আমেদাবাদের কোচয়ার গ্রামে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পরীক্ষা শুরু করেছেন তিনি। বেনারসের হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বেলগাঁওয়ের রাজনৈতিক সম্মেলন, ইম্পিরিয়াল সিটিজেনশিপ অ্যাসোসিয়েশন, লক্ষ্ণৌ ও

কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশন—নানা মঞ্চে তিনি ভারতবাসীর সমস্যা ও আন্দোলন বিষয়ে আলোচনা করেছেন, সমাধানের পথ খুঁজেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় রাষ্ট্রশক্তির শোষণ ও নিপীড়নের যে অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষভাবে তিনি সঞ্চয় করেছেন এদেশের ব্রিটিশ রাষ্ট্রশক্তির শাসনে তার চেয়ে ভিন্ন কিছু লক্ষ করেননি। সত্যাগ্রহের আন্দোলন পুরোপুরি ছড়িয়ে দিতে না পারলেও বিহার, আমেদাবাদ, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশের কৃষক ও শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি আদায়ের সংগ্রামে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং জাতীয় আন্দোলনের গণসংগ্রামের এক নতুন ধারার সূচনা করেছেন। রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে জালিয়ানওয়ালাবাগের বিয়োগান্ত পরিণতি ও ব্রিটিশ শাসনের উগ্র সামরিক কায়দায় ভারতশাসনের প্রবণতা গান্ধীজি তাঁর সত্যাগ্রহের পদ্ধতি ও নৈতিক সংগ্রামের নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করতে পারেননি।

প্রান্তলিপি ঃ এই পর্বে বিহারের চম্পায়নে তিন কাঠিয়া ব্যবস্থার বিরুদ্দে (১৯১৭) আমেদাবাদে মিল শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি আন্দোলনে (১৯১৮), গুজরাটের খেড়ায় কৃষকদের খাজনা বিরোধী আন্দোলনে (১৯১৮) গান্ধীজি অহিংসা ও সত্যাগ্রহের পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। এই পর্বেই 'অছিবাদ' (Trusteeship) 'হিন্দু স্বরাজ', সর্বোদয়, গ্রাম স্বরাজ ইত্যাদি আদর্শ তিনি প্রচার করেছেন।

সামরিক আইন দিয়ে যে ভারত শাসন সম্ভব নয় ব্রিটিশ সরকার বিলম্বে হলেও সেটা বুঝেছে। ভারতের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কঠোর নিয়ন্ত্রণ নীতির প্রতি সাময়িকভাবে ব্রিটিশ শাসক আসক্ত হলেও শেষপর্যন্ত সাংবিধানিক সংস্কারের নীতিতেই আবার ফিরে আসে। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান শক্তি এবং যুদ্ধের পরিস্থিতি সমগ্র বিষয়টি সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারকে নতুন করে চিন্তা করতে বাধ্য করে। ১৯১৭ সালের ২০ আগস্ট ভারত সচিব এডউইন মন্টেগু (Edwin Montague) কমন্স সভায় ভারত সম্পর্কে যে ব্রিটিশ নীতি ঘোষণা করেন তাতে বলা হয়েছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশ হিসাবে ভারতে স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান প্রবর্তিত হবে দায়িত্বশীল শাসন প্রতিষ্ঠার স্বার্থেই। এর কিছুকাল পরেই লর্ড চেমস্‌ফোর্ড (Lord Chelmsford) ভারত সম্পর্কে যে উদারনীতি ব্যক্ত করেন মন্টেগুর ঘোষণার সঙ্গে তার মিল ছিল। তৎকালীন ভারত সচিব অস্টিন্‌ চেম্বারলিনের (Austen Chamberlain) কাছে দায়িত্বশীল শাসনের কিছু প্রস্তাবও তিনি পেশ করেন. মন্টেগু বা চেমস্‌ফোর্ডের উদারনীতি বা ভারত সম্পর্কে আবেগ বৈপ্লবিক হলেও ১৯১৯ সালের রাওলাট আইন এবং ব্রিটিশ শাসনের কিছু কিছু অন্যায় ও অসমনীতি দায়িত্বশীল শাসনের প্রতিষ্ঠাকে মিথ্যা প্রমাণিত করেছে। তবে ভারতে স্বায়ত্তশাসন দিতে ব্রিটিশ সরকার যে বদ্ধপরিকর ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেল যখন দেখা গেল মন্টেগু রিপোর্টের ভিত্তিতেই ব্রিটিশ কমনস্‌সভায় সরকার একটি বিল উত্থাপন করে এবং এই বিলকে আইনে প্রণয়ন করার উদ্যোগ নেয়। ১৯১৯ সালে ২ জুন উত্থাপিত এই বিলটি লর্ড সেলবোর্নের (Lord Selorne) নেতৃত্বে যৌথ পার্লামেন্টীয় কমিটি কিছু সংশোধনসহ নভেম্বর মাসে পেশ করে। ১৯১৯ সালের ২৩ ডিসেম্বর বিলটি আইনে প্রণীত হয় এবং ১৯২১ সাল থেকেই কার্যকর হয়।

মন্টেগু চেমস্‌ফোর্ডের উদ্যোগে গৃহীত বলে ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন (Government of India Act, 1919) মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড আইন (সংক্ষেপে মন্টফোর্ড আইন) নামে পরিচিত। মন্টেগুর ঘোষণাটি এই আইনের প্রস্তাবনা হিসাবে জুড়ে দেওয়া হয়। দায়িত্বশীল সরকারের সূত্রপাত হিসাবে এই আইনে দ্বৈত শাসনের (Dyarchy) নিয়মাবলি প্রবর্তিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের এলাকা বিভাজন, প্রতিনিধিমূলক আইনসভা, দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা, ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণ এই আইনের কতকগুলি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এবার আসুন আমরা ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিহ্নিত করি এবং এই আইনের তাৎপর্য কী তা বিচার করি।

১৯.৫ ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য

১৯১৯ সালের আইনের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে এদেশে উত্তরোত্তর ক্রমপর্যায়ে অগ্রগতির মাধ্যমে দায়িত্বশীল সরকার প্রবর্তিত হবে; প্রশাসনে ভারতীয়দের বেশি করে সংযুক্ত করা হবে। একই সঙ্গে এই আইনের প্রস্তাবনায় একথাও বলা হল যে, এদেশে স্বায়ত্তশাসনের অগ্রগতি ও সময় ব্রিটিশ সরকার স্থির করবে এবং শাসন সংস্কারের অগ্রগতি নির্ভর করবে ভারতীয়রা সরকারের সঙ্গে কীভাবে সহযোগিতা করেন ও কতটা দায়িত্বশীল আচরণ করেন তার উপর।

প্রস্তাবনায় ঘোষিত দায়িত্বশীল সাসনের নীতিকে কার্যকর করতে ১৯১৯ সালের ভারত সাসন আইনে যে সব নতুন ধারা যুক্ত হল সেগুলি নিম্নরূপ ঃ

(১) ক্ষমতা প্রত্যর্পণ আইনের মাধ্যমে (Devolution Rules) সরকারি ক্ষমতাকে কেন্দ্র ও প্রদেশগুলির মধ্যে ভাগ করা হয়। মুদ্রা, প্রতিরক্ষা, রেল, বিমান ইত্যাদি সর্বভারতীয় বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় তালিকায় এবং জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি রাজ্য তালিকায় স্থান পেল।

(২) প্রদেশগুলির নিয়ন্ত্রণাধীন ক্ষমতাকে সংরক্ষিত (Reserved) এবং হস্তান্তরিত (Transferred) বিষয় এই দু'ভাগে ভাগ করা হল। সংরক্ষিত বিষয়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল অর্থ, পুলিশ, বিচার, সংবাদপত্র, ভূমি-রাজস্ব ইত্যাদি হস্তান্তরিত বিষয়গুলি হল স্বায়ত্তশাসন, শিক্ষা, সমবায় জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি। সংরক্ষিত বিষয়গুলি গভর্নরের শাসন পরিষদের (Executive Council) মাধ্যমে পরিচালিত হবে এবং হস্তান্তরিত বিষয়গুলি গভর্নর মন্ত্রীদের সাহায্যে পরিচালনা করবেন। মন্ত্রীদের প্রাদেসিক আইন পরিষদের কাছে যৌথভাবে নয়; পৃথক পৃথক ভাবে দায়িত্বশীল থাকতে হবে এবং আইন পরিষদে অনাস্থা প্রস্তাব এনে মন্ত্রীদের পদচ্যুত করা যাবে।

(৩) এই আইনে কেন্দ্রীয় আইনসভাকে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট করা হয়। উচ্চ কক্ষের নাম হল রাজ্য পরিষদ (Council of States) এবং নিম্ন কক্ষের নাম কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ (Central Legislative Assembly)। রাজ্য পরিষদের সদস্যসংখ্যা ৬০। এর মধ্যে ৩৩ জন নির্বাচিত, ২৭ জন গভর্নর-জেনারেল মনোনীত সদস্য। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সদস্যসংখ্যা ১৪৫। এর মধ্যে ১০৩ জন নির্বাচিত, ৪২ জন মনোনীত। নির্বাচিত সদস্যদের ৫১ জন সাধারণ নির্বাচনী এলাকা থেকে, ৩২ জন সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচিত হবেন এবং অবশিষ্ট ২০ জন জমিদার (৭ জন), ইউরোপীয় (৯ জন) ও ভারতীয় বণিকশ্রেণির (৪ জন) দ্বারা নির্বাচিত হবেন। রাজ্য পরিষদের কার্যকাল ৫ বছর। গভর্নর-জেনারেল প্রয়োজনে এর মেয়াদ বাড়াতে পারেন। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের মেয়াদ ৩ বছর। মেয়াদ শেষ হবার আগে গভর্নর-জেনারেল আইনসভা ভেঙে দিতে পারেন।

(৪) নতুন আইনে কেন্দ্রীয় আইনসভায় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট প্রণীত কোনও আইন বাতিল বা পরিবর্তনের ক্ষমতা না থাকলেও ভারতে পার্লামেন্টীয় ব্যবস্থার শীর্ষে ছিল কেন্দ্রীয় আইনসভা। ভারত সচিবের অনুমোদন সাপেক্ষে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এর পর্যাপ্ত ক্ষমতা ছিল। বাজেট উত্থাপন, প্রস্তাব পেশ, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, মুলতুবি প্রস্তাব, ভোটাভুটির ব্যবস্থা, পার্লামেন্টীয় পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার সব থেকেই আইনসভার স্বাধীনতা স্বীকৃতি পেয়েছে। আইনসভার সদস্যদের অধিকার ও সুবিধাদিও নতুন এই আইনে স্বীকার করা হয়েছে।

(৫) এই আইনে প্রাদেশিক আইন পরিষদের আয়তন বৃদ্ধি করা হয়। বোম্বাই, মাদ্রাজ, সংযুক্তপ্রদেশ প্রায় সব আইন পরিষদের সদস্য বৃদ্ধি পায়। আইন পরিষদের সদস্যদের মধ্যে ৭০ ভাগ নির্বাচিত ও বাকিরা মনোনীত হতেন। মনোনীত সদস্যদের মধ্যে গরিষ্ঠাংশই ছিলেন সরকারি সদস্য (প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ) এবং বাকিরা বেসরকারি সদস্য। সংখ্যালঘুর প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা ছিল। প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ ছিল। তবে ভোটারদের মক্ষেত্রে বসবাস, কর প্রদানের হার ইত্যাদির সীমা ছিল। প্রাদেশিক আইন পরিষদের মেয়াদ ছিল ৩ বছর। মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষমতা প্রদেশের গভর্নরের ছিল। কেন্দ্রীয় আইনসভার প্রভাব-প্রতিপত্তি বেশি হলেও প্রাদেসিক আইনসভার ক্ষমতা গৌণ ছিল না। বাজেট প্রস্তাব পেশ, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, ভোটাভুটি এমনকি বাজেট প্রত্যাখ্যানের ক্ষমতা প্রাদেশিক আইনসভার ছিল। তবে প্রত্যাখ্যাত হলেও বাজেট বলবৎ করার অধিকার গভর্নরের ছিল।

সাধারণভাবে ১৯৯৯ সালের আইনের অন্যান্য বিষয়গুলি তেমন একটা দৃষ্টিআকর্ষণ সূচক নয়। ভারত সচিবের নির্দেশ ও নিয়ন্তরের ব্যবস্থা এই আইনেও ছিল। এই আইনেও গভর্নর-জেনারেল তথা ভাইসরয় ভারত সচিবের নির্দেশ অনুসারে ক্ষমতা ব্যবহারের অধিকার পেয়েছেন। এই আইনে গভর্নর-জেনারেলের প্রতিনিধি হিসাবে ভারত সরকার কর্তৃক হাই-কমিশনার নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। ভারত সচিবের দায়িত্ব লঘু করে প্রাদেশিক সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত হস্তান্তরিত বিষয়ে হাই-কমিশনারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা, ব্রিটেনের রাজস্ব থেকে ভারত সচিবের বেতন দানের ব্যবস্থা ইত্যাদি দু-একটি ছোটখাটো পরিবর্তন ছাড়া অন্যান্য তেমন একটা পরিবর্তন চোখে পড়ে না। ১৯১৯ সালের আইনের সাধারণ তাৎপর্য হল (১) ভারতবর্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও প্রতিনিধিমূলক শাসনের সূচনা এই আইনের মাধ্যমেই হয়েছে। (২) দ্বৈতশাসন, দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা, প্রদেশগুলির আইনসভার গুরুত্ব বৃদ্ধি, প্রতিনিধিত্বের উদারনীতি সীমিতভাবে হলেও সাংবিধানিক সংস্কার ও দায়িত্বশীল শাসনের সূচনা করেছে। (৩) এই আইন পূর্ববর্তী ভারত-শাসন আইনের সংস্কার নীতির সুবিধাগুলিকে এক সূত্রে গ্রন্থীবন্ধ করেছে।

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনকে অবশ্য চূড়ান্ত বিচারে গণতন্ত্র ও দায়িত্বশীল শাসনের পথ বা পন্থা বলে স্বীকার করা যায় না। সরকার এই ধরনের দাবি করলেও সমালোচকেরা এই আইনকে দায়িত্বশীল শাসনের প্রহসন বলেই মনে করেন। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের ব্যাপকতা, গভর্নর-জেনারেলের কর্তৃত্ব, দ্বৈত শাসনব্যবস্থার নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি, (যেমন, প্রাদেশিক আইনসভার সীমাবন্ধতা, সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত বিষয়ের সম্পর্ক সীমারেখার অভাব, আর্থিক প্রশ্নে প্রাদেশিক মন্ত্রীদের অক্ষমতা, নীতি কার্যকর করার ক্ষেত্রে অসামর্থ), ব্রিটিশ সরকারের বিভাজন ও শাসনের নীতিকে (Divide and Rules) প্রসারিত করা—এই সব কিছুই প্রমাণ করে ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন ইংরেজ সরকারের দায়িত্বশীল শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য বা অগ্রগতির সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। স্বায়ত্ত শাসনের নীতিকে স্বীকার করা হলেও প্রদেশগুলির উপর ব্রিটিশ রাজশক্তির নিয়ন্ত্রণ পূর্ণ মাত্রায় বজায় ছিল। আইনসভায়ও ইংরেজ প্রতিনিধিদেরই ছিল বিশেষ প্রভাব। নির্বাচন নীতিরও সঠিক প্রয়োগ হয়নি। এই আইন জাতীয়তাবাদী নেতাদের আকাঙ্ক্ষাকে পরিপূর্ণ করতে ব্যর্থ হয়েছে, কারণ এই সংস্কার আইনের মধ্যে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ছিল না। একটি দায়িত্বহীন শাসন কর্তৃপক্ষের হাতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার অর্পণ করেছে এই আইন। প্রদেশে দ্বৈত শাসনের ব্যবস্থা, প্রদেশের উপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ শিথিল বা ভারতীয় পরিষদকে আরও প্রতিনিধিমূলক করা এই আইনের বিশিষ্টতা বলে প্রতিপন্ন করার সরকারি চেষ্টা হলেও সপরিষদ গভর্নর-জেনারেলের

আচরণে শাসন ও প্রশাসন ব্যবস্থাকে কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা প্রাদেশিক ক্ষেত্রে দ্বৈত শাসনের নীতিকে অস্পষ্ট ও জটিল করে তোলার আইনি ব্যবস্থা সমর্থনযোগ্য নয়। দুর্গাদাস বসু প্রাদেশিক শাসনের ত্রুটিগুলির দিকে তাকিয়েই বলেছেন প্রাদেশিক ক্ষেত্রে মন্ত্রীপরিষদীয় শাসন অকার্যকর প্রমাণিত হয়েছে এবং ভারতীয়দের প্রত্যাশা ব্যর্থ করেছেন ("It is no wonder....that the introduction of ministerial Government over a part of provincial sphere proved ineffective and failed the satisfy Indian as pirations"—D. D. Basu)

দায়িত্বশীল সরকার বা পরিষদীয় শাসনের বিস্তারিত ক্ষেত্র বা জাল যে ১৯১৯ সালের আইনের মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়েছে তাতে অবশ্য কোনও সন্দেহ নেই। আইনগতভাবে পরিষদের গঠন, নির্বাচন, সদস্যদের যোগ্যতা, পরিষদের ক্ষমতা, বাজেট, গভর্নর ও পরিষদের সম্পর্ক, পার্লামেন্টীয় পদ্ধতি, মন্ত্রী ও পরিষদ সচিবের নিয়োগ, বিল সংক্রান্ত নিয়ম প্রায় সব প্রশ্নই বিচার করেছে এই আইন। তবে এই আইনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য যতটা স্পষ্ট ছিল, দ্বৈত শাসনের নীতি বা পরিষদীয় পন্থাগুলি ততটাই অস্বচ্ছ ছিল। স্বভাবতই প্রতিজ্ঞা বা প্রতিশ্রুতির সঙ্গে কর্মপন্থার বিরাট ব্যবধান নজরে আসে। নরমপন্থীরা আইনটিকে দায়িত্বশীল সরকারের প্রগতিশীল বাস্তবায়ন হিসাবে দেখলেও চরমপন্থীদের চোখে বিদেশি শাসক ও প্রতিনিধিদের দ্বারা প্রাপ্ত এই ব্যবস্থা আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বায়ত্তশাসনের বিরোধী ছিল। আন্দোলনে নানা ত্রুটি বা অস্পষ্টতা সত্ত্বেও ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন প্রযুক্ত হয়। ১৯১৯ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে এই আইনকে নানা বিতর্ক ও দ্বিধা নিয়ে মেনে নেওয়া হলেও শেষপর্যন্ত এই আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে নানা বাধা এসেছে এবং নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতির চাপে বিরিটিশ সরকার আইনগত ও প্রশাসনিক সংস্কারের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ও নতুন পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যাপারে অগ্রসর হয়।

এই পাঠের শেষ অংশে ১৯২০ থেকে ১৯৩৫ সালের মধ্যেকার বছরগুলির রাজনৈতিক আন্দোলন সাংবিধানিক সংস্কারক নীতি এবং উভয়ের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া সম্পর্কে শিক্ষার্থী পাঠক বিশেষভাবে পরিচিত হতে পারবেন।

১৯.৬ ১৯১৯ ও ১৯৩৫ সালের মধ্যবর্তী বছরগুলির রাজনৈতিক আন্দোলন সাংবিধানিক সংস্কারের গতি ও ক্রিয়া-প্রক্রিয়া

১৯.৬.১ অহিংস অসহযোগ আন্দোলন

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন সম্পর্কে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া ও পরবর্তীকালে গান্ধীজির নেতৃত্বে অহিংস অসহযোগ, আন্দোলন এই পর্বের উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনা। ইতিপূর্বে বিভিন্ন অধিবেশনে মন্টেগু-চেমস্ফোর্ড প্রস্তাব নিয়ে কংগ্রেস তার অসন্তোষ জানিয়েছে এবং এই প্রস্তাবের সংশোধনী চেয়েছে। ১৯১৮ সালে বোম্বাইয়ের তেত্রিশতম অধিবেশনে কংগ্রেস রাজনৈতিকভাবে ব্রিটিশ নীতির বিরোধিতা করে। রাওলাট বিল ও মল্ট-ফোর্ড প্রস্তাব যখন আইনে রূপায়িত হল কংগ্রেস তার ক্ষোভ চেপে রাখতে পারে নি। অমৃতসরে ৩৫তম অধিবেশনে পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে লোকমান্য তিলক, আলি ভ্রাতৃদ্বয়; মদন মোহন মালব্য, গান্ধীজি এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের উপস্থিতিতে এবং সমবেত সাত হাজার প্রতিনিধির সামনে মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইনকে অপ্রতুল, অসন্তোষজনক ও হতাশাজনক বলে বর্ণনা করা হয়।

গান্ধীজির চেষ্টায় একটি আপস মীমাংসার প্রস্তাব নেওয়া হলেও বা মন্টেগুকে তাঁর সংস্কার প্রস্তাবের জন্য ধন্যবাদ জানানো হলেও, ভাইসরয় চেমসফোর্ডকে নিন্দা করা হয় ও তাঁকে প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়। পঞ্জাবের হিংসাত্মক ঘটনা এবং ব্রিটিশ সরকারের উগ্র মনোভাবের নিন্দা করা হয়। ইতিপূর্বে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে কংগ্রেসের নরমপন্থী ও চমরপন্থী নেতৃত্বের কাছাকাছি আসার ঘটনা এবং নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের ঐক্য এবং স্বরাজ সম্পর্কে কংগ্রেসের অটল ভাবনা আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটা নতুন গতি সৃষ্টি করেছে। কংগ্রেস ও লিগ মিলিতভাবে এদেশের জন্য 'ডোমিনিয়ন মর্যাদা' দাবি করেছে। গান্ধীজির নেতৃত্বে রাজনৈতিক ও জাতীয় আন্দোলনে সৃষ্টি হল সম্পূর্ণ নতুন ও সংগঠিত প্রচেষ্টা। খিলাফৎ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস ও লিগের সম্পর্ক ঘনিষ্ট হল। ৩৫তম অধিবেশনে ব্রিটিশ শাসনের খিলাফৎ নীতির তীব্র সমালোচনা হল। ১৯ মার্চ খিলাফৎ দিবস পালিত হল। গান্ধীজি অসহযোগ আন্দোলনের পরিকল্পনা গ্রহণ করলে খিলাফৎ কমিটি ১৯১৯ সালের ২০ মে তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানালো।

পরবর্তী ২-৩ বছর ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে স্মরণীয় অধ্যায়। কলকাতার ৩৬তম অধিবেশনে লালা লাজপত রাইয়ের সবাপতিত্বে পঞ্জাব বিষয়ে হান্টার কিমশনের রিপোর্টকে তীব্র সমালোচনা করা হল। পক্ষপাতমূলক বিদ্বেষপূর্ণ এই রিপোর্টকে প্রত্যাখ্যান করা হল এবং নিন্দা করা হল পঞ্জাবের হিংসাত্মক ঘটনা সম্পর্কে ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের উদাসীনতায়। ব্রিটিশ সরকারের ন্যায়পরায়ণাতায় সন্দিগ্ধ জাতীয় কংগ্রেস অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব সমর্থন করে। তীব্র বিতর্ক এবং বিপিন চন্দ্র পাল, লাজপত রাই, মতিলাল নেহরু, চিত্তরঞ্জন দাস ইত্যাদির বিরোধিতা সত্ত্বেও প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। কংগ্রেসের ৩৭তম নাগপুর অধিবেশনে অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে ব্যাপক সমর্থন আসে। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্দে অসন্তোষ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্র, যুবক, শিক্ষক, সরকারি কর্মচারী, ব্রিটিশ সরকারের সাংবিধানিক আইন, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির বিরুদ্ধে বয়কট প্রস্তাবে বিপুলভাবে সাড়া দেয়। নাগপুর সভায় জমায়েত প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল ১৪,৫৮৩। আমেদাবাদের ৩৭তম অধিবেশনে স্বরাজের আদর্শকে সামনে রেখে গান্ধীজিকে কংগ্রেসের পক্ষে অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনায় পূর্ণ ক্ষমতা দান করা হয়।

গান্ধীজির নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন স্বরাজ অর্জন ও মুক্তি-সংগ্রামের এক নতুন অধ্যায়। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে এই ধরনের প্রত্যক্ষ আন্দোলন আগে হয়নি। শুধু গণ-আন্দোলন হিসাবেই নয় এই আন্দোলন সাম্রাজ্য বিরোধী এক অভিনব বৈপ্লবিক আন্দোলন। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আন্দোলন নয়, এটি হল নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন (Passive Resistance)। এই আন্দোলনের কর্মসূচিতে ছিল—(১) আইনসভা, আদালত, শিক্ষায়াতন বর্জন, (২) নির্বাচন, বিলাতি দ্রব্য, সরকারি কাজকর্ম বয়কট, (৩) স্বদেশি প্রতিষ্ঠান, দ্রব্য, কুটিরশিল্প, চরকার প্রতিষ্ঠা ও প্রচলন, (৪) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা। এক বছরের মধ্যে স্বরাজ আসবে বলে গান্ধীজি ঘোষণা করেছেন। জাতীয় কংগ্রেস একটি সংস্কার ও সাংবিধানিক পরিবর্তনের সভা থেকে বিপ্লবী গণসংগঠনে পরিণত হল। সব শ্রেণি ও সম্প্রদায়ের মানুষ সামিল হল এই সংগঠন ও আন্দোলনে। ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, আইনজীবী তাদের প্রতিষ্ঠান বয়কট করলেন, স্বদেশি বস্ত্র ও পণ্য কেনা বন্ধ হল, কৃষক মজুরেরা স্ব-স্ব কর্মকেন্দ্রে ধর্মঘট করলেন, কুটিরশিল্পের প্রসার হল, চরকা তৈরি হল, খাদিবস্ত্র উৎপাদন হল, জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও আদালত গড়ে উঠল।

১৯.৬.২ পরবর্তী ঘটনাবলি

চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছানোর মুহূর্তেই চৌরিচৌরার হিংসাত্মক ঘটনা ও পুলিশের মৃত্যু এবং ব্রিটিশ সরকারের তীব্র দমনপীড়নের পরিস্থিতিতে বেদনাহত হয়ে গান্ধীজি অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন। ব্রিটিশ সরকার গান্ধীজিকে ১০ মার্চ, ১৯২২ গ্রেপ্তার করে এবং তার বিরুদ্ধে ছ'বছরের কঠোর বন্দিদশার আদেশ জারি করে। অসহযোগ আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণ-সংগ্রামের এই পরিণতি লাজপৎ রায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহরু, এবং কংগ্রেসের বহু সক্রিয় সদস্যের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলে। কংগ্রেসের মধ্যেই মতিলাল নেহরু ও চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে নতুন গোষ্ঠী **'স্বরাজ্য দল'** (Swaraj Party) সৃষ্টি হল। শাসনতান্ত্রিক সংস্কার, ডোমিনিয়ন মর্যাদার জন্য ওঁরা আন্দোলন শুরু করলেন। বাংলাদেশে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের পথে কাজ শুরু করলেন। দেশে বামপন্থী আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে উঠল। বামপন্থীদরে নেতৃত্বে কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত হল। ইংরেজ সরকারের দমনপীড়ন নীতির আরেকটি দুঃখজনক প্রকাশ ঘটল বামপন্থা ও চরমপন্থার আন্দোলনকে স্তব্ধ করার পরিকল্পনার মধ্যে। সরকার বিরোধী কার্যকলাপ ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন বহু বিশিষ্ট নেতা। বিচার পদ্ধতিকে প্রহসনে পরিণত করে ইংরেজ সরকার বন্দিদের বিরুদ্ধে মামলা চালান দীর্ঘ চার বছর। ভারতের ইতিহাসে এই মামলাই মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা (Meerut Trial) নামে পরিচিত।

এই পর্বের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনা হল (১) ১৯২৪ সালে স্বরাজ্য পার্টির তরফে ব্রিটিশ সরকারের কাচে দায়িত্বশীল সরকারের দাবি এনে মতিলাল নেহরুর প্রস্তাব পেশ এবং এ বিষয়ে আলোচনার জন্য গোলটেবিল বৈঠক আহ্বানের দাবি। ব্রিটিশ সরকার এই দাবি প্রত্যাখ্যান করে। (২) কেন্দ্রীয় সরকারের সৌজন্যে স্যার মুডিম্যানের (Muddiman) নেতৃত্বে গঠিত কমিটির ভারতীয় সদস্যদের অধিকাংশ ভারতের প্রতিষ্ঠিত দ্বৈত শাসনের অবসানের পক্ষে বলেন। এঁরা হলেন তেজ বাহাদুর সপ্রু (Tej Bahadur Sapru), মহম্মত আলী জিন্না (M. A. Jinna), শিবস্বামী আয়ার (Sivaswami Ire) এবং আর. পি. পরাঞ্জপে (R. P. Paranjpye)। (৩) ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন সম্পর্কে ভারতীয় রাষ্ট্র কৃত্যকের (Indian Civil Service) সদস্যরা তাঁদের চাঞ্চল্য প্রকাশ করেছেন। ১৯২৩ সালে প্রতিষ্ঠিত রয়্যাল কমিশন (এটি লী কমিশন নামেও পরিচিত) ভারতে রাষ্ট্র কৃত্যকনিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন গঠনের দাবি জানায়। (৪) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু স্বরাজ পার্টির ভাঙন ও অবসান, গান্ধীজির স্বাস্থ্যের কারণে জেল থেকে মুক্তি, ংকগ্রেস রাজনীতিতে পুনঃ প্রবেশ, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা এবং সাম্প্রদায়িক শান্তির ক্ষেত্রে গান্ধীজির আত্মনিয়োগ এই পর্বের অন্য কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

> **প্রান্তলিপি ঃ** মতিলাল নেহরু, চিত্তরঞ্জন দাশ ইত্যাদিরা চেয়েছিলেন ১৯২৩ সালের পরিষদ নির্বাচনে কংগ্রেস অংশগ্রহণ করুক। কিন্তু গান্ধী শিষ্য রাজাগোপালাচারীর সভাপতিত্বে গয়া অধিবেশনে (১৯২২, ডিসেম্বর) তাঁদের এই প্রস্তাব পরাজিত হয়। এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেস ত্যাগ করে সংগঠনে প্রভাব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নির্বাচনের আগেই তাঁরা স্বরাজ্য দল গড়েন। স্বরাজ দলের নির্বাচনী ইস্তাহারে বলা হল স্বায়ত্তশাসনের দাবি পূরণ না হলে ব্রিটিশ সরকারকে প্রতি পদক্ষেপে বাধা দান করা হবে এবং ব্রিটিশ সৃষ্টি আইনের পরিবর্তন অথবা পরিসমাপ্তির জন্য ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করা হবে। ১৯২৩ সালের নির্বাচনে স্বরাজ্য দল বিশেষ সাফল্য লাভ করে।

১৯.৬.৩ সাইমন কমিশন

১৯২৭ সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত মুসলিম নেতাদের সম্মেলনে মহম্মদআলী জিন্না সাম্প্রদায়িক সমাধানের জন্য যৌথ নির্বাচকমণ্ডলীর প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবটি মহঃ সফির নেতৃত্বে অধিকাংশ রক্ষণশীল মুসলিম নেতাদের সমর্থন পায়নি। ইতিমধ্যে ব্রিটিশ সরকার সাইমন কমিশন (Simon Commission) গঠন করে সাংবিধানিক পরিবর্তনের

জন্য তথ্যানুসন্ধানের প্রয়াস নেয়। স্যার জন সাইমনকে (Sir John Simon) চেয়ারম্যান করে গঠিত সাত সদস্যের এই কমিশন বিধিবন্ধ কমিশন (Statutory Commission) নামেও পরিচিত। এই কমিশনে কোনও ভারতীয় সদস্য ছিলেন না। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনেই দশ বছর পরে এই ধরনের এক কমিশন গঠনের প্রস্তাব ছিল। উদ্ভূত নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সরকার দু'বছর আগেই এই কমিশন (১৯২৭) গঠন করে। শ্বেতকায়দের নিয়ে গঠিত এই কমিশনের প্রতি কংগ্রেসের কোনও আস্থা ছিল না, যদিও রক্ষণশীল মুসলিম নেতারা এই কমিশনের প্রতি আনুগ্যত দেখিয়েছেন। মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের ২৭তম অধিবেশনে সাইমন কমিশনকে প্রতিটি পর্যায়ে এবং সবরকমভাবে (at each stage and in very form) ও বয়কট করার সিদ্ধান্ত হল। সাইমন কমিশন ৩ ফেব্রুয়ারি ভারতে পদার্পণ করলে ওই দিন সারা দেশে হরতাল ডাকা হল। কলকাতাসহ বহু শহরে ছাত্র বিক্ষোভ, লাঠিচালনার ঘটনা ঘটল। লাহোরে লাজপত রাই এবং সংযুক্ত প্রদেশে জওহরলাল নেহরু, গোবিন্দ বল্লভ পন্থ মিছিল পরিচালনার কালে লাঞ্ছিত হলেন। সাইমন ৭ জনের ভারতীয় কমিটি গড়ে এক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য ভাইসরায়ের কাছে প্রস্তাব করেন। আইন সভায় লাজপত রাই সাইমন কমিশন বর্জনের প্রস্তাব আনলেন। পরিস্থিতি প্রতিকূল হওয়াতে কমিশন ভারত ত্যাগ করে। তবে কমিশন পুনরায় ভারতে আসে এবং ১৯৩০ সালের মে মাসে তার রিপোর্ট পেশ করে।

সাইমন কমিশনের রিপোর্টের মূল বক্তব্য ছিল ঃ (১) প্রদেশগুলিতে দ্বৈত শাসনের অবসান ঘটবে এবং মন্ত্রীদের দায়িত্বশীল করতে হবে। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের এবং সংরক্ষিত বিষয় সংক্রান্ত শাসন বিভাগের বিলুপ্তি ঘটাতে হবে। (২) প্রদেশের শান্তিশৃঙ্খলা, সংখ্যালঘু স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যাপারে সরকারকে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। (৩) এককেন্দ্রিক শাসনের পরিবর্তে ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন, কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করতে হবে। (৪) ভোটাধিকারকে সম্প্রসারণ করতে হবে। সাইমন কমিশন। ডোমিনিয়ন মর্যাদা সম্পর্কে কিছু বলে নি। ব্রিটিশ স্বার্থ সুরক্ষার ব্যাপারটিই কমিশনের রিপোর্টে গুরুত্ব পেয়েছে। স্বাভাবিকবাবেই সাইমন কমিশন ভারতীয়দের প্রত্যাশা মেটাতে ব্যর্থ হয়েছে।

১৯.৬.৪ সর্বদলীয় সম্মেলন ও মতিলাল নেহেরু কমিটি রিপোর্ট

১৯২৭ সালের ২৪ নভেম্বর সাইমন কমিশন গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই ভারত সচিব লর্ড বার্কেনহেড (Lord Birkenhead) ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতাদের কাছে চ্যালেঞ্জ রেখেছিলেন যে, ভারতীয়রা কখনই ঐক্যবন্ধভাবে এদেশের জন্য সংবিধান রচনা করতে পারবেন না। বার্কেনহেডের এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে দিল্লিতে ১৯২৮ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি মতিলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে সর্বদলীয় এক সম্মেলন আহ্বান করা হল। এই সম্মেলনে ২৯টি সংগঠনের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সর্বদলীয় সম্মেলনে যে সব প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে তাতে একটি ব্যাপারে চূড়ান্ত ঐকমত্য হয়েছে ঃ ডোমিনিয়ন মর্যাদার ভিত্তিতে সম্পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা (full responsible government on the basis of Dominion Status)।

> **প্রান্তলিপি ঃ** ইতিপূর্বে ১৮৯৫ সালে তিলক এবং ১৯২১ সালে তেজ বাদাদুর সপ্রু ও অ্যানি বেশান্ত 'স্বরাজ বিল' ও ভারতের স্বায়ত্তশাসনের জন্য সংবিধান রচনার প্রয়াস নিলেও ব্যর্থ হন। ১৯২৫ সালে The Common-wealth of India Bill রচিত হলেও ব্রিটিশ কমন্সসভায় প্রথম পাঠ পর্যায় পর্যন্ত এটি পৌছতে পারেনি। ব্রিটেনে শ্রমিক নেতার প্রচেষ্টায় এই বিল রচিত হলেও ভারতীয় সদস্যরা এ ব্যাপারে উদ্যোগী ছিলে না।

সর্বদলীয় সম্মেলনে মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে একটি কমিটি গড়ে অধিকার দেশীয় রাজ্যের ভবিষ্যৎ ইত্যাদি বিষয়ে রিপোর্ট করার কথা বলা হয়েছে। নানা কারণে এই কমিটি নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করতে পারেনি। ১৯ মে আবার বোম্বাইয়ের সর্বদলীয় সম্মেলন আহ্বান করে

পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করে ভারতের জন্য সংবিধান সংক্রান্ত নীতি আগামী ১ জুলাইয়ের মধ্যে স্থির করা হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ব্যাপারে কমিটি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের সঙ্গে পরামর্শ করবে, কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনের ঐক্যের প্রস্তাব গ্রহণ করবে এবং সব রকমের সুপারিশ নিয়ে কাজ করবে স্থির হয়। এক্ষেত্রে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মেলনে যে সব উপসমিতি (Sub-Committees) গঠন করা হয়েছিল তাদের মতামতও গ্রহণ করার কথা বলা হয়।

মতিলাল নেহুর নেতৃত্বে গঠিত কমিটি যে খসড়া সংবিধান রচনা করেছে সেই সংবিধানের মূল কথা ছিল ঃ (১) ভারতেক ডোমিনিয়ন মর্যাদা দান; (২) কেন্দ্র ও প্রদেশগুলিতে দায়িত্বশীল সরকার গঠন; (৩) কেন্দ্রের আইনসভা হবে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট ও রাজ্যের আইনসভা এক-কক্ষ বিশিষ্ট; (৪) কেন্দ্রের আইনসভার নিম্নতর কক্ষ ও প্রদেশগুলির আইনসভায় সদস্যরা প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হবেন; (৫) যুক্তরাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে কেন্দ্র ও প্রদেশগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করতে হবে। অবশিষ্ট ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে থাকবে; (৬) সংবিধানে কতকগুলি মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ করা হবে; (৭) সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থার অবসান হবে এবং যৌথ নির্বাচকমণ্ডলীর (Joint Electorates) ব্যবস্থা করতে হবে; (৮) সর্বোচ্চ আপিল আদালত হিসাবে একটি সুপ্রিমকোর্ট স্থাপন করা হবে।

প্রান্তলিপি ঃ নেহরু কমিটির অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন স্যার তেজ বাদাহুর সপ্রু, স্যার আলি ইমাম, এস. এস. অ্যানি, সুভাষচন্দ্র বসু ও জওহরলাল নেহরু। (Tej Bahadur Sapru, Ali Imam, S. S. Annie, Subhas Chandra Basu, Jawaharlal Nehru)

১৯.৬.৫ মুসলিম লিগের ১৪ দফা দাবি

মতিলাল নেহরু কমিটি যে খসড়া সংবিধানের প্রস্তাব করেছে ভারতে সংবিধানতন্ত্রের বিকাশে তার ভূমিকা অনস্বীকার্য। এই কমিটির খসড়া প্রস্তাব লক্ষ্ণৌ-এর সর্বদলীয় সম্মেলনে অনুমোদিত হবার পর সব দলের কাছে যায় প্রস্তাবগুলি বিবেচনার জন্য। ১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বরে কংগ্রেস কার্যকরী কমিটি (Congress Working Committee) নেহরু খসড়া প্রস্তাবকে অনুমোদন করে। জওহরলাল নেহরু, সুভাষ চন্দ্র বসু অবশ্য কমিটির ডোমিনিয়ন মর্যাদার ধারণাকে সমর্থন করেননি। নেহরু কমিটির সচিব (Secretary) পদ থেকে ইস্তফা দেন। জওহরলাল নেহরু মনে করেন কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনের (১৯২৭) পূর্ণ স্বাধীনতার (Complete Independence) অঙ্গীকারও মতিলাল নেহরু কমিটি প্রস্তাবিত সংবিধানে উপেক্ষিত হয়েছে। ইতিমধ্যে সর্বদলীয় ঐকমত্যেও ফাটল ধরেছে। স্যার সফির (Sir Safi) নেতৃত্বে মুসলিম লিগ মেহুর রিপোর্টকে প্রত্যাখ্যান করেছে। নেহরু রিপোর্টের বিকল্প হিসাবে জিন্নার উদ্যোগে ১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এক বিশেষ অধিবেশনে (Special Session) ১৪ দফা দাবি সম্বলিত এক কর্মসূচি পেশ করা হল। এই কর্মসূচির মধ্যে ছিল ঃ (১) ভারতের ভবিষ্যৎ সবিধান হবে যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রকৃতির এবং অতিরিক্ত ক্ষমতা থাকবে প্রদেশগুলির হাতে; (২) সমস্ত প্রদেশগুলিকে সমরূপ স্বাতন্ত্র্য (Uniform autonomy) দিতে হবে; (৩) আইনসভায় সমস্ত সংখ্যালঘুর জন্য পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা থাকবে; (৪) কেন্দ্রীয় আইনসভায় এক-তৃতীয়াংশের কম মুসলিম প্রতিনিধি থাকবে না; (৫) সংখ্যালঘুদের জন্য পৃথক-নির্বাচকমণ্ডলীর ব্যবস্থা করতে হবে; (৬) পঞ্জাব, বাংলা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ইত্যাদি স্থানের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে প্রভাবিত করে কোনও ভূখণ্ডগত গণবণ্টনের (Trritorial Redistribution) ব্যবস্থা করা চলবে না; (৭) সমস্ত সম্প্রদায়ের ধর্মীয় স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করতে হবে; (৮) কোনও সম্প্রদায়ের তিন-চতুর্থাংশ

প্রতিনিধি কোনও বিলের বিরোধিতা করলে সেই বিল পাশ করা চলবে না; (৯) সিন্ধুকে পৃথক প্রদেশে (বোম্বে থেকে পৃথক) মর্যাদা দিতে হবে; (১০) অন্যান্য প্রদেশের মতো উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বালুচিস্থানে সংস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে; (১১) রাষ্ট্রকার্যে এবং স্থানীয় শাসনে মুসলিমদের পর্যাপ্ত অংশগ্রহণের সাংবিধানিক নিশ্চয়তা দিতে হবে; (১২) ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলিমদের সাংবিধানিক নিশ্চয়তা দিতে হবে; (১৩) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ক্যাবিনেটে মুসলিমদের সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশের কম হবে না এবং (১৪) যুক্তরাষ্ট্রের একক প্রদেশগুলির সম্মিলিত সম্মতি (Concurrence) ছাড়া কেন্দ্রীয় আইনসভার সংবিধান পরিবর্তন করা যাবে না।

১৯.৬.৬ লাহোর কংগ্রেস

সন্দেহ নেই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির এক স্পষ্ট ধারা এই সময় থেকেই ভারতের রাজনীতিতে লক্ষ করা গেল। পৃথক রাষ্ট্রের দাবি না এলেও মুসলিম লিগের ১৯৩০ সালের এলাহাবাদ অধিবেশনে মহম্মদ ইকবাল (Md. Ikbal) সভাপতির ভাষণে এক সংহত উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় মুসলিম রাষ্ট্রের (a consolidated North-West Indian Muslim State) ইচ্ছা জানিয়েছেন। বিষয়টি অবশ্য রাজনীতিজ্ঞ মহলে দার্শনিকের স্বপ্ন হিসাবেই নেওয়া হয়েছে এবং তেমন কোনও গুরুত্ব পায়নি। এই পর্বেই ১৯২৮ সালে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে ১৯২৯ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে ব্রিটিশ সরকার যদি নেহরু রিপোর্ট গ্রহণ না করে তবে কংগ্রেস অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে নামবে। ডোমিনিয়ন মর্যাদা দেবার ব্যাপারে এর পরেও ইংরেজ সরকারে উদাসীনতা লক্ষ করে ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে লাহোরে জওহরলাল নেহরুর সবাপতিত্বে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব নেওয়া হয়। লাহোর কংগ্রেসের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তগুলি হল ঃ

(১) নেহরু কমিটি প্রস্তাবিত ডোমিনিয় মর্যাদা নয়, কংগ্রেস সংবিধানের ১ ধারা অনুসারে ‘স্বরাজের’ অর্থ হল পূর্ণ স্বাধীনতা, সুতরাং পূর্ণ স্বাধীনতাই জাতীয় কংগ্রেসের দাবি।

(২) ভবিষ্যতে কোনও নির্বাচনে কংগ্রেস সদস্যরা অংশগ্রহণ করবে না এবং আইনসভা ও সরকারি কমিটিগুলি থেকে কংগ্রেস সদস্যরা ইস্তফা দেবেন।

(৩) সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটিতে ক্ষমতা অর্পণ করা হল প্রয়োজনমত আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করার জন্য। এই আন্দোলনে কতকগুলি এলাকায় কর না দেবার কর্মসূচিও থাকবে।

(৪) এর পর থেকে ২৬ জানুয়ারি দিনটিকে প্রতি বছর স্বাধীনতা দিবস হিসাবে উদ্‌যাপন করা হবে।

১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা হল, যে ব্রিটিশ শাসক ভারতকে আর্থিক, রাজনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক সব দিক থেকেই শোষণ করছে তার প্রতি আর কোন আনুগত্য নয়। আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য সবরকমের প্রস্তুতি নেবার কাজ শুরু হল। প্রসঙ্গত জানা দরকার, ১৯২৯ সালের অক্টোবর মাসে লর্ড আরউইন (Lord Irwin) ব্রিটেনের নবগঠিত শ্রমিক দলের পক্ষে ও প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোলান্ডের (Mac Donald) উদোগে ভারতে আসেন এবং এদেশের সাংবিধানিক শাসনের অগ্রগতি ও ডোমিনিয়ন মর্যাদার গুরুত্ব স্বীকার করে শীঘ্রই (সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর) এদেশের জন্য সংবিধান রচনার এক উদ্যোগ নেওয়া হবে—এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে একটি ঘোষণা করেন। কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির পক্ষ থেকে এই ঘোষণাকে স্বাগত জানানো হয়।

১৯২৯ সালের ২৩ ডিসেম্বর গান্ধীজির সঙ্গে ভাইসরয় আরউইনের এক বৈঠকে সরকারের পক্ষ থেকে সংবিধান রচনার ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রশ্নে আলোচনা ও প্রয়োজনীয় বিষদ ব্যাখ্যা দেওয়া নেওয়ার কাজ হয়েছে। বৈঠকে মহম্মদ আলী জিন্নাও উপস্থিত ছিলেন। এই বৈঠকেই এ প্রশ্নে গোল টেবিল বৈঠক (Round Table Conference) বসবে বলে স্থির হলেও প্রস্তাবিত বৈঠকে সংবিধান রচনার ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হবে ভাইসরয়ের পক্ষ থেকে এ আশ্বাস পাওয়া যায়নি।

১৯.৬.৭ আইন অমান্য আন্দোলন

সন্দেহ নেই ইংরেজ সরকারের এবং উদাসীনতা ও উপেক্ষার জবাব আইন অমান্য আন্দোলন (Civil Disobedience Movement) ১৯৩০ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি কংগ্রেস কার্যকরী সমিতি গান্ধীজিকে আন্দোলন পরিচালনার পূর্ণ কর্তৃত্ব দান করে। গান্ধীজি সারা ভারতবর্ষে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রস্তুতি নিলেন। ভাইসরয়ের কাছে এই উদ্দেশ্যে ১১ দফা দাবিও তিনি পেশ করেন। তাঁর দাবি অগ্রাহ্য হলে ২ মার্চ গান্ধীজি সত্যাগ্রহ শুরু করবেন বলে ভাইসরয়কে পত্র দিলেন এবং তাঁকে অনুরোধ জানালেন এই পরিস্থিতি যাতে সৃষ্টি না হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় নিবারণমূলক ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করুন। ব্রিটিশ সরকারের তরফে গান্ধীজির এই পত্রকেও উপেক্ষা করা হল। অবশেষে ১৯৩০ সালের ১২ মার্চ গান্ধীজি লবণ আইন অমান্য করবার জন্য শুরু করলেন ডান্ডির উদ্দেশ্যে পদযাত্রা (Dandi March)। দীর্ঘ দু'শ মাইলের এই ঐতিহাসিক পদযাত্রায় গান্ধীজির সাথী হয়েছেন তার বহু সমর্থক ও শিষ্য এবং পেয়েছেন অভূতপূর্ব উৎসাহ, শ্রদ্ধা ও সাড়া। ২৪ দিনের এই পদযাত্রার সমাপ্তি ঘটেছে ৫ এপ্রিল। এক দিনের উপবাস ও প্রার্থনার পর ডান্ডির সমুদ্র সৈকত থেকে লবণ তুলে নেবার মধ্য দিয়ে আইন অমান্য আন্দোলনের প্রতীকি সূচনা হল। নারী, পুরুষ, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, শিক্ষক, যুব, বৃদ্ধ সব মানুষ আন্দোলনে যোগ দিল। সরকারি আইন অমান্য ও অন্যায্য কর বর্জনের সঙ্গে সঙ্গে বিলাতি বস্ত্র বর্জন, সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতার আন্দোলনও সমান তালে চলেছে। ব্যাবসায়িক ক্ষতি ও রাজস্ব আদায় হ্রাসের প্রবণতা বৃদ্ধি এবং ব্যাপক বিশৃঙ্খলা ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সরকার প্রত্যাঘাত করে। সরকারি দমননীতি আগেকার সব নজির অতিক্রম করে যায়। পেশোয়ারে সরকারি দমননীতির নিষ্ঠুর ও বর্বরোচিত কাণ্ড (২৩ এপ্রিল) এবং চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের (১৮ এপ্রিল) ঘটনাও ঘটে গেছে এই সময়। জওহরলাল নেহরু, গান্ধীজিসহ বহু নেতা গ্রেপ্তার হলেন। আন্দোলন যত গভীরতা লাভ করেছে সরকারি প্রত্যাঘাত ও নিপীড়নের মাত্রা ততই বেড়েছে। প্রায় ৬০ হাজার মানুষ কারাবরণ করেছেন। সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি, স্থানীয় কংগ্রেস কমিটিগুলিকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। মহম্মদ আলি জিন্না হিন্দুপ্রধান আন্দোলন বলে বর্ণনা করেছেন এবং মুসলিম নেতারা এই আন্দোলন থেকে বিরত থেকেছেন। খান আবদুল গফ্ফর খানের (Khan Abdul Gaffar Khan) বাহিনী (Red Shirts) উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে এই আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে।

১৯. ৬. ৮ প্রথম গোলটেবিল বৈঠক

১৯৩০ সালের মে মাসে আইন অমান্য আন্দোলন চলাকালীন সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ পায়। মুসলিম লিগ ছাড়া সব দলই এই রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করে। আগস্ট মাসে তেজ বাহাদুর সপ্রু, এম. আর জয়াকার (M. R. Joyakar) ইত্যাদির নেতৃত্বে কংগ্রেস ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে নিষ্পত্তির (Conciliation) সূত্র খোঁজার চেষ্টাও ব্যর্থ হল। শেষপর্যন্ত আপস মীমাংসার পথে ইংরেজ সরকারকেই উদ্যোগ নিতে হল। লন্ডনে বসল প্রথম গোলটেবিল বৈঠক। ১২ নভেম্বর অনুষ্ঠিত এই বৈঠকের উদ্বোধন করলেন ব্রিটেনের রাজা। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী

ম্যাকডোনাল্ডের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত লন্ডনের এই বৈঠকে কংগ্রেস যোগ দেয় নি। বিশিষ্ট ব্যক্তি, ব্রিটেনের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ইত্যাদিদের উপস্থিতিতে এই সভায় ব্রিটিশ সরকার ভারত বিষয়ে একটি নিষ্পত্তিতে আসতে চাইলেন। ডেমিনিয়ন মর্যাদাসহ ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়া হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হল। ১৯৩১ সালের জানুয়ারি মাসে এই বৈঠকের সমাপ্তি দিনে (১৯ জানুয়ারি) বিস্তারিতভাবে না হলেও দায়িত্বশীল সরকার প্রবর্তনের এক প্রতিশ্রুতি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড দিয়েছেন (''..............I hope and trust and pray ....India will come to possess the only thing which she lacks to give her the status of a Dominion amonst the British Commonwealth of Nation—what she now lacks for that—the responsibilities and the cares, the burdens and the difficulties, but the pride and honour of responsible government.'' Ramsay Mac Donald).

১৯.৬.৯ গান্ধী-আরউইন চুক্তি

এই পর্বের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা গান্ধী-আরউইন চুক্তি (Gandhi-Irwin Pact) স্বরাজ ও ডোমিনিয়ন মর্যাদা লাভের মুক্ত প্রবক্তা মতিলাল নেহরু ১৯৩১ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি প্রয়াত হলেন। ভারতের পক্ষে এই বিষাদ ও দুঃখের পরিস্থিতিতে গান্ধীজি ভাইসরয় আরউইনের সঙ্গে মীমাংসা চুক্তির জন্য বৈঠকে মিলিত হলেন ১৭ ফেব্রুয়ারি। দীর্ঘ ১৮ দিন নানা আলোচনার পর চুক্তি শর্ত অনুসারে গান্ধীজি আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন। ব্রিটিশ সরকার সন্ত্রাসবাদীদের ছাড়া অন্য রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দেয় (চুক্তি স্বাক্ষরের ঠিক আগেই বিপ্লবী ভগৎ সিং-সহ কিছু সন্ত্রাসবাদীকে ফাঁসি দেওয়া হয়) লবণ তৈরি ও শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহে সরকার বাধা দেবে না বলে স্বীকার করে। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করার সম্মতি জানানো হয়।

১৯.৬.১০ দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক

গান্ধী-আরউইন চুক্তি ভারতের যুবশক্তিকে হতাশ করে। সুভাষ চন্দ্র বসু ও নেহুর এই চুক্তিকে অস্বীকার করেন। ১৯৩১ সালের মার্চ মাসে কংগ্রেসের করাচী অধিবেশনের প্রাক্কালে সর্বত্র তীব্র অসন্তোষ ধ্বনিত হতে থাকে। সর্দার বল্লভভাই পাটেলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের ৪৮তম (করাচী) অধিবেশনে বীর ভগৎ সিং-এর ফাঁসি ও ইংরেজ সরকারের নিপীড়ন নীতির তীব্র নিন্দা করা হল। শহীদদের উদ্দেশ্যে সমবেদনা জানানো হ'ল। গান্ধী-আরউইন প্রস্তাবের সংশোধন চাওয়া হ'ল। লক্ষণীয় এই চুক্তিতে ভারতে সাংবিধানিক সংস্কারের প্রশ্নে ব্রিটিশ সরকারের কর্তব্যের কথাও তেমনভাবে বলা হয়নি। গান্ধীজিকে কংগ্রেসের পক্ষে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে অংশ নেবার অনুমতি দেওয়া হল। ইতিমধ্যে ব্রিটেনের নির্বাচনে শ্রমিক দলের পতন হয়েছে। রক্ষণশীল সদস্য প্রভাবিত নতুন জাতীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ম্যাকডোনাল্ড ১৯৩১ সালের ৭ সেপ্টেম্বর যে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করলেন তাতে গান্ধীজি যোগ দিলেন। পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য ও সরোজিনী নাইডু (Sarajini Naidu) ব্যক্তিগত সামর্থ্যে বৈঠকে হাজির ছিলেন। এই বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ও সংখ্যালঘু বিষয়ক দুটি কমিটির মাধ্যমে ভারতের সাংবিধানিক সংস্কার প্রস্তাবকে রূপ দেবার উদ্যোগ নেওয়া হল। গান্ধীজি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো বিষয়ক কমিটিতে আবেগ মিশ্রিত ভাষায় সাংবিধানিক সংস্কারের সূত্র ধরে ব্রিটিশ সরকার ও ভারতীয়দের আপস মিটমাটের প্রচেষ্টার প্রশংসা করলেও শেষপর্যন্ত এই বৈঠকে কোন সমাধানই হল না। ম্যাকডোনাল্ড প্রস্তাবিত অধিকারের বিল ছাড়া এই বৈঠকের প্রাপ্তি ছিল শূন্য। গান্ধীজি খালি হাতে ফিরে এলেন এবং জানালেন তিনি ভারতীয় পতাকার সম্মানের মূল্যে আপোস মীমাংসা চান নি।

১৯.৬.১১ দ্বিতীয় পর্যায়ে আইন অমান্য

গান্ধীজি ভারতে ফিরে আসার পর পরিস্থিতি বদলে গেছে। আইউইনের পরিবর্তে লর্ড উইলিংডন (Lord Willingdon) ভাইসরয় হিসাবে ভারতে এসেছেন। গান্ধী আরউইন চুক্তির অবমাননাই নয়, নতুন ভাইসরয় ভারতীয় জাতীয়বাদের প্রতি বা সাংবিধানিক সংস্কারের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা দেখালেন না। উপরন্তু বাংলা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সংযুক্ত প্রদেশে অর্ডিন্যান্স জারি করে চূড়ান্ত নিপীড়ন ও শোষণ চালানো হল। গান্ধীজি ভাইসরয়ের সঙ্গে আলোচনায় বসবার অনুমতি চেয়েও পেলেন না। এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতি পুনারয় আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার প্রস্তাব নিল। দ্বিতীয় পর্যায়ের এই আন্দোল সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে দমনমূলক ব্যবস্থা আরও জোরদার করে। ১৯৩২ সালের ৪ জানুয়ারি সরকার ৫টি অর্ডিন্যান্স জারি করেন এবং আপৎকালীন ক্ষমতা গ্রহণ করেন। গান্ধীজিসহ কংগ্রেস কার্যালয়ে হানা দেওয়া হল, দলের গুরুত্বপূর্ণ কাজগপত্র বাজেয়াপ্ত হল, সম্পত্তি ও টাকাপয়সাও আটকে দেওয়া হল; সরকারি দমননীতির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা বৃদ্ধি পেল। বাংলা ও অন্যান্য স্থানে জেলখানায় রাজনৈতিক বন্দিদের উপর সরকার নির্মম অত্যাচার শুরু করেন। সরকারের নিপীড়ন ও নির্যাতনে বহু মানুষের মৃত্যু হল, আহত হলেন অনেকে এবং লক্ষাধিক মানুষ বন্দি হল।

১৯.৬.১২ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা

দ্বিতীয় পর্যায়ে অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড আইনসভায় সদস্য বণ্টনের এক বাঁটোয়ারার ব্যবস্থা করেন। এটি সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা (Communal Award) নামে পরিচিত। ১৯৩২ সালের ১৬ আগস্ট ঘোষিত এই বাঁটোয়ারা অনুসারে (১) প্রদেশগুলির আইনসভায় মুসলমান, শিখ, ভারতীয় খ্রিস্টান, ইঙ্গ-ভারতীয় নারীদের পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা হল; (২) শ্রম, ব্যবসায়, শিল্প, জমিদার, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পৃথক নির্বাচনক্ষেত্র ও আসনের ব্যবস্থা হল; (৩) বোম্বাই প্রদেশে মারাঠাদের জন্য ৭টি আসন সংরক্ষিত হল; (৪) অনুন্নত শ্রেণীর (Depressed Class) আলাদা নির্বাচন কেন্দ্র, নির্দিষ্ট সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা হল এবং সাধারণ নির্বাচন কেন্দ্রেও ভোটদানের অধিকার স্বীকৃত হল।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ব্যবস্থা ভারতীয় জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ইংরেজ শাসক সুকৌশলে শাসনের সুবিধার জন্যই ভাগবাঁটোয়ারার এই বন্দোবস্ত করেছে। অনুন্নত শ্রেণির জন্য আসন বণ্টন ব্যবস্থা গান্ধীজি সমর্থন করেননি। জেল থেকেই তিনি সরকারকে এই ব্যবস্থা প্রত্যাহারের অনুরোধ জানান। সরকারি উপেক্ষার জবাব হিসাবে ১৯৩২ সালের ২০ সেপ্টেম্বর তিনি জেলেই আমরণ অনশন করেন। ব্রিটিশ সরকার এতে না টললেও সারা দেশে এর তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল। রাজেন্দ্র প্রসাদ (Rajendra Prasad), মদন মোহন মালব্য, চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী, বি. আর. আম্বেদকার (B. R. Ambedkar), এম. সি. রাজা (M. C. Rajah) ইত্যাদিরা পুনরায় মিলিত হয়ে সরকারের সঙ্গে এক চুক্তি করেন। এই চুক্তি অনুসারে (Poona Pact) অনুন্নত শ্রেণির জন্য অধিক আসনের ব্যবস্থা হল। পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা পরিহার করা হল। সরকার এই চুক্তি মেনে নেয় এবং গান্ধীজিও অনশন ত্যাগ করেন।

১৯.৬.১৩ তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক ও শাসন সংস্কারের শ্বেতপত্র

পরবর্তীকালে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের ইচ্ছা প্রতিফলিত হয় তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকে (Third Round Table Conference) এবং সরকার কর্তৃত্ব সাংবিধানিক সংস্কার প্রস্তাব বিষয়ে শ্বেতপত্র (The White Papers on the proposals for Indian Constitutional Reforms) প্রদেশের মধ্য দিয়ে। তেজ বাহাদুর সপ্রুই প্রাথমিকভাবে তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক আহ্বানে উদ্যোগ নেন। ১৯৩২ সালের ১৭ নভেম্বর থেকে ২৪ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে কংগ্রেস বাদে প্রায় সব দলের প্রতিনিধিই আমন্ত্রিত হন। পূর্ববর্তী দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকের দুটি কমিটির রিপোর্টকে সামনে রেখেই এই কমিটির কাজ শুরু হয়েছে। অধিকারের বিল নিয়ে আলোচনা হলেও সরকার একে উপেক্ষা করেছে। এই বৈঠকের কোনও কৃতিত্ব বা অভিনবত্ব ছিল না। তবে এই বৈঠক চলাকালীন ভারতে মৌলানা আজাদ (Maulana Azad), সইদ মামুদ (Dr. Syed Mahamud), মদনমোহন মালব্য ইত্যাদিরা হিন্দু-মুসলিম ঐক্য বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ নেন। এলাহাবাদে ১৯৩২ সালের নভেম্বর মাসে একটি সম্মেলন (Unity Conference) অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনে (২৩ ডিসেম্বর ১৯৩২) শতকরা ৩২ ভাগ আসন মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত রেখে যৌথ নির্বাচনমণ্ডলী গড়ার এক প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ঠিক এই সময়েই নবনিযুক্ত ভারত সচিব স্যার স্যামুয়েল হোর (Sir Samuel Hoare) তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠকের শেষ দিনে (২৪ ডিসেম্বর, ১৯৩২) জানালেন (১) সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা চালু করতে প্রদেশগুলির সংখ্যা ও জনসংখ্যার অন্তত ৫০ ভাগের সমর্থন চাই; (২) কেন্দ্রীয় আইনসভায় ভারতীয় মুসলিমদের শতকরা ৩৩.৫ আসন বণ্টন করা হবে; (৩) সিন্ধু ও উড়িষ্যা দুটি নতুন প্রদেশের স্বীকৃতি পাবে। এই মর্মে ব্রিটিশ সরকার ২০২ অনুচ্ছেদ সম্বলিত এক শ্বেতপত্র প্রকাশ করে। ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে সাংবিধানিক সংস্কারের এই শ্বেতপত্র প্রকাশিত হয়। শ্বেতপত্রে যুক্তরাষ্ট্র, প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য ও এক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকারের দায়িত্ব কী—এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বলা হয়। স্যামুয়েল হোর কমন্সসভায় জানান (মার্চ ২৭, ১৯৩৩) এই প্রস্তাব স্বায়ত্তশাসনের জন্য নয়, সাংবিধানিক অগ্রগতির নতুন মাত্রা। ১৯৩৩ সালের এপ্রিল মাসে লর্ড লিনলিথগোর (Lord Linlithgow) সভাপতিত্বে ১৬ সদস্যের এক যৌথ সংসদীয় কমিটি (Joint Parliamentary Committee) নিয়োগ করে ব্রিটিশ সরকার এই শ্বেতপত্র সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যানুসন্ধান চালাবার সিদ্ধান্ত নেয়।

দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ বা শাসন সংস্কারের গতিবিধি স্পষ্ট না হলেও রাজনৈতিক আন্দোলনের গতি কিন্তু পিছিয়ে পড়ে। গান্ধীজি হিংসা, সন্ত্রাস, নিপীড়ন, সাম্প্রদায়িক অনৈক্য ইত্যাদির কথা ভেবে শাসন সংস্কার বা আন্দোলনের প্রশ্নে গুরুত্ব না দিয়ে সমাজ সংগঠন, হরিজন সমস্যা, সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিয়ে বেশি চিন্তিত হন। জেল থেকেই ১৯৩৩ সালের ৮ মে ২১ দিনের প্রায়শ্চিত্ত অনশন (atonement fast) শুরু করলেন। অনশনের দিনেই বন্দিত্বদশা থেকে মুক্তি পেলেও গান্ধীজি মানসিক মুক্তি পেলেন না। প্রায়শ্চিত্ত অনশনের মাধ্যমে এই মানসিক মুক্তি পেতে চাইলেন। আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখার কঠিন সিদ্ধান্ত নলেন গান্ধীজি। সুভাষ চন্দ্র বসু, জওহরলাল নেহরুর বিরোধিতা, সদস্য সমর্থকদের ক্রুদ্ধ প্রতিরোধ সত্ত্বেও গান্ধীজি তাঁর সিদ্ধান্ত অটল থাকেন. ইতিমধ্যে তিনি আবার গ্রেপ্তার হলেন, জেলে অনশন করলেন, মুক্তিও পেলেন। অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করলেও ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ চালিয়ে যাবার ব্যাপারে এতদিন তাঁর আপত্তি ছিল না। ১৯৩৪ সালের এপ্রিল মাস থেকে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলনও বন্ধ হল।

১৯৩৪ সালের নভেম্বর মাসে লর্ড লিনলিথগোর যৌথ পার্লামেন্টীয় কমিটি সাংবিধানিক সংস্কার বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের শ্বেতপত্র নিয়ে নানা তথ্যানুসন্ধান, জিজ্ঞাসা, আলাপ-আলোচনার পর, ব্রিটিশ ও ভারতীয় উভয়

পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণের পর শাসন সংস্কার বিষয়ে সবুজসংকেত দিল। যৌথ পার্লামেন্টীয় কমিটির সবুজ সংকেতের ভিত্তিতেই শেষপর্যন্ত ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের (Government of India Act, 1935) রূপরেখা প্রস্তুত হল।

১৯.৭ সারাংশ

১৯০৯ থেকে ১৯৩৫ সাল ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলন ও সাংবিধানিক শাসনের ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক পর্ব। রাজনৈতিক আন্দোলনের দিক থেকে এই পর্বের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি হল স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলন, সমন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, হোমরুল আন্দোলন, অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ও আইন অমান্য আন্দোলন। এই সময়ের উল্লেখযোগ্য শাসন সংস্কারগুলি হল মর্লে-মিন্টো সংস্কার, মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড আইন, সাইমন কমিশন, বিভিন্ন গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব, ম্যাকডোনাল্ড প্রবর্তিত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা এবং শাসন সংস্কারের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত ব্রিটিশ সরকারের শ্বেতপত্র। এই পর্বে কংগ্রেসের বিভিন্ন অধিবেশনে শাসন সংস্কার বিষয়ে নানা প্রস্তাব এসেছে, ব্রিটিশ সরকারের শাসননীতি নিয়ে প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত হয়েছে তবে লাহোর কংগ্রেসের প্রস্তাবটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই পূর্বে মুসলিম লিগ শাসন সংস্কার বিষয়ে তার মত প্রকাশ করেছে এবং ভবিষ্যৎ ভারতের সংবিধানর রূপ কী হবে সে সম্পর্কে মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে সর্বদলীয় সম্মেলন ও সর্বদলীয় কমিটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ প্রস্তাব রেখেছে।

১৯০৯ সালের মর্লে-মিন্টো সংস্কার প্রস্তাব ১৮৯২ সালের পরিষদ আইনের প্রসারিত রূপ। এই সংস্কার প্রস্তাবে আইন পরিষদ ও প্রশাসনে ভারতীয়দের বেশি করে সংযুক্ত করা, নির্বাচন নীতিকে গুরুত্ব দেওয়া, পরিষদের কার্যাবলির সম্প্রদাসরণের কথা আছে। এই সংস্কার আইন যে ভারতীয়দের খুশি করতে পারেনি তার প্রমাণ স্বদেশি আন্দোলন, হোমরুল আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন। প্রধানত সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনকে স্তব্ধ করতেই ব্রিটিশ সরকারের প্রবর্তন করে রাওলাট আইন (১৯১৯) পাশাপাশি ১৯১৯ সালে ব্রিটিশ সরকার শাসন সংস্কারের প্রস্তাব করলেও গান্ধীজির নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস সংস্কার ও স্বরাজের বৃহত্তর দাবিতে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেছে। ১৯১৯ সালের শাসন সংস্কার প্রস্তাবে দ্বৈত শাসন, কেন্দ্র-রাজ্য ক্ষমতা বণ্টন, আইনসভাকে দ্বি-কক্ষ করা, আইন পরিষদের আয়তন বৃদ্ধি করার কথা বলা হয়েছে। ব্যাপকতা ও গণভিত্তির দিক থেকে আইন অমান্য আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম। আন্দোলন প্রত্যাহার ও আন্দোলনের কৌশলগত প্রশ্নে গান্ধীজির সঙ্গে বিরোধীতার ফলেই চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহরু ইত্যাদিরা স্বরাজ দল গড়েছেন। অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে খিলাফৎ আন্দোলন যুক্ত হওয়াতে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ কিছুকাল পাশাপাশি এলেও শেষপর্যন্ত মুসলিম লিগ তাদের পৃথক প্রস্তাব পেশ করেছে। মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে সর্বভারতীয় মঞ্চে সংবিধান ও সংস্কার নিয়ে আলোচনা হয়েছে। রাজনৈতিক কারণে কিছুকাল আন্দোলন থেকে দূরে থাকলেও গান্ধীজি আবার ফিরে এসেছেন এবং নতুন করে সাংগঠনিক প্রস্তুতি নিয়ে শুরু করেছেন, আইন অমান্য আন্দোলন। ১৯৩০-৩১ এবং ১৯৩২-৩৪ এই দুটি পর্যায়ে আইন অমান্য আন্দোলন যে ব্রিটিশ সংস্কার আইনের কখনও সূত্র আবার কখনও ফলাফল হিসাবে ভারতের ইতিহাসে তাৎপর্যপূর্ণ তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সামিন কমিশন, গোলটেবিল বৈঠক, গান্ধী-আরউইন চুক্তি বা শাসন-সংস্কারের ব্রিটিশ শ্বেতপত্র যে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও আন্দোলনের সঙ্গে নেতিবাচক বা ইতিবাচকভাবে সম্পর্কিত এই পর্যায়ের রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক ইতিহসের ধারা সে কথা প্রমাণ করে।

১৯.৮ অনুশীলনী

(১) সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে বাক্যটি সম্পূর্ণ করুন ঃ

(ক) মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন প্রবর্তিত হয়েছে (i) ১৯০৫ (ii) ১৯০৯, ১৯১১ সালে।

(খ) মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন, আইন পরিষদের গঠন ও পর্যাবলির ক্ষেত্রে (i) পরিবর্তন এনেছে (ii) পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ হয়েছে।

(গ) বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব রদ হয় (i) ১৯০৬ (ii) ১৯০৯ (iii) ১৯১১ সালে।

(ঘ) ভারতে কেন্দ্রীয় আইনসভাকে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট করার প্রস্তাব হয় (i) ১৯০৯ সালের ভারত শাসন আইনে (ii) ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে (iii) ১৯১১ সালে সাইমন কমিশনের রিপোর্টে।

(ঙ) সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে ভারতে সর্বদলীয় সম্মেলন আহুত হয় (i) বালগঙ্গাধর তিলক (ii) মতিলাল নেহরু (iii) জওহরলাল নেহরু (iv) সুভাষ চন্দ্র বসুর নেতৃত্বে।

(চ) কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে ভারতের জন্য (i) ডোমিনিয়ন মর্যাদা (ii) পূর্ণ স্বাধীনতা (iii) সংবিধানের দাবি করা হয়।

(২) ক স্তম্ভের শব্দ বা শব্দগুচ্ছের সঙ্গে খ স্তম্ভের শব্দ বা শব্দ গুচ্ছের মিল দেখান ঃ

	স্তম্ভ ক		স্তম্ভ খ
(i)	বঙ্গভঙ্গ	(i)	বি. আর. আম্বেদকর
(ii)	মন্ট-ফোর্ড শাসনসংস্কার	(ii)	মতিলাল নেহরু
(iii)	র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড	(iii)	চিত্তরঞ্জন দাশ
(iv)	লাহোর কংগ্রেস	(iv)	লাল কুর্তা বাহিনী
(v)	পুনা চুক্তি	(v)	পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব
(vi)	সর্বদলীয় সম্মেলন	(vi)	অ্যানি বেশান্ত
(vii)	স্বরাজ্য দল	(vii)	১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন
(viii)	হোমরুল	(viii)	লর্ড কার্জন
(ix)	দ্বৈত শাসন	(ix)	সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা
(x)	খান আবদুল গফ্ফর খান	(x)	মন্টেগু ও চেমস্ফোর্ড

(৩) একটি বা দুটি বাক্যে নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন ঃ

(ক) রাওলাট আইনের উদ্দেশ্য কী ছিল?

(খ) মর্লে-মিন্টো শাসন সংস্কারের প্রধান লক্ষ্য কী ছিল?

(গ) ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের মূল উদ্দেশ্য কী ছিল?

(ঘ) লাহোর কংগ্রেসের মূল বক্তব্য কী ছিল?

(ঙ) সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা কার নীতি?

(চ) কোন্ চুক্তির শর্তবলে আই অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়েছিল?

(ছ) গান্ধীজি কোন্ গোটেবিল বৈঠকে যোগদান করেছিলেন?

(জ) গান্ধীজি কোথায় লবণ আইন অমান্য শুরু করেন?

(ঝ) সাইমন কমিশন অন্য কী নামে পরিচিত?

(ঞ) রয়্যাল কমিশন কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? এর দাবি কী ছিল?

(৪) অনধিক ৫০ বাক্যে উত্তর করুন ঃ

(ক) মর্লে-মিন্টো আইনের চারটি প্রস্তাব লিখুন।

(খ) অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের উপর টীকা লিখুন।

(গ) ১৯১৯ সালের আইনের তিনটি সংস্কার প্রস্তাব সম্পর্কে লিখুন।

(ঘ) আইন অমান্য আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও ফলাফল সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

(ঙ) সর্বদলীয় কমিটির রিপোর্ট সম্পর্কে লিখুন।

(চ) সাইমন কমিশনের রিপোর্টের মূল কথা কী ছিল?

(ছ) সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার উপর টীকা লিখুন।

৫) অনধিক ১৫০ বাক্যে উত্তর করুন ঃ

(ক) মর্লে-মিন্টো শাসন সস্কার আইনের বৈশিষ্ট্যগুলি লিখুন।

(খ) ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(গ) বিভিন্ন গোল টেবিল বৈঠকগুলির প্রস্তাব কী ছিল আলোচনা করুন।

১৯.৯ উত্তরমালা

(১) (ক) মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন প্রবর্তিত হয়েছে ১৯০৯ সালে।

(খ) মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন, আইন পরিষদের গঠন ও কার্যাবলির ক্ষেত্রে পরিবর্তন এনেছে।

(গ) বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব রদ হয় ১৯১১ সালে।

(ঘ) ভারতে কেন্দ্রীয় আইনসভাকে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট করার প্রস্তাব হয় ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে।

(ঙ) সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে ভারতে সর্বদলীয় সম্মেলন আহুত হয় মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে।

(চ) কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে ভারতের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করা হয়।

(২)	স্তম্ভ ক	স্তম্ভ খ
(i)	বঙ্গভঙ্গ	লর্ড কার্জন (viii)
(ii)	মন্ট-ফোর্ড শাসনসংস্কার	মন্টেগু ও চেমস্‌ফোর্ড (x)
(iii)	র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড	সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা (ix)
(iv)	লাহোর কংগ্রেস	পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব (v)
(v)	পুনা চুক্তি	বি. আর. আম্বেদকর (i)
(vi)	সর্বদলীয় সম্মেলন	মতিলাল নেহেরু (ii)
(vii)	স্বরাজ্য দল	চিত্তরঞ্জন দাশ (iii)
(viii)	হোমরুল	অ্যানি বেশান্ত (vi)
(ix)	দ্বৈত শাসন	১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন (vii)
(x)	খান আবদুল গফ্‌ফর খান	লাল কুর্তা বাহিনী (iv)

(৩) (ক) রাওলাট আইনের উদ্দেশ্য ছিল দমন-পীড়নের মাধ্যমে জাতীয় আন্দোলনকে স্তব্ধ করা।

(খ) মর্লে-মিন্টো শাসন সংস্কারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পরিষদ আইনের প্রসার ও প্রশাসনে ভারতীয়দের সংযুক্ত করা।

(গ) ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের মূল উদ্দেশ্য ছিল এদেশে উত্তরোত্তর দায়িত্বশীল সরকার প্রবর্তন।

(ঘ) লাহোর কংগ্রেসের মূল বক্তব্য ছিল ভারতের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা।

(ঙ) সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের নীতির।

(চ) গান্ধী-আরউইন চুক্তির শর্ত অনুসারে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়েছিল।

(ছ) গান্ধীজি দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন।

(জ) ডাণ্ডিতে গান্ধীজি লবণ লাইন অমান্য শুরু করেন।

(ঝ) সাইমন কমিশন বিধিবদ্ধ কমিশন নামে পরিচিত।

(ঞ) রয়্যাল কমিশন ১৯২৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর দাবি ছিল সর্বভারতীয় রাষ্ট্রকৃত্যক নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন গঠন।

১৯.১০ গ্রন্থপঞ্জি

1. Anil Chandra Banerjee: *Indian Constitutional Documents,* Vol. II (1949), Vol. III (1949).
2. Parmatma Sharan: *The Imperial Legislative Council of India,* 1861-1920, (1961).
3. M. M. Singh: *From Raj to Republic A Retrospect* (1972).
4. J. C. Johari: *Indian Government and Politics,* Vol-I (1996).
5. R. Palme Dutta: *India Today,* (1947).

একক ২০ ❑ প্রাক্-স্বাধীন ভারতবর্ষে সাংবিধানিক বিকাশের ধারা ঃ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন

গঠন

২০.০ উদ্দেশ্য
২০.১ প্রস্তাবনা
২০.২ মূল আলোচনা
২০.২.১ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের পটভূমি
২০.৩ ভারত শাসন আইনের (১৯৩৫) উদ্দেশ্য
২০.৪ ভারত শাসন আইনের (১৯৩৫) বৈশিষ্ট্য
২০.৫ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের দুর্বলতা ও তাৎপর্য
২০.৬ সারাংশ
২০.৭ অনুশীলনী
২০.৮ উত্তরমালা
২০.৯ গ্রন্থপঞ্জি

২০.০ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করলে আপনি

- ভারত শাসন আইনের (১৯৩৫) উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- এই আইনের বৈশিষ্ট্যগুলিকে শনাক্ত করতে পারবেন।
- স্বাধীন ভারতের সংবিধানে এই আইনের প্রভাব কী গড়েছে তা বিচার করতে পারবেন।

২০.১ প্রস্তাবনা

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন যে দায়িত্বশীল সরকার বা প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছে পরবর্তীকালের ঘটনাবলি ও প্রতিক্রিয়া তা প্রমাণ করে। পূর্ববর্তী একক পাঠ করে আপনারা জেনেছেন, অসহযোগ আন্দোলন, সর্বদলীয় সম্মেলনে সংবিধান রচনার উদ্যোগ, লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি, আইন অমান্য আন্দোলন সব কিছুই ব্রিটিশ শাসন ও সংস্কার সম্পর্কে ভারতীয়দের অতৃপ্তির প্রকাশ মাত্র। ইংরেজ সরকারও বিক্ষোভ প্রশমিত করতে, সাংবিধানিক শাসনের ধারা বজায় রাখতে তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। সাইমন কমিশন, গোলটেবিল বৈঠক, ম্যাকডোনাল্ড বাঁটোয়ারা কোনও সমাধান সূত্রই যখন কার্যকর হল না তখন তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকের শেষ দিনে ইংরেজ সরকারের পক্ষ থেকে তৎকালীন ভারত সচিব একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করে ভারতবাসীকে দায়িত্বশীল সরকার প্রবর্তনের এক আশ্বাস দিলেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের যৌথ কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতেই স্যামুয়েল হোর ১৯৩৫ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি কমন্স সভায় ভারতের শাসন সংস্কার বিষয়ে একটি বিল পেশ করেন। ১৯৩৫ সালের ২ আগস্ট বিলটি রানির অনুমোদন পায় এবং আইনে পরিণত হয়। এই আইনটিই হল ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন (Government of India Act, 1935)। কেন্দ্রে দ্বৈতশাসন প্রবর্তন,

কেন্দ্রীয় আইনসভাকে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট করা, বৃহত্তর ভারতের জন্য যুক্তরাষ্ট্র গঠন, ১১টি গভর্নরশাসিত প্রদেশকে স্বাতন্ত্র্যদান এই সংস্কার আইনের মুখ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। আইনটির মূল উদ্দেশ্য ছিল পূর্ববর্তী আইনের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি থেকে মুক্ত হয়ে ভারতের জন্য একটি দায়িত্বশীল শাসন ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন নীতি প্রতিষ্ঠা। প্রস্তাবিত দায়িত্বশীল শাসন ও যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার প্রকৃত উদ্দেশ্য ও কার্যকারিতা সম্পর্কে কংগ্রেস-সহ সব দলই সন্দেহ প্রকাশ করেছে। এই শাসন আইন অনুসারে সংসদীয় কর্মসূচি গ্রহণের প্রশ্নে জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে বিতর্ক সৃষ্টি হলেও শেষপর্যন্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও মন্ত্রিসভা গঠনের পক্ষে দলের কর্মসমিতির সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এবার আসুন আমরা মূল আলোচনায় প্রবেশ করি। মূল আলোচনায় প্রথমেই ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের পটভূমিটি জানা প্রয়োজন।

২০.২ মূল আলোচনা

২০.২.১ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের পটভূমি

১৮৫৮ সালের পর থেকেই ভারত সম্পর্কে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর মনোভাব যে বদলে যেতে থাকে তার একটার পর একটা সংকেত হল শাসননীতি ও সংস্কারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য তৎপরতা ও নমনীয়তা। উদ্দেশ্যগত বা কৌশলগত ধারণা যাই থাক, সাম্রাজ্য শাসনের মূল কাঠামো বহাল রেখে সাংবিধানিক সংস্কার, পুনর্বণ্টন ও পুনর্গঠনের এক ধারার সূচনা হল। ১৮৬১ ও ১৮৯২ সালের পরিষদ আইন, ১৯০৯ সালের শাসন সংস্কার, ১৯১৯ সালের দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা সাইমন কমিশন, গোলটেবিল বৈঠক, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর প্রশাসনিক তৎপরতার কয়েকটি বিশেষ নজির। জন স্টুয়ার্ট মিলের (T. S. Mill) উদার গণতন্ত্রের (Liberal Democratic) থারায় লালিত না হলেও ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী স্বৈরতন্ত্রী উদারনীতির (autocratic liberalism) আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে শাসন সংস্কারের কাজে অগ্রসর হলেন। ইংরেজরা নিজেরাই ভারত শাসন করবে, ভারতবাসীর অধিকার রক্ষা করবে, তাদের ত্রাণ ও সংস্কারের ব্যবস্থা করবে বাহুবলেই এবং ইংরেজ সিভিলিয়ানদের নিয়েও চলবে। এদেশের শাসন সংস্কারের কাজে জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের এই ভাবনা চার্লস উড (Charles Wood), স্ট্রেচি (Strechy), লরেন্স (Lorrence), লিটন বা কার্জনের মতো শাসকেরা ভেবেছিলেন একথা ঠিক। কিন্তু মেকলে (Macaulay) লর্ড মেয়ো, রিপন, হিউম, হেনরী বেভারীজ (Henry Bevarij) বা মিন্টো ও মর্লের মতো ইংরেজরা গর্ব বা পুরস্কার দিয়ে নয়, ভারত শাসনের প্রশ্নে প্রয়োগ করেছেন অনুভূতি ও সুবুদ্ধিকে।

স্বায়ত্তশাসন বা স্বাধন সরকার নয় ইংরেজ সরকার ভারতবাসীকে সুশাসন ও সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এই প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য কেন্দ্রীভূত আমলাতান্ত্রিক শাসনের পাশাপাশি পরষিদীয় শাসন, ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্ব এবং সীমিতভাবে আরও কিছু শাসন সংস্কারের ব্যবস্থা করা হল। শাসন সংস্কারের মধ্যে জাতি, ধর্ম ও শ্রেণিস্বার্থের সংরক্ষণ করে কৌশলে বিভেদ নীতি আমদানি করা হল। বিশেষ শ্রেণি ও সম্প্রদায়কে ইংরেজ শাসনের অনুগত করে তোলা হল এবং কংগ্রেসের মধ্যেও মডারেটদের শাসক দলের কাছাকাছি আনার চেষ্টা হল। মর্লে-মিন্টো শাসন সংস্কার (১৯৯০) বা ভারত শাসন আইন (১৯১৯) কোনও কিছুর মধ্য দিয়েই যখন ভারতবাসীর সন্তোষ বিধান করা গেল না তখন তারা সাইমন কমিশন (১৯২৮), সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা, গোলটেবিল বৈঠকের মাধ্যমে আপষ-মীমাংসার শেষ চেষ্টা করলেন। কিন্তু ব্রিটিশ

> জন স্টুয়ার্ট মিল ছিলেন একজন উদার রাষ্ট্র চিন্তাবিদ। গণতন্ত্র, শাসন সংস্কার ও ব্যক্তি স্বাধীনতার এক বিশিষ্ট প্রবক্তা হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের গতিটিকে উদার ও সংহত করার পক্ষে ছিলেন তিনি।

শাসকের এই চেষ্টাও ব্যর্থ হল। স্বরাজ ও শাসন সংস্কারের দাবিতে ভারতবাসীর বিক্ষোভ ও আন্দোলন চরম পর্যায়ে গেল। পুরোভাগে থেকে ভারতবাসীর এই বিক্ষোভকে সংগঠিত রূপ দিলেন গান্ধীজি, জওহরলাল নেহরু প্রভৃতি নেতা। ব্রিটিশ শাসন সংস্কারের প্রতি অনুগত হলেও মুসলিম লীগ পৃথকভাবে তাদের অধিকারের দাবি পেশ করল।

ইতিমধ্যে ব্রিটেনেও সরকার পরিবর্তন হয়েছে। রক্ষণশীল ব্রিটিশ নেতৃত্ব এদেশে দায়িত্বশীল শাসন প্রবর্তনে অনীহা প্রকাশ করে। ভাইসরয় লর্ড উইলিংডন, প্রধানমন্ত্রী চার্চিল (W. Churchill), ব্রিটিশ বাণিজ্যিক গোষ্ঠী, ইন্ডিয়া ডিফেন্স লিগ (India Defence League) ভারত সম্পর্কে নতুন কোনও শাসন সংস্কারের তীব্র আপত্তি জানায়। সাইমন, আরউইন, লোথিয়ান (Lothian) বা ম্যাকডোনাল্ডের মতো শাসকেরা শাসন সংস্কারের চেয়ে সাম্প্রদায়িক সংরক্ষণের ব্যাপারেই বেশি উৎসাহী ছিলেন। তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকের গুরুত্ব ছিল না। ভারত থেকে রক্ষণশীল ও আপষপন্থী প্রতিনিধিরাই আমন্ত্রিত হয়েছেন। ব্রিটেনের নতুন শাসনগোষ্ঠী কেন্দ্রীয় সরকারের কাঠামো পুনর্বিন্যাসের প্রশ্নে আলোচনা করলেও এদেশের প্রতিক্ষা, আর্থিক ব্যবস্থা ও দায়দায়িত্ব, ডোমিনিয়ন মর্যাদা বা ক্ষমতা বণ্টনের প্রশ্নে একরকম নীরবই ছিলেন। ভারতসচিব হোরের প্রচেষ্টায় শ্বেতপত্র প্রকাশিত হলেও ব্রিটিশ বিভাজন নীতি সংস্কারের প্রগতিশীল নীতিকে কখনই কার্যকর হতে দেয়নি। সংসদের আয়তন বৃদ্ধি, পরোক্ষ নির্বাচন, সাম্প্রদায়িক সংরক্ষণ, রাজন্যবর্গের ভিটো ক্ষমতা, ভারতসচিব ও গভর্নর জেনারেলের নিয়ন্ত্রণ—এর বাইরে শ্বেতপত্রে বেশি কিছু ছিল না। যাই হোক, শেষপর্যন্ত লর্ড লিনলিথগোর সভাপতিত্বে যৌথ পার্লামেন্টীয় কমিটি গঠিত হল। শ্বেতপত্রে নির্বাচিত শাসন সংস্কার, আইন অমান্য, সত্যাগ্রহ এবং গান্ধীজির অনশন পদ্ধতি নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে বিতর্ক ও বিভ্রান্তি থাকলেও, সংসদীয় রাজনীতির মোহ কংগ্রেস ত্যাগ করতে পারেনি। ১৯৩৪ সালের নভেম্বরে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের নির্বাচনে কংগ্রেস অংশগ্রহণ করেছে। শাসন সংস্কার বিষয়ে ব্রিটিশ সরকার নিযুক্ত যৌথ পার্লামেন্টীয় কমিটি নানা তথ্যানুসন্ধান, মিটিং ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে শাসন সংস্কারের উপর রিপোর্ট দিল। কমিটির রিপোর্ট নিয়ে রাজনৈতিক মহলে হতাশা সৃষ্টি হলেও, কংগ্রেস কার্যকরী সমিতিতে সংস্কারের প্রস্তাবকে অপ্রতুল বলা হলেও, ১৯৩৫ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী প্রতিবাদ দিবস পালিত হলেও শাসন সংস্কার বিলকে আটকানো গেল না। এই রিপোর্টের ভিত্তিতেই ভারত সচিব স্যামুয়েল হোর হাউস অব কমন্সে নতুন শাসনতান্ত্রিক আইন উত্থাপন করলেন। ১৯৩৫ সালের ২ আগস্ট ব্রিটিশ সংসদের উভয় সভায় ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫ অনুমোদন লাভ করে এবং রাজার সম্মতি লাভ করে।

এবার আসুন আমরা ভারত শাসন আইনের উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে আলোচনা করি।

২০.৩ ভারতে শাসন আইনের (১৯৩৫) উদ্দেশ্য

ভারতে শাসন সংস্কার বিষয়ে ইংরেজ সরকারের উদ্দেশ্য ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট—ইংরেজ কেন্দ্রীভূত আইন এবং স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের নিয়ন্ত্রণে রেখেই ভারত সম্পর্কে শাসন নীতি ও প্রস্তাব পেশ করা। সংসদীয় শাসনের কথা বলা হলেও সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচন ও ভোটাধিকারের নীতি প্রগতিশীল আইনসভার গঠন ও কাজে প্রতিকূলতা সৃষ্টি করেছে। শাসনের সুবিধার নজ্যই ব্রিটিশ সরকার এটা মনে প্রাণেই চেয়েছিলেন। শ্বেতপত্রের ব্যবস্থা ছিল ব্রিটিশ কর্মচারী ও মনোনীত সদস্যদের স্থান নেবেন ফেডারেশনে যোগদানকারী রাজন্যবর্গের প্রতিনিধিরা। ভাইসরয় ও ভারতসচিবের হাতেও প্রদেশের গভর্নরদের হাতে 'বিশেষ দায়িত্ব'ও বিবেচনা অনুসারে নীতি গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়ার অর্থ ভারতীয়দের প্রকৃত ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করা। ১৯৩৫ এর ভারত শাসন আইনে সংসদীয় শাসনের রূপটি হল—প্রসারিত সংসদ ও পরোক্ষ নির্বাচন। সংসদকে বড় করা হলেও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে

সংসদকে গণতান্ত্রিক করা হল না; আবার যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থা হল বটে কিন্তু তা প্রযোজ্য হল কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষেত্রে। প্রদেশে এতদিন দ্বৈতশাসন ছিল এবার তো কেন্দ্রের ক্ষেত্রে বলবৎ হল। ১১টি প্রদেশে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার কথা বলা হল বটে তবে কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হল না। গভর্নরের হাতে প্রভূত পরিমাণে 'বিশেষ ক্ষমতা' দেওয়া হয়েছে। আইন প্রণয়নেও প্রাদেশিক আইনসভাগুলির সীমাবদ্ধতা ছিল। প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রের গঠন প্রকৃতি ছিল অস্বাভাবিক ও জটিল। প্রচলিত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সঙ্গে এর কোনও মিল ছিল না। ব্রিটিশ শাসক নয়া শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক শাসনের এক ধারা এনেছেন স্বৈরতান্ত্রির ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ণ রেখে। সমকালে ভারতবর্ষে গণতন্ত্রের যে প্রবণতা ও প্রত্যাশা গড়ে উঠেছিল ব্রিটিশ সরকার সেই প্রবণতা ও প্রত্যাশাকে কখনই বাড়তে দিতে চায় নি। ডোমিনিয়ন মর্যাদার কথাও বলা হল না। আবার 'ভেদ কর ও শাসন কর' (Divide and Rule) নীতি বজায় রেখে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা অনুসারে পৃথক ভোটাধিকারের ব্যবস্থাও বহাল রইল। ফেডারেশন বা যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব থাকলেও তা শেষপর্যন্ত কার্যকরও হয়নি। ব্রিটিশ রক্ষণশীলদলের ক্রমবর্ধমান প্রভাব ও চাপ এর প্রধান কারণ হলেও ভারতীয়দের অর্ন্তদ্বন্দ্ব ও পরস্পর বিরোধিতাও এর জন্য দায়ী ছিল। চার্চিল, অস্টিন (Austin), চেম্বারলিন (Chamberlin), বলডুইনই (Baldwin) নয়। দেশীয় রাজারা এ প্রশ্নে একমত ছিলেন না। মুসলিমরা ফেডারেশন চায়নি আর গান্ধীজির চোখে যুক্তরাষ্ট্র ছিল অপবিত্র কাঠামো (unholly structure)।

ব্রিটিশের উদ্দেশ্য যাই হোক কংগ্রেসের বামপন্থী ও তরুণ অংশ (নেহরু, সুভাষ বোস ইত্যাদিরা) বা ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি সমাজতন্ত্রী দল শুধুমাত্র শাসন সংস্কার বা যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না। কংগ্রেস গণপরিষদ ও ভারতীয়দের দ্বারা রচিত সংবিধানের দাবিতে সোচ্চার হয়েছে। কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্রীরা ব্রিটিশ প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কারের নীতিতেই অনাস্থা প্রকাশ করেছে। পরিষদীয় কাজের চেয়ে ও বাইরের দৈনন্দিন গণসংগ্রামেই তাঁদের বেশি আস্থা ছিল। আচার্য নরেন্দ্র দেব, জয়প্রকাশ নারায়ণ, ইউসুফ মেহের আলি, মিনু মাসানি, অশোক মেহতা, রামমনোহর লোহিয়া ইত্যাদিরা নির্বাচন, মন্ত্রীত্ব ইত্যাদির লড়াইয়ের চেয়ে কৃষক ও শ্রমিক সংগঠনের ব্যাপারে বেশি আগ্রহী ছিলেন। কমিউনিষ্টরাও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ উদ্ঘাটন ও কংগ্রেসের সংবিধানতন্ত্রের নীতি পরিবর্তনের প্রশ্নে অধিক উৎসাহী ছিলেন। ব্রিটিশ শাসক অবশ্য তার পথেই চলেছে। গান্ধীর নৈতিক পন্থার প্রতি তাদের আকর্ষণ ছিল না। নতুন শাসন সংস্কারের প্রশ্নে তাই তারা গান্ধীজির সঙ্গে কোনও আলোচনাই করে নি। নেহেরু, বামপন্থী কংগ্রেসী এবং কমিউনিস্টদের নিষেধাজ্ঞা আর আটক আইন জারি করেই তারা নিরস্ত করতে চেয়েছে। কমিউনিস্ট সংগঠনকে তো বে-আইনি ঘোষণা করা হয়েছে। ব্রিটিশ শাসকের প্রতি আনুগত্য থাকলেও ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মুসলিম লিগ প্রবল সন্দেহ ও আপত্তি জানিয়েছে।

২০.৪ ভারত শাসন আইনের (১৯৩৫) বৈশিষ্ট্য

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের দুটি মূল বৈশিষ্ট্য ছিল ঃ (১) ব্রিটিশ ভারতীয় প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলির সমবায়ে একটি সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের গঠন; (২) প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন।

(১) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় যে সব বৈশিষ্ট্য এই আইনে লিপিবদ্ধ হয়েছে সেগুলি হল ঃ

(ক) কেন্দ্রে দ্বৈতশাসন (Dyarchy) ঃ ১৯১৯ সালের আইনে প্রদেশের ক্ষেত্রে দ্বৈতশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই আইনে প্রদেশের দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার বিলোপ করে, কেন্দ্রে দ্বৈতশাসন নীতি গৃহীত হল।

(খ) এই আইনে কেন্দ্রের শাসন-বিভাগীয় ক্ষমতাকে ২ ভাগে ভাগ করা হল—সংরক্ষিত (Reserved) ও হস্তান্তরিত (Transferred)। সংরক্ষিত বিষয়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল দেশরক্ষা, শান্তি-শৃঙ্খলা

রক্ষা, ধর্ম সংক্রান্ত ও উপজাতি সংক্রান্ত বিষয়। এই বিষয়গুলির পরিচালনার দায়িত্ব গভর্নর জেনারেল ও তার তিন উপদেষ্টার (Councillors) হাতে থাকবে। হস্তান্তরিত বিষয়গুলি গভর্নর জেনারেল কর্তৃক মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুসারে পরিচালিত হবে।

(গ) এই আইন অনুসারে গভর্নর জেনারেলের পরামর্শদাতারা পদাধিকারবলে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার সদস্যপদ লাভ করতে পারেন। তবে তাদের ভোটাধিকার থাকবে না; আইনসভার কাছে তাঁদের কোনও দায়িত্ব থাকবে না। তাঁদের দায়িত্ব শুধুমাত্র গভর্নর জেনারেলের কাছে।

(ঘ) গভর্নর জেনারেলের মন্ত্রিপরিষদের সদস্যসংখ্যা হবে অনধিক ১০ জন। গভর্নর জেনারেলের সন্তুষ্টির উপরই তাঁদের পদে থাকা নির্ভরশীল।

(ঙ) এই আইনে গভর্নর জেনারেলের হাতে স্বেচ্ছাধীন (discretionary) ও বিশেষ ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে মন্ত্রীদের পরামর্শ ছাড়াই তিনি ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন। এই ক্ষমতাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ভারতবর্ষ বা তার কোনও অংশে শান্তি ও নিরাপত্তার বিপন্ন হলে তার প্রতিকার, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, সরকারি কর্মচারীদের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ, সংখ্যালঘুদের আইনগত স্বার্থ সুনিশ্চিত করা, দেশীয় রাজ্যের ধিকার ও রাজন্যবর্গের মর্যাদা রক্ষা, ব্যক্তিগত বিচার ও বিশেষ অধিকার প্রয়োগের ব্যাপারে অসুবিধাগুলি দূর করা। স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ছাড়াও বাদরাকি গভর্নর জেনারেলকে বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করতে পারেন। এক্ষেত্রেও তিনি মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করবেন না। গভর্নর জেনারেলের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার মধ্যে মন্ত্রীদের নিয়োগ ও অপসারণ, যুক্তরাষ্ট্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভায় গৃহীত বিলে ভিটো প্রদান, আইনসভা ভেঙে দেওয়া ইত্যাদিও উল্লেখযোগ্য।

(চ) ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের কেন্দ্রীয় আইনসভাকে দ্বি-কক্ষবিসিষ্ট করা হয়। নিম্নকক্ষের নাম হল যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা (Federal Assembly) ও উচ্চকক্ষের নাম হল রাজ্য পরিষদ (Council of States)। নিম্নকক্ষের সদস্য হবে ৩৭৫ এবং উচ্চ পরিষদের সদস্য ২৬০। নিম্নকক্ষরে ৩৭৫ জন সদস্যদের মধ্যে ২৫০ জন নির্বাচিত এবং ১২৫ জন দেশীয় রাজ্যগুলির শাসকদের দ্বারা মনোনীত হবেন উচ্চপরিষদের সদস্যদের মধ্যে দেশীয় রাজ্যগুলির শাসকদের দ্বারা মনোনীত হবেন ১০৪ জন, বিভিন্ন রাজ্যগুলি থেকে নির্বাচিত হবেন ১৪০ জন, গভর্নর জেনারেলের মনোনীত সদস্য থাকবেন ৬ জন এবং ১০ জন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান, ভারতীয় খ্রিস্টান ও ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত। ভোটাধিকারের ভিত্তি হল পরোক্ষ নির্বাচন। সাধারণ মুসলমান ও শিখ তিন ধরনের সদস্যরাই নির্বাচিত হবেন। রাজ্যপরিষদ স্থায়ী কক্ষ—প্রতি তিন বছর অন্তর এর এক-তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর নেবেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার কার্যকাল ৫ বছর। গভর্নর জেনারেল প্রয়োজনে আগেই একে ভেঙে দিতে পারেন আবার এর মেয়াদ বাড়িয়ে দিতে পারেন। আইনসভার কার্যপরিচালনার জন্য অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল।

(ছ) ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে কেন্দ্রীয় ও যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় আইনসভাকে আইন প্রণয়নের অধিকার দেওয়া হয়। কোনও বিল আইনসভার উভয়কক্ষে পাশ হবার পর গভর্নর জেনারেলের স্বাক্ষর পেলে আইনে পরিণত হয়। অর্থবিল পাশের ব্যাপারে নিম্নকক্ষের বাড়তি ক্ষমতা ছাড়া বিল পাশের ক্ষেত্রে উভয়কক্ষের ক্ষমতা সমান। অর্থবিল কেবলমাত্র নিম্নকক্ষে উত্থাপিত হবে। কেন্দ্রীয় আইনসভাকে কতকগুলি ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয় নি,

যেমন ইংলন্ডের রাজপরিবার, ভারত সচিবের আদেশের বিরোধিতা, গভর্নর-জেনারেলের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার বিরোধিতা ইত্যাদি। আইনসভার অধিবেশন বন্ধ থাকাকালীন গভর্নর জেনারেল তাঁর বিশেষ দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য জরুরি আইন জারি করতে পারবেন। কতকগুলি ক্ষেত্রে বিল উত্থাপনের জন্য গভর্নর-জেনারেলের পূর্বানুমতি লাগত। আইনসভায় পাশ হওয়া বিলে ভিটো প্রদান বা কোনও বিষয়ে আইনসভাকে আলোচনা থেকে বিরত রাখার ক্ষমতা গভর্নর জেনারেলের ছিল।

(জ) ভারত শাসন আইনে রাজনৈতিকভাবে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অংশ হল—ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্য। এই বিলে বলা হয় দেশীয় রাজ্যগুলি ইচ্ছা করলে যুক্তরাষ্ট্রে কোনওরকম বাধ্যবাধকতা ছাড়াই যোগ দিতে পারবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠার পদ্ধতিটি হল বিভক্তিকরণের পদ্ধতিতে (by disaggregation) যুক্তরাষ্ট্র গঠন। একটি এককেন্দ্রিক শাসনকে ভেঙে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রচলিত ঐতিহাসিক পদ্ধতি বা যুক্তরাষ্ট্রের অভিন্ন প্রকৃতির উপাদান মেনে এই আইন যুক্তরাষ্ট্র সৃষ্টি করে নি।

(ঝ) ক্ষমতা বণ্টন পদ্ধতির ব্যাপারে ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইন তিনটি তালিকার ব্যবস্থা রেখেছে—কেন্দ্রীয় তালিকা (Central List), প্রাদেশিক তালিকা (Provincial List) এবং যুগ্ম তালিকা (Concurrent List)। কেন্দ্রীয় তালিকার বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় আইনসভার অনন্য এলাকা। কেন্দ্রীয় তালিকার মধ্যে ছিল পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা, জনগণনা, ডাক ও তার, রেল, মুদ্রা ব্যবস্থা ও বাণিজ্য প্রভৃতি ৫১টি বিষয়। প্রাদেশিক তালিকার (Provincial List) মধ্যে ছিল আইন-শৃঙ্খলা, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, সমবায় প্রভৃতি ৫৫টি বিষয়। প্রাদেশিক আইনসভার অনন্য এক্তিয়ার বলেই এগুলিকে ধরা হয়েছে। যুগ্ম তালিকার (Concurrent List) অন্তর্ভুক্ত ছিল সংবাদপত্র, বিবাহ, দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইন, শিল্পবিরোধ ইত্যাদি ৩৬টি বিষয়। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় আইনসভাকেই আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়। তবে, এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আইনসভার কোনও বিষয় থাকলে প্রাদেশিক আইনসভার আইন প্রণয়নের অধিকার ঐ বিষয়ে থাকবে না। এই তিনটি তালিকার বাইরে যাবতীয় ক্ষমতাকে অবশিষ্ট ক্ষমতা (Residuary Power) হিসাবে বর্ণনা করে বিষয়গুলিকে গভর্নর-জেনারেলের এক্তিয়ারে রাখা হয়েছে। জরুরি অবস্থার সময় কেন্দ্রীয় আইনসভা ক্ষমতাবণ্টন ব্যবস্থাকে বাতিল করে দিতে পারে। কেন্দ্রীয় আইনের বিরোধী কোনও প্রাদেশিক আইনকেও বাতিল করার অধিকার কেন্দ্রীয় আইনসভার আছে।

(ঞ) ১৯৩৫ সালের আইনের যুক্তরাষ্ট্রীয় বিষয়ক আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত। একজন প্রধান বিচারপতি ও দু'জন বিচারপতিকে নিয়ে গঠিত এই আদালতের মূল ও আপিল এলাকা (Original and Appellate Jurisdiction), ক্ষমতায় এই দুই এলাকা থাকবে বলা হয়। কেন্দ্র ও প্রদেশের বিরোধ, প্রদেশগুলির বিরোধের মীমাংসা, সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রভৃতি ছিল মূল এলাকার অন্তর্ভুক্ত। আপিল এলাকা অনুসারে নিম্ন-আদালতের আপিল গ্রহণের অধিকার এর ছিল।

(২) ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অন্য একটি বিশেষ দিক হল প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য বা স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা। ১৯১৯ সালের আইনে প্রাদেশিক ক্ষেত্রে যে দ্বৈতশাসনের ব্যবস্থা ছিল এই আইনে তার অবসান ঘটিয়ে

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের নীতি গ্রহণ করা হয়। প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের ক্ষেত্রে যেসব ব্যবস্থার কথা এই আইন বলেছে সেগুলি হল ঃ

(ক) গভর্নরকে সাহায্য করবার জন্য প্রতিটি প্রদেশে একটি মন্ত্রিসভা থাকবে। ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশগুলি দু'ভাগে বিভক্ত ছিল—(i) গভর্নর শাসিত প্রদেশ (ii) প্রধান কমিশনারের প্রদেশ। সিন্ধু, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও উড়িষ্যাসহ মোট ১১টি প্রদেশকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়। অন্যান্য প্রদেশগুলি হল—বাংলা, বোম্বাই, বিহার, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ ওবেরায় এবং আসাম। প্রাদেশিক সরকারের স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে সরাসরি কিছু না বলা হলে যৌথ সংসদীয় কমিটির রিপোর্ট মতো প্রাদেশিক সরকারের শাসন ও ব্যবস্থা বিভাগ (the Executive and Legislature) কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে প্রধানত মুক্ত থাকবে, তবে সম্পূর্ণভাবে নয়। প্রদেশের শাসন বিভাগ আইনসভার কাছে দায়িত্বশীল হলে শাসকপ্রধান গভর্নরের হাতে ছিল বিশেষ ক্ষমতা।

(খ) প্রদেশগুলিতে আইনসভার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে মন্ত্রিসভা গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রাদেশিক শাসনের বিষয়গুলি পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মন্ত্রিসভাকে। প্রাদেশিক ক্ষেত্রে কোনও সংরক্ষিত বিষয় আর রইল না, সবই হস্তান্তরিত ক্ষমতা।

(গ) প্রদেশগুলিতে এক বা দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট প্রাদেশিক আইনসভা গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, বাংলা ও আসাম এই ছ'টি প্রদেশের আইনসভা দুটি কক্ষ নিয়ে গঠিত হবে। অন্যান্য পাঁচটি প্রদেশের আইনসভা হবে এক-কক্ষবিশিষ্ট। দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার কক্ষ দুটি হল আইনসভা (নিম্নকক্ষ) ও আইন পরিষদ (উচ্চকক্ষ)। আইনসভার উচ্চকক্ষের সদস্যসংখ্যার সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। আইনসভার সদস্যসংখ্যাও সর্বাধিক কত হবে বলা হয়েছে। বাংলায় আইনসভার সীমা ২৫০ ও আইন পরিষদের সীমা ৬৩-৬৫ জন সদস্য। সদস্য নির্বাচনের ব্যাপারে আসনগুলিকে 'সাধারণ', 'সাম্প্রদায়িক' এই দুই শ্রেণিতে ভাগ করা হয় এবং এ ব্যাপারে র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার শর্ত কার্যকরী হবে বলা হয়। আইনসভার কার্যকাল ৫ বছর নির্ধারিত হয় এবং আইনসভাগুলিতে স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। আইনসভা, আইন পরিষদ আহ্বান, বিরতি ও আইনসভার বিলুপ্তি সাধনের ক্ষমতা গভর্নরের হাতে দেওয়া হল।

(ঘ) বর্তমান আইনে দেশগুলির আইনসভার সদস্যসংখ্যা সমান ছিল না। আইনসভার সাধারণ আসনগুলিতে তপশিলভুক্ত সম্প্রদায়ের জন্য কিছু আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। আইন পরিষদের আসনগুলিকে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয় (i) প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সদস্য নির্বাচন, (ii) আইনসভার সদস্য কর্তৃক কিছু সদস্য নির্বাচন, (iii) গভর্নর মনোনীত সদস্য।

(ঙ) প্রদেশে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে মূল ক্ষমতা আইনসভার হাতেই থাকবে। আইন পরিষদ বিল সংশোধন ও অনুমোদন বা বিলম্বিত করার অধিকার পাবে। তবে অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে আইনসভার হাতেই মূল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হবে। গভর্নরের সম্মতি ছাড়া বিল আইনের মর্যাদা পাবে না। গভর্নর প্রয়োজনে অর্ডিন্যান্স বা অস্থায়ী জরুরি আইন জারি করতে পারেন।

(৩) ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দুটি বিশেষ দিক ছাড়াও অন্য একটি দিক ছিল ইংলন্ডে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের অবস্থানগত পরিবর্তন। এই আইনে ভারত সচিবের

শাসনতান্ত্রিক পরিষদের অবসান হল। একটি উপদেষ্টামণ্ডলী গঠন করা হয়েছে। অবশ্য প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ভারত সচিব পদটির অস্তিত্ব ছিল। অন্য একটি পরিবর্তন হল ভারতীয় অফিসের ব্যয়ভার ভারতের রাজস্বের উপর ন্যস্ত না হয়ে ব্রিটিশ সরকারের নিজস্ব রাজস্ব খাতে চাপানো হল। এই আইনে ভারত সচিব নিযুক্ত রাষ্ট্রকৃত্যক, ফেডারেল কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারকদের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়।

সীমিতভাবে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ১৯৩৭ সালের ১ এপ্রিল থেকে কার্যকর হল। সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন সংক্রান্ত দিকটি কার্যকর হয়নি। দেশীয় রাজন্যবর্গ যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনায় উৎসাহবোধ করেনি। তাদের অধিকার স্বীকার না করে যুক্তরাষ্ট্র কাঠামো প্রতিষ্ঠা অর্থহীন বলে যুক্তরাষ্ট্রে অংশগ্রহণের ব্যাপারে তারা উৎসাহ বোধ করে নি। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস মনে করেছে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনায় রাজন্যবর্গ অহেতুক গুরুত্ব পেয়েছে। এর ফলে জাতীয়তাবাদী ও প্রগতিশীল শক্তিসমূহ দুর্বল হবে। মুসলিম রাজন্যবর্গের মনোনীত প্রতিনিধিরা এলে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভায় হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাবে এই আশঙ্কায় যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনাকে অগণতান্ত্রিক ও প্রতিক্রিয়াশীল মনে করেছে। ব্রিটিশ রক্ষণশীল প্রতিনিধিরা এই আইনের বিরোধিতা করেছেন এই কারণে যে, ভারত স্বশাসনের উপযোগী নয়। বামপন্থী ও সমাজতন্ত্রীরা আইনের দ্বারা প্রভাবিত হয়নি কারণ ব্রিটিশ সংবিধানিক সংস্কারের প্রতি তাদের আস্থা ছিল না।

এবার আসুন ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের দুর্বলতা বা ত্রুটিবিচ্যুতির দিকে কিছু আলোচনা করা যাক। প্রসঙ্গত এই আইনের তাৎপর্য কী সেটাও বিচার করা যাবে।

২০.৫ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের দুর্বলতা ও তাৎপর্য

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের তুলনায় অগ্রসর হলেও ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনেক দিক দিয়েই দুর্বল প্রতীয়মান হয়েছে।

(১) প্রচলিত যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ম মেনে এই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সৃষ্টি হয়। যথাসম্ভব নিয়ম-নীতি প্রযোজ্য হয়নি বলে এটি ছিল অস্বাভাবিক (abnormal) যুক্তরাষ্ট্র। এই যুক্তরাষ্ট্রে প্রদেশগুলির অবস্থান নির্ধারিত হয়। ভারত রাষ্ট্রকে বিভক্ত করে কয়েকটি প্রদেশ সৃষ্টি করে তাদের হাতে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়েছিল। প্রদেশগুলিকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত করা হয়নি।

(২) ব্রিটিশ রাজশক্তিকে সার্বভৌম রেখে পরাধীন ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিকল্পনা অসম্ভব। ব্রিটিশ প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সংবিধানের সার্বভৌমত্ব, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের ছিল না।

(৩) কার্যক্ষেত্রে সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের গঠন সংক্রান্ত দিকটি কার্যকর হয়নি। গভর্নর-জেনারেলের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার বাড়াবাড়ি, আইনসভার কাছে মন্ত্রীদের দায়িত্বের অনুপস্থিতি, ক্ষমতাবণ্টন পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় আইনসভার প্রাধান্য, যুগ্ম ক্ষেত্রে এবং অতিরিক্ত ক্ষমতার ক্ষেত্রে কেন্দ্রের প্রাধান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অকার্যকারিতার উদাহরণ।

(৪) রজনীপাম দত্ত মনে করেন, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা নয়, স্বৈরতন্ত্রী শাসনের এক প্রশাসনিক উপায়মাত্র। তাঁর মতে, ব্রিটিশ শাসক স্ব-শাসনের বাস্তবায়ন (Virtual realiation of self-Government) হিসাবে দেখলেও এটি ছিল সাম্রাজ্যবাশাসনকে শক্তিশালী করার প্রস্তাবমাত্র (A scheme for strengthening the imperialist hold in India)। যুক্তরাষ্ট্রের প্রচলিত কোনও নীতিই উপস্থিত ছিল না বলে তিনি একে সম্পূর্ণ অসার্থক এক নাম—স্বৈরী

একনায়কতন্ত্রী শাসন চালাবার এক কৌশল ছাড়া অন্য কিছু ভাবেন নি ("....the proposed 'Federation' for India was a complete misnomer—a trick of language to describe an arbitary despotic dictatorship"—R. S. Dutt)। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন, আইন প্রণয়ন ব্যবস্থা, প্রশাসন কিছুই ছিল না। নাগরিকদের জন্য মৌলিক অধিকারের ব্যবস্থা ছিল না। প্রতিক্রিয়াশীল নৃপতিদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে ২৭ কোটি ভারতীয়দের উপর অথচ এদের ভোটাধিকার ছিল না। দায়িত্বশীল ব্যবস্থা প্রহসনে পরিণত হয়েছে আইনসভায় অপ্রতিনিধিসুলভ, অনির্বাচিত গোষ্ঠীর, প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর আসন সংরক্ষণের মাধ্যমে। আইনসভার নিয়ন্ত্রণের ধারণাও মিথ্যা।

(৫) প্রদেশগুলির সমান প্রতিনিধিত্বে নীতি অগ্রাহ্য হয়েছে এই আইনে। ২ কোটির মতো বোম্বাই প্রদেশের উচ্চ পরিষদে আসন ছিল ১৬ অথচ ৩ কোটি জনসংখ্যার বাংলা পেয়েছে মাত্র ২০টি আসন। জনসমষ্টির তুলনায় কেন্দ্রীয় আইনসভায় দেশীয় আসনসংখ্যা ছিল অনেক বেশি। ৮ কোটি লোকসংখ্যার দেশীয় রাজ্যের আসনসংখ্যা ১২৫ অথচ ব্রিটিশ ভারতের ২৫ কোটি লোকসংখ্যার জন্য আসন ২৫০। আসন নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক সমানাধিকার নীতি প্রযোজ্য হয়। ৬ কোটি ৫০ লক্ষ মুসলিম জনসমষ্টির জন্য ৮৩টি আসন অথচ প্রায় ১৫ কোটি অ-মুসলিম জনসমষ্টির জন্য ১০৫টি আসন। রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে আসনসংখ্যা নির্ধারণ সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিবেশ রচনার পরিপন্থী।

উচ্চকক্ষে আঞ্চলিক প্রতিনিধি ছিল না, উচ্চকক্ষ প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থ ও শ্রেণির স্বার্থে পুষ্ট হয়েছে; দায়িত্বশীলতার নীতি শাসন বিভাগ বা আইন বিভাগ কোনও ক্ষেত্রেই কার্যকর হয়নি, ক্ষমতাবণ্টন পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ, ডোমিনিয়ন মর্যাদা গুরুত্ব পায়নি, প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের নীতি বাস্তবায়িত হয়নি। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের বিরুদ্ধে এই সব যুক্তি দেখানো হলেও এই আইন একেবারে তাৎপর্যহীন একথা বলা যাবে না।

(১) ভারতের সারবিধানিক রাজনীতির ইতিহাসে এই আইনের গুরুত্ব অপরিসীম। শেষ বিচারে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের হাত পুষ্ট করেছে একতা বলা হলেও এই আইনের প্রতিটি সাংবিধানিক প্রস্তাব স্পষ্ট। ক্ষমতাবণ্টন পদ্ধতি (তপশিল ৭) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন বিভাগ (অনুচ্ছেদ ৮), গভর্নর-জেনারেলের ক্ষমতা (অনুচ্ছেদ ৩), উপদেষ্টা ও মন্ত্রীর ক্ষমতা [অনুচ্ছেদ ১১(১) ও ১১(২)], মন্ত্রিসভা [অনুচ্ছেদ ৯(১)], যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা (অনুচ্ছেদ ১৮), যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত (অনুচ্ছেদ ২০০), আদালতের এলাকা (অনুচ্ছেদ ২০৪), সরকারি কর্মচারীদের ১০১), প্রশাসনিক সম্পর্ক [অনুচ্ছেদ ৮, ৪৯(২), ১২২(১), ১২৬(১), ১২৮(১)], আইনগত সম্পর্ক ইত্যাদি সম্পর্কে এত বিস্তৃত সাংবিধানিক ব্যবস্থা ইতিপূর্বে ছিল না। প্রাদেশিক শাসন বিষয়েও বিস্তৃত সাংবিধানিক ব্যবস্থা এই আইনে ছিল। গভর্নর (অনুচ্ছেদ ৪৮, ৫২, ৫৭, ৫৮, ৮৮, ৮৯, ৯০), রাজ্যের মন্ত্রিপরিষদ (অনুচ্ছেদ ৫০, ৫১), রাজ্যের আইনসভা (অনুচ্ছেদ ৬০), ভারতীয় রাজ্যের সাংবিধানিক অবস্থান (অনুচ্ছেদ ৩১১) সব কিছুরই বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়েছে এই আইন। স্বাধীন ভারতের সংবিধানের প্রতিটি অঙ্গে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের স্পর্শ আছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা তো বটেই, পার্লামেন্টীয় শাসনের বহু সূক্ষ্ম ও গভীর অংশে এই আইনের প্রভাব লক্ষণীয়।

(২) ১৯৩৬ সালের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে ভারত শাসন আইনের যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করা হলেও বা ১৯৩৬ সালের ফৈজপুর অধিবেশনে জওহরলাল নেহরু দম্ভের সঙ্গে এই আইনের

বিরুদ্ধতা করার কথা বললেও (“We go to the legislatures not to cooperate with the apparatus of British Imperialism but to combat the Act.”—Nehru) কংগ্রেস কিন্তু এই আইন অনুসারেই প্রাদেশিক আইনসভায় নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়, বিপুলসংখ্যক আসনে জয়লাভ করে পাঁচটি প্রদেশে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও জয়লাভের মধ্য দিয়ে কংগ্রেস শুধু নিজেকে সাংগঠনিকভাবে বা জনপ্রিয়তার বিচারে ভারতের বৃহত্তম দল হিসাবেই নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের সুযোগ পেল তাই নয় প্রদেশের রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে ফেলে। জওহরলাল নেহরু কংগ্রেসের মন্ত্রীসভায় যোগদানের বিরোধী হলেও দলের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব সরকার গড়ার পক্ষে জোরালো মত দিলেন। প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, আজাদকে নিয়ে গঠিত পার্লামেন্টারী বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে শেষপর্যন্ত মন্ত্রীসভা গঠনের সিদ্ধান্ত হল।

সাতটি প্রদেশে মন্ত্রিসভা কার্যভার গ্রহণের পর নানা সাংবিধানিক অসুবিধা ও ইংরেজ শাসকদের প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও কংগ্রেসের দ্বিতীয় সারির নেতাদের তত্ত্বাবধানে সীমিত ক্ষমতার মধ্যে শাসন পরিচালনায় ও সংস্কারের কাজে কংগ্রেস কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। মাদ্রাজে রাজা গোপালাচারী, উত্তরপ্রদেশে গোবিন্দ বল্লভ পন্থ দক্ষ নেতৃত্বের পরিচয় দিয়েছেন। রফি আহমদ কিদোয়াই, কে. এম. মুন্সী, ভি. ভি. গিরি ইত্যাদিরা দক্ষ প্রশাসক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। অর্থ সমস্যা, রাজবন্দিদের মুক্তি, সাম্প্রদায়িক সংঘাত, শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন—নানা জটিল সমস্যার আবর্তে পড়েও কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলি জনকল্যাণমূলক কাজ, সামাজিক সংস্কার, অনুন্নত শ্রেণির উন্নয়ন ইত্যাদির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে। গ্রামীণ উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ, শ্রমিক কল্যাণ, বুনিয়াদি শিক্ষা, হরিজন উন্নয়ন, মাদকদ্রব্য বর্জন ইত্যাদির ক্ষেত্রে কংগ্রেসের সাফল্য লক্ষণীয়। দমনমূলক আইন প্রত্যাহার, বন্দিমুক্তি, বাজেয়াপ্ত জমি প্রত্যর্পণ ইত্যাদির ক্ষেত্রেও কংগ্রেস সরকার কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে।

ভারত শাসন আইনের (১৯৩৫) সুবিধা অকংগ্রেসি দলগুলিও নিয়েছে। পঞ্জাবে সিকান্দার হায়াত খাঁর নেতৃত্বে ইউনিয়নিস্ট পার্টি, বাংলায় প্রজাদলের নেতা ফজলুল হকের নেতৃত্বে অকংগ্রেসি জোট সরকার শাসন ক্ষমতায় এসেছে। তবে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের কার্যকারিতা শেষপর্যন্ত আর রইল না। ব্রিটিশ যুদ্ধনীতির (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ) প্রতিবাদে কংগ্রেসের প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাগুলি কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির নির্দেশে পদত্যাগ করে। মুসলিম লিগের কংগ্রেস বিরোধিতা, কংগ্রেসের সাংগঠনিক বিরোধ (সুভাষ-গান্ধী বিরোধ), বিশ্ব রাজনীতির নতুন অবস্থান সব কিছু মিলেই রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও শাসন সংস্কারের গতি পশ্চাৎগামী হল। রাজনীতির অব্যবহিত জটিল সমস্যার জালে ১৯৩৫ সালের আইন বাধাপ্রাপ্ত হলেও, স্বাধীন ভারতের সংসদীয় ও দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থার জন্য এই আইন রেখে গেল কিছু চিরস্থায়ী রসদ।

২০.৬ সারাংশ

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের পরবর্তীকালের রাজনৈতিক ঘটনা ও রাষ্ট্রশাসনের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়েই ব্রিটিশ শাসক ভারতের জন্য একটি নতুন শাসন পরিকল্পনা ও সংস্কারের ব্যাপারে উদ্যোগী হয়। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও পার্লামেন্টীয় গণতন্ত্রের এক ঐতিহাসিক ও আইনগত দলিল। এই আইনের মধ্য দিয়ে এক ত্রিস্তরবিশিষ্ট শাসনব্যবস্থার রূপ প্রতিষ্ঠিত হল। এই তিনটি স্তর হল ব্রিটিশ সরকার, ব্রিটিশ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকার। এই আইন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে ভারত শাসন ব্যাপারে তাকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা দান করেছে। ভারত সচিবের পরামর্শ নিয়ে মহামান্য রাজা ভরত

বিষয়ে শাসন ক্ষমতা ব্যবহার করবেন একথা বলা হল। ভারতে শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে কয়েকজন উপদেষ্টা সাহায্য ও পরামর্শ দেবেন স্থির হল।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হল ব্রিটিশ ভারত ও ভারতীয় রাজ্যগুলিকে নিয়ে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গড়ে উঠবে। এই যুক্তরাষ্ট্রে শাসন বিভাগীয় দায়িত্ব পালন করবেন; গভর্নর-জেনারেলের হাতে সংরক্ষিত ক্ষমতা থাকবে। হস্তান্তরিত বিষয়গুলি তিনি মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুসারে পরিচালনা করবেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা গঠিত হবে মহামান্য রাজার প্রতিনিধি, গভর্নর-জেনারেল এবং নিম্নকক্ষ যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা ও উচ্চকক্ষ রাজ্য পরিষদ নিয়ে। উভয়কক্ষেই প্রদেশ থেকে নির্বাচিত সদস্য, দেশীয় রাজাদের মনোনীত সদস্য, গভর্নর-জেনারেলের মনোনীত সদস্য এবং বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের সংরক্ষিত সদস্য থাকবেন। এই আইনে ক্ষমতা-বণ্টনের তিনটি তালিকা নির্দিষ্ট হল—কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক ও যুগ্ম তালিকা। এই আইন একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের ব্যবস্থাও করেছে। এই আদালতে মূল ও আপিল এলাকা থাকবে।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অভিনব বৈশিষ্ট্য হল প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের ব্বস্থা। প্রদেশে পৃথক শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ থাকবে বলা হল। প্রদেশের শাসক হিসাবে গভর্নর ও মন্ত্রিপরিষদ এবং আইনসভা এককক্ষ ও দ্বিকক্ষবিশিষ্ট উভয় ধরনেরই রাখা হল। যেখানে দুটি কক্ষ নিয়ে আইনসভা থাকবে সেখানে কক্ষ দুটি পরিচিত হবে নিম্নকক্ষ আইনসভা নামে এবং উচ্চকক্ষ আইন পরিষদ নামে। প্রাদেশিক আইনসভায় যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার মতো নির্বাচিত, মনোনীত ও সংরক্ষিত আসন থাকবে বলা হল। সদস্য নির্বাচনের ব্যাপারে সাধারণ ও 'সাম্প্রদায়িক' এই দু'ভাগে আসনগুলিকে ভাগ করা হল।

১৯৩৫ সালের আইনে ভারত সচিবের শাসনতান্ত্রিক পরিষদের অবসান হল। প্রচলিত যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ম মেনে এই আইন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেনি। সবচেয়ে বড় কথা যুক্তরাষ্ট্রের গঠন সংক্রান্ত দিকটি কার্যকর হয়নি। এই আইনে দেশীয় রাজ্যগুলি বেশি সুবিধা পেয়েছে। নানা দুর্বলতা সত্ত্বেও আইনগত, শাসনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিকভাবে আইনটি তাৎপর্যপূর্ণ ছিল।

২০.৭ অনুশীলনী

(১) সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে বাক্যটি সম্পূর্ণ করুন ঃ

(ক) ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে (i) কেন্দ্রে (ii) প্রদেশে দ্বৈত শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

(খ) ১৯৩৫ সালের আইনে কেন্দ্রের শাসন বিভাগীয় সংরক্ষিত ক্ষমতা ব্যবহার করার অধিকার দেওয়া হয়েছে (i) ভারত সচিবের (ii) গভর্নর-জেনারেলের (iii) মন্ত্রিপরিষদের হাতে।

(গ) ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে গভর্নর-জেনারেলকে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা (i) দেওয়া হয়েছে (ii) হয় নি।

(ঘ) ভারতে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পদ্ধতিটি হল (i) একত্রীকরণের পদ্ধতি (ii) বিভক্তিকরণের পদ্ধতি।

(ঙ) ভারত শাসন আইন ১৯৩৫) অনুসারে কেন্দ্রীয় আইনসভা (i) এককক্ষ-বিশিষ্ট (ii) দ্বিকক্ষ-বিশিষ্ট।

(চ) ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে মোট (i) ৭ (ii) ৯ (iii) ১১টি প্রদেশকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হয়।

(ছ) ১৯৩৫ সালের আইনে ভারত সচিবের শাসনতান্ত্রিক পরিষদের (i) অবসান হল (ii) ক্ষমতা কমে গেল (iii) ক্ষমতা বৃদ্ধি পেল।

(২) স্তম্ভ ক ও খ-এর শব্দ বা শব্দগুচ্ছের মধ্যে মিল দেখান ঃ

স্তম্ভ ক		স্তম্ভ খ	
(i)	প্রতিরক্ষা	(i)	প্রদেশের আইনসভার উচ্চকক্ষ
(ii)	শিক্ষা	(ii)	গভর্নর-জেনারেল
(iii)	সংরক্ষিত ক্ষমতা	(iii)	প্রদেশের প্রধান শাসন কর্তৃপক্ষ
(iv)	গভর্নর	(iv)	প্রাদেশিক তালিকা
(v)	আইন পরিষদ	(v)	কেন্দ্রীয় তালিকা

(৩) একটি বা দুটি বাক্যে প্রশ্নগুলির উত্তর দিন ঃ

(ক) ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য কী?

(খ) ১৯৩৫ সালের আইন অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সর্বোচ্চ শাসন কর্তৃপক্ষ কে?

(গ) ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন গভর্নর-জেনারেলের হাতে যে-সব স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা দিয়েছে তার মধ্যে দুটির উল্লেখ করুন।

(ঘ) ১৯৩৫ সালের আইন অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের প্রধানত কী কী ক্ষমতা ছিল?

(ঙ) ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন কবে থেকে কার্যকর হয়?

(৪) সংক্ষেপে ৫০টি বাক্যের মধ্যে উত্তর করুন ঃ

(ক) ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন বিভাগের রূপটি কেমন ছিল আলোচনা করুন।

(খ) ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার রূপটি কেমন ছিল সংক্ষেপে লিখুন।

(গ) ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার চারটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

(ঘ) ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের চারটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

(ঙ) ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে ইংলন্ডের ভারতীয় কর্তৃপক্ষের অবস্থানগত পরিবর্তন কী হয়েছে লিখুন।

৫) অনধিক ১৫০ বাক্যে উত্তর করুন ঃ

(ক) ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার রূপটি বর্ণনা করুন।

(খ) ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের প্রাদেশিক শাসনের রূপটি বর্ণনা করুন।

(গ) ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ত্রুটিগুলি কী ছিল আলোচনা করুন

(ঘ) ভারত শাসন আইনের (১৯৩৫) তাৎপর্য সম্পর্কে লিখুন।

২০.৮ উত্তরমালা

(১) (ক) ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে কেন্দ্রে দ্বৈতশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

(খ) ১৯৩৫ সালের আইনে কেন্দ্রের শাসন বিভাগীয় সংরক্ষিত ক্ষমতা ব্যবহার করার অধিকার দেওয়া হয়েছে গভর্নর-জেনারেলের হাতে।

(গ) ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের গভর্নর-জেনারেলকে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

(ঘ) ভারতের যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পদ্ধতিটি হল বিভক্তিকরণের পদ্ধতি।

(ঙ) ভারত শাসন আইন (১৯৩৫) অনুসারে কেন্দ্রীয় আইনসভা দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট।

(চ) ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে মোট ১১টি প্রদেশকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হয়েছে।

(ছ) ১৯৩৫ সালের আইনে ভারত সরকারের শাসনতান্ত্রিক পরিষদের অবসান হল।

(২) ক স্তম্ভের শব্দ বা শব্দগুচ্ছের সঙ্গে খ স্তম্ভের শব্দ বা শব্দগুচ্ছের মিল দেখান ঃ

	স্তম্ভ ক		স্তম্ভ খ
(i)	প্রতিরক্ষা	(i)	কেন্দ্রীয় তালিকা (v)
(ii)	শিক্ষা	(ii)	প্রাদেশিক তালিকা (iv)
(iii)	সংরক্ষিত ক্ষমতা	(iii)	গভর্নর-জেনারেল (ii)
(iv)	গভর্নর	(iv)	প্রদেশের প্রধান শাসন কর্তৃপক্ষ (iii)
(v)	আইন পরিষদ	(v)	প্রদেশের আইনসভার উচ্চকক্ষ (i)

(৩) (ক) ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল (i) সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন (ii) প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন।

(খ) ১৯৩৫ সালের আইন অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হলেন গভর্নর-জেনারেল।

(গ) ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন গভর্নর-জেনারেলের হাতে যেসব স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা দিয়েছে তার মধ্যে দুটি হল; (i) ভারতবর্ষ বা তার কোনও অংশে শান্তি বা নিরাপত্তা বিপন্ন হলে তার প্রতিকার; (ii) যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা।

(ঘ) ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ১৯৩৭ সালে ও এপ্রিল থেকে কার্যকর হয়।

২০.৯ গ্রন্থপঞ্জি

1. A. C. Banerjee: *Indian Constitutional Documents* Vol. 3 (1949).
2. R. P. Dutta: *India Today,* (1947).
3. M. M. Singh: *From Raj to Republic, A Retrospect,* (1972).
4. J. C. Johari: *Indian Government and Politics,* Vol-I (1996).
5. Druga Das Basu: *Introduction to the Constitution of India,* (1999).

একক ২১ ❑ প্রাক্-স্বাধীন ভারতবর্ষে সাংবিধানিক বিকাশের ধারা ঃ ১৯৩৫-১৯৪৭

গঠন

২১.০ উদ্দেশ্য
২১.১ প্রস্তাবনা
২১.২ মূল আলোচনা
২১.২.১ ১৯৩৫ সালের শাসন-সংস্কারের পরবর্তী পাঁচ বছরের ঘটনাক্রম
২১.৩ ক্রীপস প্রস্তাব
২১.৪ ওয়াভেল পরিকল্পনা
২১.৫ ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা
২১.৬ ভারতে ক্ষমতাহস্তান্তর সম্পর্কে এ্যাটলীর ঘোষণা, মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা ও ভারতের স্বাধীনতা আইন
২১.৭ সারাংশ
২১.৮ অনুশীলনী
২১.৯ উত্তরমালা
২১.১০ গ্রন্থপঞ্জি

২১.০ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করলে আপনি

- ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন পাশের পরবর্তীকালের সময় থেকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের পরবর্তী সময়ে শাসনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক গতিটিকে জানতে পারবেন।
- নানা ঘটনা ও ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে কীভাবে স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের সৃষ্টি হল সেই ঐতিহাসিক পর্বটিকে চিহ্নিত করতে পারবেন।
- স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার প্রেক্ষাপটটি শনাক্ত করতে পারবেন।

২১.১ প্রস্তাবনা

ছোট-বড় অসংখ্য ঘটনা ও নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে ভারতের সাংবিধানিক বিকাশের গতি ক্রমশ পরিণতির পথে পা বাড়িয়েছে। ভারতের সাংবিধানিক বিকাশের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় অতিক্রম করে আমরা পৌঁছে গেলাম এর শেষ ধাপে। পূর্বের পাঠে আপনি লক্ষ্য করেছেন ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ত্রুটি-বিচ্যুতি যাই থাকুক এর প্রাপ্তিটি বড় কম নয়। এই আইনটির সাহায্য নিয়েই ভারতীয়রা শাসন বিষয়ে সামান্য সময়ের জন্য হলেও ভালো রকম অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। দেশবাসীর স্বায়ত্তশাসনের চাহিদা না মিটলেও ধীরে ধীরে স্বরাজ ও রাষ্ট্র-শাসনের নানা সুযোগ ও সুবিধা সৃষ্টি হল। যুদ্ধের পরিস্থিতি ও ভারতের রাজনৈতিক পরিবর্তিত পরিস্থিতির চাপে ব্রিটিশ সরকারের নীতি কীভাবে পরিবর্তিত হতে থাকে এবং ভারতে প্রতিনিধিমূলক শাসনের এক

অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হতে থাকে বর্তমান পাঠের আলোচনা থেকে আপনি সেই গতিটিকে চিহ্নিত করতে পারবেন। ভারতের সংবিধানতন্ত্র ও দায়িত্বশীল শাসনের চারটি উল্লেখযোগ্য ধাপ হল ক্রীপস প্রস্তাব (Cripps Mission), ওয়াভেল পরিকল্পনা (Wavel Plan), ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা (Cabinet Mission Plan) ও মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা (Mountbatten Plan) বর্তমান পাঠে এই প্রতিটি ধাপের সাংবিধানিক বিকাশের ধারাটিকে শনাক্ত করতে পারবেন। এই সময়েই জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে ভারতীয়দের একটি অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠিত হল; গণপরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল, ভারতের স্বাধীনতা আইন ও ভারত-বিভাগের নীতি কার্যকর হল। আলাপ-আলোচনার পথে আপস-মীমাংসার পথেই শেষপর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা এল। পূর্ণ স্বাধীনতা নয় ভারত-বিভাজন নিয়ে এল খণ্ডিত স্বাধীনতা। এই পর্বের গণবিক্ষোভগুলির রাজনৈতিক তাৎপর্য অবশ্য এই কারণে ক্ষুণ্ণ হয় না।

২১.২ মূল আলোচনা

২১.২.১ ১৯৩৫ সালের শাসন-সংস্কারের পরবর্তী পাঁচ বছরের ঘটনাক্রম

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন কার্যকর হওয়ার পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক নানা ঘটনাপ্রবাহের চাপে ব্রিটিশ শাসননীতির পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের নীতি কার্যকর হওয়ার ফলে ভারতের সাংবিধানিক ইতিহাসে সর্বপ্রথম সংসদীয় ও দায়িত্বশীল সরকারের প্রকৃত সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পর সাতটি রাজ্যে ক্ষমতায় এসে কংগ্রেস দল সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করে। ১৯৩৫-এর সংস্কার আইনকে প্রাদেশিক আইনসভায় কেন্দ্রীয় নির্দেশমতো নিন্দা করা হলেও, গণপরিষদের দাবি বা ফেডারেশনের নিন্দা করা হলেও এই আইনেরই সুবিধা নিয়ে কংগ্রেস শাসন-সংস্কারের নানা কাজে অগ্রসর হয়। গান্ধীজির গঠনমূলক কাজের ধারণাকে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা বিশেষ গুরুত্ব দেয়। কৃষকদের অবস্থার উন্নতির জন্য কর, খাজনায় চাপ, শোষণ ও ঋণের ভার থেকে তাদের মুক্ত করা, প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা, শ্রমিক-কল্যাণ ও মজুরির আইন প্ররবর্তন, বন্দিমুক্তির ব্যবস্থা, দমনমূলক আইন প্রত্যাহার সব কাজেই কংগ্রেসি মন্ত্রিসভা উৎসাহ দেখিয়েছে। বিহার, সংযুক্ত প্রদেশে কৃষি-সংস্কারের কাজ, প্রজাদখলি স্বত্বের ব্যবস্থা হয়েছে, বোম্বাইয়ে বাজেয়াপ্ত জমি প্রত্যর্পণের ব্যবস্থা, ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা হয়েছে, মাদ্রাজে ঋণের দায়ে দাসত্ব প্রথা চালুর যে অন্যায় ব্যবস্থা ছিল তার অবসানের চেষ্টা হয়েছে। গ্রামীণ পুনর্গঠনের কাজে প্রাধান্য পেয়েছে জল সরবরাহ, রাস্তাঘাট নির্মাণ, স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন, কুটিরশিল্প খাদির প্রসার এবং কর্মমুখী বৃত্তি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা; তবে সাফল্য সব ক্ষেত্রে আসেনি। সংস্কারের অগ্রাধিকার নিয়ে, বন্দিমুক্তি নিয়ে, অর্থনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে গভর্নর ও ব্রিটিশ আমলাদের সঙ্গে বিরোধ বেধেছে। সাংগঠনিক বাধাবিপত্তি এবং মুসলিম লিগের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি ও দায়িত্বশীল শাসন-সংস্কারের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নিয়ে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের বিরোধ, নেহরু ও জিন্নার বির্তক এবং সাংগঠনিক প্রশ্নে গান্ধীজি ও সুভাষ বসুর বিরোধ ভারতের রাজনীতিকে ভিন্ন পথে পরিচালিত করে।

> **প্রান্তলিপি ঃ** গঠনমূলক কাজ হল গান্ধীজির সর্বোদয়ের সমাজদর্শনকে কার্যে রূপায়িত করার বাস্তব কর্মসূচি। প্রাথমিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, খাদি ও কুটিরশিল্পের প্রসার, মাদকদ্রব্য বর্জন, সমবায় ইত্যাদির কাজে স্বেচ্ছা- অংশগ্রহণের ভিত্তিতে ঐক্য, নিষ্ঠা, অহিংসা, জনসেবা, দায়িত্বশীলতার নীতিতে সামিল হওয়াই হল সর্বোদয়।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ব্রিটেন ঘোরতর সংকটে পড়ে। ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষে তার মিত্র খুঁজে বেড়াচ্ছেন। জিন্নার মুসলিম লিগ সাহায্যের হাত বাড়ালেও কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এক্ষেত্রে সতর্ক। হরিপুরা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে ইতিপূর্বেই স্বাধীনতার দাবিতে কংগ্রেস সক্রিয়

প্রতিরোধের কথা ঘোষণা করেছে এবং ব্রিটিশ-প্রবর্তিত ফেডারেল পরিকল্পনা, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাকে বিভেদমূলক, ভারতবর্ষের ঐক্যবিরোধী ও অগণতান্ত্রিক বলে আখ্যা দিয়েছে। সুভাষ বসুর বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি, পুনর্গঠনের ও পরিকল্পনার তত্ত্ব, সুশৃঙ্খল কেন্দ্রীয় সংগঠনের অধীনে গণ-আন্দোলন সুগঠিত করার ভাবনা, এই পর্বে কংগ্রেস রাজনীতিতে কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্রীদের যোগদান বা বামপন্থী-প্রভাবিত কংগ্রেস দলের ফেডারেশন ও শাসন-সংস্কারের চেয়ে গণ-আন্দোলনের প্রতি অতিরিক্ত মোহ কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বকে একেবারেই খুশি করতে পারেনি। ফৈজপুর কংগ্রেসে (১৯৩৭) কৃষক ও মজুর শ্রেণির সঙ্গে কংগ্রেসের জোট বাধার জন্য নেহরুর আহ্বান এবং হরিপুরা কংগ্রেসে (১৯৩৮) সুভাষ বসুর বামপন্থনী অবস্থান তাঁদের আতঙ্কিত করেছে। এই পরিস্থিতিতে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধির জন্য কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব প্রজা-আন্দোলনের মাধ্যমে দেশীয় রাজাদের উপর গণতান্ত্রিক সংস্কারের চাপ দিতে থাকেন, দেশীয় রাজ্যের নির্বাচনপ্রথা চালুর জন্য ব্রিটিশ সরকারের কাছে দাবি পেশ করেন। অর্থাৎ, নেহরু বা সুভাষচন্দ্রের মতো ফেডারেশনকে অগ্রহণীয় বা অবাঞ্ছিত না বলে ফেডারেল নীতির কিছু সংস্কার ও সংশোধন চাইলেন তাঁরা। কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যে সুভাষচন্দ্র ও বামপন্থীদের প্রভাব কমাতে তৎপর হলেন তাঁরা। ত্রিপুরী কংগ্রেসে (১৯৩৯) গোবিন্দ বল্লভপন্থ প্রস্তাব আনলেন গান্ধীজি এবং পুরোনো কংগ্রেস কর্মসমিতির উপরই তাঁরা আস্থা জানাচ্ছেন। নির্বাচিত নতুন সভাপতি সুভাষ বসুকে গান্ধীর আস্থা নিয়েই নতুন কর্মসমিতি গড়তে হবে। বিতর্ক, বিরোধিতা, দক্ষিণপন্থীদের চাপের মুখে নতি স্বীকার করে অসুস্থ সুভাষ বসুকে শেষপর্যন্ত সভাপতির পদ ত্যাগ করতে হয়। কংগ্রেস সংগঠনের দক্ষিণপন্থীদের প্রভাব কায়েম হয়।

যুদ্ধের পরিস্থিতিতে ফেডারেশনের ব্রিটিশ পরিকল্পিত নীতি কাজ করেনি। ভাইসরয় ভারতের পক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন, ‘ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া’ অর্ডিন্যান্স (Defence of India Ordinance) জারি করলেন; প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন মুলতবি রাখা হল। নতুন পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট ও বামপন্থীদের ফ্যাসিস্টবিরোধী অবস্থানের চেয়ে কংগ্রেস এবং তার দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের কাছে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদী অবস্থানই শ্রেয় মনে হল। নেহরু যুদ্ধে ব্রিটিশ শক্তিকে সহযোগিতা দেবার বিনিময়ে ব্রিটিশ ভারতে পূর্ণ গণতন্ত্র স্থাপনে উদ্যোগী হবে এই প্রতিশ্রুতি চাইলেন। ব্রিটিশ শাসক কংগ্রেসকে কোনও আগাম প্রতিশ্রুতি দিতে চাননি। যুদ্ধ শেষ হলে ডোমিনিয়ন মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে, সকলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক নীতি স্থির করা যেতে পারে, অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা হিসাবে কাউন্সিল সম্প্রসারণ ও পরামর্শদাতা কমিটি গঠন করা যেতে পারে—এর বেশি কিছু ব্রিটিশ সরকার আশ্বাস দিতে পারেনি। নেহরু ও গান্ধী (নেহরু ইতিমধ্যে দক্ষিণপন্থী ও গান্ধীজির সঙ্গে একই সঙ্গে অবস্থান করছেন) ব্রিটিশ প্রস্তাব নাকচ করেন। যুদ্ধে অসহযোগিতার দৃষ্টান্ত হিসাবে, কংগ্রেস মন্ত্রীদের পদত্যাগের নির্দেশ দিয়ে কংগ্রেস কমিটি সিদ্ধান্ত নিল। ইতিমধ্যে ব্রিটিশ সরকার পরোক্ষে মুসলিম তোষণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। ব্রিটিশ শাসক কংগ্রেসশাসিত প্রদেশগুলিতে গভর্নরের শাসন প্রবর্তন করে। কংগ্রেস ও আইন অমান্যের প্রস্তুতি নিল (২২ ডিসেম্বর, ১৯৩৯)। রামগড় কংগ্রেসে (মার্চ, ১৯৪০) প্রস্তাব নেওয়া হল কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে অংশ নেবে না, ডোমিয়িন মর্যাদা যথেষ্ট নয়, চাই গণপরিষদ। লিগের লাহোর প্রস্তাবও (মার্চ, ১৯৪০) (পাকিস্তান প্রস্তাব) এর মধ্যে এসেছে এবং লিগ ও জিন্নার দাবির প্রতি ব্রিটিশ সরকারের সহানুভূতিও ছিল প্রবল। ব্রিটিশ সরকার যখন শাসন বিভাগীয় পরিষদ সম্প্রসারণ করছেন, জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদ গড়ছেন কংগ্রেস তখন সত্যাগ্রহ শুরু করেছে।

যুদ্ধের পরিস্থিতি যখন ভয়াবহ [জার্মানি সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর এবং জাপান পার্ল হারবারে (Pearl Harbour) আক্রমণ চালিয়েছে], যখন আটলান্টিক সনদের ঘোষণা সত্ত্বেও ভারতের সার্বভৌমত্ব ও স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত হল না, শাসন-সংস্কারের ব্যাপারেও ব্রিটিশ শাসক যখন কোনও প্রতিশ্রুতিই পালন করতে চাইছেন না তখন কংগ্রেস ১৯৪২ সালে মিত্রশক্তির যুদ্ধকে ফাসিবাদবিরোধী যুদ্ধ বলে ঘোষণা করে। এই পরিস্থিতিতে ১৯৪২ সালের

২৩ মার্চ স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস (Sir Stafford Cripps) ভারতে এলেন ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে একদফা প্রস্তাব নিয়ে।

এবার আসুন আমরা দেখি ক্রীপস প্রস্তাবের বিষয়বস্তু কী এবং ভারতের জাতীয় আন্দোলন ও কংগ্রেসের উপর তার কী প্রভাব পড়েছে?

২১.৩ ক্রীপস প্রস্তাব

১৯৪০ সালের মাঝামাঝি বিশ্বযুদ্ধের রণাঙ্গনে মিত্রশক্তির (ব্রিটেনের চার্চিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রুজভেল্ট এবং রাশিয়ার স্ট্যালিন এই জোটের মুখ্য প্রতিনিধি) অবস্থা যখন রীতিমতো সংকটাপন্ন এবং জার্মান হানায় ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিপর্যস্ত তখন ব্রিটিশ-কর্তৃপক্ষ কংগ্রেসসহ বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর কাছে সমর্থন চেয়েছেন এবং ভাইসরয় লিনলিথগোর মাধ্যমে ৮ আগস্ট একটি সংস্কার প্রস্তাব এনে এদেশে প্রতিনিধিমূলক সংস্থা গঠন ও এই সংস্থায় ভারতীয়দের নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিলেন। একটি যুদ্ধ উপদেষ্টা পর্যদ গঠন করে সেখানে ভারতীয়দের নেওয়া হবে বলেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু এই ঘোষণা ছিল অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং একে কার্যকর করার চেষ্টাও ছিল না। স্বভাবতই রাজনৈতিক অচলাবস্থা কাটে নি। ১৯৪০-১৯৪১ এই দীর্ঘসময় ধরে গান্ধীজির নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ চলেছে এক প্রতীকী আন্দোলন হিসাবে। কিন্তু প্রতীকী আন্দোলন হিসাবে। কিন্তু পরিস্থিতি ক্রমশই গণ-আন্দোলনের রূপ নিতে থাকলে ভিতরে ও বাইরের চাপে জর্জরিত ব্রিটিশ শাসক আবার একগুচ্ছ সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার সদস্য স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসকে পাঠালেন। ২৩ মার্চ ভারতে পদার্পণ করার পরেই তিনি ব্রিটিশ শাসন প্রস্তাবের তালিকা বড়লাট (ভাইসরয়) লিনলিথগোর হাতে তুলে দিতেই শাসন প্রস্তাব নিয়ে তাঁর সঙ্গে বড়লাটের বিতর্ক শুরু হল। লর্ড লিনলিথগো ভারত সম্পর্কে সংস্কার পুনির্ববেচনার প্রশ্নে চূড়ান্ত বিরোধী ছিলেন। ভারত-সচিব আমেরীর (Amery) হস্তক্ষেপে অবশ্য শেষপর্যন্ত এই বিতর্কের অবসান হয়। কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আজাদকে সংস্কার প্রস্তাবের মূল বিষয়বস্তু ও ব্রিটিশ সরকারের ইচ্ছা জানিয়ে জিন্নাকেও প্রস্তাবের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করে ২৯ মার্চ ক্রীপস প্রস্তাবটি প্রকাশ করেন। জিন্না নীতিগতভাবে প্রস্তাবটি মেনে নিলেও গান্ধীর কাছে প্রস্তাবটির কয়েকটি অংশ বিতর্কিত মনে হয়েছে। প্রস্তাবটিতে মুসলিম স্বার্থরক্ষা বা দেশীয় রাজাদের ক্ষমতা সুরক্ষিত করার ব্যাপারে ব্রিটিশ তৎপরতা গান্ধীজির ভাল লাগে নি। ক্যাবিনেট ধাঁচের সরকার, কাউন্সিলের ভারতীয়করণ এবং সংহতি ও ঐক্যের যুক্তি দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত ২৯ মার্চ প্রস্তাবটি সর্বসমক্ষে প্রচার করা হল। প্রতিরক্ষার প্রশ্নে সংশয় থাকলেও শাসন-সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রস্তাবটি অবশ্যই পালাবদলের এক সূচনা।

শাসন-সংস্কার ও অন্যান্য বিষয়ে প্রস্তাবটিতে যা বলা হয়েছে সংক্ষেপে তা হল ঃ

(১) যুদ্ধ শেষ হবার পরই এক নির্বাচিত সংস্থার মাধ্যমে ভারতের সংবিধান প্রণয়ন করা হবে, ভারতকে শাসনাধিকার দেওয়া হবে।

(২) নবনির্বাচিত প্রাদেশিক আইনপরিষদ গণপরিষদ নির্বাচন করবে।

(৩) গণপরিষদে ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্য—উভয়েরই প্রতিনিধি থাকবে।

(৪) ব্রিটিশ ভারতের যে কোনও প্রদেশ এই ব্যবস্থার বাইরে থাকতে পারে আবার পরে যোগদানের সিদ্ধান্তও নিতে পারে।

(৫) যেসব প্রদেশ যোগদান করবে না তারা তাদের নিজস্ব সংবিধান প্রণয়ন ও গ্রহণ করতে পারবে।

(৬) ভারত কমনওয়েলথে থাকতেও পারে, নাও পারে কিন্তু ব্রিটেনের স্বার্থ, দায়িত্ব ইত্যাদির জন্য তাকে সন্ধি করতে হবে।

(৭) যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় ভারতের প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত দায়িত্ব ব্রিটিশ সরকারের উপরই থাকবে।

(৮) সব ক্ষেত্রেই এই সক্রিয় এবং গঠনমূলক কাজে দেশের মানুষ ও দলগুলির সাহায্য এখন থেকেই আহ্বান করা হচ্ছে।

(৯) শাসন পরিষদে ভারতীয় দলগুলির আসার ব্যাপারে আলোচনা হবে।

ক্রীপস প্রস্তাব কোনও দলই মানেনি। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে কোনও সাংবিধানিক পরিবর্তনের প্রস্তাব ছিল না। কংগ্রেস এই প্রস্তাব গ্রহণ করেনি কারণ এই প্রস্তাবে ডোমিনিয়ন মর্যাদার কথা ছিল, পূর্ণ স্বাধীনতার কোনও প্রতিশ্রুতি ছিল না। ভারতীয়ের হাতে প্রতিরক্ষা দপ্তর অর্পণের কংগ্রেসি দাবিও পূরণ হয়নি। পাকিস্তান প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন আর দেশীয় রাজাদের তোষণের নীতিও কংগ্রেস সমর্থন করে নি। গান্ধীজির কথায় ক্রীপস প্রস্তাব ফেল পড়া ব্যাঙ্কের আগাম চেক (A post dated Cheque on a crashing bank)। ক্রীপস প্রস্তাবে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল বা প্রদেশগুলিকে স্বতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্র গঠনের অধিকার দেওয়া হয়েছে বলে এই প্রস্তাবকে সন্তোষজনক মনে করলেও যেহেতু এই প্রস্তাবে সংবিধান প্রণয়নের পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু বলা হয় নি তাই মুসলিমলিগ প্রস্তাবটিকে হতাশাজনক মনে করেছে। ভারত বিভাগের সম্ভাবনা আছে বলে হিন্দু জাতীয়তাবাদী দল হিন্দুসভা এই প্রস্তাবকে সমর্থন করেনি। আম্বেদকর আবার এই প্রস্তাবের মধ্যে বর্ণহিন্দুদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দেখেছেন। শিখ সম্প্রদায়ের আশঙ্কা ছিল এই প্রস্তাবের সুযোগ নিয়ে পঞ্জাবের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র থেকে আলাদা হয়ে যাবে।

স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস অবশ্য কংগ্রেসসহ সব দলের সঙ্গেই দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। নেহরু, আজাদ ইত্যাদির নমনীয় হলেও গান্ধীর অনমনীয়তা তাঁর প্রস্তাবকে কার্যকরী হতে বাধ্য দিয়েছে বলে তাঁর অভিমত। তবে নেহরু, আজাদ ইত্যাদিরা তাঁর প্রস্তাব কংগ্রেস অগ্রাহ্য করছে একথা জানালে তিনি প্রধানমন্ত্রী চার্চিলকে তা জানিয়েছেন। কিন্তু নিজে উদার হলে কি হবে ব্রিটিশরাজ বা বড়লাট কেউই এ ব্যাপারে উদার বা নমনীয় ছিলেন না। চার্চিল মূল প্রস্তাব থেকে সরে যেতে চান নি আর বড়লার্ট তো ভারতীয়দের স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্তই মনে করেননি। ভারতীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে ক্রীপসের আলোচনা, রুজভেল্টের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি কর্নেল এল. এ. জনসনের (L. A. Johnson) কাছে পরামর্শ চাওয়া, প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ভাগ করে ভারতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর হাতে কী কী ক্ষমতা দেওয়া যেতে পারে এ নিয়ে কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে তাঁর মতবিনিময় ব্রিটিশ শাসকদের খুশি করেনি। ক্রীপসের প্রস্তাব ও দৌত্য ব্যর্থ হল। অথচ প্রতিরক্ষার প্রশ্নে সরকার নমনীয় হলে বিষয়টির একটি সন্তোষজনক মীমাংসা হতে পারত।

সংস্কার প্রশ্নে মীমাংসা হল না। সুতরাং, যুদ্ধের প্রতিকূল পরিবেশ এবং দেশের ভেতরের আন্দোলন ও প্রতিরোধের চাপ ব্রিটিশ সরকারের উপর থেকে বিন্দুমাত্র কমেনি। বরং পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সামরিক পরিস্থিতি এমনই জটিল হয়ে ওঠে যে ভারতবর্ষে জাপানি আক্রমণের সম্ভাবনা প্রকট হয়ে ওঠে। ভারতের নিরাপত্তা রক্ষা এবং এদেশে ব্রিটিশ শাসনের উপযোগিতা নিয়ে ভারতবাসীর মনে হতাশা সৃষ্টি হয়। এই সময়ই (২৬ এপ্রিল, ১৯৪২) গান্ধীজি 'হরিজন' পত্রিকায় 'ভারত ছাড়' (Quit India) পরিকল্পনা ব্যক্ত করেন এবং ব্রিটিশ সরকারকে ভারতের স্বার্থেই দায়িত্বভার ছেড়ে দিতে অনুরোধ করেন। গান্ধীজির যুক্তি ছিল ব্রিটিশ ভারত ছেড়ে গেলে ভারতে জাপানি আক্রমণের সম্ভাবনা থাকবে না। (হরিজন পত্রিকায় তিনি লিখিলেন, '.....The British presence is the incentive for the Japanese attack' I am convinced that the time has come for the British and the Indians to be reconciled to complete separation from each offer.' 'complete and immediate orderly withdrawal of the British from India at least in reality.....will

at onece put the Alied cause on a completely Moral basic.' গান্ধীজি একথাও জানিয়েছেন, 'I ask for a bloodless end of an unnatural domination and for a new era." "Leave India to God and if that be to much leave her to anarchy.") "গান্ধীজি চেয়েছেন যে কোনও মূল্যেই ব্রিটিশ ভারত ত্যাগ করুক। প্রয়োজনে জাপানের বিরুদ্ধেও যে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন করতে হবে এবং এক খণ্ড জমিও যে তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে না গান্ধীজি তাও জানালেন"। গান্ধীজি বলেছেন, ব্রিটেনের প্রতি তাঁর নীতিগত সমর্থন আছে কিন্তু বর্তমানে সেই নৈতিক সমর্থন জানাতে তাঁর মন প্রস্তুত নয়।

কংগ্রেস কার্যকরী কমিটি ১৪ জুলাই ওয়ার্ধায় 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং কমিটির সুপারিশ মতোই সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি (A.I.C.C.) বোম্বাইয়ে "ভারত ছাড়" (Quit India) প্রস্তাব ৭ ও ৮ আগস্ট অনুমোদন করে। প্রাথমিকভাবে নেহরু ও আজাদ যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির পক্ষপাতী ছিলেন না। জাপানর সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে মুক্তি পাবার ব্যাপারেও তাঁদের সন্দেহ ছিল। যুদ্ধের পরিস্থিতিতে গণ-আন্দোলনের উপর নিপীড়ন ও আক্রমণ আসতে পারে বলে তাঁদের অভিমত। তবে শেষপর্যন্ত নেহরুই প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। কংগ্রেসের কাছে এই আন্দোলন শুধু স্বাধীনতা অর্জনের আন্দোলন নয়, বিশ্ব স্বাধীনতা ও আন্তর্জাতিক মুক্তি আন্দোলনের অঙ্গ। এটি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ নয়। স্বাধীন দেশ হিসাবেই ভারত ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চায়। কংগ্রেসের এটি ন্যায়সঙ্গত দাবি। এ দাবি উপেক্ষিত হলে কংগ্রেস যে কোনও মূল্য দিতে প্রস্তুত। এটি হল কংগ্রেসের শেষ লড়াইয়ের বলিষ্ঠ অঙ্গীকার (It is going to be a fight to the finish)।

শুরু হল কংগ্রেসের নেতৃত্বে এক অভূতপূর্ব গণ-আন্দোলন, 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' ('do or die') অর্থাৎ কিছু করবার অথবা মরবার আন্দোলন। এই আন্দোলন স্তব্ধ করতে ব্রিটিশ সরকার পরিকল্পিত প্রশাসনিক ও নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা নিয়েছে। প্রথম সারির সব নেতাদের বন্দি করা হল, গান্ধীজিকে পুনায় আগা খাঁ প্রাসাদে অন্তরীণ রাখা হল, কংগ্রেস সংগঠন বেআইনি ঘোষিত হল। সত্যাগ্রহ হিসাবে শুরু হলেও দমন, নিপীড়নের চাপে এই আন্দোলন অহিংস থাকেনি। ষড়যন্ত্র ও সন্ত্রাসবাদ ছড়িয়ে পড়েছে। প্রতিরোধ আন্দোলনের চাপে ব্রিটিশ প্রশাসনযন্ত্র ভেঙে পড়েছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী কৌশল, স্বরাষ্ট্র বিভাগের গুপ্ত ও প্রতিহিংসামূলক নীতি, সামরিক ও দমননীতির নগ্ন চেহারা এই প্রতিরোধ আন্দোলনের ফলে প্রকাশ্যভাবে ধরা পড়েছে। পশ্চিম ভারতে কেন্দ্রীভূত হলেও সারা দেশেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে। ইংরেজবিদ্বেষ বা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ নয়, এই আন্দোলন ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে। আইনসভা থেকে মিউনিসিপ্যালিটি সর্বত্র কংগ্রেস কর্মীদের সত্যাগ্রহে যোগদানের আহ্বান জানানো হল, স্কুল-কলেজের ছাত্র, শ্রমিক, কৃষিক, মহিলা সবাইকে সরকার বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত করা হল। আন্দোলনের গতি দেখে বড়লাট লিনলিথগোও স্বীকার করেছেন সিপাহী বিদ্রোহের পর এত ব্যাপক সরকারবিরোধী আন্দোলন আর দেখা যায়নি। আন্দোলনের সাফল্য বা ব্যর্থতা যাই থাকুক পদ্ধতির দিক থেকে এই আন্দোলন ছিল উচ্চাঙ্গের—হরতাল, স্কুল-কলেজ বর্জন, কৃষক বিদ্রোহ, পুলিশ ও সৈন্যদের সঙ্গে সংঘর্ষ, সরকারি অফিসের উপর আক্রমণ, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি ছিল দৈনন্দিন ঘটনা। বাংলাদেশের মেদিনীপুর ছিল এই আন্দোলনের সংগ্রামী কেন্দ্র। তাম্রলিপ্ত শহরে জাতীয় সরকার ঘোষিত হল, সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগ, থানা স্থাপিত হল। জনযুদ্ধের মতবাদ মেনে কমিউনিস্টরা অবশ্য এই গণ-আন্দালন যোগ দেয়নি। মুসলিমদেরও এই আন্দোলন নিয়ে কোনও সাড়া ছিল।

১৯৪২-৪৩ ছিল আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্ব। মিটিং-মিছিল, ধর্মঘট থেকে শুরু করে গেরিলা কাজকর্ম, সন্ত্রাস সব কিছুই ছিল। গুজরাট ছাড়া অন্য সব জায়গায় আন্দোলন শান্তিপূর্ণ হয়েছে বলা চলে না। তবে এই আন্দোলন শেষপর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে কখনও সরকারি নিস্পেষণে, কখনও বা প্রকৃতির নিষ্ঠুর চাপে। যুদ্ধ, সৈন্যবাহিনীর বিরাট দায়, উৎপাদন হ্রাস, ব্যাবসায়িক ফাটকা, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সব কিছুর পরিণতি হিসাবে দেখা দিল দুর্ভিক্ষ, মহামারি, মন্বন্তর। ৪২-এর গণ-আন্দোলন, যুদ্ধ এবং মন্বন্তর এই ত্রিমুখী চাপে ব্রিটিশ সরকার সংকটময় পরিস্থিতিতেও ভারত সম্পর্কে অনমনীয় ছিলেন এবং রাজনৈতিক প্রভাবের কাছে নীতি স্বীকার করতে চান নি। সপ্রুর নেতৃত্বে সর্বদলীয় সভায় গান্ধীর মুক্তি সম্পর্কে ভারতীয়দের আবেদন ব্যর্থ হল। ভারত সম্পর্কে মার্কিন রাষ্ট্রপতির নীতি পরিবর্তনের চাপও ব্রিটিশ সরকার মেনে নেয়নি। গান্ধীজির অনশন নীতি বা রাজনীতিগত অন্য কোনও চাপের কাছে কোনওভাবেই পরাজয় স্বীকার করতে রাজি ছিল না ব্রিটিশ সরকার। অবশ্য মুসলিম লিগের কংগ্রেস বিরোধী নীতি, সাম্প্রদায়িক চাহিদা ব্রিটিশ সরকারকে তার নীতিতে অবিচল থাকতে সাহায্য করেছে। বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির অবস্থা অনুকূল হতে থাকায় ব্রিটিশ সরকারের আস্থা বেড়েছে, ভারতের প্রবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থাকেও তারা অনুকূল মনে করেছে। ‘ভারত ছাড়’ আন্দোলন ব্যর্থ ও পরাজিত হওয়াতে চার্চিল ব্রিটিশ সরকারের ১৯১৯ সালের শাসনতান্ত্রিক অবস্থানে ফিরে যেতে চাইছিলেন। অবশ্য ভারতের পরবর্তী ভাইসরয় তথা বড়লাটের পরিকল্পনা ছিল অন্যরকম। এবার আসুন আমরা ওয়াভেল পরিকল্পনায় শাসনসংস্কারের কী প্রস্তাব ছিল এবং ভারতের সাংবিধানিক সংস্কারের ইতিহাসে এই পরিকল্পনার প্রভাব কী সে সম্পর্কে কিছু জানার চেষ্টা করি।

২১.৪ ওয়াভেল পরিকল্পনা

১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লর্ড ওয়াভেল (Lord Wavell) ভারতের পরবর্তী ভাইসরয়ের পদে মনোনীত হলে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ওয়াভেলের জন্য যে নির্দেশনামা পাঠিয়েছেন তাতে বলা হয়েছে স্বায়ত্তশাসিত ভারতবর্ষ সৃষ্টি রানির ইচ্ছা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত রেখেই ভারতের নজ্য সংস্কার প্রস্তাব পেশ করার জন্য তাঁকে ক্ষমতা দেওয়া হল। তবে যুদ্ধের পরিস্থিতিতে সর্তক থেকেই তাঁকে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ওয়াভেল কিন্তু চার্চিলের মতো অনমনীয় ছিলেন না বা পূর্ববর্তী বড়লাটের মতো ভারত সম্পর্কে তাঁর কোনও উদাসীনতাও ছিল না। ওয়াভেল মনে-প্রাণে চেয়েছিলেন একটা রাজনৈতিক সমাধান হোক। তবে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার না হলে যে এই রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব নয় এমনকি গান্ধীজির মুক্তি বা বন্দিমুক্তি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয় কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের বাজেট অধিবেশনের বক্তৃতায় (১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৪) তা তিনি জানালেন। ওয়াভেল অবশ্য ভারতভাগ, হিন্দু-মুসলমানের পৃথক রাষ্ট্র চান নি। তবে একথার অর্থ এই নয় তিনি কংগ্রেসকে তুষ্ট বা মুসলিম লিগকে রুষ্ট করতে চাইছেন। ভারত বিভাগ ছাড়া ওয়াভেল ক্রিপস প্রস্তাবের শাসনসংস্কার নীতিতেই আস্থা রেখেছেন। ইতিমধ্যে দেশের রাজনীতি এবং বিশ্ব রাজনীতিরও পালাবদলের সম্ভাবনা দেখা গেল। অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করার প্রশ্নে ওয়াভেল গান্ধীজিকে বিবেচনা করার অনুরোধ জানালেন। ১৯৪৪ সালের ৬ মে গান্ধীজি অন্তরীণ অবস্থা থেকে মুক্তি পেলেন এবং জানালেন নতুন অবস্থার প্রেক্ষিতে আগস্ট প্রস্তাব আর প্রযোজ্য নয়। গান্ধীজি ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা, জাতীয় সরকার গঠন, দায়িত্বশীল শাসন প্রবর্তনের শর্তে ব্রিটিশ সরকারকে সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন। তবে ক্রীপস প্রস্তাব যে তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য

নয় একথাও তিনি জানালেন। জিন্নার দ্বিজাতি তত্ত্বের যে গান্ধীর কোনও আস্থা নেই, স্বাধীনতার আগে দেশ—বিভাজন যে তাঁর পছন্দ নয় গান্ধী ও জিন্নার আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হল।

গান্ধী-জিন্না আলোচনা ব্যর্থ হলে ওয়াভেল তাঁর দূরদৃষ্টি দিয়ে একথা বুঝতে পারলেন ভারতের অচলাবস্থার মীমাংসা প্রয়োজন এবং এ ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারকেই উদ্যোগ নিতে হবে। ২১ সেপ্টেম্বর ভারত সচিবকে প্রস্তাব পাঠিয়ে ওয়াভেল চাইলেন প্রধান রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে কেন্দ্রে এক অস্থায়ী সরকার গঠনের নজ্য সম্মেলন ডাকা হোক। ২৪ অক্টোবর চার্চিলকে এক পত্র পাঠিয়ে তিনি জানালেন ভারতকে আর বাহুবলে শাসন করা সম্ভব নয়। ব্রিটিশ সরকারের স্বার্থেই এদেশে শাসন সংস্কার বিষয়ে সুপরিকল্পিত ও গঠনমূলক পন্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। যুদ্ধের পরবর্তীকালে ভারতে দমননীতির প্রয়োগ ব্রিটিশ শাসন চলুক এটা বিশ্ব জনমত সমর্থন করবে না; উপরন্তু ভারত শাসনের প্রতিকূল অবস্থার জন্য দায়ী করা হবে ব্রিটিশ সরকারকে। শ্রান্ত ও ক্লান্ত আমলা বা ব্রিটিশ সৈন্যদের আর ভারত শাসনের ইচ্ছাও তেমন থাকবে না। সুতরাং, ভারতকে যদি কমনওয়েলথের সদস্য হিসাবে রাখতে হয় তবে এদেশের জন্য আশু সংস্কার প্রয়োজন।

ওয়াভেল চাইলেন সৎ ও বন্ধুত্বপূর্ণ এক প্রস্তাব এবং শাসনতান্ত্রিক সমঝোতা নিয়ে চূড়ান্ত আলোচনা। এই সমঝোতা নিয়েই আলোচনা শুরু হল। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ভুলাভাই (Bhulabhai Desai) প্রস্তাব দিলেন বর্তমান শাসনতন্ত্রের অধীনে জাতীয় সরকার গঠন করা হোক। তেজ বাহাদুর সপ্রু নির্দলীয় কমিটি গঠন করলেন। তবে ব্রিটিশ সরকার বা ক্যাবিনেটের তরফে কোনও সমাধান সূত্র এল না। চার্চিল সাধারণ নির্বাচনের জন্য নতুন কোনও প্রস্তাব চাননি। ক্যাবিনেট সাব-কমিটির সদস্য অ্যাটলি, অ্যামেরী, ক্রীপস, অ্যান্টারসন, সাইমন ইত্যাদিরা আইনের কূট তর্কেই ব্যস্ত ছিলেন। ওয়াভেল নিজে চাইছেন শাসন সংস্কারের ব্যাপারে দীর্ঘসূত্রতার অবসান ঘটুক। এরই মধ্যে কংগ্রেসের দাবি বাড়তে থাকে; ভারতীয় শিল্পপতি ও বণিকরা নানা প্রস্তাব ও পরিকল্পনা সরকারের কাছে পেশ করতে থাকেন। নেহরু, ঘনশ্যামদাস বিড়লা (Ghanashyamdas Birla), আম্বেদকর সকলেই ভারতের রাজনীতি ও শাসন সংস্কার বিষয়ে আগ্রহ দেখাচ্ছেন আবার বিতর্কও করছেন। এই পরিস্থিতিতেই চার্চিলের সমর্থন নিয়ে ১৯৪৫ সালের ১৪ জুন ওয়াভেল তাঁর শাসনতান্ত্রিক সংস্কার বিষয়ক প্রস্তাব ঘোষণা করলেন। ওয়াভেলের প্রস্তাবে বলা হল ঃ

> **প্রান্তলিপি ঃ** ১৯৪০ সালের আগেই জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লিগ মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি জানায়। জিন্না জানান, মুসলমানরা শুধুমাত্র একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নয়, তারা একটি স্বতন্ত্র জাতি। স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত না হলে ভারতীয় মুসলমানরা প্রকৃত মুক্তি অর্জন করতে পারবে না। ১৯৪০ সালের ২০ মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত বার্ষিক অধিবেশনে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হয়। যদিও পাকিস্তান কথাটি এই প্রস্তাবে ব্যবহৃত হয় নি বা জিন্না স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের জন্য কোন আন্দোলন সংগঠিত করেন নি। দরকষাকষির একটি রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে তিনি প্রাথমিকভাবে এই প্রস্তাবকে ব্যবহার করেছেন। পরবর্তীকালে অবশ্য এটি পৃথক পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলনেই চালিত হয়।

(১) ভারতের নতুন সংবিধান রচিত না হওয়া পর্যন্ত ভারতীয় নেতৃবর্গকে নিয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হবে।

(২) বড়লাট ও প্রধান সেনাপতি ছাড়া শাসন বিভাগীয় পরিষদের সব সদস্য হবেন ভারতীয়। বর্ণ-হিন্দু ও মুসলমান সদস্যদের সমসংখ্যক প্রতিনিধি কাউন্সিল তথা পরিষদে থাকবেন।

(৩) ১৯৩৫ সালের আইন অনুসারেই কাউন্সিল চলবে। কাউন্সিল নতুন সংস্কার বিষয়ে বিবেচনা করবে।

(৪) বন্দি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মুক্তি দেওয়া হবে।

(৫) ভারতের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব যতদিন ব্রিটিশ সরকারের হাতেই থাকবে ততদিন সামরিক দপ্তরের ভার ব্রিটিশ সরকারের হাতেই থাকবে।

(৬) এই সব প্রস্তাব কার্যকর করার জন্য ২৫ জুন থেকে ভারতীয় রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে সিমলায় এক সম্মেলন বসবে।

কাউন্সিলের সদস্যপদ নিয়ে ঐকমত্য না হলেও বা বর্ণহিন্দু কথাটি নিয়ে গান্ধীজির তীব্র আপত্তি থাকলেও, জিন্নার কিছু দাবি থাকলেও শেষপর্যন্ত সিমলায় সম্মেলন বসেছে। কাউন্সিলের গঠন ও সদস্য মনোনয়ন নিয়ে তীব্র বাদানুবাদ ঘটেছে; প্রশ্ন উঠেছে কোন্ নীতির ভিত্তিতে কাউন্সিল কাজ করবে। প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে কংগ্রেস এবং মুসলিম লিগের মধ্যে বিতর্ক অব্যাহত থাকে। জিন্নার মুসলিম প্রতিনিধিত্বের বিষয়ে অনমনীয় মনোভাব ছিলই। ওয়াভেল কিন্তু ভারত ভাগ চান নি এবং জিন্নার সংকীর্ণ, প্রতিক্রিয়াশীল, সাম্প্রদায়িক ভাবনাকে আমল দিতে চান নি। শেষপর্যন্ত সিমলার বৈঠক বানচাল হল। ওয়াভেল দেশে ফিরে ১৯ সেপ্টেম্বর ভারত সম্পর্কে নীতি ঘোষণা করলেন। ঘোষণায় বলা হল ঃ

(১) সামনের শীতেই কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচন হবে।

(২) ভারতে যতশীঘ্র সম্ভব সংবিধান রচনার জন্য এক গণপরিষদ গঠন করা হবে। নির্বাচনের পর আইনসভার (প্রাদেশিক) সদস্যদের সঙ্গে বসে বড়লাট এ সম্পর্কে আলোচনা করবেন। ক্রীপস প্রস্তাব অথবা অন্য কোনও বিকল্প প্রস্তাব নিয়েও আলোচনা হবে। রাজন্যবর্গের সঙ্গে গণপরিষদ যোগদানের ব্যাপারে আলোচনা হবে।

(৩) ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে সন্ধির শর্ত নিয়েও আলোচনা হবে।

(৪) সব ভারতীয় দলের গ্রহণযোগ্য শাসন পরিষদ নির্বাচনের ভিত্তিতে গঠন করবেন বড়লাট।

ব্রিটিশ সরকারের প্রস্তাব নিয়ে কংগ্রেসে আলোচনা শুরু হলেও বিতর্ক অব্যাহত ছিল। আই.এন.এ. (United National Army) বন্দিদের সমর্থন নিয়ে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির প্রস্তাব সরকারের পছন্দ ছিল না, গান্ধীর সীমাবদ্ধ পাকিস্তানের পূর্ব প্রস্তাব নিয়ে কংগ্রেসের আপত্তি ছিল, আবার কংগ্রেস-লিগ সম্পর্ক নিয়ে কংগ্রেসের ভাবনায় গান্ধীজি সন্তুষ্ট ছিলেন না। স্বাধীন ভারতের রূপরেখা নিয়ে গান্ধী ও নেহরুর মতান্তর সৃষ্টি হল। গান্ধীজি ফিরে যেতে চাইলেন তাঁর 'গ্রাম-স্বরাজের' ভাবনায় আর নেহরু জড়িয়ে পড়লেন নির্বাচনী রাজনীতিতে। এরই মধ্যে বাংলাদেশে আই.এন.এ. বন্দিদের মুক্তি নিয়ে আন্দোলন শুরু হয়েছে, কলকাতায় ধর্মঘট পালিত হয়েছে, রয়াল ইন্ডিয়ান নেভির (RIN) বিদ্রোহে উত্তাল হয়েছে সারা ভারতবর্ষের মানুষ। বোম্বাই, মাদ্রাজ, পুণা, কলকাতা, যশোর ও আম্বালায় নৌ-সেনারা ধর্মঘট করে; একই সঙ্গে শিল্প, রেল নানা স্থানে শ্রমিক ধর্মঘট হয়। সরকারও বিদ্রোহ দমনের জন্য ব্যবস্থা নেয়। তবে পরিস্থিতি যে ব্রিটিশ সরকারকে প্রভাবিত করেছে তার প্রমাণ ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের তিন সদস্যকে ভারতে পাঠাবার সরকারি সিদ্ধান্ত। ১৯৪৫ সালে ব্রিটেনে শ্রমিক সরকার ক্ষমতায় আসীন হয়। শ্রমিক নেতা ও নতুন প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট অ্যাটালির উদ্যোগেই শাসন-সংস্কার বিষয়ে আলোচনা ও ক্ষমতা হস্তান্তরের উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতে এলেন ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের সদস্য লর্ড পেথিক লরেন্স, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস ও এ. ভি. আলেকজান্ডার। ক্যাবিনেট মিশন (Cabinet Mission) নামে পরিচিত এই গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হলেন বড়লাট লর্ড ওয়াভেল। বিভিন্ন গোষ্ঠী ও দলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে ক্যাবিনেট মিশন যে নতুন সংস্কার প্রস্তাব পেশ করে সেটিই হল ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা (Cabinet Mission Plan)।

ক্যাবিনেট মিশন ভারতে পদার্পণ করার আগেই কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে নির্বাচন হয়। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে সংগঠিত এই নির্বাচনে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ বিশেষ সাফল্য পায়। বলা যেতে পারে, সংসদীয় রাজনীতর স্বাদ ও অভিজ্ঞতা লাভ করতে এই নির্বাচন ও তার ফলাফল ভারতীয়দের বিশেষ সাহায্য করে। কেন্দ্রীয় আইনসভার সাধারণ আসনগুলিতে প্রদত্ত ভোটের নব্বই শতাংশের অধিক ভোট পেয়েছে কংগ্রেস আর মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত আসনের মোট ভোটের প্রায় ৮৭ শতাংশ লাভ করেছে মুসলিম লিগ। কেন্দ্রীয় আইনসভায় সবগুলি মুসলিম আসনই দখল করে লিগ। কেন্দ্রীয় আইনসভার দলগত অবস্থান ছিল এই রকম ঃ

মোট আসন	১০২
কংগ্রেস	৫৭
মুসলিম লিগ	৩০
নির্দল	৫
আকালী	২
ইউরোপীয়	৮

প্রদেশগুলির মধ্যে আসাম, সংযুক্ত প্রদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ, বিহার, উড়িষ্যা আর মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেস জিতেছে ও মন্ত্রিসভা গঠন করেছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পঞ্জাবেও কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করতে পেরেছে। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের তুলনায় মুসলিম লিগের নির্বাচনি সাফল্যও ছিল যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক। বাংলায় মুসলিম লিগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ২৫০ সদস্যবিশিষ্ট বাংলার আইন পরিষদের মুসলিম লিগ পেয়েছে ১১৫টি আসন, কংগ্রেস পেয়েছে ৬২টি আসন। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের তুলনায় বাংলাদেশে ১৯৪৫ সালের নির্বাচনে লিগের সাফল্য অভাবনীয়। ফজলুল হক (Fazlul Haq) সাহেবের প্রজা পার্টির (পূর্বের কৃষক-প্রজা পার্টি) এই নির্বাচনে সাফল্য ছিল নৈরাশ্যজনক।

নির্বাচনি সাফল্য এলেও কংগ্রেসের মূল দাবি পূর্ণ স্বাধীনতা বা লিগের পৃথক রাষ্ট্রের দাবি কার্যকরভাবে স্বীকৃতি লাভ করেনি। রাজনৈতিক পরিস্থিতিও ক্রমশ জটিল ও অশান্ত হয়ে উঠেছে। ব্রিটিশ সরকারের কাছে নির্বাচনি পরিস্থিতি বা ফলাফল ও পরিষদীয় রাজনীতির চেয়ে অবশ্য এই পর্বে অন্য কতকগুলি সমস্যা প্রাধান্য পেয়েছে। বাংলার রাজনীতি এবং সর্বভারতীয় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ ঘটেছে। কংগ্রেসের তরুণ নেতৃত্ব সংসদীয় রাজনীতির চেয়ে গণআন্দোলনের দিকেই আকর্ষণ অনুভব করছেন এবং হিংসা ও দলাদলির রাজনীতি সংস্কারের মূল ধারা থেকে সরকারকে পিছিয়ে দিচ্ছে। ক্যাবিনেট মিশন ভারতে এল এই গণবিক্ষোভ, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, হিংসার পরিস্থিতিতে ভারতের অবস্থাকে নতুনভাবে যাচাই করার জন্য।

এবার আসুন আমরা ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার মূল প্রস্তাবগুলি কী এবং ভারতের সাংবিধানিক রাজনীতির উপর এর প্রভাব কী পড়েছে, ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা নিয়ে কংগ্রেস বা মুসলীম লিগের প্রতিক্রিয়া কী ছিল সে সম্পর্কে আলোচনা করি।

২১.৫ ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা

ওয়াভেল প্রস্তাব ও সিমলা সম্মেলন এক অর্থে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। পাকিস্তান দাবি স্বীকৃত না হওয়ায় ভারতের জাতীয়তাবাদী শক্তির কাছে এটিই ছিল ভারতের সংহতি রক্ষা এবং ঐক্যবদ্ধ এক ভারতের জন্য স্বাধীনতা অর্জন ও স্বাধীন ভারতের সাংবিধানিক ব্যবস্থার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের শেষ সুযোগ। এই সুযোগ ব্যর্থ হয়েছে মুসলিম

লিগ ও কংগ্রেসের ঐক্যের অভাবে এবং অবশ্যই জিন্নর অমননীয় মনোভাবের জন্য। ক্যাবিনেট মিশন ভারতের সাংবিধানিক কাঠামো স্থির করার প্রয়োজনে ভারতের বিভিন্ন দলের কাছে যে পরামর্শ ও প্রস্তাব চেয়েছে তাতে দেখা গেল জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে মৌলানা আজদের প্রস্তাবের সঙ্গে জিন্নার প্রস্তাবের কোনও মিলই নেই। মৌলানা আজাদ ভারতের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, ভারতের সংবিধান রচনার জন্য একটি গণপরিষদ গঠন, গণপরিষদের আনুপাতিক হারে বিভিন্ন দলের প্রতিনিধি নির্বাচন, এদেশের জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ইত্যাদির দাবি জানালেন। মধ্যবর্তী সময়কালে যে অন্তর্বর্তী সরকারের হতে শাসনভার থাকবে তার মন্ত্রিসভায় কংগ্রেস ও লিগের সদস্য সংখ্যা সমান হলে চলবে না আজাদ একথাও জানালেন। অপরদিকে, জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লিগ দ্বি-জাতি তত্ত্বের আদর্শেই অবিচল ছিল। এরা ছয়টি মুসলমান-প্রধান প্রদেশকে একটি গ্রুপে আনা; এদের জন্য পৃথক গণপরিষদ, পারিস্তান গ্রুপের প্রত্যেক প্রদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা অনুসারে গণপরিষদে প্রতিনিধি নির্বাচন ইত্যাদির দাবি জানায়। কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের দৃষ্টিভঙ্গিগত মৌলিক পার্থক্য লক্ষ্য করে ক্যাবিনেট মিশন আর আলোচনা দীর্ঘায়িত না করে ভারত সম্পর্কে নিজেদের পরিকল্পনাটি পেশ করে ১৯৪৬ সালের ১৬ মে।

ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার মূল সুপারিশগুলি হল ঃ

(১) ব্রিটিশ ভারত ও দেশীর রাজ্যগুলি (রাজন্য ভারত) নিয়ে সমগ্র ভারতের একটি ইউনিয়ন গঠিত হবে। এই ভারতীয় ইউনিয়নের হাতে থাকবে ৪টি ক্ষমতা—প্রতিরক্ষা, বিদেশ, যোগাযোগ এবং এই তিনটি বিষয় পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ।

(২) ইউনিয়নের একটি শাসন-পরিষদ থাকবে এবং ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় ভারতের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত একটি আইনসভা থাকবে।

(৩) আইনসভার কোনও গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন নির্ধারণে দুই প্রধান সম্প্রদায়ের উপস্থিতি ও ভোট প্রদানকারী প্রতিনিধিদের সংখ্যাধিক্যের প্রয়োজন হবে।

(৪) ইউনিয়নের বিষয় ছাড়া অন্য সব বিষয় ও সব অবশিষ্ট ক্ষমতা (Residuary Powers) প্রদেশগুলির হাতে থাকবে।

(৫) প্রদেশগুলি ইচ্ছামতো শাসন-পরিষদ ও আইনসভা সমেত গ্রুপ গঠন করতে পারবে এবং প্রত্যেক গ্রুপ কোন্ কোন্ বিষয় প্রদেশগুলির সঙ্গে যুক্তভাবে গ্রহণ করবে তা ঠিক করবে।

(৬) একটি গণপরিষদের মাধ্যমেই ভবিষ্যৎ সংবিধান প্রণয়ন করা হবে। গণপরিষদের সদস্যরা প্রাদেশিক বিধানসভায় নিজ নিজ সম্প্রদায় কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। আইনসভার প্রতিটি অংশ (সাধারণ, মুসলিম, শিখ) এক হস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের পদ্ধতিতে প্রতিনিধি নির্বাচন করবে। চিফ্ কমিশনারের প্রতিনিধি হিসাবে কেন্দ্রীয় আইনসভায় দিল্লির প্রতিনিধি, আজমীড় মারওয়াড়ের প্রতিনিধি এবং কুর্গ লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের প্রতিনিধি যুক্ত হবেন।

(৭) গণপরিষদে রাজন্য ভারতের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব দিতে হবে। এর সংখ্যা ৯৩-র বেশি হবে না। প্রতিনিধি নির্বাচনের পদ্ধতি আলোচনার পর ঠিক হবে। রাজ্যগুলির প্রতিনিধি হিসাবে প্রথমে একটি আলোচনা-কমিটি কাজ করবেন। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যত শীঘ্র সম্ভব নয়া দিল্লিতে মিলিত হবেন। একটি প্রাথমিক অধিবেশনে সাধারণ কার্যবিধি স্থির হবে। আদিবাসী ও বহির্ভূত অঞ্চলগুলির উপর উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হবে। প্রদেশের প্রতিনিধিরা বিভিন্ন ভাগে (ক, খ, গ) বিভক্ত হবেন এবং বিভাগের অন্তর্গত প্রদেশের সংবিধান রচনায় কাজ আরম্ভ করবেন। বিভাগগুলি হল (ক) মাদ্রাজ, বোম্বাই যুক্তপ্রদেশ,

বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা (খ) পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, সিন্ধু (গ) বাংলা, আসাম। প্রদেশগুলি বিভিন্ন বিভাগের এবং রাজন্য ভারতের প্রতিনিধিরা ইউনিয়ন সংবিধান রচনার জন্য পুনর্বার মিলিত হবেন।

(৮) সংবিধান চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে কোনও প্রদেশ ইচ্ছা করলে যে গ্রুপে তার স্থান হয়েছে সেই গ্রুপ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে।

(৯) আশু ক্ষমতা হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে এক ''অন্তর্বর্তী সরকার'' (Interim Government) গঠন করা হবে। এই সরকারের সব দলেরই প্রতিনিধি থাকবেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সব দপ্তরই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে ভারতীয়দের হাতে হস্তান্তরিত হবে। ব্রিটিশ সরকার এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে প্রয়োজনীয় সব সাহায্য করবে।

ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনায় ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করার প্রস্তাব না থাকলেও, কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের দাবির মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের এই চেষ্টা ছিল। মুসলিম লিগ অবশ্য প্রস্তাবটিকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে। অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান করার প্রশ্নে মুসলিম লিগ প্রথমে দ্বিধা দেখালেও পরে রাজি হয়। কংগ্রেসের তরফে গ্রুপ গঠনের প্রস্তাবে প্রবল বিরোধিতা করা হয়। সংবিধান রচনায় পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি প্রসঙ্গেও কংগ্রেসের অন্তোষ ছিল। কংগ্রেস ক্যাবিনেট মিশনের সংবিধান রচনার প্রস্তাব গ্রহণ করে কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদানের অপ্রশ্নটি অগ্রাহ্য করে। কংগ্রেস সবাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করে নেহরু জানান কংগ্রেস যদি গণপরিষদে স্বাধীনভাবে কাজ না করতে পারে তবে গণপরিষদ থেকে বেরিয়ে আসতে দ্বিধা করবে না। মৌলানা আজাদ নেহরুর বিবৃতিকে দুঃখজনক বলে অভিহিত করে বলেছেন এই অবিবেচক বিবৃতি ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে এবং জিন্না ও মুসলিম লিগকে সংঘর্ষের পথে যেতে সাহায্য করেছে। জিন্না ক্যাবিনেট কিশনের বৃত্ত থেকে বিচ্ছিন্ন হতেই চাইছিলেন। নেহরুর বিবৃতি তাকে সুযোগ এনে দিল।

৮ আগস্ট কংগ্রেস অন্তর্বর্তী সরকার গঠনে রাজ হলেও, মুসলিম লিগ নেহরু মন্ত্রিসভায় যোগ দেয়নি। ওয়াভেল আশা প্রকাশ করেছেন, শেষপর্যন্ত মুসলিম লিগ সরকারে যোগ দেবে এবং স্বচ্ছন্দেই ভারতে সাংবিধানিক সংস্কারের কাজ চলবে। ওয়াভেলের ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে মুসলিম লিগ ২৬ আগস্ট প্রত্যক্ষ দিবস পালন করে, মিটিং-মিছিল ইত্যাদির মাধ্যমে প্রবল ক্ষোভ প্রকাশ করে। অন্তর্বর্তী সরকারে কংগ্রেসের অংশগ্রহণের প্রশ্ন নিয়ে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের মধ্যে কলহের পরিণতি হিসাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি হয় এবং বহু মানুষ হতাহত হয়। দাঙ্গার সূত্রপাত কলকাতায় কিন্তু তা ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। এলাহাবাদ, বোম্বাই, পূর্ববঙ্গ, বিহার সর্বত্রই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। কলকাতার দাঙ্গার পরে লিগ রাজনৈতিক প্রতিকূল পরিস্থিতি ও দাঙ্গার ভয়ানক পরিণতি এড়াতেই ওয়াভেলের আহ্বানে মন্ত্রিসভায় যোগ দেয়। তবে, এর ফলে ভারতীয় রাজনীতির অচলাবস্থা দূর হয়নি। দপ্তর বণ্টন নিয়ে কংগ্রেস-লিগ বিরোধ বেধেছে। গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর (অর্থ, বাণিজ্য, ডাক ও বিমান, পরিষদীয়) পেয়েও লিগ গণপরিষদে অংশগ্রহণের পূর্বশর্ত অর্থাৎ পাকিস্তান রাষ্ট্র ও পৃথক সংবিধানসভার দাবি ছাড়েনি। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নীতিও ত্যাগ করেনি। কংগ্রেস-লিগ যুক্তফ্রন্ট সরকার থাকাকালীনই ঘটল ইতিহাসের আরেক নির্মম ট্র্যাজেডি—নোয়াখালির দাঙ্গা। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠীর কথায় ''নোয়াখালির ভয়াবহ ট্র্যাজেডি কংগ্রেস ও লীগ, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে রক্তের নদী বইয়ে দিল তার উপর আর সেতু গড়া গেল না।'' গ্রামের পর গ্রাম আক্রমণ, লুটপাট, হত্যা, অগ্নিসংযোগ এমন কি নারী ধর্ষণ ও ধর্মান্তরকরণের ঘটনাও ঘটেছে নির্বিচারে। এই অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতির সমাধানে ওয়াভেল দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা গ্রহণের কথা যখন ভাবছেন, নানা বিকল্পের সন্ধান করছেন, তখনই তিনি বরখাস্ত হলেন। ভারতের বড়লাট হয়ে এলেন মাউন্টব্যাটেন (Lord Mountbatten)।

ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা রূপ পাবার সম্ভাবনা নেই দেখে প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি ১৯৪৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি সংসদে ঘোষণা করলেন, ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে দায়িত্বশীল ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। এর আগেই ৮ ফেব্রুয়ারি মাউন্টব্যাটেন বড়লাট হিসাবে তাঁর নিয়োগপত্র এবং এই ঘোষণাটির খসড়া হাতে পেলেন।

এবার আসুন, আমরা দেখি, অ্যাটলির স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র এবং এই ঘোষণা অনুসারে ক্ষমতা হস্তান্তরকে ত্বরান্বিত করতে নতুন বড়লাট মাউন্টব্যাটেন কী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। ভারতের সাংবিধানিক শাসনব্যবস্থার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের এটাই শেষ এবং চূড়ান্ত পর্ব।

২১.৬ ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে অ্যাটলির ঘোষণা, মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা ও ভারতের স্বাধীনতা আইন

১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে সংবিধান রচনা পরিষদের নির্বাচনের ফলাফলে দেখা গেল ১৯৬ সদস্যবিশিষ্ট পরিষদে কংগ্রেস পেয়েছে ২০৮টি আসন আর মুসলিম লিগ পেয়েছে ৭৫টি আসন। কিন্তু ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা মতো সংবিধান প্রণয়নের ব্যাপারে যখন পরিষদের সভা ডাকা হল মুসলিম লিগের নির্বাচিত সদস্যরা সভা বয়কট করলেন। গ্রুপে যোগদান বিষয়ে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব নিয়ে মুসলিম লিগ ও কংগ্রেস ভিন্ন ব্যাখ্যা করায় কংগ্রেস ও লিগের মতবিরোধ তুঙ্গে পৌঁছায়। শুধু তাই নয়, অন্তর্বর্তী সরকারের কার্যকলাপেও লিগ ও কংগ্রেস বিরোধী অবস্থান স্পষ্ট হল। বাজেটে ব্যবসায়ীদের উপর কর ধার্যের প্রস্তাবের জন্য লিগের অর্থমন্ত্রী লিয়াকৎ আলী (Liyakat Ali) প্রচণ্ড কংগ্রেস বিরোধিতার সম্মুখীন হলেন। মুসলিম লিগও নানাভাবে সরকারের কার্যকলাপে অচলাবস্থার সৃষ্টি করতে থাকে। মুসলিম লিগের অবস্থান নিয়ে নেহরু, প্যাটেল, আজাদ কেউই সন্তুষ্ট ছিলেন না। সীমান্ত দখলের জন্য জিন্নার লড়াই, গণপরিষদের শর্ত প্রত্যাখ্যান করা, পঞ্জাবে, লাহোরে লিগের প্ররোচনায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি, মুলতান, লাহোর, গুজরাট ও জলন্ধরে সভা, হরতাল, মিছিল পেশোয়ারে ‘লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান’ ঘোষণা সব কিছু মিলে মুসলিম লিগের আচরণে কংগ্রেস নেতৃত্ব ক্ষুব্ধ। নেহরু চাইছেন মুসলিম লিগকে গণপরিষদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হোক। লিগও চাইছে নানাভাবে কংগ্রেসকে বিব্রত করতে। ওয়াভেল চাইলেন না নেহরু বা কংগ্রেস একাই সংবিধান রচনার অংশীদার হোক। ওয়াভেল তাই নিয়ে এলেন ‘Breakdown Plan’; ওটি হল ভারতীয় নেতাদের শেষ চাপ বা ধাক্কা দেবার পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৪৮ সালের ৩১শে মার্চের মধ্যে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনা। সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের মীমাংসা না হওয়াতে শুধু কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলিকে আগে স্বাধীন করা হবে। মুসলমানপ্রধান প্রদেশগুলি এখনকার মতো ব্রিটিশ শাসনের অধীনে থাকবে, পরে সুবিধামতো তাদের স্বাধীনতা দেওয়া হবে।

ওয়াভেলের নীতি ভারতের ঐক্যের পরিপন্থী এবং ভারতীয়দের মধ্যে বিরোধিতা সৃষ্টি করবে। সন্দেহ নেই ১৯৪৭ সালের গোড়া থেকেই যে ধরনের শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি দেখা দিল তাতে সরকারি আশংঙ্কা প্রমাণিত হল। ব্রিটিশ সরকার চাইলেন ক্ষমতা হস্তান্তর করতে গেলে চাই ‘Breakdown Plan’ দিয়ে নয়, ব্রিটিশ সরকার চাইলেন নতুন বড়লাট মাউন্টব্যাটেনের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত আবেদন আর গণমোহিনী ব্যক্তিত্বকে কাজে লাগাতে। ১৯৪৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি অ্যাটলির ঘোষণা জারি হল। ঘোষণায় বলা হল ঃ

(১) কোনওরকম বিলম্ব না করেই দায়িত্বশীল ভারতীয়দের হাতে ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে।

(২) ইতিমধ্যে যদি দেখা যায় ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা অনুসারে গঠিত প্রতিনিধিমূলক গণপরিষদ রচিত সংবিধান সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হচ্ছে না তবে ব্রিটিশ সরকার স্থির করবে নির্দিষ্ট সময়ে কার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে।

(৩) দেশীয় রাজ্যগুলির উপর রাজশক্তির সর্বময় ক্ষমতার অবসান, হবে অর্থাৎ ওরা ক্ষমতা হস্তান্তরের আগেই স্বাধীন হবে।

(৪) ক্ষমতা হস্তান্তরের ফলে যে সব বিষয় উদ্ভূত হবে সে সব বিষয় সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকার বিভিন্ন দলগুলির সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে চুক্তি সম্পাদন করবে।

(৫) ব্রিটিশ সরকার আশা পোষণ করে যে, ব্রিটেনের ব্যবসায় ও শিল্প স্বার্থ উভয় দেশের স্বার্থেই বিবেচিত হবে।

(৬) সরকার আশা করে, ক্ষমতা হস্তান্তরের ফলে ব্রিটেনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হবে না।

২৪ মার্চ, ১৯৪৭ মাউন্টব্যাটেন ভারতের বড়লাট হিসাবে কার্যগ্রহণ করলেন। এরই মধ্যে গণপরিষদ নিয়ে কংগ্রেস ও লিগের মতপার্থক্য চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। কংগ্রেস সিদ্ধান্ত নিল লিগকে বাদ দিয়েই গণপরিষদ চলবে, সংবিধান রচনার কাজ চলবে। কংগ্রেস চাইল অন্তর্বর্তী সরকারকে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হোক, লিগ চাইল অকংগ্রেসি প্রদেশগুলির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর হোক। পঞ্জাবে লিগের নেতৃত্বে আইন-অমান্য আন্দোলন ব্যাপক হয়ে উঠেছে। পঞ্জাবের খিজির মন্ত্রিসভার পদত্যাগ ও মুসলিম লিগের সরকার গঠনের প্রচেষ্টায় অমৃতসর, মুলতান, রাওলপিণ্ডিতে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দিল। দেশের এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে মাউন্টব্যাটেন চাইলেন ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে। ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী অখণ্ড ভারতের পরিকল্পনা কার্যকরী করতে কংগ্রেস বা লিগের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেও তিনি কোনও সমাধান পেলেন না। শেষপর্যন্ত ভারতে গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি, মুসলিম লিগের পাকিস্তান দাবির অনমনীয় অবস্থান এসব কথা বিচার করে মাডন্টব্যাটেন ও তাঁর সহকারীরা সিদ্ধান্ত নিলেন—বিভক্ত ভারতের সিদ্ধান্ত। বর্তমান বিস্ফোরক পরিস্থিতিতে ভারত বিভাজন, ক্ষমতা হস্তান্তর ও ভারত ত্যাগই ব্রিটিশ সরকারের শ্রেষ্ঠ পন্থা। আগ্নেয়গিরির প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে বিস্ফোরক, বিধ্বংসী উপাদানে ভর্তি, আগুন লাগা জাহাজে (ভারতকে এ রকমভাবেই দেখেছেন তাঁরা) দাঁড়িয়ে আর গভীর বিচার-বিবেচনার সুযোগ নেই। অন্তর্বর্তী সরকারের কার্যকারিতা নিয়েও তাঁর কোনও আস্থা নেই। ভারত বিভাজন ও হস্তান্তর পরিকল্পনার খসড়া রচনার কাজ মাউন্টব্যাটেন শুরু করে দিলেন। খসড়া পরিকল্পনা পেশ হল, ভারতীয়দের ও সরকারের তরফে বাধা এল, আবার নতুন খসড়া তৈরি হল এবং শেষপর্যন্ত ২ জুন খসড়াটি অনুমোদন পেল। ব্রিটিশ সংসদে প্রস্তাবটি ঘোষিত হল ৩ জুন, ১৯৪৭।

মাডন্টব্যাটেন পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যগুলিকে এইভাবে আলোচনা করা যায় ঃ (১) মাডন্টব্যাটেন পরিকল্পনার প্রথম ও প্রধান সিদ্ধান্ত নিল দেশ বিভাজন ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবিকে মেনে নেওয়া। বলা হল ভারত ও পাকিস্তান উভয়েই ডোমিনিয়ন মর্যাদা পাবে, ভবিষ্যতে কমনওয়েলথ ত্যাগ করার অধিকারও উভয়ের থাকবে। (২) এই পরিকল্পনায় দুটি গণপরিষদের প্রস্তাব করা হয়। বলা হয়, যেসব অঞ্চল বর্তমান গণপরিষদে যোগ দিতে অস্বীকার করেছে তাদের উপর বর্তমান গণপরিষদ রচিত সংবিধান চাপিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। সমস্যার সমাধান হিসাবে বলা হল ঃ

(ক) বাংলা ও পাঞ্জাবের মুসলমানপ্রধান জেলাগুলি ও অ-মুসলমানপ্রধান জেলাগুলি পৃথকভাবে বৈঠক বসবে। এরা সাধারণ ভোটে স্থির করবে পাঞ্জাব ও বাংলাকে ভাগ করা হবে কিনা। যদি ভাগ করার প্রস্তাব হয়

তা হলে প্রত্যেক অংশ বর্তমান গণপরিষদে যোগদান করবে কিনা, অথবা কোনও নতুন গণপরিষদ গঠন করে তাতে যোগ দেবে তা ঠিক করবে।

(খ) বাংলা ও পাঞ্জাবে সীমানা নির্ধারণ করবে দুটি পৃথক সীমানা কমিশন।

(গ) সিন্ধু প্রদেশের আইনসভা স্থির করবে যে ঐ প্রদেশ বর্তমান গণপরিষদে অথবা কোনও এক নতুন গণপরিষদে যোগদান করবে।

(ঘ) আসামের মুসলমানপ্রধান শ্রীহট্ট জেলা গণভোটের মাধ্যমে ঠিক করবে এ জেলা আসামের সঙ্গে থাকবে, না পূর্ববঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হবে।

(ঙ) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশও গণভোটের মাধ্যমে ঠিক করবে যে, ঐ প্রদেশ ভারত বা পাকিস্তান কার সঙ্গে যুক্ত হবে।

(চ) বালুচিস্তান সিদ্ধান্ত নেবে তারা ভারতীয় ইউনিয়নের সঙ্গে যোগ দেবে কিনা।

(ছ) দেশীয় রাজ্যগুলির যে কোনও ডোমিনিয়নে যোগদানের অধিকার থাকবে।

(৩) এই সব প্রস্তাবগুলিকে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট যথাশীঘ্র সম্ভব আইন প্রণয়ন করবে।

বিতর্ক যাই হোক, জাতীয় কংগ্রেস মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনাকে মেনে নিল। নেহরু জানালেন বেদনাহত চিত্তে তিনি এই প্রস্তাব মেনে নিচ্ছে ("....It is with no joy in my heart that I commend these proposals.....Nehru) গান্ধীজি অবশ্য এই সমাধান সূত্রকে মেনে নেন নি, তবে প্যাটেল, নেহরু বা কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির সিদ্ধান্তকে তিনি প্রভাবিত করতেও ব্যর্থ হয়েছেন। জিন্না শেষপর্যন্ত খণ্ডিত পাকিস্তান পেয়েই খুশি হলেন। প্রদেশগুলিতে গণভোট নেবার পর দেখা গেল বাংলা ও পাঞ্জাবের আইনসভায় অমুসলমান সদস্যরা ভারতে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিল; পশ্চিম পাঞ্জাব, পূর্ব বাংলা ও আসামের শ্রীহট্ট পাকিস্তানে যোগ দিল। পূর্ব পাঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে খান আবদুল গফ্‌ফর খান ও কংগ্রেস গণভোট বর্জন করলেও, শতকরা পঞ্চাশ ভাগের উপস্থিতিতে গৃহীত গণভোটে অধিকাংশ পাকিস্তানে যোগ দেবার পক্ষে মত দেয়। পাঞ্জাব ও বাংলার ব্যবচ্ছেদ ও ভাগবাঁটোয়ারার জন্য স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফের (Siril Radcliffe) নেতৃত্বে দুটি সীমানা কমিশন নিযুক্ত হয়। কমিশনের হিন্দু ও মুসলমান সদস্যরা এব্যাপারে এক মতে আসতে না পারায় স্যার র‍্যাডক্লিফ নিজেই এ ব্যাপারে রায় দেন। ১৭ আগস্ট প্রকাশিত এই রায় অনুসারে বাংলার শতকরা ৩৬ ভাগ অঞ্চল ও ৩৫ ভাগ জনসংখ্যা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ গঠিত হল। পূর্ব পাঞ্জাব পেল ৩৮ ভাগ অঞ্চল ও ৪৫ ভাগ জনসংখ্যা।

দেশীয় রাজ্যের ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বাধীনতার আগে বিশেষ সমস্যা সৃষ্টি হয়। সমযন্ধ ও সম্পদশালী দেশীয় রাজ্য হায়দ্রাবাদ, কাশ্মীর, মহীশূর, ভূপাল ইত্যাদি ভৌগোলিক দিক থেকে ভারত রাষ্ট্রের সংলগ্ন হলেও এরা স্বাধীন রাজ্য হিসাবে থাকতে চেয়েছে। অন্যদিকে ছোট ছোট দেশীয় রাজ্যগুলির ইচ্ছা ছিল ভারতের সঙ্গে যুক্ত হবার। শেষপর্যন্ত অবশ্য কাশ্মীর, জুনাগড় ও হায়দ্রাবাদ ছাড়া প্রায় ৫৬টি দেশীয় রাজ্য ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয়। এ ব্যাপারে সর্দার প্যাটেলের বিশেষ কৃতিত্ব ছিল এবং মাউন্টব্যাটেনের সহযোগিতা ছিল। প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ ভিন্ন অন্যান্য ক্ষেত্রে স্বশাসনের অধিকার দেশীয় রাজাদের ছিল।

প্রান্তলিপি ঃ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মোট ভোটদাতা ছিল ৫,৭২,৭৯৯। গৃহীত ভোটের সংখ্যা ছিল ২,৯২,১১৮। এদের মধ্যে পাকিস্তানের পক্ষে ভোট পড়ে ২,৮৯,২৪৪, ভারতের পক্ষে ভোট পড়ে ২,৮৭৪।

পরবর্তী ঘটনাবলি অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং দ্রুততার সঙ্গেই ঘটেছে। প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি ৪ জুলাই ভারতীয় স্বাধীনতা বিল (Indian Inedpendence Bill) কমন্সসভায় পেশ করেন। এটি ১৯৪৭ সালের জুন মাসের মাউন্টব্যাটেন প্রস্তাবকেই লিপিবদ্ধ আইনের রূপদান করার এক প্রচেষ্টা মাত্র। সৃষ্টি হল দুটি ডোমমনিয়ন—ভারত ও পাকিস্তান। ১ জুলাই রাজ্য ষষ্ঠ জর্জের স্বাক্ষর পাবার সঙ্গে সঙ্গে বিলটি আইনে পরিণত হল। ১৯ জুলাই, ভারত ও পাকিস্তানের অস্থায়ী সরকার ঘোষিত হল। মাউন্টব্যাটেন ভারতের গভর্নর-জেনারেল হলেন, জিন্না হলেন পাকিস্তানর গভর্নর-জেনারেল। ভারত ও পাকিস্তানের অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রক প্রত্যাহার ও বিনিময়, আমলা বিনিময়, তদারকির জন্য পার্টিশন কাউন্সিল গঠনের কাজ সম্পন্ন হল। এই কাউন্সিলে কংগ্রেসের পক্ষে প্যাটেল ও রাজেন্দ্র প্রসাদ, লিগের পক্ষে জিন্না ও লিয়াকৎ রইলেন। রাজজি ও নিস্তার ছিলেন অতিরিক্ত বিকল্প সদস্য। এই কমিটি একটি স্টিয়ারিং কমিটির মাধ্যমে কাজ করেছে। মতবিরোধ এড়াতে সৃষ্টি হয়েছে সালিশি ট্রাইব্যুনাল। এরপর শুরু হল সৈন্যবাহিনী বিভাজনের কাজ এবং ব্রিটিশ সৈন্য অপসারণের কাজ। অসামরিক ব্রিটিশ কর্মচারীরাও বিদায় নিলেন। বহু বাঞ্ছিত স্বাধীনতা শেষপর্যন্ত এল। দেশ ভাগের অনিবার্যতা নিয়ে প্রশ্ন বা বিতর্কের অবসান কিন্তু ঘটেনি। স্বাধীনতার আগে ও পরের হিংসা, মৃত্যু, গৃহচ্যুতি ও উদ্বাস্তুর স্রোত, জনহস্তান্তর, সংখ্যালঘুর স্বার্থরক্ষা দেশভাগের এই করুণ পরিণতিকে সঙ্গে নিয়েই এগিয়ে চলেছে দুই দেশের সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক পুনর্বাসনের কাজ।

২১.৭ সারাংশ

রাজনৈতিক ঘটনাবলি ও শাসন সংস্কারের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৩৫ সাল ও তার পরবর্তীকালের একযুগের ইতিহাস ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের সুবাদেই প্রদেশগুলিতে সংসদীয় ও দায়িত্বশীল শাসন চালু হয়েছে। কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলিতে কৃষি, জনকল্যাণ, গ্রামীণ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছে। তবে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, কংগ্রেসের সাংগঠনিক ও কর্মপন্থাগত বিরোধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষপর্যন্ত শাসন সংস্কারের এই সমস্ত কর্মসূচির সাফল্যের অন্তরায় হয়েছে। যুদ্ধের পরিস্থিতিতে প্রাদেশিক স্বাতন্ত্রের নীতি আদৌ কার্যকর ছিল না। কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলিতে গভর্নরের (ছোটলাট) শাসন চালু হয়েছিল। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত হল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারকে সমর্থন করা হবে না। দাবি উঠল স্বায়ত্তশাসনের এবং গণপরিষদের। পরিস্থিতিকে সামাল দেওয়ার জন্য ১৯৪২ সালের ২৩ মার্চ ব্রিটিশ সরকার স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্‌কে পাঠালেন এ দেশের জন্য শাসন সংস্কারের কিছু নয়া প্রস্তাব কার্যকর করার জন্য। ক্রিপস্ প্রস্তাবে ভারতের জন্য নির্বাচিত এক সংস্থার মাধ্যমে সংবিধান প্রণয়ন, শাসন পরিষদে ভারতীয়দের গ্রহণ ও অন্যান্য কিছু শাসন সংস্কারের কথা বলা হলেও কংগ্রেসের কাছে এই প্রস্তাব অসন্তোষজনক মনে হয়েছে। অন্যান্য দলগুলিও প্রস্তাবটিকে সমর্থন করেনি। এদেশে ব্রিটিশ শাসনের উপযোগিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ভারত ছাড় আন্দোলনের প্রস্তাব ও প্রস্তুতি নেওয়া হল। প্রতিরোধ শক্তি, পদ্ধতি ও ব্যাপকতায় এই আন্দোলন পূর্বের সরকারবিরোধী সব আন্দোলনকে অতিক্রম করে গেছে।

একদিকে গণপ্রতিরোধ আন্দোলন, অন্যদিকে বিশ্বযুদ্ধের চাপ এই দু'য়ের মাঝে তৃতীয় শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হল দুর্ভিক্ষ, মহামারি ও মন্বন্তর। পরিস্থিতির মোকাবিলায় নতুন ভাইসরয় তথা বড়লাট ওয়াভেল হাজির করলেন এক নতুন সংস্কার পরিকল্পনা (জুন ১৯৪৫)। নতুন সংবিধান রচিত না হওয়া পর্যন্ত ভারতীয়দের নিয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন, শাসন বিভাগীয় পরিষদের ভারতীয়দের গ্রহণ (হিন্দু ও মুসলিমদের সমপ্রতিনিধিত্বসহ), বন্দিমুক্তি ইত্যাদি প্রস্তাব ওয়াভেল পরিকল্পনায় দেওয়া হল। ওয়াভেল প্রস্তাব নিয়েও বিতর্ক দেখা দেওয়াতে এবং ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও জটিল হওয়াতে ব্রিটিশ সরকার শঙ্কিত হয়ে পড়ে। নবনির্বাচিত শ্রমিক সরকারের পক্ষ থেকে পাঠানো হল লর্ড লরেন্স, স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ ও এ. ভি. আলেকজান্ডারকে নিয়ে গড়া

তিনসদস্যবিশিষ্ট ক্যাবিনেট মিশন। বিভিন্ন গোষ্ঠী ও দলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে ক্যাবিনেট মিশন সংস্কারের এক ব্যাপক কর্মসূচি পেশ করে ১৯৪৬ সালের ১৬ মে। ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনায় বলা হয় ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলিকে নিয়ে সমগ্র ভারতের এক ইউনিয়ন গঠন করে তার হাতে প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, যোগাযোগ এবং এই বিষয়গুলি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের ক্ষমতা দেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় আইনসভায় ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রতিনিধি থাকবে। আইনসভায় সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন নির্ধারণে প্রধান দুটি সম্প্রদায়ের সমর্থন নেওয়া হবে। গণপরিষদের মাধ্যমে ভারতের সংবিধান রচনা করা হবে। ক্ষমতা হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে এক অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হবে।

ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা অনুসারে গণপরিষদের নির্বাচন হয়েছে এবং নির্বাচনে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ উভয়েই সাফল্য পেয়েছে। কিন্তু গণপরিষদে শেষপর্যন্ত মুসলিম লিগ অংশ নেয় নি। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নানা বিতর্ক ও দ্বিধার পর মুসলিম লিগ অংশ নেয়। তবে অচিরেই পাকিস্তান গঠনের প্রশ্নে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়; প্রদেশে প্রদেশে সাম্প্রদায়িক আবহাওয়া বিষাক্ত হতে থাকে। ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি ক্ষমতা হস্তান্তর এবং ভারত বিভাজনের সরকারি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে এবং ঘোষণাটিকে কার্যকর করার জন্য লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ভাইসরয় করে ভারতে পাঠায়। ১৯৪৭ সালের জুন মাসে ভারতের রাজনৈতিক অচলাবস্থা অবসানের জন্য ঘোষিত হয় মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা। গণপরিষদ রচিত সংবিধান সমগ্র ভারতের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে না, সমস্যা সমাধানের জন্য গণভোটের মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ অঞ্চল ভারত বা পাকিস্তানে থাকার সিদ্ধান্ত নেবে, মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনায় এটিই স্থির হয়। কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ উভয় দলই এই পরিকল্পনাকে স্বীকার করে নেয়। ভারতের স্বাধীনতা ও এই সঙ্গে ভারত ব্যবচ্ছেদের পরিকল্পনা কার্যকর হয়।

২১.৮ অনুশীলনী

(১) সঠিক উত্তর বেছে নিয়ে বাক্যটি সম্পূর্ণ করুন ঃ

(ক) স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ ছিলেন, (i) ভারত সচিব, (ii) ব্রিটিশ মন্ত্রিসভায় সদস্য, (iii) ভাইসরয়।

(খ) ক্রিপস্ প্রস্তাব ‘ফেল পড়া ব্যাংকের আগাম চেক্’ বলেছেন (i) জিন্না, (ii) জওহরলাল নেহরু, (iii) গান্ধীজি।

(গ) ওয়াভেলের শাসন সংস্কারের প্রস্তাব ঘোষিত হয় (i) ৭ আগস্ট, ১৯৪২ (ii) ১৪ জুন, ১৯৪৫, (iii) ২৬ জানুয়ারি, ১৯৪৫।

(ঘ) ওয়াভেল প্রস্তাবে পাকিস্তান দাবি, (i) স্বীকৃত হয়নি, (ii) স্বীকৃত হয়েছে।

(ঙ) ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা অনুসারে ভারতে একটি অন্তর্বর্তী সরকার, (i) গঠিত হয়েছে, (ii) গঠিত হয়নি।

(চ) ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনা জারি হয়েছে, (i) ওয়াভেলের নির্দেশ, (ii) ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবে, (iii) প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলির ঘোষণায়।

(ছ) ভারতের শেষ ভাইসরয় (বড়লাট) ছিলেন, (i) ওয়াভেল, (ii) মাউন্টব্যাটেন, (iii) লিনলিথগো।

(জ) (i) মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনায়, (ii) ওয়াভেল প্রস্তাবে, (iii) ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনায় দুটি গণপরিষদের দাবি কার্যকর হয়।

(২) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(ক) গান্ধীজি—পত্রিকায় 'ভারত ছাড়' পরিকল্পনা ব্যক্ত করেন।

(খ) ক্যাবিনেট মিশনের তিন সদস্য ছিলেন — —, — — ও — — —।

(গ) ওয়াভেলের — — হল ভারতীয় নেতাদের শেষ চাপ বা ধাক্কা দেবার পরিকল্পনা।

(ঘ) ২৪ মার্চ — মাউন্টব্যাটেন ভারতের — হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন।

(ঙ) প্রধানমন্ত্রী — ৪ জুলাই, ১৯৪৭ ভারতীয় স্বাধীনতা বিল — পেশ করেন।

(৩) একটি বা দুটি বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন ঃ

(ক) ক্রিপস্ প্রস্তাব সম্পর্কে গান্ধীজির মন্তব্য কী ছিল?

(খ) আগস্ট প্রস্তাব কোন্ সালে কোথায় গৃহীত হয়?

(গ) ওয়াভেল প্রস্তাবের প্রথম ও প্রধান কথা কী ছিল?

(ঘ) কার উদ্যোগে ক্যাবিনেট মিশন ভারতে আসে?

(ঙ) মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনার দুটি উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব কী ছিল?

(৪) অনধিক ৫০টি শব্দের মধ্যে প্রশ্নগুলির উত্তর করুন ঃ

(ক) ক্রিপস্ প্রস্তাবের তিনটি মূল বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

(খ) ওয়াভেল পরিকল্পনার তিনটি প্রস্তাব উল্লেখ করুন?

(গ) অ্যাটলির স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে কী বলা হয়েছে?

(ঘ) মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনার মূল বিষয়বস্তু কী ছিল?

(৫) ১৫০টি শব্দের মধ্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন ঃ

(ক) ভারত ছাড় আন্দোলনের উপর একটি টীকা লিখুন।

(খ) ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার উপর একটি টীকা লিখুন।

(গ) মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা সম্পর্কে যা জেনেছেন সংক্ষেপে লিখুন।

(৬) বর্তমান পর্যায়ের বিভিন্ন এককগুলি পাঠ করে ১৮৫৮ থেকে ১৯৪৭ এই সময়কালের মধ্যে ব্রিটিশ সরকার প্রবর্তিত বিভিন্ন শাসন সংস্কার সম্পর্কে আপনি ধারাবাহিকভাবে কিছু ধারণা লাভ করেছেন। ব্রিটিশ সরকার প্রবর্তিত এই শাসন সংস্কারগুলির একটি তালিকা ক্রমপর্যায় অনুসারে প্রস্তুত করুন।

২১.৯ উত্তরমালা

(১) (ক) স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ ছিলেন ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার সদস্য।

(খ) ক্রিপস্ প্রস্তাব ফেলপড়া ব্যাঙ্কের আগাম চেক বলেছেন গান্ধীজি।

(গ) ওয়াভেলের শাসন সংস্কার প্রস্তাব ঘোষিত হয় ১৪ জুন, ১৯৪৫।

(ঘ) ওয়াভেল প্রস্তাবে পাকিস্তান দাবি স্বীকৃত হয়নি।

(ঙ) ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা অনুসারে ভারতে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়েছে।

(চ) ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনা জারি হয়েছে প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলির ঘোষণায়।

(ছ) ভারতের শেষ ভাইসরয় (বড়লাট) ছিলেন মাউন্টব্যাটেন।

(জ) মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনায় দুটি গণপরিষদের দাবি কার্যকর হয়।

(২) (ক) গান্ধীজি 'হরিজন' পত্রিকায় 'ভারত ছাড়' পরিকল্পনা ব্যক্ত করেন।

(খ) ক্যাবিনেট মিশনের নিত সদস্য ছিলেন লর্ড লরেন্স, স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ ও এ. ভি. আলেকজান্ডার।

(গ) ওয়াভেলের Break down Plan হল ভারতীয় নেতাদের শেষ চাপ বা ধাক্কা দেবার পরিকল্পনা।

(ঘ) ২৪ মার্চ, ১৯৪৭ মাউন্টব্যাটেন ভারতের বড়লাট হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন।

(ঙ) প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি ও ৪ জুলাই, ১৯৪৭ ভারতীয় স্বাধীনতা বিল কমন্সসভায় পেশ করেন।

(৩) (ক) ক্রিপস প্রস্তাব সম্পর্কে গান্ধীজির মন্তব্য ছিল এটি হল ফেলপড়া ব্যাঙ্কের আগাম চেক।

(খ) আগস্ট প্রস্তাব ১৯৪২ সালে বোম্বাইয়ে গৃহীত হয়।

(গ) ওয়াভেল প্রস্তাবের প্রথম ও প্রধান কথা ছিল ভারতের নতুন সংবিধান রচিত না হওয়া পর্যন্ত ভারতীয় নেতৃবর্গকে নিয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হবে।

(ঘ) ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলির উদ্যোগে ক্যাবিনেট মিশন ভারতে আসে।

(ঙ) মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনার দুটি উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব ছিল দেশ বিভাজন ও দুটি গণপরিষদের প্রস্তাব।

(৪) ব্রিটিশ সরকার প্রবর্তিত শাসন সংস্কারের তালিকা ঃ

সাল	আইন/সংস্কার
১৮৫৮	রানির ঘোষণা এবং ভারত শাসন আইন
১৮৬১	ভারতীয় পরিষদ আইন
১৮৯২	ভারতীয় পরিষদ আইন
১৯১৯	ভারত শাসন আইন (মন্ট-ফোর্ড বা মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড আইন) সংস্কার
১৯৩৫	ভারত শাসন আইন
১৯৪২	ক্রিপস্‌ প্রস্তাব
১৯৪৩	ওয়াভেল পরিকল্পনা
১৯৪৬	ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা
১৯৪৭ (২০ ফেব্রুয়ারী)	ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলির ঘোষণা
১৯৪৭ (৩ জুন)	মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা
১৯৪৭ (৪ জুলাই)	ভারতীয় স্বাধীনতা বিল

১৮.১০ গ্রন্থপঞ্জি

1. J. C. Johari: *Indian Government and Politics,* Vol-I (1996).
2. M. M. Singh: *From Raj to Republic A Retrospect* (1972).
3. R. P. Dutt : India Today (1947).
4. A. C. Banerjee : Constitutional History of India Vol. III (1978).
5. অমলেশ ত্রিপাঠী ঃ স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫-১৯৪৭)

ভূমিকা

এই পর্যায়ে ভারতের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রারম্ভিক কিছু আলোচনা স্থান পেয়েছে। ভারতে সংবিধান রচনার উদ্যোগ, এদেশের রাষ্ট্রকাঠামো, নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য, রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি ও সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ধারণা শিক্ষার্থী পাঠক এই পর্যায়ের আলোচনা থেকে লাভ করতে পারবেন। এই পর্যায়ের এককগুলির বিষয়বস্তু নিম্নরূপ ঃ

২২তম এককে স্বাধীন ভারতবর্ষের নতুন সংবিধান রচনার প্রয়াস ও এক্ষেত্রে গণপরিষদের উদ্যোগে কী কী কাজকর্ম হয়েছে সে বিষয়ে শিক্ষার্থী অবগত হতে পারবেন। একটি স্বাধীন দেশের যাত্রা শুরু হয় নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ জাতিকে পরিচালনার জন্য কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ ও তাদের জন্য নানা কল্যাণকর কর্মসূচি গ্রহণের মধ্য দিয়ে; সংবিধান রচনার মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষে এই কাজটি প্রাথমিক ভাবে শুরু হয় বলা যায়। গণপরিষদের সৃষ্টি, গঠন ও গণপরিষদের বিভিন্ন সভায় গৃহীত প্রস্তাব, সংবিধান খসড়া কমিটি গঠন, খসড়া সংবিধান পেশ—বর্তমান এককের আলোচনায় এইসব কৌতূহলজনক বিষয়ের উপর শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

২৩তম এককে ভারতবর্ষের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন কাঠামো, এদেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতা বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনা থেকে শিক্ষার্থী বুঝতে পারবেন যুক্তরাষ্ট্রের চিরাচরিত ও প্রচলিত ধারা আমাদের দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তবে কেন্দ্রপ্রবণ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলেও সংবিধান প্রণেতারা সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রের ধারণাকে একেবারে অস্বীকার করেননি।

২৪তম এককে আছে, ভারতীয় সংবিধানে লিপিবদ্ধ নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য এবং রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি মস্পর্কে আলোচনা। মৌলিক অধিকার ও নির্দেশমূলক নীতির মধ্যে তুলনা করলে শিক্ষার্থীরা এদের আইনগত, সামাজিক অবস্থান এবং সাংবিধানিক তাৎপর্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

২৫তম এককে ভারতের সংবিধানের সংশোধন প্রণালী বা পদ্ধতির পরিচয় দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের স্থায়িত্ব ও পবিত্রতার কথা বিচার করে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধনের বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করা হলে সামগ্রিক বিচারে ভারতের সংবিধান নমনীয়।

একক ২২ ❑ ভারতের নতুন সংবিধান রচনার উদ্যোগ

গঠন

২২.০ উদ্দেশ্য
২২.১ প্রস্তাবনা
২২.২ মূল আলোচনা
২২.৩ গণপরিষদের ধারণা ও গণপরিষদ সৃষ্টির পটভূমি
২২.৪ গণপরিষদের গঠন
২২.৫ গণপরিষদের কার্যাবলি
২২.৬ গণপরিষদের কাজকর্মের মূল্যায়ন
২২.৭ সারাংশ
২২.৮ অনুশীলনী
২২.৯ উত্তরমালা
২২.১০ গ্রন্থপঞ্জি

২২.০ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করলে আপনি

- স্বাধীন ভারতবর্ষে সংবিধান রচনার প্রয়োজন বা তাৎপর্য কী তা বুঝতে পারবেন;
- গণপরিষদ সৃষ্টির পটভূমিটি জানতে পারবেন;
- গণপরিষদের গঠনপ্রকৃতি ও কার্যাবলি বিষয়ে ধারণা লাভ করতে পারবেন;
- গণপরিষদের গঠনপ্রণালী ও কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের মতামত যাচাই করতে পারবেন এবং এ সম্পর্কে আপনার স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করতে পারবেন।

২২.১ প্রস্তাবনা

শাসনতন্ত্র বা সংবিধানকে দেশের সর্বোচ্চ আইন, মৌলিক আইনের মর্যাদা দেওয়া হয়। দেশের শাসনব্যবস্থাকে সুনিশ্চিত করতে, নাগরিক অধিকারকে সুনিশ্চিত করতে, সরকার ও নাগরিকের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে অধিকাংশ দেশই সাংবিধানিক শাসনের ধারণাকে মর্যাদা দেয়। ভারতবর্ষও এর ব্যতিক্রম নয়। সংবিধান রচনার প্রস্তুতি কর্মের মধ্য দিয়েই স্বাধীন ও নতুন ভারত গঠনের প্রাথমিক উদ্যোগ লক্ষ করা গেল। বর্তমান পাঠে সংবিধান রচনার এই উদ্যোগ পর্ব সম্পর্কেই আপনারা পরিচিত হতে পারবেন। প্রথম পর্যায়ের বিভিন্ন এককগুলি পাঠ করে আপনারা জেনেছেন ১৮৫৭ সালের পর থেকেই ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে পালাবদলের সূচনা হয়। সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭) ইংরেজ শাসককে ভারতের শাসন পদ্ধতি সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে। এরই ফলশ্রুতি ভারত শাসনের উৎকর্ষ বিধিব্যবস্থা। কোম্পানির শাসনে ছেদ পড়ল, রাজশক্তির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হল, আইন প্রণয়নে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির ব্যবহার লক্ষ করা গেল এবং শাসন সংস্কারের নানা পরিস্থিতি সৃষ্টি হল। ভারত শাসন আইন (১৯১৯), সাইমন কমিশন (১৯২৭), নেহরু প্রস্তাব (১৯২৮), ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন, কংগ্রেস প্রস্তাব (১৯৪২), ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা (১৯৪৬), মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা (১৯৪৭), সব কিছুই ঔপনিবেশিক শাসকের নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক ও স্বাধীন ভারতবর্ষের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির সহায়ক।

ক্ষমতা হস্তান্তর শুরু হবার আগেই গণপরিষদ সৃষ্টি হল এবং স্বাধীন ভারতবর্ষের জন্য সংবিধান রচনার প্রয়াস শুরু হল।

বর্তমান এককে সংবিধান রচনার এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টিকেই উন্মোচন করা হয়েছে। এই পাঠের প্রথমেই গণপরিষদ সম্পর্কে শিক্ষার্থী কিছু ধারণা লাভ করতে পারবেন। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের নানা কর্মসূচী ও জাতীয় নেতাদের ভাবনা-চিন্তার মধ্যেই গণপরিষদের দাবি ছিল। ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনায় দাবিটি গৃহীত হলেও কিপসের প্রস্তাবে দাবিটির সমর্থন ছিল। এই অংশের আলোচনায় সমকালের জাতীয় কংগ্রেসের রাজনীতিও গণপরিষদের সম্পর্কটি শিক্ষার্থী পাঠক অবশ্যই লক্ষ্য করবেন।

গণপরিষদের গঠন পদ্ধতি প্রতিনিধিত্বের রূপ ও নেতৃত্ব সম্পর্কে আলোচনাটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এই আলোচনা থেকে গণপরিষদের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।

এই এককের শেষ অংশে ভারতীয় গণপরিষদের কার্য সম্পাদন, কার্য পরিচালনা ব্যবস্থা এবং গণপরিষদে গৃহীত আদর্শ ও নীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। গণপরিষদের কার্য-পরিচালনা, আদর্শ বা প্রস্তাব নিয়ে নানা বিতর্ক আছে, সমালোচনা আছে। এই বিতর্ক ও সমালোচনা থেকে শিক্ষার্থী গণপরিষদ সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা তৈরি করে নিতে পারবেন।

২২.২ মূল আলোচনা

স্বাধীন ভারতে সংবিধান রচনার উদ্যোগ নিঃসন্দেহে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ভারতবর্ষের সংবিধানকে অনেকেই ব্রিটিশ উত্তরাধিকার বা ব্রিটিশ শাসকের দান হিসেবে দেখাতে চালেও এটাই ঘটনা যে, স্বাধীন ভারতের সংবিধান একটি স্বাধীন জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চিন্তা-চেতনারই মূর্ত প্রকাশ। এই সংবিধানকে সামনে রেখেই স্বাধীন ভারতের নতুন করে শুরু করা ও এগিয়ে চলার শুভ সূচনা হয়েছে। যে অর্থেই সংবিধানকে দেখা হোক না কেন বা সংবিধান সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গি থাকুক না কেন (কেউ কেউ সংবিধানকে শুধুমাত্র আইনগত দৃষ্টিতেই বিচার করেন, আবার কেউ কেউ সংবিধান বলতে সব ধরনের নিয়মাবলিকেই বোঝেন) সংবিধানের উদ্দেশ্য বা তাৎপর্য নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই, কোনও তত্ত্ব, আবেগ, ইতিহাস বা অনুকরণের পথে না গিয়ে সাধারণ উদ্দেশ্য বা বোধকে সামনে রেখে সংবিধানকে বিচার করে আমরা বলতে পারি স্বাধীন ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক, দায়িত্বশীল, নিয়ন্ত্রিত শাসনের স্বার্থেই একটি সংবিধানের প্রয়োজন ছিল। শাসন পরিচালনার নীতি এবং সরকারের দায়িত্ব-কর্তব্যকে স্থির করে দেওয়ার সাথে সাথে নাগরিক অধিকার সুরক্ষার ব্যাপারটিও সুনিশ্চিত করে সংবিধান। শুধুমাত্র লিখিত দলিল হিসেবেই নয়, ভারতের মতো দেশে সংবিধান সামাজিক মূল্যবোধ, জন-নৈতিকতা ও দেশ গঠনের উৎসাহ বা শক্তিও বটে। ক্ষমতা হস্তান্তর বা স্বাধীনতা লাভের পর তাই সংবিধান রচনার কাজেই উৎসাহ, উদ্যোগ লক্ষ করা গেল। এদেশের জননেতা ও জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে। সংবিধান রচনার জন্য সৃষ্টি হল গণপরিষদ (Constituent Assembly)। আসুন এবার আমরা এই গণপরিষদ সৃষ্টির পটভূমিটি বিচার করি।

২২.৩ গণপরিষদের ধারণা ও গণপরিষদ সৃষ্টির পটভূমি

সাধারণ অর্থে গণপরিষদ হল সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে মিলিত নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের এক সভা বা সংস্থা। আরও ব্যাপক অর্থে গণপরিষদ হল জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত জনপ্রিতিনিধিদের সেই সংস্থা যার কাজ হল দেশের মানুষের জন্য নবজীবন পদ্ধতির এক সংহিতা রচনা। এর মধ্যে একই সঙ্গে প্রতিফলিত হবে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের আদর্শ আর জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা। মার্কিন যক্তরাষ্ট্রের সাংবিধানিক কনভেনশেন, (Constitutional Convention), ফ্রান্সের জাতীয় কনভেনশন (National Convention) অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে নিজেদের দেশের জন্য সংবিধান রচনার উদ্দেশ্য নিয়েই গড়ে উঠেছিল। উভয় দেশেই বিপ্লব (বুর্জোয়া বিপ্লব),

গণসংগ্রাম ও গণতান্ত্রিক আদর্শের ভাবনাকে রূপ দিতেই নতুন সংবিধান রচনার উদ্যোগ লক্ষা করা যায়। ভারতবর্ষে পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক দেশগুলির মতোই স্বাধীনতা সংগ্রামের অভিজ্ঞতা এবং দেশ পরিচালনায় নতুন ভাবনায় প্রভাবিত হয়েছেন গণপরিষদের সদস্যরা।

ভারতের গণপরিষদ গঠনের সঙ্গে এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের যোগটি লক্ষণীয়। গণপরিষদ গঠনের দাবিটি স্বরাজ ও স্বাধীনতার ভাবনার পরিপূরক হিসেবেই এসেছে। ১৯০৬ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ‘স্বরাজ’ সংক্রান্ত যে প্রস্তাব প্রকাশ করে সেই প্রস্তাবে গণপরিষদের দাবি ছিল। ১৯২২ সালে গান্ধীজি তাঁর ‘Young India’ পত্রিকায় ভারতীয় গণপরিষদের অনিবার্যতার কথা ঘোষণা করলেন : ‘স্বরাজ বা স্বাধীনতা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের দান হিসাবে আসবে না, ভারতের আত্মসত্তার পরিপূর্ণ অনুভূতির এটি এক অভিব্যক্তি (“Swaraj will not be free gift of the British Parliament; it will be a declaration of India’s full self-expression.”—Mahatma Gandhi)। ভারত শাসন আইনে (১৯৩৫) বাইরের হস্তক্ষেপ ছাড়াই ভারতীয় জনগণের দ্বারা সংবিধান রচনার দাবি গৃহীত হয়নি। ১৯৩৫ সালে জাতীয় কংগ্রেস আনুষ্ঠানিক ভাবে এই দাবি তুলেছিল। ১৯৩৮ সালে জওহরলাল নেহরু সুস্পষ্টভাবে গণপরিষদের দাবি পেশ করে জানালেন, জাতীয় কংগ্রেস স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রিকরণের পক্ষে। কংগ্রেসের প্রস্তাব হল বাইরের হস্তক্ষেপ ছাড়াই সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত একটি গণপরিষদের দ্বারা স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচিত হবে (“The National Congress stands for independence and demoratic state. It has proposed that the Constitution of free India must be framed, without outside interference, by a Constituent Assembly elected on the basis of adult franchise”—Jawaharlal Nehru)। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি (Congree Working Committee) ১৯৩৯ সালে বিষয়টি আবার উত্থাপন করে। ১৯৩৭ সালে বিভিন্ন প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইনসভায়, ১৯৩৬ সালে ফৈজপুর সম্মেলন এবং ১৯৪০ সালে রামগড় সম্মেলনে কংগ্রেস স্বরাজ ও গণপরিষদের দাবি তুলেছে। হরিপুরা, ত্রিপুরী বা পরবর্তীকালে সিমলা সম্মেলনেও (১৯৪৫) বিদেশি হস্তক্ষেপ ছাড়াই দেশের জনগণের দ্বারা রচিত এক সংবিধানের ভাবনা ব্যক্ত হয়েছে।

১৯৪২ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল (Winston Churchill) তাঁর ক্যাবিনেটের বিশিষ্ট মন্ত্রী স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে (Sir Stafford Cripps) ভারতে পাঠন গণপরিষদের একটি প্রস্তাব দিয়ে। প্রস্তাবে বলা হয় : (১) ভারতের সংবিধান ভারতের জনসাধারণ দ্বারা নির্বাচিত গণপরিষদের দ্বারা রচিত হবে। (২) এই সংবিধান ভারতকে ডোমিনিয়ন মর্যাদা দেবে। (৩) প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য নিয়ে একটি ভারতীয় ইউনিয়ন গঠিত হবে। (৪) যদি কোনও প্রদেশ এই সংবিধান গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক হয় তবে ঐ প্রদেশ পৃথক ব্যবস্থার জন্য ব্রিটিশ সরকারের সাথে যুক্তি করতে পারে।

প্রান্তলিপি ঃ ডোমিনিয়ন (dominion) হল এক কথায় অধিরাজ্য। ব্রিটিশের উপনিবেশ হলেও ভারত স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করেছে, নিজস্ব সংবিধান প্রণয়ন ও গ্রহণের অধিকার পেয়েছে। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে চুক্তি করে কমনওয়েলথভুক্ত হবার অধিকার পেয়েছে।

ক্রিপস্ প্রস্তাব নিয়ে এদেশের দুটি দল—কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ একমত হতে পারে নি। মুসলিম লিগ স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্র এবং এই রাষ্ট্রের জন্য পৃথিক গণপরিষদ দাবি করে। ইতিমধ্যে জনবিক্ষোভ, নৌবিদ্রোহ ইত্যাদি আভ্যন্তরীণ প্রতিকূল পরিস্থিতি এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পটভূমিতে উদ্ভূত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দিকে চেয়ে ব্রিটিশ সরকার তার ভারত-নীতি সম্পর্কে নতুনভাবে ভাবনা-চিন্তা শুরু করে। ব্রিটেনের শ্রমিক দলের সরকার ক্রিপস্ প্রস্তাব প্রত্যাহার করে ক্ষমতা হস্তান্তর ও গণপরিষদ সংক্রান্ত নতুন সরকারি নীতি কার্যকর করার জন্য ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে ক্যাবিনেট মিশন (Cabinet Mission) নামে একটি দলকে ভারতে পাঠায়। প্রায় দু’মাস ধরে কংগ্রেস, মুসলিম লিগ ও অন্যান্য দলের নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে ক্যাবিনেট মিশন আপস-মীমাংসার এক পথ গ্রহণ করেন। ১৬ মে প্রকাশিত ক্যাবিনেট মিশন পারিকল্পনায় ভারতকে অবিভক্ত রেখে ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যসমূহকে নিয়ে সমগ্র ভারতের এক ইউনিয়ন গঠন ও এর হাতে বিদেশ, প্রতিরক্ষা ও যোগাযোগ—

এই তিনটি ক্ষমতা দেওয়ার প্রস্তাব হয়। প্রস্তাবে আরও বলা হয় কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগ ও আইনসভায় ব্রিটিশ-ভারত ও দেশীয় রাজ্য উভয়েরেই প্রতিনিধি থাকবে, আইন সভায় কোনও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নির্ধারণে দেশের দুটি প্রধান সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠের উপস্থিতি ও সমর্থন প্রয়োজন। প্রস্তাবের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল প্রদেশগুলির হাতে আইনগত ও পরিচালনাগত ক্ষমতা অর্পণ। গণপরিষদ সম্পর্কে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব ছিল গণপরিষদের মাধ্যমেই এদেশের ভবিষ্যৎ সংবিধান রচিত হবে এবং গণপরিষদের সদস্যর প্রাদেশিক বিধান সভায় নিজ নিজ সম্প্রদায় দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হবেন। সব দলের প্রতিনিধি নিয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার (Interim Government) গঠিত হবে ক্ষমতা হস্তান্তর ব্যবস্থাকে দ্রুত কার্যকর করার জন্য।

ব্রিটিশ সরকার পরবর্তীকালে ক্ষমতা হস্তান্তর ও সেই সঙ্গে ভারত বিভাজনের নীতিকে কার্যকর করার প্রস্তাব করে মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা অনুসারে (৬ জুন, ১৯৪৭)। এই পরিকল্পনায় ভারত ও পাকিস্তান পৃথক ডোমিনিয়নের মর্যাদা পেল এবং উভয় দেশের জন্য পৃথক গণপরিষদের অধিকারও স্বীকৃতি পেল। এই প্রস্তাব আইনের রূপ পেল ১৯৪৭ সালে জুলাই মাসে ভারতীয় স্বাধীনতা আইনে (The Indian Independence Act, 1947)। আইনটি কার্যকর হল ১৫ আগস্ট।

১৯৪৬ সালে অবিভক্ত গণপরিষদের নির্বাচন ও গঠনের কাজ শুরু হলেও এই পর্বে গণপরিষদের কাজকর্ম শুরু হয়ে গেলেও, মুসলিম লিগ ঐক্যবদ্ধ গণপরিষদের কাজে তেমনভাবে অংশ নেয়নি। ভারত বিভাজনের পর ডোমিনিয়ন ভারতে ভারতীয় জনগণের পক্ষে ভারতের গণপরিষদ নতুন সংবিধান রচনার দায়িত্ব নেয়। সংবিধান রচনার কাজ শেষ হলে ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর ভারতীয় জনগণের পক্ষে নতুন সংবিধান গণপরিষদ গ্রহণ করে। আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের সংবিধান ১৯৫০ সালের ২৬ নভেম্বর ভারতীয় জনগণের পক্ষে নতুন সংবিধান গ্রহণ করে। আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের সংবিধান ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে কাজ শুরু করে।

এবার গণপরিষদের গঠন নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

২২.৪ গণপরিষদের গঠন

সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে সৃষ্ট ভারতের গণপরিষদের গঠন প্রণালী কেমন হবে সে ব্যাপারে প্রথম প্রস্তাব পাওয়া গেল ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনায়। জাতীয় কংগ্রেসের দাবিমতো সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণপরিষদ গঠনের নীতি ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনায় গৃহীত হয়েছিল। ক্যাবিনেট মিশন গণপরিষদের গঠনকার্য বিলম্বিত হোক চায়নি। প্রত্যক্ষ নির্বাচনের পরিবর্তে প্রাদেশিক আইন সভার সদস্যদের দ্বারা পরোক্ষ পদ্ধতিতেই গণপরিষদের সদস্যরা নির্বাচিত হবেন বলে স্থির হয়। প্রতিনিধিত্ব ও আসন বণ্টনের যেসব নীতি ক্যাবিনেট মিশন স্থির করেছিল তা নিম্নরূপ ঃ

(১) ব্রিটিশ শাসিত প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্যগুলির জনসংখ্যার অনুপাতে গণপরিষদে আসন পাবে। প্রতি দশ লক্ষ জনসংখ্যার জন্য প্রত্যেক প্রদেশ একজন করে প্রতিনিধি গণপরিষদে পাঠাতে পারবে।

(২) গণপরিষদের সব আসন সাধারণ, মুসলমান ও শিখ—এই তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে আনুপাতিক হারে বণ্টিত হবে।

(৩) প্রাদেশিক আইনসভাগুলির সদস্যরা একক হস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন।

(৪) দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতিনিধি মনোনয়নের পদ্ধতি স্থির হবে গণপরিষদ ও দেশীয় রাজ্যের শাসকদের মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে। দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধির সংখ্যা স্থির হয় ৯৩। ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব অনুসারে অবিভক্ত ভারতের গণপরিষদের প্রতিনিধি সংখ্যা ছিল এই রকম ঃ

মোট সদস্য	প্রদেশগুলির সদস্য			চিফ কমিশনার শাসিত প্রদেশগুলির সদস্য	দেশীয় রাজ্যগুলির সদস্য
	সাধারণ	মুসলিম	শিখ		
৩৮৯	২১০	৭৮	৪	৪	৯৩

ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে গণপরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রদেশগুলির ২৯২ ও চিফ কমিশনার শাসিত ৪টি প্রদেশের (দিল্লি, আজমীঢ়-মেড়ওয়াড়া, কুর্গ ও ব্রিটিশ বালুচিস্থান) ২টি প্রতিনিধির জন্য নির্বাচন হয়। দিল্লি ও আজমীঢ়-মেঢ়ওয়াড়া থেকে কেন্দ্রীয় আইনসভায় যে ২জন প্রতিনিধি ছিলেন তাঁরা গণপরিষদে ঐ অঞ্চলের প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকৃতি পান। প্রদেশগুলির ২৯২টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ২০৮, মুসলিম লীগ ৭৩ ও অন্যান্য দল বাকি আসন লাভ করে। অবিভক্ত গণপরিষদে কংগ্রেসর সদস্য সংখ্যার শতকরা হিসেব ছিল ৬৯%।

দেশবিভাগের পর স্বতন্ত্র ভারতীয় গণপরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল ২৯৯। এঁদের মধ্যে ২২৯ জন ছিলেন প্রদেশগুলির প্রতিনিধি এবং ৭০ জন দেশীয় রাজ্যের (Princely States) প্রতিনিধি। ভারতীয় গণপরিষদেও কংগ্রেসের আসনের শতকরা ভাগ ছিল ৮২%। ভারত বিভাগের পর মুসলিম লিগের ৭৩ জন সদস্যের মধ্যে ২৯ জন এদেশে ছিলেন। গণপরিষদ গঠনের পর প্রায় চার মাসের অধিক সময় কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের মধ্যে মতানৈক্যের কারণে গণপরিষদের অধিবেশন বসেনি। অবশেষে ১৯৪৬ সালের ৯ ডিসেম্বর দিল্লির কনস্টিটিউশন হলে গণপরিষদের অধিবেশন বসল। এই অধিবেশনে ২০৭ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। মুসলিম লিগের সদস্যরা এই সভা বর্জন করেছিলেন। কংগ্রেসের বয়োঃজ্যেষ্ঠ সদস্য সচ্চিদানন্দ সিংহকে (Sachadinanda Sinha) অস্থায়ী সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন। ১১ ডিসেম্বর ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ (Dr. Rajendra Prasad) গণপরিষদের স্থায়ী সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন। ১২ ডিসেম্বর সভার কার্যবিধি সংক্রান্ত কমিটি (Committee on Rules of Procedure) গঠিত হল। এই কমিটির সদস্য ছিলেন ১৬ জন। কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সদস্যরা ছিলেন ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ, জগজীবন রাম (Jagjivan Ram), এ. কে. আইয়ার (A. K. Ayyar), রফি আহমদ্ কিদোয়াই (Rafi Ahmed Kidwai), এন. জি. আয়েঙ্গার (N. G. Ayyangar), পুরুষোত্তম দাস ট্যান্ডন (Purushottam Das Tandon), গোপীনাথ বরদোলুই (Gopinath Bardoli), পট্টভি সিতারামাইয়া (Pattabhi Sitaramayya), কে. এম. মুন্সী (K. M. Munshi) প্রভৃতি। অবিভক্ত ভারতের গণপরিষদ এর পর আরও তিনিটি অধিবেশনে মিলিত হয়েছে। এই অধিবেশনের সংবিধান সম্পর্কিত কোনও বিতর্ক বা প্রস্তাব হয়নি। তবে গণপরিষদের আরও কিছু কমিটি গঠনের কাজ এই সব অধিবেশনে সম্পন্ন হয়েছে। কার্যনির্বাহক কমিটি (Steering Committee), কেন্দ্রীয় ক্ষমতা সংক্রান্ত কমিটি (Union Power Committee), উপদেষ্টা কমিটি (Advisory Committee), কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত কমিটি (Union Constitution Committee), প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র সংক্রান্ত কমিটি (Provincial Constitutitional Committee), রাজ্য বিষয়ক কমিটি (States Committee)—এই ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ কমিটি এই সময় গঠন করা হয়েছে। এ ছাড়াও এই পর্বে মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত উপসমিতি (Fundamental Rights Sub-Committee) ও সংখ্যালঘু সম্পর্কিত উপসমিতি (Minorities Sub-committee) নামে দুটি উপদেষ্টা কমিটিও গঠিত হয়েছে। মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা ও ভারতের স্বাধীনতা আইন ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে গণপরিষদের গঠন পরিকল্পনায় তেমন কিছু পরিবর্তন না হলেও দেশ বিভাগ ও পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের পর গণপরিষদের সদস্য সংখ্যা হ্রাস পায় এবং ভারতের গণপরিষদ সার্বভৌম ক্ষমতা লাভ করে। গণপরিষদের পঞ্চম অধিবেশনে ১৯৪৭ সালে ১৪ আগস্ট মধ্যরাত্রে এই অধিবেশন বসে) স্বাধীন ভারতের জনগণের পক্ষে প্রধানত কংগ্রেস দলের নেতৃত্বে গণপরিষদের প্রয়োজনীয় পুনির্বন্যাস ও সংবিধান রচনার নব উদ্যোগ লক্ষ করা গেল। নেহরু অন্তর্বর্তীকালীন ভারত ডোমিনয়নের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হলেন। পূর্বের কমিটিগুলিকে বহাল রেখে এগুলির নব উদ্বোধন ঘটানো হল। গণপরিষদকে আইনসভার দায়িত্ব দান ও সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হল। এই কমিটির প্রতিবেদন

মতো গণপরিষদ একই সঙ্গে আইনসভার মর্যাদা পেল এবং সংবিধান রচনার দায়িত্ব পেল। গণপরিষদের পক্ষে সংবিধান রচনার দায়িত্ব নিল একটি নতুন কমিটি। এই কমিটি সংবিধান খসড়া কমিটি নামে পরিচিত হল। কমিটির সভাপতির দায়িত্ব নিলেন ড. বি. আর. আম্বেদকর। সংবিধান খসড়া কমিটি (Drafting Committee) অন্যান্য সদস্যরা হলেন বি. এল. মিত্র, এন. জি. আয়েঙ্গার, এ. কে. আয়ার, কে. এম. মুন্সী, মহম্মদ সাহদুল্লা, এন. মাধব রাউ, ডি. পি. খৈতান, টি. টি. কৃষ্ণমাচারী। এঁদের মধ্যে বি. এল. মিত্রের সদস্যপদ বাতিল হয় এবং ডি. পি. খৈতানের মৃত্যু হয়।

গণপরিষদের গঠন পদ্ধতির দিকে দৃষ্টি দিলে শিক্ষার্থী পাঠকেরা এর কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন ঃ

১। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তত্ব ও পদাধিকারীরাই ছিলেন গণপরিষদের প্রভাবশালী শক্তি। সর্বভারতীয় নেতৃবর্গের মধ্যে ছিলেন নেহরু, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, বল্লভভাই প্যাটেলের মতো ব্যক্তি, যাঁরা সবাই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন। অন্যান্য বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা যাঁরা গণপরিষদের কাজে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন গোবিন্দ বল্লভ পন্থ, জগজীবন রাম, জে. বি. কৃপালনী, পট্টভি সীতারামাইয়া, সি. রাজাগোপালাচারী। গণপরিষদের বিভিন্ন কমিটিতে নেহরু, প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও মৌলানা আজাদের মতো ব্যক্তিরাই হয় সভাপতি অথবা সদস্য হিসেবে ছিলেন। সবচেয়ে লক্ষণীয় ব্যাপার হল একই ব্যক্তি দুই বা ততোধিক কমিটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

২। নানা বৃত্তি, পেশা, শ্রেণি, সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব গণপরিষদে ছিল। এটি অবশ্যই গণপরিষদের সর্বজনীন চরিত্রের প্রকাশ। ড. বি. আর. আম্বেদকরের মত আইনজ্ঞ ও হরিজন সদস্য, শাহদুল্লার মতো বিশিষ্ট মুসলিম নেতা, বি. এন. রাউ-এর (B. N. Rau) মত সাংবিধানিক উপদেষ্টা, এন. জি. আয়েঙ্গারের মতো প্রশাসক, রাজকুমারী অমৃত কাউর, সরোজিনী নাইডুর মতো মহিলা ব্যক্তিত্ব, এ. কে. আইয়ার, এইচ. এন. কুঞ্জরু, এন. জি. আয়েঙ্গারের মতো অভিজ্ঞ আইনজ্ঞ ও শিক্ষাবিদের উপস্থিতি গণপরিষদের মর্যাদা বাড়িয়েছে। আদিবাসী, মাড়োয়ারি, শিখ, খ্রিস্টান, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ও পারসি সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নিয়েই গণপরিষদ চলেছে।

৩। কংগ্রেসের প্রভাবশালী নেতা, ভাইসরয়ের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য, প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, প্রাদেশিক মন্ত্রী, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য, নানা বৃত্তি ও পেশাজীবী মানুষ, সাংবাদিক, চিকিৎসক, আইনজ্ঞ, লেখক ও কত বিশিষ্ট মানুষের ভিড়ে গণপরিষদ ছিল রীতিমতো জমজমাট এক সভা। এতসব সত্ত্বেও গণপরিষদ প্রকৃত গণসংস্থার চরিত্র পায়নি। কংগ্রেস দলই দেশের সব মানুষের প্রতিনিধি হতে পারে না। দেশের প্রায় এক-চতুর্থাংশ মানুষে প্রতিনিধি গণপরিষদের প্রথম সভায় অনুপস্থিত ছিলেন, মুসলিম লিগ এই সভা বর্জন করায় গান্ধীজি গণপরিষদের সার্বভৌমত্ব মানতে রাজি ছিলেন না। সমাজতন্ত্রী, কমিউনিস্ট বা হিন্দু মহাসভার সরকারি প্রতিনিধি ছিল না। কংগ্রেস দলের সদস্যরাই সভার আলোচনায় কখনও সমর্থক আবার কখনও সমালোচকের ভূমিকা নিয়েছেন।

৪। গণপরিষদের নেতৃত্বের প্রকৃতি বিচার করলে দেখা যাবে কংগ্রেস দলের নেতা, সরকারের নেতা আর গণপরিষদের নেতা এঁরা যেন একটা ত্রিভুজের মতো পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ এক ব্যবস্থার অঙ্গ। সরকার যদি এই ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু হয়, তবে কংগ্রেস আর গণপরিষদ হল তার ভিত্তি। একই ব্যক্তি যিনি সরকারের প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্বে আছেন, তিনিই আবার কংগ্রেসের নেতা এবং গণপরিষদের নেতা। গণপরিষদে কংগ্রেস দলের সরকারি শাখার যতটা প্রভাব তুলনামূলকভাবে দলীয় শাখার ততটা প্রভাব নেই।

৫। গণপরিষদের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে অনেকেই সংশয় প্রকাশ করেছেন। যেভাবে গণপরিষদ গঠিত হবে

প্রত্যাশা ছিল তা মেটেনি। সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এর নির্বাচন হয়নি। গণপরিষদের প্রতিনিধিদের সামাজিক ভিত্তি কি, সমাজের কোন্ অংশ থেকে এঁরা এসছেন এটাও বিচার্য। আইনবিদ, প্রশাসক, শিল্পপতি, বা বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত রাজনীতিবিদগণ সাধারণ জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি। দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিরা গণপরিষদের গণতান্ত্রিক অবস্থানের বিরোধী—এরা রক্ষণশীল, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির অনুকূলেই কাজ করেছেন।

এবার সংক্ষেপে গণপরিষদের কাজকর্ম ও সংবিধান রচনায় এর ভূমিকা নিয়ে আমরা আলোচনা করবো।

২২.৫ গণপরিষদের কার্যাবলি

অনেকটা আইনসভার মতোই ছিল গণপরিষদের কার্যপদ্ধতি। আইনসভার মতোই বিভিন্ন সময়ে সভার অধিবেশন আহ্বান, একজন বয়োঃজ্যেষ্ঠ সদস্যকে অস্থায়ী সভাপতি করে সভার প্রথম অধিবেশন শুরু, একজন স্থায়ী সভাপতি নির্বাচন, বিভিন্ন কমিটি গঠন, সভা পরিচালনার নিয়ম-নীতি নির্ধারণ, বিতর্ক ও আলোচনা এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ—অবিভক্ত ভারতবর্ষে গণপরিষদের কাজকর্ম এই ভাবেই শুরু হয়েছে। আইন সভায় যেমন ক্যাবিনেটই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয় এবং সভার অনুমোদন নেয়, গণপরিষদের সিদ্ধান্তের অধিকাংশই পেশ হত কংগ্রেসের প্রভাবশালী নেতাদের দ্বারা। ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত আলোচনা ও বিতর্কের পরে গণপরিষদের অনুমোদিত হত।

ভারতের গণপরিষদ প্রাথমিকভাবে একটি জনমঞ্চ (Public Forum) হিসেবেই কাজ করেছে। জনমঞ্চ হিসেবে গণপরিষদ প্রধানত দুটি দায়িত্ব পালন করেছে। এর একটি হল কমিটির মাধ্যমে কার্য পরিচালনা এবং দ্বিতীয়টি, উদ্দেশ্য সংক্রান্ত প্রস্তাব পেশ। গণপরিষদের প্রথম চারটি অধিবেশনে পরিষদের কাজকর্ম কীভাবে চলবে, বিভিন্ন স্তরে সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ কীভাবে হবে, কোন্ কোন্ ক্ষেত্র গুরুত্ব পাবে, কীভাবে দায়িত্ব বণ্টন হবে এই সব প্রশ্নের বিচার-বিবেচনা করতেই গণপরিষদ ব্যস্ত ছিল। বিভিন্ন কমিটির মধ্যে কর্তব্য বণ্টন করে দেওয়া হয়। কতকগুলি কমিটির কাজ ছিল সভার কার্যপ্রণালীগত বিষয়গুলির দিকে দৃষ্টি দেওয়া। এই সব কমিটিগুলি হল সভার কার্যবিধি সংক্রান্ত কমিটি, কার্যনির্বাহক কমিটি (Steering Committee), পরিচয় পত্র সংক্রান্ত কমিটি (Credentials Committee), কর্ম নির্দেশক কমিটি (Orders of Business Committee)। বিভিন্ন অনুবাদ কমিটি—হিন্দি ও উর্দু, অর্থ ও কর্মচারী সংক্রান্ত কমিটি (Finance and Staff Committee)। স্থায়ী কমিটিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল রাজ্যগুলির সঙ্গে চুক্তি বা বোঝাপড়া সংক্রান্ত কমিটি (Committee for Negotiation with states), বিভিন্ন উপদেষ্টা কমিটি, কেন্দ্রীয় ক্ষমতা সংক্রান্ত কমিটি, কেন্দ্র ও রাজ্য শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত কমিটি। অবিভক্ত ভারতের গণপরিষদ সংবিধান রচনার কাজ শুরু করেনি। ভারতের স্বাধীনতা আইন পাশ এবং ভারতের জন্য পৃথক গণপরিষদ কাজ শুরু করার পর সংবিধান রচনার জন্য খসড়া কমিটি (Drafiting Committee) গঠিত হয়। বিভিন্ন কমিটির প্রতিবেদন পেশ, প্রতিবেদনের উপর আলাপ-আলোচনা এবং বিভিন্ন প্রতিবেদন অনুমোদনের মধ্য দিয়েই প্রথম পর্যায়ে গণপরিষদের কাজ চলেছে। এই পর্যায়ে গণপরিষদ কতকগুলি ক্ষেত্রে প্রস্তুতি কর্মের কাজ এগিয়ে রেখেছে। এগুলি হল মৌলিক অধিকার, সংখ্যালঘু ও উপজাতি বিষয়ক নীতি, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র সংক্রান্ত নীতি, কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে চুক্তি, জাতীয় পতাকার পরিকল্পনা ইত্যাদি। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত সমস্যা বা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সমস্যা নিয়ে পরিষদে আলোচনা হয়েছে।

অবিভক্ত ভারতে গণপরিষদের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হল সংবিধানের উদ্দেশ্য সংক্রান্ত প্রস্তাব (Objective Resolution) পেশ। ১৩ ডিসেম্বর ১৯৪৬ সালে উত্থাপিত এবং ২২ ডিসেম্বর ১৯৪৬ অনুমোদিত এবং ২২

জানুয়ারি ১৯৪৭ সালে গণপরিষদে গৃহীত উদ্দেশ্য সংক্রান্ত এই প্রস্তাব ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের সংবিধান গঠন ও রূপদানে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছে। প্রস্তাবটির বয়ান সংক্ষেপে এইভাবে পেশ করা যায় ঃ

এই গণপরিষদ অতন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ও ভাবগম্ভীরভাবে জানাচ্ছে ঃ

(ক) ভারত একটি স্বাধীন সার্বভৌম সাধারণতন্ত্রে পরিণত হবে। এর পরিচালনার জন্য একটি সংবিধান তৈরি করা হবে।

(খ) দেশীয় রাজ্য, ব্রিটিশ শাসিত প্রদেশ ও অন্যান্য অঞ্চল যারা এই স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রের অংশ হতে তায় সংশ্লিষ্ট সকল এলাকা নিয়ে গড়ে উঠবে ভারতীয় ইউনিয়ন।

(গ) এখানে সকল ক্ষমতার উৎস হবে জনগণ।

(ঘ) এখানে সকলের জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ন্যায়, মর্যদা, সুযোগ ও আইনের চোখে সমতা এবং চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্মাচরণ ও সংঘ গঠনের স্বাধীনতা থাকবে আইন ও জননৈতিকতা মেনে।

(ঙ) এখানে সংখ্যালঘু, অনুন্নত ও উপজাতি এলাকা ও নিপীড়িত মানুষের স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা হবে।

(চ) ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের অখণ্ডতা সুরক্ষিত হবে এবং ন্যায় বিচার ও জাতিসমূহের আইন মেনে স্থলে, জলে, আকাশে, ভারতের সংহতি ও সার্বভৌমত্ব সুরক্ষিত হবে।

(ছ) বিশ্বের দরবারে এই প্রাচীন ভূমির সম্মান অর্জনে এবং শান্তি ও মানব কল্যাণ নিশ্চিত করতে দেশ সচেষ্ট হবে।

নেহরুর চোখে উদ্দেশ্য সংক্রান্ত এই প্রস্তাব নিছক কোনও প্রস্তাব বলে মনে হয়নি। তিনি একে ঘোষণা (declaration), দৃঢ় প্রতিজ্ঞা (a firm resolve), সংকল্প (a pledge), অঙ্গীকার (an undertaking) এবং সকলের জন্য একে উৎসর্গ (a dedication) বলে বিবেচনা করেছেন। গণপরিষদের উদ্দেশ্য সংক্রান্ত প্রস্তাবের এই আদর্শগুলিই স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের প্রস্তাবের মূল আদর্শে প্রায় সব কিছুই গ্রহণ করা হয়েছে। সার্বভৌমিকতা, সাধারণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সাম্য, ন্যায়বিচার, দেশের সংহতি সমস্ত উচ্চ আদর্শগুলিই সংবিধানের প্রস্তাবনায় ধ্বনিত হয়েছে। গণপরিষদের উদ্দেশ্য ও আদর্শগুলির প্রচারে গণপরিষদের সমকালীন নেতৃবর্গের সকলের ভাবনা বা ইচ্ছাই যেন ব্যক্ত হল। নেহরুর গণতান্ত্রিক সমাজবাদের আদর্শ রাজেন্দ্রপ্রসাদের উদারবাদী ভাবনা, প্যাটেলের রক্ষণশীল চিন্তা, আম্বেদকরের নিপীড়িতের দর্শন সব কিছুর এক সমন্বয় লক্ষ করা গেল উদ্দেশ্য সংক্রান্ত প্রস্তাবে। ভারত চেতনার এক বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গির ছাপ এই প্রস্তাবে পাওয়া যায়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কর্মসূচিগুলি সবই এখানে ছিল। নেহরুর তাত্ত্বিক-ভাবনা ও মানবিক প্রত্যয় ও বাস্তব দৃষ্টির সঙ্গে প্যাটেলের সন্দেহবাদ, আজাদের অনুধাবন ও বিবেচনা বোধ, শাহ ও মুন্সীর মধ্যপন্থার দৃষ্টি এখানে মিলে গেছে।

প্রান্তলিপি ঃ
প্রস্তাবনা (Preamble) হল ভারতীয় সংবিধানের মুখবন্ধ; সংবিধানের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা, পথ নির্দেশিকা। ভারত রাষ্ট্রের রাজনৈতিক গড়নটি কী হবে প্রস্তাবনায় তা বলা হয়েছে। সংবিধানের সঙ্গে প্রস্তাবনাটি যুক্ত হলেও এর কোনও আইনানুগ তাৎপর্য নেই। এটি একটি সংকল্প; কার্যকরী আইন নয়। ১৯৪৯ সালের, ২৬ নভেম্বর গণপরিষদে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তীকালে প্রস্তাবনায় ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতন্ত্র কথা দুটি যুক্ত হয়।

ভারত বিভাগের পর গণপরিষদের ভূমিকা ছিল অনেকটাই আইনসভার মতো। ভারতের স্বাধীনতা আইন ডোমিনিয়ন ভারতের শাসনব্যবস্থা সংসদীয় শাসন এবং গণপরিষদকে সার্বভৌম ঘোষণা করে। অন্তর্বর্তী সরকারের অবসান ঘটে। ভারত সচিবের দপ্তরের বিলোপ সাধন হয়, ভারতীয় ডোমিনিয়নে একজন গভর্নর জেনারেল থাকবেন বলে স্থির হয়। এই গভর্নর জেনারেল হবেন নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা। আইনসভার কাছে দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুসারেই তিনি কাজ করবেন। কেন্দ্রীয় আইনসভার বিলোপ ঘটিয়ে গণপরিষদকে সাময়িকভাবে (যতদিন না সংবিধান রচনা কার্য সমাপ্ত হচ্ছে) আইন সভায় রূপান্তরিত করা হয়। এইসময় গণপরিষদ দুটি ভূমিকা

পালন করে—সংসদ বা পার্লামেন্ট হিসেবে এবং গণপরিষদ বা সংবিধান সভা হিসেবে। পার্লামেন্ট হিসেবে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন মেনেই গণপরিষদ কাজ করেছে। কেন্দ্রীয় বিষয়গুলির উপর আইন প্রণয়নের পূর্ণ ক্ষমতা ছিল গণপরিষদের। এই সময় গণপরিষদ কমিটিগুলিকে আরও সংগঠিত করে। আইনসভায় গণপরিষদের দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য একজন অধ্যক্ষ (Speaker) নিযুক্ত করা হয়। জি. ভি. মভলঙ্কর (G. V. Mavlankar) কেন্দ্রীয় আইনসভার প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। আইনসভা হিসেবে গণপরিষদ কি দায়িত্ব পালন করবে গণপরিষদের একটি বিশেষ কমিটি (Special Committee) সে বিষয়ে প্রতিবেদন পেশ করে।

গণপরিষদের পঞ্চম অধিবেশনের শেষ দিন ২৯ আগস্ট, ১৯৪৭ পরিষদের একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত হল খসড়া সংবিধান রচনার জন্য একটি খসড়া কমিটি গঠন। গণপরিষদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল সংবিধান রচনা। গণপরিষদের পক্ষে সংবিধান রচনার এই গরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেছে ড. আম্বেদকারের নেতৃত্বে খসড়া কমিটি। গণপরিষদ ১৯৪৭ সালের ৩১ অক্টোবর পুনর্মিলিত হয়েছে। ইতিপূর্বে জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় ক্ষমতা সংক্রান্ত কমিটি, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে মৌলিক অধিকার ও সংখ্যালঘু বিষয়ক কমিটি, ড. কে. এম. মুন্সীর নেতৃত্বে কার্যনির্বাহক কমিটি, সর্দার প্যাটেলের নেতৃত্বে প্রাদেশিক সংবিধান কমিটি এবং পণ্ডিত নেহরুর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সংবিধান কমিটি সংবিধান রচনায় প্রাথমিক কাজ কিছু কিছু সম্পন্ন করেছে। নবগঠিত খসড়া কমিটি সংবিধান রচনার কাজ শুরু করে ১৯৪৭ সালের ৪ নভেম্বর। খসড়া কমিটি বিকল্প ও অতিরিক্তি প্রস্তাব সংযোজন করে ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ‘ভারতের খসড়া সংবিধান’ পেশ করে। বিশিষ্ট আইনজ্ঞ বি. এন. রাউ খসড়া সংবিধান প্রস্তুত করেন। আলাদি কৃষ্ণস্বামী আয়ারের নেতৃত্বে ৭ সদস্যের এক কমিটি এই খসড়া সংবিধান পরীক্ষা করে। ড. বি. আর. আম্বেদকর খসড়া সংবিধানটি গণপরিষদে উপস্থিত করেন। সাংবিধানিক আইনজ্ঞ হিসেবে পরিচিত নেহরু ক্যাবিনেটের আইনমন্ত্রী ড. আম্বেদকর খসড়া সংবিধানের সপক্ষে যে বিস্তারিত ও যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সংবিধানের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে যে সতর্কতা দেখিয়েছেন, প্রায় ৭০০০ সংশোধনী প্রস্তাবকে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রহণ ও বর্জন করতে খসড়া কমিটিকে নেতৃত্বে দিয়েছেন, গণপরিষদে যে বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ মত পেশ করেছেন, ভারতের সংবিধান রচনার কাজে যে মূল্যবান সময়, শক্তি ও উৎসাহ নিয়োগ করেছেন সেদিকে তাকিয়েই সংবিধান বিশেষজ্ঞ ও গবেষকেরা তাঁকে ভারতীয় সংবিধানের জনক (Father of the Indian Constitution) আখ্যা দিয়েছেন।

গণপরিষদের পরবর্তী অধিবেশনে (নভেম্বর, ১৯৪৮) খসড়া সংবিধানের প্রতিটি ধারার উপর আলোচনা শুরু হল। প্রায় এক বছর সময়কাল বিভিন্ন অধিবেশনে, আলোচনা ও দ্বিতীয় পাঠ সমাপ্ত হল ১৯৪৯ সালের ১৭ অক্টোবর। ১৯৪৯ সালের ১৪ নভেম্বর গণপরিষদ আবার বসে সংবিধানের তৃতীয় পাঠের জন্য। সংবিধান রচনা পর্ব শেষ হয় ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভের পর। নাগরিকতা, নির্বাচন, অস্থায়ী আইনসভা এবং কিছু কিছু সাময়িক ও পরিবর্তনযোগ্য ধারাকে ২৬ নভেম্বর থেকেই কার্যকর করা হয়েছে। সম্পূর্ণ সংবিধানটি কার্যকর হয়েছে ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০। চূড়ান্ত সংবিধানে ৩৯৫টি ধারা ও ৮টি তপশিল ছিল।

সংবিধান রচয়িতাগণ সংসদীয় সরকার, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা, মৌলিক অধিকার, নির্দেশমূলক নীতি, সংবিধানের ব্যাখ্যা বা বৈধতা বিচারের প্রশ্ন সব কিছুই বিস্তারিত আলোচনায় পর সংবিধানে লিপিবদ্ধ করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের গড়ন, সম্পত্তির অধিকার, নিবর্তনমূলক আটক আইন (Preventive Detention Act), দেশীয় রাজ্যগুলির অধিকার, সুপ্রিমকোর্টের ক্ষমতা, সংবিধান সংশোধন—নানা প্রশ্নেই গণপরিষদে দীর্ঘ বিতর্ক হয়েছে। আলোচনা, পর্যালোচনা, জনসাধারণের কাছে প্রচার, সংশোধনী ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বিকল্প অনুসন্ধান এবং সংবিধানের উদ্দেশ্য ও নীতিকে উপস্থিত করার যে প্রচেষ্টা ছিল তা অভূতপূর্ব। ভারতীয় সংবিধানের মূল বাণীটি প্রচারিত হয়েছে সংবিধানের প্রস্তাবনায়।

সংবিধান রচনার কাজে গণপরিষদের সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের মতামত থেকে গণপরিষদ বা

খসড়া কমিটির কাজকর্মের একটা মূল্যায়ন করতে পারবেন। আসুন, এই এককের মূল আলোচনার শেষের অনুচ্ছেদে এ সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা যাক।

২২.৬ গণপরিষদের কাজকর্মের মূল্যায়ন

গণপরিষদের গঠন প্রণালী ও নেতৃত্ব সম্পর্কিত আলোচনা থেকে আপনি জেনেছেন গণপরিষদের নির্বাচন, প্রতিনিধি সামাজিক ভিত্তি ও অবস্থান, কতিপয়ের প্রভাব ও নেতৃত্ব, বিশেষ দলীয় মতাদর্শের প্রাধান্য। এ সবকিছুই গণপরিষদের গণতান্ত্রিক চরিত্রের বিরোধী। অথচ গণভিত্তিক এক পরিষদ ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংবিধান রচনার কথা বারবার গণপরিষদের নেতারা বলেছেন। সমালোচকদের ভাবনাকে একত্রিত করে আমরা বলতে পারি ঃ

১। গণপরিষদকে প্রকৃত অর্থে গণতান্ত্রিক সংস্থা বলা যায় না। এর পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি, দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতিনিধি মনোনয়ন ব্যবস্থা, সারা দেশে গণভোটের মাধ্যমে সংবিধান সংশোধনের ব্যবস্থার অনুপস্থিতি প্রমাণ করে গণপরিষদ গণতান্ত্রিক ও জনঅনুমোদিত সংস্থা নয়।

২। যে সংবিধান গণপরিষদ রচনা করেছে তা আইনজ্ঞ আর রাজনীতিবিদের উপহার। নেহরু, প্যাটেল, আজাদ ও রাজেন্দ্রপ্রসাদের মতো রাজনীতিবিদ এবং আম্বেদকর, মুন্সী, আয়ার ও আয়েঙ্গারের মতো আইনবিদরাই সংবিধান রচনাকার্যের মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন। বিরাট সংবিধান বহু ধারা উপধারার উপস্থিতি, অনেক অপ্রয়োজনীয় অংশের অন্তর্ভুক্তি সংবিধানকে অযথা জটিল ও ভারাক্রান্ত করেছে।

৩। সংবিধানের কোনও মতাদর্শগত স্পষ্টতা ছিল না। গণপরিষদে সমাজতন্ত্রের ভাবনা (কে. টি শাহ এই ভাবনাকে প্রচার করতে চেয়েছেন) গুরুত্ব পায়নি। উদারবাদ, সমাজবাদ বা ধর্মনিরপেক্ষতা সব প্রশ্নেই বিতর্ক ছিল।

৪। গণপরিষদ অনুমোদিত ও খসড়া কমিটি রচিত সংবিধানকে মৌলিক বলা চলে না। বিভিন্ন সংবিধানের অভিজ্ঞতা অনুকরণ করেই এই সংবিধান রচিত। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের প্রভাব এবং সংবিধান স্পষ্ট।

৫। রাজন্যবর্গের স্বার্থ সংরক্ষণ, ব্রিটিশ স্বার্থ সংরক্ষণের আই. সি. এস ব্যবস্থা প্রবণতার কথাও ধীরেন্দ্রনাথ সেনের মতো কোনও কোনও লেখক বলেছেন। কোনও কোনও লেখক মনে করেন, গণপরিষদ সৃষ্ট খসড়া কমিটি আইনের কঠিন জালে আটকে পড়েছে খসড়া কমিটিতে আম্বেদকরের আচরণ ছিল অনেকটাই প্রভুর মতো। এটি যেন আইন কলেজের এক শ্রেণিকক্ষ আর ড. আম্বেদকার হলেন গুরুগম্ভীর সেই শিক্ষক যিনি সকলকেই তাঁর মনোযোগী ছাত্র বলে মনে করেন এবং তাঁর কথাই হল শেষ কথা। খসড়া কমিটির নীতি পরিবর্তন, নমনীয়তাকে উপহাস করে কেউ একে বলেছেন লক্ষশূন্য কমিটি (Drifting Committee), জয়প্রকাশ নারায়ণ (Jayaprakash Narayan), মহাবীর ত্যাগী (Mahabir Tyagi) গণপরিষদের কাজে অসন্তুষ্ট ছিলেন। জনসাধারণের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন গণপরিষদে ঘটেনি। জোহারী (J. C. Johari) বলেছেন, গণপরিষদ সৃষ্ট খসড়া কমিটি কখনো কখনো তার সৃষ্টিকর্তাকে অতিক্রম করার চেষ্টা করেছে; নিজেকে শাসন বিভাগ বা ক্যাবিনেট বলে মনে করেছে। কমিটির কাজে পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতাও ছিল এবং ধারণাগত ফাঁকও ছিল।

সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও গণপরিষদ ও খসড়া কমিটি বিশ্বের এক বৃহত্তম সংবিধান আমাদের উপহার দিয়েছে। কংগ্রেস দল বা তার ওয়ার্কিং কমিটির নেতারা সংবিধান রচনায় প্রভাবশীল হলেও নেহরুর দূরদর্শিতা বা আম্বেদকরের বিশেষজ্ঞ জানে পুষ্ট সংবিধান সব ক্ষেত্রে রক্ষণশীল একথা বলা যাবে না। নেহরু চেয়েছিলেন এমন এক সংবিধান

যা এদেশের মানুষের অভাব মেটাবে, আত্মবিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করবে। অস্টিন বলেছেন, গণপরিষদের লক্ষ্য ছিল এমন এক সংবিধানের রূপরেখা প্রণয়ন বা সামাজিক বিপ্লবের চূড়ান্ত লক্ষ্যকে পূরণ করবে। ("The Constitution Assembly's task was to draft a Constitution that would serve the ultimate goal of social revolution....." G. Austin)। জোহারী বলেছেন, গণপরিষদের দ্বারা সংবিধান রচনা জনসম্মতির ভিত্তিতে বিপ্লবের জয়কে সূচিত করে। গণপরিষদ ছিল স্বাধীনতার প্রতীক (রাজনৈতিক) স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক মানবিক অভিজ্ঞতা, বিজ্ঞতা, ঐতিহ্য ও পরম্পরায় এক মূল্যবান আধার হল গণপরিষদ। ("The making of our Constitution by the grand con'sembly signifies the triumph of a revolution by the consent of the people of the country. The Assembly was a symbol of freedom (political) to achieve freedoms (social and economic)—J. C. Johari।

২২.৭ সারাংশ

সংবিধান একটি স্বাধীন জাতির চিন্তা-চেতনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ। ভারতে সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যেই স্বাধীনতার আগেই সৃষ্টি হয়েছে গণপরিষদ। ১৯০৬ সালে জাতীয় কংগ্রেসের স্বরাজ সংক্রান্ত প্রস্তাবে, ১৯২২ সালে Young India-য় প্রকাশিত গান্ধীজির একটি প্রবন্ধে এবং ১৯৩৫ সালের পরবর্তীকালে জাতীয় কংগ্রেসের বিভিন্ন সম্মেলনে গণপরিষদের জন্য দাবি উঠেছিল। ১৯৪২ সালে ক্রিপস্ মিশন ও ১৯৪৬ সালে ক্যাবিনেট মিশন ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে গণপরিষদের এই দাবি মেনে নেয়। ভারতীয় স্বাধীনতা আইনে ভারতের জন্য পৃথক গণপরিষদ গঠনের প্রস্তাব হয়। স্বাধীনতা লাভ ও ভারত বিভাজনের পরবর্তীকালে গণপরিষদ সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্যোগ নেয়। ২৯ আগস্ট, ১৯৪৭ গণপরিষদ সংবিধান রচনার জন্য ড. বি. আর. আম্বেদকরের নেতৃত্বে খসড়া কমিটি গঠন করে।

গণপরিষদের সদস্যরা প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যদের দ্বারা পরোক্ষ পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়েছেন। জনসংখ্যার অনুপাতে প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে আসন বণ্টন, আনুপাতিক হারে সাধারণ, মুসলমান ও শিখ এই তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে আসন বণ্টন, একক হস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নির্বাচন গণপরিষদ গঠনের ক্ষেত্রে ওই নীতিগুলিই কার্যকর হয়েছে। চিফ কমিশনার শাসিত প্রদেশগুলির জন্য আসন সংরক্ষিত ছিল। অবিভক্ত ভারতের গণপরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল ৩৮৯। দেশ বিভাগের পর ভারতীয় গণপরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল ২৯৯। গণপরিষদে জাতীয় কংগ্রেসের সদস্যরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন।

১৯৪৬ সালের ৯ই ডিসেম্বর দিল্লির কনস্টিটিউশন হলে অবিভক্ত ভারতবর্ষের গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে। ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ গণপরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন। কমিটির মাধ্যমে কার্য পরিচালনা ছিল গণপরিষদের বিশেষত্ব। বিভিন্ন অধিবেশনে যেসব গুরুত্বপূর্ণ কমিটি গণপরিষদ গঠন করেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কার্যবিধি-সংক্রান্ত কমিটি, কার্য নির্বাহক কমিটি, কেন্দ্রীয় ক্ষমতা-সংক্রান্ত কমিটি, উপদেষ্টা কমিটি, কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্র-সংক্রান্ত কমিটি এবং রাজ্য শাসনতন্ত্র-সংক্রান্ত কমিটি। ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ, জওহরলাল নেহরু, মৌলানা আজাদ, বল্লভভাই প্যাটেল, এ. ডি. আয়েঙ্গার, এ. কে. আইয়ার, কে. এম. মুন্সী, বি. পট্টভি সিতারামাইয়া, বি. আর. আম্বেদকর গণপরিষদের বিভিন্ন কমিটির কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। গণপরিষদের গঠন পদ্ধতির কিছু বৈশিষ্ট্য হল (ক) জাতীয় কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীদের প্রভাব, (খ) নানা বৃত্তি, শ্রেণি ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব, (গ) নির্বাচন ও প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির অনুপস্থিতি।

গণপরিষদ সাধারণভাবে একটি গণমঞ্চ, আইনসভা ও সংবিধান রচনা, সংস্থা হিসেবে কাজ করেছে। প্রাথমিকভাবে কমিটির মাধ্যমে কার্য পরিচালনা এবং উদ্দেশ্য সংক্রান্ত প্রস্তাব পেশ—গণপরিষদ এই দুটি দায়িত্ব

সম্পন্ন করেছে। কমিটিকে গণপরিষদ ব্যবহার করেছে দক্ষতার সঙ্গে বিভিন্ন কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে। উদ্দেশ্য সংক্রান্ত প্রস্তাব পেশ করে গণপরিষদ ভারত গঠনে তার প্রতিজ্ঞা, সংকল্প ও অঙ্গীকারের কথা জানিয়েছে এবং প্রচার করেছে তার লক্ষ্য ও আদর্শ। আইনসভা হিসাবে গণপরিষদ ছিল সার্বভৌম সংস্থা। পার্লামেন্টীয় গণতন্ত্রের ধারা অনুসরণ করেই গণপরিষদ আইনসভা হিসেবে তার দায়িত্ব সম্পন্ন করেছে। জি. ভি. মভলঙ্কর ছিলেন আইনসভায় গণপরিষদের স্পিকার। গণপরিষদের কমিটিগুলি আইনসভা হিসেবে এর দায়িত্ব পালনে বিশেষ সহায়তা করেছে। গণপরিষদ বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে সংবিধান রচনা সংস্থা হিসেবে। খসড়া কমিটির উদ্যোগে ১৯৪৭ সালের ৪ নভেম্বর থেকে সংবিধান রচনায় যে কাজ আরম্ভ হয় তা সম্পন্ন হয় ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর। এই সংবিধান কার্যকর হয় ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে।

গণপরিষদের কাজকর্ম নিয়ে সমালোচনা কম হয়নি। প্রকৃত অর্থে কখনই একটি গণতান্ত্রিক সংস্থা হিসেবে গণপরিষদ কাজ করেনি। কংগ্রেসি গোষ্ঠীতন্ত্রের একচ্ছত্র প্রভাব, খসড়া কমিটির আইনি জাল-জটিলতা, মতাদর্শগত স্পষ্টতার অভাব ওই সব সমালোচনা ছাড়াও গণপরিষদ রচিত সংবিধানে মৌলিকতার অভাব ছিল এরকম অভিযোগও উঠেছে। প্রগতিশীলতার বিচারে সবক্ষেত্রে উত্তীর্ণ না হলেও বিশেষজ্ঞ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় পুষ্ট গণপরিষদ এবং এই গণপরিষদ দ্বারা রচিত সংবিধানের বৈপ্লবিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্যকে অস্বীকার করা চলে না।

২২.৮ অনুশীলনী

(১) সঠিক উত্তর বেছে নিয়ে বাক্যটি সম্পূর্ণ করুন ঃ

(ক) ভারতের গণপরিষদের সভাপতি ছিলেন (i) জওহরলাল নেহরু (ii) বল্লভভাই প্যাটেল (iii) রাজেন্দ্রপ্রসাদ।

(খ) ভারতের গণপরিষদের খসড়া কমিটির সভাপতি ছিলেন (i) কে. এম. মুন্সী (ii) বি. আর. আম্বেদকর (iii) জওহরলাল নেহরু।

(গ) ভারতের গণপরিষদ গঠিত হয়েছিল (i) ক্রিপস্ প্রস্তাব অনুসারে (ii) ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা অনুসারে।

(ঘ) অবিভক্ত ভারতের গণপরিষদে মোট সদস্য সংখ্যা ছিল (i) ২৯৯ (ii) ৩১০ (iii) ৩৮৯।

(ঙ) গণপরিষদের সদস্যরা নির্বাচিত হতেন (i) জনসাধারণের প্রত্যক্ষ ভোটে (ii) প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যদের ভোটে।

(চ) গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসেছিল (i) ১৯৪৬ সালের ৯ ডিসেম্বর (ii) ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট (iii) ১৯৪৭ সালের ২২ জানুয়ারি।

(ছ) ভারতের সংবিধান কার্যকর হয়েছিল (i) ১৫ আগস্ট, ১৯৪৭ (ii) ২৬ নভেম্বর, ১৯৪৯ (iii) ২৬ জানুয়ারি, ১৯৫০।

(২) ক-স্তম্ভের নাম বা শব্দগুলির সঙ্গে খ-স্তম্ভের নাম বা শব্দের মিল দেখান ঃ

স্তম্ভ ক	স্তম্ভ খ
(i) গান্ধীজি	(i) ব্রিটিশ সরকারের ক্যাবিনেট মন্ত্রী
(ii) জাতীয় কন্‌ভেনশন	(ii) ভারতীয় সংবিধানের জনক
(iii) স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্	(iii) গণপরিষদের স্পিকার
(iv) খসড়া কমিটি	(iv) Young India
(v) জি. ভি. মভলঙ্কর	(v) সংবিধান রচনা
(vi) বি. আর. আম্বেদকর	(vi) ফ্রান্স

(৩) একটি বা দুটি বাক্যে প্রশ্নগুলির উত্তর দিন ঃ
(ক) গণপরিষদ বলতে কী বোঝেন।
(খ) ভারতের গণপরিষদের সভাপতি কে ছিলেন?
(গ) গণপরিষদের দুটি কমিটির নাম করুন।
(ঘ) সংবিধান খসড়া কমিটির সভাপতি কে ছিলেন?
(ঙ) গণপরিষদের দুটি কাজের উল্লেখ করুন।
(চ) গণপরিষদে উদ্দেশ্য সংক্রান্ত প্রস্তাব কে পেশ করেন?
(ছ) ভারতের সংবিধান কবে থেকে কার্যকর হয়েছে?
(জ) ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারত রাষ্ট্রের রূপ কী নির্দেশ করা হয়েছে?

(৪) সংক্ষেপে উত্তর করুন (৫০টি বাক্যের মধ্যে)
(ক) ভারতে গণপরিষদ গঠনের জন্য দাবিগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু লিখুন।
(খ) ভারতের গণপরিষদের প্রধান প্রধান কমিটিগুলির নাম করুন।
(গ) গণপরিষদ সম্পর্কে ক্রীপস্ প্রস্তাবে কী বলা হয়েছে?
(ঘ) আইনসভা হিসেবে গণপরিষদের কাজ কী ছিল?

৫) নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন (১৫০টি শব্দের মধ্যে)
(ক) গণপরিষদের গঠন সম্পর্কে কিছু লিখুন।
(খ) গণপরিষদের কাজ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২২.৯ উত্তরমালা

(১) (ক) ভারতের গণপরিষদের সভাপতি ছিলেন ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ।
(খ) ভারতের গণপরিষদের খসড়া কমিটির সভাপতি ছিলেন বি. আর. আম্বেদকর।
(গ) ভারতের গণপরিষদ গঠিত হয়েছিল ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা অনুসারে।
(ঘ) অবিভক্ত ভারতের গণপরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৩৮৯।
(ঙ) গণপরিষদের সদস্যরা নির্বাচিত হতেন প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যদের ভোটে।
(চ) গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসেছিল ১৯৪৬ সালের ৯ ডিসেম্বর।
(ছ) ভারতের সংবিধান কার্যকর হয়েছিল ২৬ জানুয়ারী, ১৯৫০।

(২)

স্তম্ভ ক	স্তম্ভ খ
(i) গান্ধীজি	(i) Young India (iv)
(ii) জাতীয় কন্‌ভেনশন	(ii) ফ্রান্স (vi)
(iii) স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্	(iii) ব্রিটিশ সরকারের ক্যাবিনেট মন্ত্রী (i)
(iv) খসড়া কমিটি	(iv) সংবিধান রচনা (v)
(v) জি. ভি. মভলঙ্কর	(v) গণপরিষদের স্পিকার (iii)
(vi) বি. আর. আম্বেদকর	(vi) ভারতীয় সংবিধানের জনক (ii)

(৩) (ক) গণপরিষদ হল সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে মিলিত নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের এক সভা।
(খ) ভারতের গণপরিষদের সভাপতি ছিলেন ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ।
(গ) গণপরিষদের দুটি কমিটি হল—কার্যবিধি-সংক্রান্ত কমিটি ও সংবিধান রচনার জন্য খসড়া কমিটি।

(ঘ) সংবিধান খসড়া কমিটির সভাপতি ছিলেন ড. বি. আর. আম্বেদকর।

(ঙ) গণপরিষদের দুটি কাজ ছিল আইনসভা হিসাবে আইন প্রণয়ন ও নীতি অনুমোদনের কাজ এবং সংবিধান সভা হিসেবে সংবিধান রচনার কাজ।

(চ) গণপরিষদের উদ্দেশ্য সংক্রান্ত প্রস্তাব পেশ করেন জওহরলাল নেহরু।

(ছ) ভারতের সংবিধান কার্যকর হয়েছে ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে।

(জ) ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তীকালে সংবিধান সংশোধন করে এর সঙ্গে ধর্ম নিরপেক্ষ ও সমাজতন্ত্র কথা দুটি যুক্ত করা হয়।

২২.১০ গ্রন্থপঞ্জি

1. Durga Das Basu : Introduction to the Constitution of India (1999).
2. Granville Austin : The Indian Constitution : Cornerstone of a Nation (1985).
3. J. C. Johari: *Indian Government and Politics,* Vol-I (1996).
4. Dhirendranath Sen : From Raj to Swaraj (1954).
5. M. M. Singh: *From Raj to Republic* : *A Retrospect,* (1972).

একক ২৩ ❑ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা

গঠন

২৩.০ উদ্দেশ্য
২৩.১ প্রস্তাবনা
২৩.২ মূল আলোচনা
২৩.৩ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহাসিক পটভূমি
২৩.৪ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের গঠনপ্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য
২৩.৫ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রপ্রবণতা
২৩.৬ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রপ্রবণতা বিষয়ে বিতর্ক
২৩.৭ ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সংস্কার ও পুনর্বিন্যাস সম্পর্কে মতামত ও প্রস্তাব
২৩.৮ সারাংশ
২৩.৯ অনুশীলনী
২৩.১০ উত্তরমালা
২৩.১১ গ্রন্থপঞ্জি

২৩.০ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করলে আপনি

- সরকার বা শাসনব্যবস্থার একটি রূপ হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অর্থ, প্রকৃতি জানতে পারবেন, এই ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিহ্নিত করতে পারবেন।
- ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহাসিক পটভূমি বিচার করতে পারবেন।
- ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও বাস্তব প্রবণতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- যুক্তি-তর্কের সাহায্যে এদেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবেন।
- এই ব্যবস্থার সংস্কার ও পুনর্বিন্যাস সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের প্রস্তাব ও সুপারিশগুলিকে যাচাই করতে পারবেন।

২৩.১ প্রস্তাবনা

পূর্ববর্তী এককে আপনারা পড়েছেন বা জেনেছেন ভারতের গণপরিষদ এবং খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির উদ্যোগে সংবিধান রচনার যে প্রয়াস এদেশে হয়েছে তার মূল উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীন রাষ্ট্রের সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও রাষ্ট্রকাঠামোর উপযোগী এক ব্যবস্থাকে রূপ দেওয়া। স্বাধীন ভারতের সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামাকেই গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান এককে ভারতের এই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার রূপ, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতা সম্পর্কেই আলোকপাত করা হয়েছে।

ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার রূপ ও গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেতে গেলে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা বাঞ্ছনীয়। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে একটি তাত্ত্বিক আলোচনা দিয়েই বর্তমান এককের পাঠ শুরু হয়েছে। এই আলোচনায় যুক্তরাষ্ট্র বলতে কী বোঝায়,

রাষ্ট্রসমবায়ের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের পার্থক্য কী, এককেন্দ্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে এই ব্যবস্থা কী অর্থে তুলনীয়, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সুবিধা-অসুবিধা ইত্যাদি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত অথচ স্পষ্ট ধারণা দেওয়া হয়েছে।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহাসিক পটভূমি শীর্ষক আলোচনায় ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষে এ বিষয়ে কি প্রস্তাব বা আইন ছিল, গণপরিষদের সদস্যরা এ সম্পর্কে কি ভেবেছিলেন শিক্ষার্থী পাঠকের কাছে সেইসব আইনগত ও তাত্ত্বিক ভাবনাচিন্তাগুলি পেশ করা হয়েছে।

স্বাধীন ভারতবর্ষের সংবিধান ও শাসনব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অবস্থান বিষয়ে শিক্ষার্থী পাঠকের দৃষ্টি ফেরাতে এই পর্বে এক একে আলোচনা করা হয়েছে কতকগুলি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক সমস্যা। এগুলি হ'ল—ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য, গঠনপদ্ধতি, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রপ্রবণতা এবং কেন্দ্রপ্রবণতা সম্পর্কে সংবিধানবিদ ও বিশেষজ্ঞের বিতর্ক। বর্তমান এককের সব শেষে এদেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সংস্কার ও পুনর্বিন্যাস সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

২৩.২ মূল আলোচনা

২৩.২.১ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ঃ অর্থ, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা-অসুবিধা

এবার মূল আলোচনা শুরু করা যাক। যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েই এই আলোচনা শুরু। যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ অর্থ হল একই রাষ্ট্রে দুটি সরকারের পাশাপাশি অবস্থান। অধ্যাপক এ. ভি. ডাইসি লিখেছেন যুক্তরাষ্ট্র হল একটি রাজনৈতিক যন্ত্র বা জাতীয় ঐক্য ও ক্ষমতার সঙ্গে রাজ্যের অধিকারের সামঞ্জস্য বিধান করে ("A Federal State is a Political contrivance intended to reconcile national unity and power with the maintenance of 'State rights' "—A. V. Dicey)। ডাইসি মনে করেন যুক্তরাষ্ট্রের দুটি প্রধান শর্ত—(১) প্রদেশ, উপনিবেশ বা ক্যান্টনগুলির অধিবাসীদের মধ্যে ভৌগোলিক সান্নিধ্য ও জাতীয় ভাবের উপস্থিতি এবং (২) মিলনের, ঐক্যের প্রেরণা অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রীয় অনুভূতি। কে. সি. হোয়্যার-এর মতে কতকগুলি সাধারণ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে রাজ্যগুলির স্বাধীন সহাবস্থানকে যুক্তরাষ্ট্র বলা চলে না। যুক্তরাষ্ট্র বলতে রাজ্য সমবায়কে বোঝায় না। এই অর্থে অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্য বা ১৮৭১-১৯১৮ এই সময়কালের জার্মান সাম্রাজ্যও যুক্তরাষ্ট্র বা জাতিসংঘের মতো সংস্থাও যুক্তরাষ্ট্র। প্রকৃত অর্থে যুক্তরাষ্ট্র হ'ল এমন এক নীতি যা সমগ্র দেশের সরকার এবং আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতাবণ্টন পদ্ধতিকে নির্দেশ করে, উভয়ের স্বাধীন ও সমতুল্য অস্তিত্বকে প্রকাশ করে ("By the federal principle I mean the method of dividing powers so that the general and the regional governments are each, within a sphere, co-ordinate and independent"—K. C. Wheare)।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃত রূপ হিসাবে গ্রহণ করে অধ্যাপক হোয়্যার বলেছেন যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি হল ঃ (১) জাতীয় ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতাবণ্টন; (২) উভয় সরকারের স্বাধীন ক্ষেত্রের অবস্থিতি এবং (৩) উভয় সরকারের মধ্যে সহযোগিতার বন্ধন। সুইটজারল্যান্ড ও কানাডায় যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির অস্তিত্ব থাকলেও কঠোরভাবে এই নীতিগুলিকে মানা হয় না। প্রাথমিকভাবে রাষ্ট্র সমবায় (confederation) হিসাবে গড়ে উঠলেও (অর্থাৎ আঞ্চলিক সরকারগুলির স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের বৃহত্তর প্রয়োজনে জাতীয় সরকার সৃষ্টি করে এই সরকারের হাতে সাধারণ কিছু ক্ষমতা অর্পণ) পরবর্তীকালে যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির প্রকৃত প্রতিফলন ঘটেছে মার্কিন সংবিধানে। জাতীয় সরকারের আঞ্চলিক সরকারের উপর নির্ভরতা নয়, বর্তমান মার্কিন সংবিধান অনুসারে জাতীয় ও আঞ্চলিক উভয় সরকারই নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীন অথচ একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতায় আবদ্ধ। রাষ্ট্রসমবায় ও যুক্তরাষ্ট্রের পার্থক্য হল—

(১) রাষ্ট্রসমবায়ে কতকগুলি সার্বভৌম রাষ্ট্র নিজেদের মধ্যে চুক্তি করে কয়েকটি নির্দিষ্ট ক্ষমতা কেন্দ্রীয়

সরকারের হাতে তুলে দেয়। এখানে কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধান দ্বারা সৃষ্টি নয়, চুক্তির দ্বারা গঠিত। যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধান দ্বারা সৃষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত, রাজ্যগুলির কোনো চুক্তির ফল নয়।

(২) রাষ্ট্রসমবায়ে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এখানে রাজ্য সরকার প্রত্যক্ষভাবে জনগণের সঙ্গে সম্পর্কিত। যুক্তরাষ্ট্রে উভয় সরকার সংবিধানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এখানে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েরই জনগণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে।

এককেন্দ্রিক সরকারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের পার্থক্য আছে। এককেন্দ্রিক সরকারে কেন্দ্রীয় সরকারেরই প্রাধান্য, যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধানই চরম ও মৌলিক আইন। এখানে সংবিধান অনুসারেই কেন্দ্র ও রাজ্যের ক্ষমতা বণ্টিত হয়। এককেন্দ্রিক সরকারে আইনত কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই সমস্ত ক্ষমতা ও আঞ্চলিক সরকারের স্বাধীন অস্তিত্ব এখানে নেই। আঞ্চলিক সরকারের সৃষ্টি বা বিলুপ্ত; স্বায়ত্তশাসনের অস্তিত্ব সবই এখানে কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। এককেন্দ্রিক সরকারে শাসন, শৃঙ্খলা, প্রশাসন, নীতি সব কিছু সমরূপ। যুক্তরাষ্ট্রে শাসনপদ্ধতি, প্রশাসন, নীতির ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য লক্ষণীয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির আলোকে অধ্যাপক হোয়্যার যুক্তরাষ্ট্রের কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। তিনি মনে করেন এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে সামনে রেখেই কোনো ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় কি না তা বিচার করা যেতে পারে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি হল ঃ

(১) সংবিধান অনুসারে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে ক্ষমতাবণ্টন বা উভয়ের এলাকা নির্ধারণ।

(২) সংবিধানের প্রাধান্য অর্থাৎ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার উভয়েরই ঊর্ধ্বে সংবিধান, সংবিধান মেনেই উভয়কে চলতে হবে এবং সংবিধানকে অতিক্রম করে কোনো সরকারই তার ক্ষমতা ব্যবহার করবে না। যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান হবে লিখিত ও অনমনীয়। সংবিধানের লিখিত আইনই হল দেশের সর্বোচ্চ আইন। সংবিধান-নির্দিষ্ট বিশেষ পদ্ধতি ছাড়া সংবিধানের পরিবর্তন সম্ভব নয়।

(৩) স্বাধীন নিরপেক্ষ বিচারালয়ই হবে যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধানের ব্যাখ্যাকর্তা ও অভিভাবক। ক্ষমতাবণ্টন বা সংবিধানের ব্যাখ্যা নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্যের মতবিরোধ হলে আদালতই এই বিরোধের মীমাংসা করবে এবং সংবিধানবিরোধী যে কোনো কাজকেই অসাংবিধানিক (Unconstitutional) বলে ঘোষণা করবে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অন্যান্য কিছু আপেক্ষিক বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন রাজ্যগুলি স্বাধীন হলেও দেশের অখণ্ডতার বিনিময়ে আঞ্চলিক স্বাধীনতা সম্ভব নয়। ফ্রিম্যানের (Freeman) মতো কোনও কোনও লেখক মনে করেন যুক্তরাষ্ট্রে আঞ্চলিক সরকারগুলির মূল ভূখণ্ড ত্যাগ করে স্বাধীন সরকার গঠনের অধিকার তাত্ত্বিকভাবে সংগত নয়। অঙ্গরাজ্যগুলির পৃথক সংবিধান কেন্দ্রীয় আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষে রাজ্যগুলির সুষ্ঠু ও সমান প্রতিনিধিত্ব, প্রদেশে বা রাজ্যে বসবাসকারী নিবেশীর (domiciled) দ্বৈত-নাগরিকতার অধিকারের (double-citizenship) স্বীকৃতি, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যুগ্ম অধিক্ষেত্র (concurrent jurisdiction), ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির (separation of powers) প্রয়োজনীয় প্রয়োগ রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ঐক্য ও সংহতির চেতনা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অন্যান্য প্রয়োজনীয় শর্ত বলে হোয়্যার মনে করেন। যুক্তরাষ্ট্রে অর্থ, বাণিজ্য, প্রশাসন, সমাজসেবা ও বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে সংহতি ও ভারসাম্যের উপযুক্ত নীতির ব্যবস্থা থাকও প্রয়োজন।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রধান দুর্বলতা হল ক্ষমতার প্রশ্নে কেন্দ্র-রাজ্যের বিরোধ। কেউ কেউ বলেন এই ব্যবস্থায় আঞ্চলিকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রশ্রয় পায়। ডাইসি মনে করেন অতিরিক্ত অনমনীয়তার জন্য এই ব্যবস্থা রক্ষণশীল, কোনও দ্রুত পরিবর্তন বা আমূল সংস্কার ওখানে সম্ভব নয়। আদালতনির্ভর সাংবিধানিক শ্রেষ্ঠত্বের জালে ওখানে আইনসভার মতো প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব তেমনভাবে অনুভব করা যায় না—এটি একটি অধস্তন আইন প্রণয়ন সংস্থা মাত্র। তবে যুক্তরাষ্ট্রের সুবিধা অবশ্যই এই দুর্বলতাকে অতিক্রম করে যায়। জাতীয় ঐক্য আর রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য উভয়ে মিলে যুক্তরাষ্ট্র এক শক্তিশালী ও সুসংহত রাষ্ট্র। এই ব্যবস্থা বৈচিত্র্যকে প্রতিফলিত করে, আইন প্রণয়ন ও শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে পরীক্ষানিরীক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করে, স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে স্বীকার করে, জনসংযোগ ও জনমত

সংগঠনের মাধ্যমে রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসারে সাহায্য করে। শাসন পরিচালনায় সংযোগের অভাব; নীতির ক্ষেত্রে কেন্দ্র-রাজ্য বিরোধ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার দুর্বলতার লক্ষণ হলেও এই ব্যবস্থায় কেন্দ্র ও রাজ্য একে অপরের বাধা ও ভারসাম্য হিসাবে কাজ করে সরকারি স্বৈরাচারিতার সম্ভাবনাকে রোধ করে।

২৩.৩ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহাসিক পটভূমি

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে সাধারণ ধারণা পাবার পর আসুন এবার আমরা দেখি ভারতের যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটি কী। ব্রিটিশ শাসনকালের শেষ তিরিশ বছরের ঘটনা-পরম্পরাই এদেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ঐতিহাসিক পটভূমি হিসাবে গবেষকমহলে বিবেচ্য। ব্রিটিশশাসিত ভারতের সাধারণভাবে একটি কর্তৃত্বমুখী ও এককেন্দ্রিক ব্যবস্থাই কার্যকর হয়েছে। তবে দেশের বিশাল আয়তন, বিপুল জনসংখ্যা বিচিত্র আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির কথা ভেবে বর্তমান শতকের বিশের দশক থেকেই ক্ষমতাবণ্টন ও প্রাদেশিক শাসনের এক প্রবণতা লক্ষ করা যেতে থাকে। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে দায়িত্বশীল সরকার প্রবর্তনের মাধ্যমে শাসনসংস্কারের প্রচেষ্টা হয়েছে। দ্বিজাতীয় সরকার (Dyarchy) প্রবর্তন করে শাসন সংক্রান্ত বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রদেশগুলির মধ্যে ভাগাভাগি করার প্রস্তাব হয়। কেন্দ্র প্রদেশগুলির হাতে ক্ষমতা প্রত্যর্পণের উদ্দেশ্যে নিয়ম করে (Devolution Rules) এবং প্রদেশের নিয়ন্ত্রিত বিষয়গুলিকে সংরক্ষিত বিষয় (Reserved Subjects) ও হস্তান্তরিত বিষয় (Transferred Subjects) এই দুই ভাগে ভাগ করে। সংরক্ষিত বিষয়গুলি গভর্নরের শাসন পরিষদের (Executive Council) মাধ্যমে পরিচালিত হত। হস্তান্তরিত ক্ষমতাগুলি গভর্নর মন্ত্রীদের সাহায্যে পরিচালনা করতেন। মন্ত্রীরা প্রাদেশিক আইন পরিষদের (Legislative Council) কাছে তাদের কাজের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়িত্বশীল ছিলেন। সন্দেহ নেই প্রত্যর্পণ সংক্রান্ত আইনের বলে শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতাকে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক এই দুই ভাগে ভাগ করা, প্রাদেশিক বিষয়গুলির (শাসন, আইন প্রণয়ন, রাজস্ব ইত্যাদি) ক্ষমতা প্রদেশগুলির হাতে অর্পণ করায় এই ব্যবস্থা এদেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গঠনের এক ঐতিহাসিক পর্বের সূচনা করেছে।

তবে ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন সীমাবদ্ধভাবেই প্রয়োগ করা হয়। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রাদেশিক আইন পরিষদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ছিল, কেন্দ্রীয় আইনসভার নিয়ন্ত্রণক্ষমতা ছিল অধিক। একই ভাবে শাসনের ক্ষেত্রে স-পরিষদ গভর্নর জেনারেলের (Governor General's Executive Council) মাধ্যমে ভারত সরকারের আদেশ-নির্দেশ প্রদেশগুলির উপর বজায় ছিল। প্রাদেশিক আইনের প্রস্তাব গভর্নর জেনারেলের সার্টিফিকেট প্রদানের ক্ষমতা (Power of Certification) দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল অর্থাৎ ব্রিটিশ ভারতের নিরাপত্তা ও শান্তির অজুহাতে গভর্নর জেনারেল প্রাদেশিক আইনসভা-প্রণীত বিল বাতিল করতে পারতেন। প্রদেশিক আইনসভা প্রস্তাবিত বিলকে রাজশক্তির (Crown) বিবেচনার জন্য ধরে রাখার ক্ষমতাও তাঁর ছিল। আবার অর্ডিন্যান্স বা অস্থায়ী জরুরি আইন জারি করে ভারতের শান্তি ও স্ব-শাসনের স্বার্থে প্রদেশের আইন ও শাসনাধিকার খর্ব করার ক্ষমতাও তাঁর ছিল।

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের ত্রুটি-বিচ্যুতি জাতীয় আন্দোলনের তীব্রতা, রাওলাট আইনের (Rowlat Act, 1919) দমনমূলক চরিত্র, জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা, সাইমন কমিশনের সুপারিশ, নেহরুর নেতৃত্বে গঠিত সর্বদলীয় কমিটিতে সম্পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা এবং আঞ্চলিক স্বাধীনতার দাবি, গান্ধীজির নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন—এই সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনা ও পরিস্থিতি পরবর্তীকালে ব্রিটিশ শাসককে স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে আবার নতুন করে বিচার-বিবেচনা করতে বাধ্য করে। গোলটেবিল বৈঠক, দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠস, ম্যাকডোনাল্ড প্রস্তাব, শুনা চুক্তি, তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক সব কিছুর মিলিত প্রভাব ও চাপের পরিণতি হিসাবে অবশেষে ১৯৩৫ সালের

ভারত শাসন আইন (The Government of India Act, 1935) প্রবর্তিত হয়। এই আইনে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে ব্রিটিশ সরকার নীতিগত ও আইনগতভাবে স্বীকৃতি দেয়। স্বাধীন ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উৎস ও প্রেণা হিসাবে অনেকেই এই আইনের কথা বলেন। এই আইনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি হল ঃ

(১) বৃহত্তর ভারত অর্থাৎ ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলিকে নিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য এক যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা।

(২) ১১টি গভর্নরশাসিত প্রদেশকে স্বাতন্ত্র্য দান।

(৩) এই যুক্তরাষ্ট্র হবে দেশের এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থাকে ভেঙে প্রদেশগুলির হাতে ক্ষমতা অর্পণ করে বিভক্তিকরণ পদ্ধতির (Process of disaggregation) ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্র। প্রচলিত যুক্তরাষ্ট্রের একত্রীকরণের পদ্ধতির (Process of aggregation) সম্পূর্ণ বিপরীত এই পদ্ধতি।

(৪) এই আইনের সপ্তম সূচী (Schedule VII) মেনে ক্ষমতার তিনটি তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছিল—কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক ও যুগ্ম তালিকা। অবশিষ্ট বা তালিকা-বহির্ভূত ক্ষমতা (resudiary or unenumerated power) সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা ছিল গভর্নর জেনারেলের হাতে, তিনি ইচ্ছামতো এই ক্ষমতা কেন্দ্র বা প্রদেশকে সমর্পণ করতে পারবেন।

(৫) যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত ছিল বটে তবে প্রচলিত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মতো ওই আদালতের ক্ষমতা ছিল না।

(৬) দ্বিকক্ষবিশিষ্ট যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার প্রস্তাব কবে নিম্নতর কক্ষকে যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা (Federal Assembly) এবং উচ্চতর কক্ষকে রাষ্ট্রীয় পরিষদ (Council of States) নামে অভিহিত করা হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যরা প্রদেশগুলি থেকে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হবেন কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভায় প্রদেশগুলি থেকে পরোক্ষভাবে এবং পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে নির্বাচিত হবেন ওই ব্যবস্থা ছিল।

প্রান্তলিপি ঃ

* **রাওলাট আইন** ছিল বিনা বিচারে আটক, যথেষ্ট দণ্ডদান ও নিপীড়ন এবং সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত ব্রিটিশ সরকারের এই কুখ্যাত আইন।

* **সাইমন কমিশন** হল স্যার জন সাইমনের (Sir John Simon) নেতৃত্বে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ৭ জন সদস্যকে নিয়ে গঠিত কমিশন। ভারতে তথ্যানুসন্ধানের জন্য নিযুক্ত এই কমিশন ১৯৩০ সালে এদেশের বিচিত্রময়ী সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সুপারিশ করে।

(৭) প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের কথা বলা হলেও এই আইনে প্রদেশের শাসন ও আইন প্রণয়নে সীমাবদ্ধতা ছিল কিছু কিছু আইনের ক্ষেত্রে গভর্নর জেনারেলের পূর্বানুমতি নেবার প্রয়োজন ছিল। অনেক ক্ষেত্রেই গভর্নর স্ব-বিবেচনা অনুসারে চলতেন এবং গভর্নর জেনারেলের নিয়ন্ত্রাধীন থাকতেন।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, বাস্তব কার্যকারিতার দিক থেকে অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও ভারতবর্ষে দায়িত্বশীল শাসন ও যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। ওই আইনের উপর ভিত্তি করেই ১৯৩৭ সালের পর প্রাদেশিক শাসনগুলিতে কিছুটা হলেও যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির প্রভাব পড়েছে। স্বাধীনতার পর ভারতের নতুন সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর যে পরিকল্পনা হয়েছে তা একরকম ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অনুসরণ বলা যায়।

এবার আসুন গণপরিষদের সদস্য সংবিধানরচয়িতাদের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে ভাবনা কী ছিল সে বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করি।

সংবিধানপ্রণেতারা এদেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে যে প্রচলিত বিশেষ তত্ত্ব বা যুক্তরাষ্ট্রের একটি স্থির অর্থকে সামনে রেখে বিচার করেছিলেন তা নয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে গ্রহণ করায় পেছনে দেদেশের সমকালীন ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা, সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা এবং অবশ্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, সুইটজ্যারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া এসব দেশের যুক্তরাষ্ট্রের গঠনপ্রণালী ও কার্যপদ্ধতির ধারাটিকে বিচার করেছেন। সন্দেহ নেই নিজেদের দেশের ক্ষেত্রে বিদেশের অভিজ্ঞতাকে যেমনভাবে, যতটা সুবিধামতো ব্যবহার করা যায়, সেইভাবেই তাঁরা ব্যবহার বা পছন্দ করেছেন। ড.

রাজেন্দ্র প্রসাদের কাছে সংবিধানের উদ্দেশ্যটিই ছিল আসল কথা, সংবিধানের পরিচয় যুক্তরাষ্ট্র বা এককেন্দ্রিক যাই হোক না কেন। গ্র্যানভিল অস্টিন মনে করেন, ভারতের বিচিত্র চাহিদার কথা মাথায় রেখে গণপরিষদ একটি নতুন ধরনের যুক্তরাষ্ট্র এদেশের জন্য উপস্থাপনা করেছে (''The Assembly, in fact, produced a new kind of federation to meet India's peculiar needs.'' Granville Austin)। দেশের জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার খসড়া প্রস্তাব পেশ করার সময় গণপরিষদের সদস্যদের মধ্যে কেন্দ্রগত বা প্রাদেশিক—এ ধরনের কোনও বিরোধ ছিল না। সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রের এই ভাবনাকেই তাঁরা রূপ দিতে চেয়েছেন। ড. আম্বেদকর অবশ্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো কঠোর ব্যবস্থা এদেশে চান নি। তিনি চেয়েছেন সময় ও পরিস্থিতির চাহিদামতো এদেশে এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় উভয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে। আম্বেদকর মনে করেন না এদেশে রাজ্যগুলি চুক্তির ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রে মিলিত হয়েছে। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করার কোনও অধিকারও তাদের নেই।

ড. বি. আর. আম্বেদকর, জওহরলাল নেহরু, রাজেন্দ্র প্রসাদ, মৌলনা আবুল কালাম আজাদ, গোবিন্দ বল্লভ পন্থ, আলাদি কৃষ্ণস্বামী আয়ার, কে. এম. পানিক্কর, এন. ডি. আয়েঙ্গার, কে. এম. মুন্সী, কে. টি. শাহ, জগজীবন রাম, এস. পি. মুখার্জী, গোবিন্দ মেনন ইত্যাদিদের উপস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সংবিধান কমিটির সভায় ভারতবর্ষে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারসহ এক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গঠনের পরীক্ষামূলক সিদ্ধান্ত হয়। এই সঙ্গে তিনটি আইনগত সম্পূর্ণ তালিকা (কেন্দ্র, রাজ্য ও যুগ্ম তালিকা) ও কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অবশিষ্ট ক্ষমতা রাখার কথা বলা হয়। নৃপতিশাসিত রাজ্যগুলিকে, বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া প্রদেশগুলির মতো মর্যাদা দেওয়া এবং কেন্দ্রের শাসনবিভাগীয় কর্তৃত্ব আইনবিভাগীয় কর্তৃত্বের সঙ্গে সহব্যাপী রাখার কথাও বলা হয়েছে সংবিদান কমিটির এই সভায়।

২৩.৪ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের গঠনপ্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

এবার আমরা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের গঠনপ্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বিষয়ে আলোচনা করব।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনার প্রথমেই আপনাদের বিচার করতে হবে একটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন—ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার কারণ কী? সংবিধানপ্রণেতারা মনে করেন ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে ওঠার পেছনে স্বাতন্ত্র্য ও ঐক্যের মনোভাব দুটি বিপরীতমুখী শক্তিই একসঙ্গে কাজ করেছে। ভারতবাসী হিসাবে নানা বৈচিত্র্য সত্ত্বেও এক গভীর ঐক্যবোধ এদেশের মানুষের মধ্যে ছিল। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘমেয়াদি স্বাধীনতা সংগ্রাম, নিরাপত্তার আকাঙ্ক্ষা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সুবিধা পাবার ইচ্ছা নানা কারণেই ভারতবাসীর মধ্যে মিলনের ভাব যেমন ছিল তেমনি আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও চেতনা, জীবনধারাগত বৈচিত্র্য, ভৌগোলিক ব্যবধান ও যোগাযোগের সমস্যা, বিরাট দেশ, বিপুল জনসংখ্যা—এইসব কারণে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যের চেতনাও প্রকাশ পেয়েছে। দেশীয় রাজ্যগুলিকে অন্তর্ভুক্তির প্রশ্ন, বিকেন্দ্রীকরণের ভিত্তিতে একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণের ইচ্ছা, দেশ পরিচালনার সমস্যা ও প্রশাসনিক সুবিধা, প্রাদেশিক নেতৃত্বের উদ্ভব—এদেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে এগুলিও বিশেষ নির্ধারক হিসাবে কাজ করেছে।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের গঠনপদ্ধতি এদেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি বিচারে সাহায্য করে। যুক্তরাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে চিরাচরিত মার্কিন ধারাকে আমাদের সংবিধানপ্রণেতারা গ্রহণ করেন নি। 'সার্বভৌম রাষ্ট্র'গুলি স্বেচ্ছামূলকভাবে এক রাষ্ট্রে মিলিত হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি করবে এই মার্কিনী ভাবনা পরিত্যাগ করে ভারতের সংবিধানপ্রণেতারা ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অনুসরণে 'বিভক্তিকরণের পদ্ধতিতে যুক্তরাষ্ট্র' অর্থাৎ এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের মধ্য থেকেই যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা করেছেন। এই পদ্ধতিটি অনেকটা কানাডার যুক্তরাষ্ট্র গঠনপদ্ধতির অনুরূপ অর্থাৎ একই আইনের দ্বারা প্রদেশগুলিকে স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন অঙ্গরাজ্যে পরিণত করে সেগুলিকে যুক্তরাষ্ট্রে মেলাবার ব্যবস্থা হল।

১৯৩৫ সালের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে ভিত্তি করে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের যে ব্যবস্থা সংবিধানপ্রণেতারা করলেন সেই যুক্তরাষ্ট্রের রূপ হল ঃ

(১) ভারতকে রাজ্যসংঘ বা রাজ্যসমূহের ইউনিয়ন (a Union of States) নামে অভিহিত করা হল। ড. আম্বেদকর 'ইউনিয়ন' শব্দটি গ্রহণ করার কারণ হিসাবে জানিয়েছেন, অঙ্গরাজ্যগুলির চুক্তির মধ্য দিয়ে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়নি। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার অঙ্গরাজ্যগুলির নেই। ভারতবর্ষে অঙ্গরাজ্যগুলির যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধা ভোগের অধিকার থাকবে। এই সঙ্গে ভারতবর্ষের সংহতি ও অখণ্ডতাও বজায় থাকবে। ড. আম্বেদকারের কথায়, "The federation is a union because it is indestructible" অর্থাৎ ভারতের যুক্তরাষ্ট্র 'ইউনিয়ন' কারণ এটি অবিনশ্বর।

প্রান্তলিপি ঃ
* ভারতীয় সংবিধানের প্রথম ধারায় বলা হয়েছে, "India, that is Bharat, shall be a Union of States."

(২) পূর্বতন গভর্নরশাসিত প্রদেশগুলিকে ভারতীয় ইউনিয়নের অঙ্গরাজ্যে পরিণত করা হল।

(৩) নৃপতি শাসিত দেশীয় রাজ্যগুলিকে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে আনা হল।

আসুন এবার আমরা দেখি ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী। একথা সত্য, আদর্শ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সব নীতি বা বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের দেশে নেই, তবে এই ব্যবস্থার প্রাথমিক লক্ষণগুলি সবই আমাদের সংবিধানে উপস্থিত।

— ভারতে দু'ধরনের সরকার আছে—জাতীয় বা কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য বা প্রাদেশিক সরকার। এদেশে বর্তমানে রাজ্য সরকারের সংখ্যা ২৫।

— সংবিধানই এদেশের সর্বোচ্চ আইন। সংবিধানই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ক্ষমতার উৎস।

— ভারতে একটি লিখিত সংবিধান আছে, এই সংবিধান পৃথিবীর লিখিত সংবিধানসমূহের মধ্যে বৃহত্তম।

— সংবিধান অনুসারেই ভারতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতাবণ্টন করা হয়েছে। সংবিধানে তিনটি তালিকা নির্দিষ্ট করা হয়েছে—কেন্দ্রীয় তালিকা, রাজ্যতালিকা ও যুগ্মতালিকা। কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত এলাকায় কেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট আইন প্রণয়নের অধিকারী, রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে রাজ্য আইনসভা আইন প্রণয়ন করতে পারবে এবং যুগ্মতালিকাভুক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইনসভা যুগ্মভাবে আইন প্রণয়ন করতে পারবে।

— মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো অনমনীয় সংবিধান না হলেও ভারতের সংবিদান অংশত অনমনীয়। কতকগুলি ক্ষেত্র আছে, যেমন ক্ষমতা বণ্টন সংক্রান্ত প্রশ্নে বা সংবিধান সংশোধনেরপদ্ধতি পরিবর্তনের প্রশ্নে বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করেই সংবিধান সংশোধন করতে হয়। সংবিধান সংশোধনের এই বিশেষ পদ্ধতি হল ঃ পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে (লোকসভা ও রাজ্যসভা) মোট সদস্যসংখ্যার অধিকাংশ উপস্থিত ও ভোট-প্রদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ এবং রাজ্যগুলির অন্তত অর্ধেক আইনসভার সম্মতি।

প্রান্তলিপি ঃ
কেন্দ্র তালিকাভুক্ত ৯৯টি বিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, রেল, ডাক ও তার, মুদ্রা ব্যবস্থা, বিমা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, যুদ্ধ ও শান্তি, পারমাণবিক শক্তি, নাগরিকতা। রাজ্য তালিকাভুক্ত ৬১টি বিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পুলিশ, আইনশৃঙ্খলা, ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব, জনস্বাস্থ্য, স্বায়ত্তশাসন, পূর্ত। যুগ্ম-তালিকাভুক্ত ৫২টি বিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বিবাহ, দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইন, বিদ্যুৎ, সংবাদপত্র, শ্রমিক কল্যাণ, শিক্ষা, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ।

— ভারতের সংবিধান অনুসারে প্রশাসনিক ও রাজস্ব সংক্রান্ত ক্ষমতাও কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে বণ্টিত হয়েছে। সংবিধানে বলা হয়েছে কেন্দ্র যে সব বিষয়ে আইন-প্রণয়ন করতে পারে সেসব বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের এবং যে সব বিষয়ে আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা রাজ্যগুলির হাতে আছে সে সব ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক (শাসন) ক্ষমতা থাকবে

(৭৩,১৬২ ধারা), স্বাধীনভাবে যুগ্ম তালিকা বিষয়ে প্রশাসনিক ক্ষণতা রাজ্যগুলির হাতেই থাকবে। তবে সংসদ আইন করে বিশেষ ক্ষেত্রে শাসনক্ষমতা কেন্দ্রকে দিতে পারে। রাজস্বের ক্ষেত্রে সংবিধানে যে বণ্টনব্যবস্থা আছে তাতে দেখা যায় কেন্দ্রের অনন্য এলাকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কোম্পানি কর, উৎপাদন কর, কৃষি ব্যতীত অন্যান্য আয়ের উপর কর, বাণিজ্য শুল্ক প্রভৃতি। রাজ্যের অন্যান্য এলাকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কৃষি আয়ের উপর কর, কৃষিজমির উত্তরাধিকারের উপর কর, রাজ্যে উৎপাদিত দ্রব্যের উপর অন্তঃশুল্ক, সাধারণ বিক্রয় কর, আমোদ কর, যানবাহন কর, (তপশিল ৭) সংগৃহীত অর্থ কেন্দ্র এককভাবে ভোগ করে না। কতকগুলি কর আছে যা আরোপ করে কেন্দ্র, সংগ্রহ ও ভোগ করে রাজ্য। তবে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে কর ধার্য ও সংগ্রহ করে কেন্দ্র। আবার কতকগুলি ক্ষেত্র আছে যেখানে কর আরোপ ও সংগ্রহ করে কেন্দ্র, সংগৃহীত অর্থ বণ্টন হয় রাজ্যগুলির মধ্যে। রেলপথযাত্রী ও দ্রব্যাদির ভাড়ার উপর কর, সংবাদপত্র ও বিজ্ঞাপনের উপর কর এই তালিকায় পড়ে। এ ছাড়াও কতকগুলি কর আছে যা কেন্দ্রীয় সরকার আরোপ ও সংগ্রহ করে, সংগৃহীত অর্থ কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টিত হয়। আয়কর ও কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুল্ক এই শ্রেণিভুক্ত।

ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত হিসাবে আছে সুপ্রিমকোর্ট। সংবিধানসম্মতভাবে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক বিষয়ে কোন বিরোধ মীমাংসার দায়িত্ব সুপ্রিমকোর্টের হাতেই অর্পণ করা হয়েছে। সংবিধানের ব্যাখ্যাকর্তা ও অভিভাবক হিসাবে সুপ্রিমকোর্টের বিশেষ ভূমিকা আছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো আদর্শ বা কঠোর যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অনেক ক্ষেত্রেই মিল নেই। আপনারা আগেই জেনেছেন, গঠনপদ্ধতি দিক থেকে ভারতের যুক্তরাষ্ট্র কিছুটা ভিন্ন ধরনের। মার্কিনী শাসনব্যবস্থার আদলে নয়, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অনুকরণে যে যুক্তরাষ্ট্র সংবিধানপ্রণেতারা উপহার দিয়েছেন সেটি হল একটি এককেন্দ্রিক ব্যবস্থাকে ভেঙে গড়া এক শিথিল যুক্তরাষ্ট্র। কানাডায় যেভাবে যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি করা হয়েছে সেই একই প্রথা অনুসরণ করে এখানে স্বয়ংশাসিত একক সৃষ্টি করে সেগুলিকে মিলিয়ে দেওয়া হল যুক্তরাষ্ট্রের (ইউনিয়ন) সঙ্গে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো এই এককগুলি (রাজ্যগুলি) কোন সার্বভৌম রাষ্ট্র নয়। ইউনিয়ন অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র এখানে রাজ্যের মধ্যে চুক্তির ফলেও সৃষ্টি হয়নি। এই যুক্তরাষ্ট্র একান্তভাবেই কেন্দ্রপ্রবণ যুক্তরাষ্ট্র।

আসুন এবার আমরা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের এই কেন্দ্রপ্রবণতার লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যগুলিকে শনাক্ত করার চেষ্টা করি।

২৩.৫ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্র-প্রবণতা

(১) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্র-প্রবণতার গতি বিশেষভাবে লক্ষ করা যায় আইনগত ক্ষেত্রে ক্ষমতাবণ্টন সংক্রান্ত ব্যবস্থায়। আইনগত ক্ষেত্রে ক্ষমতাবণ্টনের যে তালিকা আছে তাতে দেখা যায় কেন্দ্রের অনন্য ক্ষমতা (Exclusive power) রাজ্যের তুলনায় সংখ্যায় অনেক বেশি। শুধু তাই নয়, গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সবকটি ক্ষেত্রেই যেমন প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, মুদ্রা, ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ইত্যাদি কেন্দ্রের হাতেই ন্যস্ত। জনস্বাস্থ্য, জনশৃঙ্খলার মতো তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিই রাজ্যের হাতে ন্যস্ত। রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয় 'শিক্ষা'কে যুগ্ম তালিকায় আনা হয়েছে। যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়গুলিতে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েরই আইনের প্রণয়নের ক্ষমতা থাকলেও, এক্ষেত্রে কোনও বিষয় নিয়ে উভয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হলে কেন্দ্রীয় আইনই প্রাধান্য পাবে বলে সংবিধান ২৫৪(২) ধারায় বলা হয়েছে। আইন সংক্রান্ত তিনটি তালিকার ক্ষেত্রে যদি কোনও বিষয় প্রান্তদেশে অবস্থান করছে (overlapping of a matter) বলে মনে হয় তবে সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আইনসভার

প্রান্তলিপি ঃ
অবশিষ্ট ক্ষমতা (Residuary power) বলতে বোঝায় কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও যুগ্ম তালিকাবহির্ভূত বিষয়।

প্রাধান্য থাকবে। কানাডার সংবিধানের মতো ভারতে অবশিষ্ট ক্ষমতা পার্লামেন্টের হাতেই থাকবে বলে সংবিধান জানিয়েছে (২৪৮ ধারা) রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়গুলিতেও অনেক ক্ষেত্রেই কেন্দ্রের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়, যেমন, (ক) রাজ্যসভা যদি মনে করে রাজ্য তালিকাভুক্ত কোনও বিষয় জাতীয় স্বার্থে কেন্দ্র অথবা যুগ্মতালিকাভুক্ত হওয়া উচিত সেক্ষেত্রে রাজ্যসভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে বিষয়টিকে কার্যকর করা যাবে (২৪৯ ধারা)। (খ) জরুরি অবস্থার সময় রাজ্যতালিকাভুক্ত কোনও বিষয়ের উপর কেন্দ্রীয় আইনসভা হস্তক্ষেপ করতে পারে। জাতীয় জরুরি অবস্থারক্ষেত্রে সমস্ত দেশে এবং ৩৫৬ ধারা অনুসারে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা দেখা গেলে কোনও রাজ্যের ক্ষেত্রে পার্লামেন্ট ও রাজ্যের আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা নিজের হাতে নিতে পারে। (গ) দুই বা ততোধিক রাজ্য অনুরোধ জানালে (রাজ্য আইনসভাগুলির দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন থাকা চাই) রাজ্যতালিকাভুক্ত কোনও বিষয়ে পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করতে পারে (২৫২ ধারা)।

(২) প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও কেন্দ্রের প্রাধান্যের বেশ কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। (যেমন, (ক) ভারতীয় সংবিধানের ২৫৬ ধারা অনুসারে প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যের শাসনক্ষমতা পার্লামেন্ট-প্রণীত আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই প্রয়োগ করতে হবে। (খ) জাতীয় স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে বা সামরিক কারণে কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজন মনে করলে রাজ্য সরকারকে যোগাযোগব্যবস্থা ও রাজ্যের অন্তর্গত রেলপথ সংরক্ষণের নির্দেশ দিতে পারে (২৫৭ ধারা)। (গ) তপশিলি উপজাতিদের কল্যাণ বিষয়ক কোনও কর্মসূচি গ্রহণ ও রূপায়ণ বিষয়ে এবং ভাষাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সন্তান-সন্ততিদের জন্য প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষার শিক্ষা পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করতে কেন্দ্রীয় সরকার যথাক্রমে সংবিধানের ৩৩৯(২) এবং ৩৫০-এ ধারা অনুসারে রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিতে পারে। (ঘ) আন্তঃরাজ্য নদী ও নদী উপত্যকা নিয়ে কোনও বিরোধ সৃষ্টি হলে পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করে সেই বিরোধের নিষ্পত্তি করতে পারে (২৬২ ধারা)। (ঙ) বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি করে শাসনকার্যে সংহতি বিধানের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি আন্তঃরাজ্য পরিষদ গঠন করতে পারেন (২৬৩ ধারা)। (চ) জরুরি অবস্থা বা রাজ্যের সাংবিধানিক অচলাবস্থা বা আর্থিক জরুরি অবস্থার সময় কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ দানের ক্ষমতা প্রসারিত হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে আর্থিক উপযুক্ততার নীতি মেনে চলতে নির্দেশ দেয়। [৩৫৩(ক), ৩৫৬(১), ৩৬০(২) ধারা]।

(৩) আর্থিক ক্ষেত্রে কতকগুলি বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সুনিশ্চিত প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। যেমন (ক) গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের উপর কেন্দ্রের অধিকার প্রতিষ্ঠিত (দৃষ্টান্ত আয়কর, উত্তরাধিকার কর)। (খ) কিছু কিছু ক্ষেত্রে কর আদায়ের ক্ষমতা পেলেও রাজ্য সরকারের কর ধার্যের ক্ষমতার উপর বিধিনিষেধ আছে। (গ) রাজ্যগুলিকে অনুদান মঞ্জুরির ক্ষমতাও কেন্দ্রের।

(৪) কেন্দ্রপ্রবণ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে আরও অনেক ক্ষেত্রেই রাজ্য সরকারের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। যেমন (ক) শাসনতন্ত্রের ৩ ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট সাধারণ আইন পাশের পদ্ধতিতে যে কোনো অঙ্গ রাজ্যের সীমানায় পুনর্বিন্যাস করতে পারে। ভারতবর্ষের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে মার্কিন ব্যবস্থার মতো ‘an indestructible Union composed of indestructible States’ অর্থাৎ অবিনশ্বর রাজ্য নিয়ে গড়া অবিনশ্বর ইউনিয়ন বলা যাবে না। ভারতবর্ষে রাজ্যগুলির যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে বেরিয়ে আসার অধিকার নেই, অর্থাৎ অখণ্ড ভারত ত্যাগ করে পৃথক রাষ্ট্র গঠন করার অধিকার তাদের নেই, অথচ রাজ্যগুলির অখণ্ডতার কোনও নিশ্চয়তা নেই। রাজ্যের সীমানাবদলের অধিকার কেন্দ্রর আছে। (খ) জম্মু ও কাশ্মীর বাদে কোনও রাজ্যেরই নিজের সংবিধান রচনার অধিকার নেই। (গ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যের নাগরিকতা পাবার বিধি রাজ্যের অধিবাসীর নেই। এখানে নাগরিকের দ্বৈত-নাগরিকতা

(double citizenship) নয়, শুধুমাত্র ভারতীয় নাগরিকত্ব পাবার অধিকার স্বীকৃত। (ঘ) রাজ্যের সমানাধিকারের নীতিও ভারতবর্ষের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য নয়। রাজ্যসভায় রাজ্যগুলির সমপ্রতিনিধিত্বের দাবি এখানে স্বীকৃতি লাভ করেনি। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের বিশেষ সাংবিধানিক মর্যাদা সংবিধানের ৩৭০ ধারায় সুনিশ্চিত করা হয়েছে। সংবিধানের ৬৯তম ধারা সংশোধন করে দিল্লিকে জাতীয় রাজধানী অঞ্চলের মর্যাদা দান করা হয়েছে। সিকিম, মিজোরাম, অরুণাচল প্রদেশ, গোয়ার জন্যও বিশেষ সাংবিধানিক ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে (সংবিধানের ৩৭১ চ, ছ, জ, ঝ ধারা)। (ঙ) ভারতের আদালত ব্যবস্থাও যুক্তরাষ্ট্রের সংগে সংগতিপূর্ণ নয়। এখানে দ্বৈত-বিচারব্যবস্থা অর্থাৎ কেন্দ্র ও রাজ্যের বিচারব্যবস্থার ভাগ নেই। সমগ্র দেশের জন্য সমজাতীয় যে বিচারব্যবস্থা আছে সুপ্রিমকোর্ট তার শীর্ষে অবস্থান করে। (চ) জনপালন কৃত্যক, নির্বাচনব্যবস্থা, হিসাব ও হিসাবপরীক্ষা-ব্যবস্থা সব কিছুই ভারতবর্ষে এক অখণ্ড ব্যবস্থা। রাজ্য সরকারগুলি এই অখণ্ড ব্যবস্থার নিয়ম ও নীতি অনুসারে পরিচালিত। সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রেও রাজ্যের অধিকার সীমিত।

(৫) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রপ্রবণতার অন্য কতকগুলি বিশেষ নজির হল কেন্দ্রনিয়ন্ত্রিত কিছু প্রতিষ্ঠানগত ব্যবস্থা। রাজ্যের সর্বোচ্চ শাসনবিভাগীয় কর্তৃপক্ষ রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত ও অপসারিত হন এবং তাঁর খুশি অনুসারেই স্বপদে বহাল থাকেন। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, রাজ্যপাল কেন্দ্রের বিশ্বস্ত প্রনিধি হিসাবে অনেক ক্ষেত্রে যে ভূমিকা নিয়েছে তা রাজ্যের স্বার্থের পরিপন্থী। এদেশে জরুরি অবস্থান সংক্রান্ত আইন ও কেন্দ্রের অবাধ হস্তক্ষেপের এক ব্যবস্থা। এই আইন প্রয়োগের মাধ্যমে এদেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে মুহূর্তে এককেন্দ্রিক ব্যবস্থায় রূপান্তরে কোনও বাধা নেই। অর্থ কমিশন, পরিকল্পনা কমিশন, নির্বাচন কমিশন, হিসাবপরীক্ষার প্রতিষ্ঠানগত ব্যবস্থা সব কিছুই কেন্দ্রনির্ভর যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ধারাকেই শক্তিশালী করেছে।

২৩.৬ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রপ্রবণতা বিষয়ে বিতর্ক

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রপ্রবণতা নিয়ে সংবিধানবিশেষজ্ঞ ও গবেষকমহলে বিতর্ক আছে। রাজনীতিবিদেরাও এই বিতর্কে অংশ নিয়েছেন। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সমালোচনা করে জেনিংস বলেছেন ভারত হল একটি প্রবল কেন্দ্রপ্রবণ যুক্তরাষ্ট্র (a federation with strong centralizing tendency)। অধ্যাপক কে. সি. হোয়্যার ভারতের সাসনব্যবস্থাকে আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা (a Qusai-federal system) বলে বর্ণনা করেছেন। রাজ্যের এলাকায়কেন্দ্রীয় সরকার ও পার্লামেন্টের হস্তক্ষেপের ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হিসাবে ভারতের অবস্থানকে সন্দেহজনক করে তুলেছে বলে অধ্যাপক হোয়্যার মনে করেন ("What makes one doubt that the Constitution of India is strictly and fully federal....are the powers of internvention in the affairs of the States given by Constitution to the Central government and parliament." K. C. Wheare)। নতুন রাজ্য গঠনে পার্লামেন্টের ক্ষমতা, রাজ্যের সীমানা পরিবর্তনে পার্লামেন্টের ক্ষমতা, জরুরি অবস্থা জারি ও প্রয়োগে পার্লামেন্ট ও কেন্দ্রীয় সরকারের একচ্ছত্র ক্ষমতা ইত্যাদির দৃষ্টান্ত উপস্থিত করে ভারতকে আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বলাই সংগত বলে অধ্যাপক হোয়্যার মনে করেন। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার শক্তিশালী এককেন্দ্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা পল. আর. ব্রাসও (Paul. R. Brass) বলেছেন এবং তিনি এক্ষেত্রে ভারত শাসন আইন ও ভারতীয় সংবিধানের মধ্যে একটি ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করেছেন।[৮] গণপরিষদের অন্যতম সদস্য কে. এম. পানিক্কর (K. M. Panikkar) পরবর্তীকালে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বাস্তব অভিজ্ঞতার বিচারে কেন্দ্রীকরণের ঝোঁক যে এদেশের প্রবল একথা স্বীকার করেছেন।[৯]

ঐতিহাসিকভাবে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে ১৮৫৮ সালের পর থেকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকের প্রশানিক স্বার্থ

ও সুবিধার প্রয়োজনে গৃহীত ক্ষমতা প্রতিসংক্রমের নীতির (Policy of Devolution of Powers) উত্তরাধিকার হিসাবে ভাবা হয়। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের প্রভাব কেন্দ্রপ্রবণ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিকাশে সাহায্য করেছে। ড. ধীরেন্দ্রনাথ সেন রাজ্যের সীমানা পরিবর্তনে পার্লামেন্টের কর্তৃত্ব, প্রদেশগুলির মধ্যে অসাম্য ও সাংবিধানিক পছন্দের নীতি, রাজ্যতালিকায় কোনও কোনও ক্ষেত্রে সংবিধান চালু হবার পাঁচ বছর পর্যন্ত পার্লামেন্টের আইন প্রণয়নের অধিকার, রাজ্যপাল কর্তৃক রাষ্ট্রপতির অনুমতির জন্য রাজ্য আইনসভা প্রণীত কোন বিল সংরক্ষিত রাখার ক্ষমতা, রাজ্যপাল নিয়োগের পদ্ধতি, জরুরি আইন, ইত্যাদি ব্যবস্থার মধ্যে ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির অপসরণ (detraction) লক্ষ্য করেন। ড. সেন ভারতকে স্বীকৃত বা পরিচিত কোনও যুক্তরাষ্ট্রীয় রীতির সঙ্গে সুসমঞ্জস মনে করেন না। কানাডার প্রণালীর সঙ্গে অবশ্য রূপে এবং সারবস্তুতে (in form and substance) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মিল আছে। ক্ষমতাবণ্টনের কিছু ক্ষেত্র, ক্ষমতাবণ্টনকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত কিছু যুক্তিসংগত বিরোধ এবং সংবিধানসংশোধনের একটি বিশেষ পদ্ধতির উপস্থিতি অবশ্যই ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় উপাদান। তবে এগুলি এককেন্দ্রিক বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের নিয়ন্ত্রণেই চালিত হয়। স্বাভাবিক নিত্যকর্মে এবং জরুরি উদ্দেশ্য (“...it has....centrain federal elments....These, however, are controlled by a unitary steam-roller both as normal routine business and for emergency purposes.” D. N. Sen)।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রপ্রবণতার বিরুদ্ধে ডি. এন. ব্যানার্জী, কে. ডি. রাও, জে. সি. জোহারী, এইচ. ভি. কামাথ, প্রাক্তন স্বতন্ত্র নেতা রাজা গোপালাচারী, বিশিষ্ট মার্কসবাদী নেতা নাম্বুদ্রিপাদ প্রায় সকলেই কমবেশি বলেছেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক মঞ্চে, পত্র-পত্রিকায় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বাস্তব প্রবণতা নিয়ে নানা আলোচনা ও বিতর্ক হয়েছে। সকলেই যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রপ্রবণতা নিয়ে অভিযোগ করেছেন তা নয়। গণপরিষদে কেন্দ্রপ্রবণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে আম্বেদকর সহ অনেকেই যুক্তি দিয়েছেন। দেশীয় রাজ্যগুলির বিরোধিতা ও বিচ্ছেদকামী শক্তির প্রতিষেধ হিসাবে, দেশের অখণ্ডতা ও নিরাপত্তার স্বার্থে, অর্থনৈতিক সংকট ও রাজনৈতিক প্রণেতারা-সহ অনেক বর্তমান লেখকই একথা স্বীকা করেন।

ভাতের সংবিধানকে যুক্তরাষ্ট্র বা এককেন্দ্রিক, এইভাবে বিচার না করে তৃতীয় একদল নিরপেক্ষ একটি দৃষ্টি নিয়ে সমস্যাটিকে বিচার করেছেন। অনেকেই মনে কনের যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রপ্রবণতা একটি স্বাভাবিক ঝোঁক। আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক নতুন পরিস্থিতি এবং পরিবর্তনশীল সমাজের চাহিদা মেটাতে রাষ্ট্রকে বিশেষ দায়িত্ব নিতে হয়। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারগুলির দায়িত্বকে অস্বীকার না করেও বলা যায় কেন্দ্রীয় সরকার শক্তিশালী না হলে নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা অসম্ভব। ভারতবর্ষে কেন্দ্রপ্রবণ যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা অন্যান্য দেশের মতোই একটি স্বাভাবিক ও অনিবার্য ঝোঁক। কেন্দ্রপ্রবণতার অর্থ অবশ্যই রাজ্যের স্বাতন্ত্র্যে আঘাত নয়, বৃহত্তর সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক স্বার্থেই ভারতের মতো দেশে কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়িত্ব নিতে হবে। কেন্দ্রপ্রবণ যুক্তরাষ্ট্র এদেশে দায়িত্বশীল গণতন্ত্রের প্রসারেই সাহায্য করবে।

ভারতের যুক্তরাষ্ট্রকে কেন্দ্রপ্রবণ যুক্তরাষ্ট্র না বলে অনেকে সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্র বলতে চান। কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সহযোগিতার নিদর্শনই ভারতের যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আবিষ্কার করেন গঠনমূলক ভাবনায় প্রভাবিত কোনও লেখক। গ্র্যানভিল অস্টিন মনে করেন, গণপরিষদে যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি বা ব্যবস্থা সম্পর্কে খসড়া প্রস্তাব গ্রহণ করার সময়ে কেন্দ্রবাদী ও আঞ্চলিকতাবাদীদের মধ্যে কোনও বিরোধ ছিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিলাডেলফিয়ার ১৭৮৭ সালে বা কানাডায় অস্টারিও ও কুইবেকের মধ্যে এ প্রশ্নে যে গভীর স্বার্থের সংঘাত ছিল ভারতে গণপরিষদের কার্যবিবরণীতে সে ধরনের কোনও বিরোধের প্রতিফলন ঘটেনি। এ. এইচ. বার্চ (A. H. Birch) প্রমুখরা সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রের যে ধারণা উপস্থিত করেছেন ভারতের গণপরিষদ প্রথম থেকেই সেই ভাবনাকেই সাগ্রহে গ্রহণ করেছেন (“The Assembly was perhaps the first constituent body to embrace from the start what A. H. Birch and others have called ‘co-operative federalism’—Austin)। ভারতে সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রের ভাবনাকে প্রচার করেন বিশিষ্ট আদর্শকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের একটি

বৈশিষ্ট্য বলে মনে করেন। কেন্দ্র-রাজ্য পরস্পরনির্ভরতা ও সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে নানা ব্যবস্থার মাধ্যমে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন স্তরের মন্ত্রী ও প্রতিনিধিদের মধ্যে সম্মেলন, আন্তঃরাজ্য পরিষদ, আঞ্চলিক পরিষদ, জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ গঠন ইত্যাদি।

বিশিষ্ট সংবিধান-বিশেষজ্ঞ দুর্গাদাস বসু মনে করেন ভারতকে অতিমাত্রায় যুক্তরাষ্ট্রীয় বা কেন্দ্রপ্রবণ যুক্তরাষ্ট্র যেভাবেই চিহ্নিত করা হোক না কেন ভারতবর্ষে রাজ্যের অধিকার নেই বা যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্য এদেশে ম্লান বা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে এরকম ভাবার কোনও কারণ নেই। কেন্দ্রের অস্বাভাবিক আর্থিক প্রাধান্য এবং রাজ্যগুলির কেন্দ্রনির্ভরতা এদেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ভারসাম্য নষ্ট করেছে এই অভিযোগ মাত্রার দিক থেকে সমর্থনযোগ্য হলেও; নীতির দিক থেকে নয়, কারণ কেন্দ্রের আর্থিক নিয়ন্ত্রণ দেশের সমরূপ বিকাশের স্বার্থেই প্রয়োজন। কেন্দ্র-রাজ্যের নিজস্ব স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের সাবেকি তত্ত্বের পরিবর্তে আজ কেন্দ্র-রাজ্য সহযোগিতা ও পরস্পরনির্ভরতার তত্ত্ব অধিকাংশ দেশে জনপ্রিয় হয়েছে। ভারতবর্ষে দুটি পরস্পরবিরোধী প্রবণতার মধ্যে বোঝাপড়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। এই দুটি প্রবণতা হল স্বাভাবিক ক্ষমতাবণ্টনের ধারায় রাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য ও তাদের রাজস্ববৃদ্ধির ক্ষমতা এবং দ্বিতীয়টি হল জাতীয় সংহতি ও শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজনীয়তা। ভারতীয় সংবিধানের বিভিন্ন ধারার ব্যাখ্যায় বিচারবিভাগ এই দুই পরস্পরবিরোধী প্রবণতার ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার কথা বলেছে। ভারতে কেন্দ্রপ্রবণতা আছে একথা স্বীকার করেও বলতে হয় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু অক্ষুণ্ণ আছে কেবলমাত্র বিভেদকামী শক্তির প্রতিষেধ হিসাবে নয়, রাজ্যগুলিও আজ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে নিজেকে সক্রিয় করেছে, বহু অঞ্চল রাজ্যের অধিকার চালইছে। রাজ্য আজ কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্ট নয়, বিভিন্ন রাজ্য বিভিন্ন দলের সরকার একথা প্রমাণ করে। রাজস্বক্ষমতার দাবিতে রাজ্যে রাজ্যে আন্দোলন একথা প্রমাণ করে যে রাজ্যগুলিও ভারতীয় রাজনীতিতে আজ প্রবল শক্তি হিসাবে উঠে আসছে।

দুর্গাদাস বসু ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের নানা সম্ভাবনা, বাস্তব নানা গতি লক্ষ্য করে বলেছেন ভারতের সংবিধানকে পুরোপুরি যুক্তরাষ্ট্রীয় বা এককেন্দ্রিক কোনোটাই বলা যাবে না। এটি হল উভয়ের সংমিশ্রণে গঠিত এক অভিনব ধরনের ইউনিয়ন বা সংযুক্ত রাষ্ট্র (''....the Constitution of India is neither Surely federal nor purely unitary but is a combination of both. It is a Union or composite state of novel type.''—D. Basu)।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের স্বাভাবিক গতিটি যাতে বজায় রাখা যায়, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ককে যাতে সত্যসত্যই উন্নত করা যায় সে ব্যাপারে সরকারি ও বেসরকারিভাবে নানা মতামত ও সংস্কারের প্রস্তাব এসেছে। এই পাঠের মূল আলোচনার শেষ অনুচ্ছেদে আসুন আমরা সেইসব মতামত ও প্রস্তাবগুলিকে সংক্ষেপে বিচার করি।

২৩.৭ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সংস্কার ও পুনর্বিন্যাস সম্পর্কে মতামত ও প্রস্তাব

নতুন ও পরিবর্তিত পরিস্থিতির পটভূমিতে কেন্দ্রপ্রবণ যুক্তরাষ্ট্রের পরিবর্তে সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রের ভাবনাকেই অধিকাংশ লেখক স্বাগত জানাতে চান। শক্তিশালী কেন্দ্র দেশের নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ এবং দেশের ভারসাম্যযুক্ত উন্নয়নের সহায়ক এই যুক্তিকে মেনে নিয়েও অনেকেই ভারতের প্রচলিত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিমার্জন হোক আশা করেন। দেশের বৈচিত্র্য শক্তিশালী আঞ্চলিক দলগুলির উত্থান, প্রদেশে ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে উন্নয়নের দাবি, বিভিন্ন রাজ্যগুলিতে কেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার আন্দোলন, রাজ্যে ও কেন্দ্রে পৃথক দলীয় সরকার এইসব প্রবণতা একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় প্রচলিত কাঠামোগত পরিবর্তন না হলেও কার্যগত পরিবর্তন প্রয়োজন। রাজ্যগুলি যে আজ আগের মতো শুধুমাত্র গ্রাহকের ভূমিকায় নেই একথা মরিস-জোনস্-এর (Marris-Jones) মতো কোনও কোনও লেখক স্বীকার করেন (....the states are not entirely on the receiving end) সম্পদ সংগ্রহ, পরিকল্পনা গ্রহণ, শিক্ষার প্রসার, জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের স্বার্থরক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির ভূমিকা কম নয়। সুতরাং আইনগত আর্থিক ও প্রশাসনিক

ক্ষমতাবন্টনের সাংবিধানিক পদ্ধতির কিছুটা পরিবর্তন প্রয়োজন। কেন্দ্রের নির্দেশদানের ক্ষমতা, জরুরি অবস্থা জারির ক্ষমতা, রাজ্যে রাজ্যপালের মাধ্যমে ক্ষমতার অপপ্রয়োগ, রাজ্যের স্বাধিকার ও স্বাতন্ত্র্যের পরিপন্থী। এসব ক্ষেত্রে কেন্দ্রের ক্ষমতা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে যাতে ব্যবহৃত না হয় সে ব্যাপারে সতর্কতা প্রয়োজন। রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষণা নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্য বিরোধ যে স্তরে পৌঁছেছে তা মোটেই কাম্য নয়। এই ক্ষমতার প্রয়োগে সতর্কতা প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গ, কেবল, বিহার, ত্রিপুরা, পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, উত্তরপ্রদেশ প্রায় সব রাজ্যেই কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিন্যাসের দাবি উঠেছে। আর্থিক, প্রশাসনিক, আইনগত ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্যের সম্পর্কের প্রশ্নটি নতুন মাত্রা পায় সত্তরের দশক থেকে। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বামফ্রন্ট সরকার একটি প্রতিবেদনে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের সুপারিশ করে। এর মধ্যে অন্যতম হল ক্ষমতার সুষম বণ্টন, ২৪৯ ধারার বিলোপ, পরিকল্পনা কমিশনের সংস্কার, ৩৫৬ ও ৩৫৭ ধারার বিলোপ, ২০০, ২০১ ধারার পরিবর্তন, রাজ্যসভায় রাজ্যগুলির সমপ্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন, আই. এ. এস ও আই. পি. এস.-এর উপর থেকে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার ইত্যাদি।

কেন্দ্র ও রাজ্যের সম্পর্কের প্রশ্নে পরিকল্পনা কমিশনের ভূমিকা আরও গঠনমূলক হওয়া দরকার বলে মরিস-জোনস্, কে. সুব্বারাও, কে. ভি. রাও, জে. সি. জোহারী প্রমুখরা মনে করেন। পরিকল্পনা কমিশনের সংস্কার বিষয়ে ‘‘রাজমান্নার কমিটি’’ উল্লেকযোগ্য প্রস্তাব রেখেছে, এর মধ্যে অন্যতম হল কিমশনকে স্বাধীন সংস্থায় পরিণত করা, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের কমিশনে নিয়োগ করা, কমিশনের সদস্য হিসাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের গ্রহণ না করা, রাজ্যের প্রকল্পে কমিশনের পরামর্শদান ইত্যাদি। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের কাজকর্ম আরও গঠনমূলক করা প্রয়োজন বলে মনে করেছেন। বিশিষ্ট প্রশাসন-বিশেষজ্ঞ এস. আর. মহেশ্বরী, অশোক চন্দ, সংবিধানবিশেষজ্ঞ মরিস-জোনস্, কে. শান্তনমা ক্ষমতাবণ্টন-ব্যবস্থার পরিমার্জন প্রয়োজন বলে মনে করেছেন। সংবিধান-বিশেষজ্ঞ এম. ভি. পাইলি, পরিকল্পনা কমিশনের বিশিষ্ট সদস্য রাজকৃষ্ণ (Rajkrishna) রাজস্ববণ্টন নীতির পরিবর্তন চেয়েছেন। রাজ্যের প্রশাসনিক দায়িত্ব ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে রাজ্যকে আরও বেশি অঙ্গীকারবদ্ধ করার প্রয়োজন আছে বলে অনেকেই মনে করেন। আন্তঃরাজ্য পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদের কাজকর্মেও আরও গতি আনা দরকার বলে অনেকে মনে করেন।

ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় পুনির্বিন্যাস ও কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের উন্নতির কথা ভেবে ১৯৮৩ সালে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর উদোগে একটি কমিশন গঠিত হয়। তিন সদস্যবিশিষ্ট এই কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন সুপ্রিমকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি আর. এস. সারকারিয়া। এই কমিশন সারকারিয়া কমিশন নামে পরিচিত। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য অনুসারে এই কমিশন সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে থেকেই কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের কার্যকর দিক নিয়ে পর্যালোচনা করবে এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ করবে। কমিশনের সভাপতি কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের প্রশ্নে গুরত্ব দেন। আইন সংক্রান্ত ক্ষমতাবণ্টন, রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রের নির্দেশদান, রাজ্যপালের ভূমিকা, রাষ্ট্রপতির শাসন, আন্তঃরাজ্য পরিষদ, পরিকল্পনা কমিশন, পরীক্ষানিরীক্ষা করবে ও সুপারিশ করবে বলে সভাপতি আশ্বাস দেন। কমিশন রাজ্য সরকার, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে একটি প্রশ্নমালা পাঠায় এবং তাঁদের মতামত ও তথ্যাদি পাঠাতে অনুরোধ করে। ৪ বছর পর ১৯৮৭ সালে ৪,১০০ পৃষ্ঠার এক প্রতিবেদন কমিশন সরকারের কাছে পেশ করে। কমিশনের সুপারিশের মূল কথাগুলি হল ঃ

— কমিশন ভারতীয় শাসনব্যবস্থাকে আকৃতিতে যুক্তরাষ্ট্র ও প্রকৃতিতে এককেন্দ্রিক মনে করে। কমিশন শক্তিশালী কেন্দ্রের ধারণাকে সমর্থন করে, তবে অঙ্গরাজ্যগুলিও যাতে নিজস্ব ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আইনগত, প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা পায় এবং কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে যাতে ক্ষমতার সমন্বয় থাকে সে ব্যাপারে কমিশন দৃষ্টি দিয়েছে।

— কেন্দ্রীয় তালিকায় অন্তর্ভুক্ত অবশিষ্টাংশকে যুগ্মতালিকায় আনা, রাজ্যে স্থানীয় সংস্থাসমূহের কার্যসম্পাদন সুনিশ্চিত করতে রাজ্য তালিকাভুক্ত ৫টি বিষয়ের পরিবর্তন, রাজ্যগুলিকে কোম্পানি করের অংশদান, কৃষি আয়কর ইত্যাদির ব্যাপারে কমিশন সুপারিশ করেছে।

— কমিশন মনে করেছে স্বাধীনতার পর জাতীয় প্রয়োজনেই কেন্দ্রের ক্ষমতা বেড়েছে, সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে রাজ্য তালিকা থেকে কিছু বিষয় যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজন ছিল। তবে আন্তঃরাজ্য পরিষদের বদলে আন্তঃসরকারি পরিষদ কেন্দ্র-রাজ্য প্রশাসনিক সমস্যা নিয়ে ভাববে এবং পরিষদের কাজের ক্ষেত্রে নতুন গতি আনা দরকার বলে কমিশন জানিয়েছেন। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের কাজের সমালোচনা করলেও কমিশন রাজ্যপালের ভূমিকা বা জরুরি অবস্থা সম্পর্কে নীরব থেকেছে। ৩৫৬ ধারার অপব্যবহার সম্পর্কে অবশ্য কমিশন পর্যালোচনা ও মন্তব্য করেছে। কেন্দ্রীকরণের প্রাবল্য, রাজ্য সরকারের স্বাতন্ত্র্য ও আর্থিক সম্পর্ক বৃদ্ধি বা আর্থিক নীতি প্রণয়নে অঙ্গরাজ্যের দায়িত্ব বিষয়ে কমিশন উদাসীন থেকেছে।

২৩.৮ সারাংশ

সাধারণ অর্থে যুক্তরাষ্ট্র হল একই রাষ্ট্রে দুটি সরকারের পাশাপাশি অবস্থান, জাতীয় ঐক্য ও রাজ্যের অধিকার এই দুটি লক্ষ্যের দিকে চেয়েই যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়। জাতীয় ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতাবণ্টন সংবিধানের প্রাধান্য এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের উপস্থিতি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। আঞ্চলিকতা ও বিচ্ছিন্নতার ভাবনা প্রশ্রয় পায় এ অভিযোগ থাকলেও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রধান সুবিধা হল জাতীয় ঐক্য, বৈচিত্র্য ও স্বায়ত্তশাসনের দাবি এখানে সমানভাবে মর্যাদা পায়।

ভারতের সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্র কথাটি সরাসরি ব্যবহৃত না হলেও ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হিসাবেই পরিচিত। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন ও ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিকাশে সহায়তা করেছে। ভারতের সংবিধান-রচয়িতাগণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রচলিত তত্ত্ব ও ব্যবহার দিয়ে এই ব্যবস্থাকে বিচার করেননি। দেশের সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখে কেন্দ্রপ্রবণ এক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে এদেশে রূপ দেবার কথা তাঁরা ভেবেছিলেন।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের গঠনপদ্ধতি হল 'বিভক্তিকরণের পদ্ধতিতে যুক্তরাষ্ট্র অর্থাৎ এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে থেকেই যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনার লক্ষ্য হল একই আইনের দ্বারা প্রদেশগুলিকে স্বাতন্ত্র্য সম্পন্ন অঙ্গরাজ্যে পরিণত করে তাদের যুক্তরাষ্ট্রে মেলাবার ব্যবস্থা। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি হল কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অস্তিত্ব, এদের মধ্যে ক্ষমতাবণ্টন, লিখিত সংবিধান, অংশত অনমনীয় সংবিধান, সংবিধানের প্রাধান্য এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত হিসাবে সুপ্রিমকোর্টের উপস্থিতি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো আদর্শ বা কঠোর যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের মিল নেই।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র প্রধানত একটি কেন্দ্রপ্রবণ যুক্তরাষ্ট্র। নানা ক্ষেত্রেই এই কেন্দ্রপ্রবণতা প্রকট। আইনগত, আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কেন্দ্রপ্রবণতা অত্যন্ত প্রবল। অঙ্গরাজ্যের সীমানা পরিবর্তনে কেন্দ্রীয় আইন সভার ক্ষমতা, রাজ্যসভায় রাজ্যগুলির সম-প্রতিনিধিত্বের নীতির অনুপস্থিতি, রাজ্যের পৃথক সংবিধানের অস্তিত্ব, আদালতব্যবস্থা এবং জনপালন কৃত্যক ও নির্বাচনব্যবস্থার অখণ্ডতা, দ্বি-নাগরিকতার অনুপস্থিতিতে কেন্দ্রপ্রবণ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্য কতকগুলি দৃষ্টান্ত। রাজ্যপাল, জরুরি ব্যবস্থা, অর্থ কমিশন ইত্যাদির মধ্যেও কেন্দ্রপ্রবণতার লক্ষণ অত্যন্ত স্পষ্ট।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রপ্রবণতা নিয়ে নানা সমালোচনা ও বিতর্ক আছে। প্রবলভাবে কেন্দ্রপ্রবণ যুক্তরাষ্ট্র, আধা-যুক্তরাষ্ট্র নামে সমালোচকমহলে পরিচিত হলেও ভারতকে সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্র এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সংমিশ্রণে সৃষ্ট এক অভিনব ধরনের ইউনিয়ন বা সংযুক্ত রাষ্ট্রও বলা হয়।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পুনর্বিন্যাসে বা পরিমার্জন ঘটিয়ে এদেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে আরও পরিণত, গঠনমূলক করে তোলা যায় কি না সংবিধান-বিশেষজ্ঞ ও রাজনৈতিক গবেষকেরা তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করেছেন। ১৯৮৩ সালে বিচারপতি, সারকারিয়ার নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করে ভারতে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু নতুন

প্রস্তাব ও সুপারিশ গ্রহণের এক প্রচেষ্টা সরকারের তরফে হয়েছিল। ১৯৮৭ সালে কমিশন সরকারের কাছে তার সুপারিশ পেশ করেন।

২৩.৯ অনুশীলনী

(১) সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে বাক্যটি সম্পূর্ণ করুন ঃ

(ক) ভারত একটি (i) এককেন্দ্রিক (ii) যুক্তরাষ্ট্রীয় (iii) আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা।

(খ) (i) ভারত (ii) কানাডা (iii) যুক্তরাষ্ট্রীয় একটি আদর্শ যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত।

(গ) সংবিধানের প্রাধান্য যুক্তরাষ্ট্রের একটি (i) চিহ্ন (ii) চিহ্ন নয়।

(ঘ) ভারতের বর্তমান সংবিধানে 'শিক্ষা' (i) কেন্দ্রতালিকার (ii) যুগ্মতালিকার (iii) রাজ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত।

(ঙ) ভারতীয় ইউনিয়নে অঙ্গরাজ্যের সংখ্যা হল (i) ২২ (ii) ২৫ (iii) ২৭।

(চ) ভারতের যুক্তরাষ্ট্র (i) একত্রিকরণ (ii) বিভক্তিকরণের ভিত্তিতে গঠিত।

(ছ) ভারতের শাসনব্যবস্থা আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয় বলেছেন (i) এ. ভি. ডাইসি (ii) মরিস-জোন্স (iii) কে. সি. হোয়্যার (iv) দুর্গাদাস বসু।

(২) ক স্তম্ভের নাম বা শব্দগুচ্ছের সঙ্গে খ স্তম্ভের নাম বা শব্দগুচ্ছের মিল দেখান ঃ

স্তম্ভ ক	স্তম্ভ খ
(i) ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন	(i) শাসনতন্ত্র অনুসারে ক্ষমতাবণ্টন
(ii) ভারত একটি	(ii) অবশিষ্ট ক্ষমতা
(iii) যুক্তরাষ্ট্রে অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য	(iii) আন্তঃরাজ্য পরিষদ
(iv) কেন্দ্র, রাজ্য ও যুগ্মতালিকাবর্হির্ভূত বিষয়	(iv) রাজ্যসংঘ
(v) সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্র	(v) দ্বি-জাতীয় সরকার

(৩) একটি বা দুটি বাক্যে প্রশ্নগুলির উত্তর করুন ঃ

(ক) যুক্তরাষ্ট্রের একটি সংজ্ঞার্থ প্রদান করুন।

(খ) যুক্তরাষ্ট্রের তিনটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

(গ) যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এককেন্দ্রিক ব্যবস্থার একটি পার্থক্য নির্দেশ করুন।

(ঘ) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে সংবিধানে কীভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে?

(ঙ) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

(চ) ভারতে কেন্দ্রপ্রবণতার দুটি দৃষ্টান্ত দিন।

(ছ) ভারতে কেন্দ্র ও রাজ্যতালিকা থেকে দুটি করে বিষয় উল্লেখ করুন।

(জ) ভারতে যুগ্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত দুটি বিষয়ের নাম করুন।

(ঝ) সমবায়িক যুক্তরাষ্ট্র বলতে কী বোঝেন?

(ঞ) সারকারিয়া কমিশন কোন্ সালে গঠিত হয়েছিল?

(৪) সংক্ষেপে উত্তর করুন (৫০টি শব্দের মধ্যে) ঃ

(ক) যুক্তরাষ্ট্র বলতে কী বোঝেন? যুক্তরাষ্ট্র ও রাষ্ট্রসমবায়ের পার্থক্য বুঝিয়ে দিন।

(খ) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?

(গ) ভারতকে কেন্দ্রপ্রবণ রাষ্ট্র হিসাবে গ্রহণ করার যুক্তি কী?

(ঘ) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রপ্রবণতার চারটি দৃষ্টান্ত দিন।

(৫) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর করুন (অনাধিক ১৫০ শব্দে) ঃ

(ক) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

(খ) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে কেন্দ্রপ্রবণ যুক্তরাষ্ট্র বলা হয় কেন?

(গ) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে সংবিধানবিশেষজ্ঞের মতামত আলোচনা করুন।

(ঘ) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পুনর্বিন্যাস সম্পর্কে মতামত ও প্রস্তাবগুলি আলোচনা করুন।

২৩.১০ উত্তরমালা

[২.৫ অংশের প্রশ্নগুলির উত্তর বর্তমান উত্তরমালা/উত্তরসংকেত দেখে মিলিয়ে নিল।]

(১) (ক) ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা।
(খ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি আদর্শ যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত।
(গ) সংবিধানর প্রাধান্য যুক্তরাষ্ট্রের একটি চিহ্ন।
(ঘ) ভারতের বর্তমান সংবিধানে শিক্ষা যুগ্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত।
(ঙ) ভারতের ইউনিয়নে অঙ্গরাজ্যের সংখ্যা হল ২৫।
(চ) ভারতের যুক্তরাষ্ট্র বিভক্তিকরণের ভিত্তিতে গঠিত।
(ছ) ভারতের শাসনব্যবস্থা আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয় বলেছেন কে. সি. হোয়্যার।

(২) ক স্তম্ভের শব্দ বা শব্দগুচ্ছের সঙ্গে খ স্তম্ভের শব্দ বা শব্দগুচ্ছের মিল দেখান ঃ

স্তম্ভ ক	স্তম্ভ খ
(i) ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন	(i) দ্বি-জাতীয় সরকার (v)
(ii) ভারত একটি	(ii) রাজ্যসংঘ (iv)
(iii) যুক্তরাষ্ট্রে অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য	(iii) শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ক্ষমতাবণ্টন (i)
(iv) কেন্দ্র, রাজ্য ও যুগ্মতালিকাবর্হিভূত বিষয়	(iv) অবশিষ্ট ক্ষমতা (ii)
(v) সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্র	(v) আন্তঃরাজ্য পরিষদ (iii)

(৩) (ক) অধ্যাপক এ. ভি. ডাইসির মতে যুক্তরাষ্ট্র একটি রাজনৈতিক যন্ত্র বা জাতীয় ঐক্য ও ক্ষমতার সঙ্গে রাজ্যের অধিকারের সামঞ্জস্য বিধান করে।
(খ) যুক্তরাষ্ট্রের তিনটি বৈশিষ্ট্য হল ঃ (i) শাসনতন্ত্র অনুসারে কেন্দ্র ও রাজ্য-দুইটি সরকারের মধ্যে ‘ক্ষমতাবণ্টন; (ii) সংবিধানের প্রাধান্য (iii) যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত।
(গ) যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এককেন্দ্রিক ব্যবস্থায় মূল পার্থক্য হল যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধানই মৌলিক ও চরম আইন, এককেন্দ্রিক সরকারে কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ণপ্রাধান্য।
(ঘ) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে রাজ্যসংঘ (Union of States) বলে বর্ণনা করা হয়েছে।
(ঙ) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের তিনটি বৈশিষ্ট্য হল (i) শাসনতন্ত্র অনুসারে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ক্ষমতাবণ্টন (ii) লিখিত ও অংশত অনমনীয় সরকার (iii) যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত হিসাবে সুপ্রিমকোর্টের অবস্থান।
(চ) ভারতে কেন্দ্রপ্রবণতার দুটি দৃষ্টান্ত (i) রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়ে জরুরি অবস্থার সময় কেন্দ্র হস্তক্ষেপ করতে পারে (ii) কেন্দ্রের আইনসভা রাজ্যের সীমানা পরিবর্তন করতে পারে।
(ছ) কেন্দ্রতালিকায় দুটি বিষয় হল—প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র, রাজ্যতালিকায় দুটি বিষয় হল—ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব।
(জ) ভারতে যুগ্মতালিকাভুক্ত দুটি বিষয় হল—বিবাহ, দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইন।
(ঝ) সমবায়িক যুক্তরাষ্ট্র হল কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের পরস্পরনির্ভরতা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে পরিচালিত যুক্তরাষ্ট্র।
(ঞ) সারকারিয়া কমিশন ১৯৮২ সালে গঠিত হয়েছিল।

২০.৯ গ্রন্থপঞ্জি

1. Druga Das Basu:—*Introduction to the Constitution of India,* (1999).
2. Granville Austin—*The Indian Constitution Cornerstone of a Nation* (1985).
3. J. C. Johari: *Indian Government and Politics,* Vol-I (1996).
4. Dhirendranath Sen, *From Raj to Swaraj* (1954).
5. K. C. Wheare, *Federal Government* (1963).

একক ২৪ ❑ অধিকার, কর্তব্য, রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি

গঠন

২৪.০ উদ্দেশ্য
২৪.১ প্রস্তাবনা
২৪.২ মূল আলোচনা
 ২৪.২.১ অধিকারের তাৎপর্য ও অর্থ
২৪.৩ ভারতে নাগরিকের মৌলিক াধিকর
২৪.৪ মৌলিক অধিকারগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয়
 ২৪.৪.১ সাম্যের অধিকার
 ২৪.৪.২ স্বাধীনতার অধিকার
 ২৪.৪.৩ শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার
 ২৪.৪.৪ ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার
 ২৪.৪.৫ সংস্কৃতি ও শিক্ষার অধিকার
 ২৪.৪.৬ শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার
২৪.৫ ভারতীয় নাগরিকের মৌলিক কর্তব্য
২৪.৬ রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি ঃ অর্থ ও বৈশিষ্ট্য
 ২৪.৬.১ নির্দেশমূলক নীতির পরিচয়
 ২৪.৬.২ রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতির তাৎপর্য
২৪.৭ সারাংশ
২৪.৮ অনুশীলনী
২৪.৯ উত্তরমালা
২৪.১০ গ্রন্থপঞ্জি

২৪.০ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করলে আপনি

- নাগরিক অধিকারের গুরুত্ব সম্পর্কে সাধারণ কিছু ধারণা লাভ করতে পারবেন এবং সংবিধানের অধিকার লিপিবন্ধ করার প্রয়োজনীয়তা কী তা জানতে পারবেন।
- ভারতীয় সংবিধানে সংরক্ষিত মৌলিক অধিকারগুলির বৈশিষ্ট্য ও বিভিন্ন মৌলিক অধিকারের প্রকৃতি আলোচনা করতে পারবেন।
- ভারতীয় সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত নাগরিকের মৌলিক কর্তব্যগুলি বর্ণনা করতে পাররেন।
- ভারতের সংবিধানভুক্ত নির্দেশমূলক নীতিসমূহের প্রকৃতি ও তাৎপর্য বিচার করতে পারবেন।

২৪.১ প্রস্তাবনা

অধিকার শুধুমাত্র ব্যক্তিত্ববোধের সহায়ক নয়, সমাজ ও ব্যক্তির জীবনকে পরিপূর্ণ করার এক আবশ্যিক শর্ত হল অধিকার। সমাজ বিবর্তন ও রাষ্ট্রের বিকাশ, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রসার মানুষকে অধিকারবোধে সচেতন

করেছে। কর্তব্য, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের দায়িত্ব পালনের এক অঙ্গীকার। ভারতীয় সংবিধানে নাগরিকের অধিকারের সাংবিধানিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য জানতে গেলে মৌলিক অধিকার শীর্ষক আলোচনাটি পাঠ করা বিশেষ প্রয়োজন। আমাদের সংবিধানে মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কেন বা এই অধিকারগুলির বৈশিষ্ট্য কী সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর সংবিধানে লিপিবদ্ধ প্রতিটি মৌলিক অধিকার কী অর্থ, বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য বহন করে তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মৌলিক অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে সংবিধানে নাগরিকদের জন্য কী কী মৌলিক কর্তব্য নির্দেশ করা হয়েছে, এই কর্তব্যগুলির তাৎপর্য ইত্যাদি সম্পর্কেও আপনি অবহিত হতে পারবেন।

রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি একাধারে রাষ্ট্রপরিচালনার কতকগুলি নীতি এবং নাগরিকের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের প্রতিফলন। মৌলিক অধিকারের সঙ্গে এই নীতিগুলির সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে। নির্দেশমূলক নীতি শীর্ষক আলেচনায় আপনি লক্ষ্য করবেন যে, নীতিগুলি শাসনতান্ত্রিক ও সামাজিক সংস্কারের নীতি হিসাবেই গুরুত্বপূর্ণ নয়, গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ ও সমাজতান্ত্রিক ভাবনার প্রসারেও নীতিগুলি সমানভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

২৪.২ মূল আলোচনা

২৪.২.১ অধিকারের তাৎপর্য ও অর্থ

মূল আলোচনার শুরুতেই অধিকার ধারণাটির তাৎপর্য ও অর্থ বিষয়ে কিছু তাত্ত্বিক উপলব্ধি আবশ্যক। আসুন আমরা সংক্ষেপে এই বিষয়ে কিছু আলোকপাত করি। অধ্যাপক হ্যারল্ড ল্যাস্কি তাঁর ‘A Grammar of Politics’ গ্রন্থে লিখেছেন ‘Every State is known by the rights it maintains.’ অর্থাৎ নাগরিক অধিকার সংরক্ষণের মধ্যেই প্রতিটি রাষ্ট্রের পরিচয়। অধিকার ব্যক্তিত্ববোধের সহায়ক এক শর্ত। নানাভাবেই অধিকার কথাটির অর্থ প্রকাশ করা হয়। কেউ বলেন অধিকার ইতিহাসের সৃষ্টি, কোন জাতির শৈশবে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক শর্তাবলি। কারোর মতে অধিকার স্বাভাবিক, জন্মগত, সহজাত, চিরন্তন এক ধারণা। অধিকার আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করার এক ধারণা বা রাষ্ট্র-স্বীকৃত দাবি বলেও কেউ কেউ মনে করেন। অধ্যাপক ল্যাস্কি মনে করেন অধিকার হল সামাজিক জীবনের সেইসব শর্ত যা ছাড়া কোনও ব্যক্তির পক্ষে সর্বোচ্চ আত্মোপলব্ধি সম্ভব নয়। (“Rights, in fact, are those conditions of social life without which no man can seek, in general, to be himself at his best”—Laski.).

সন্দেহ নেই অধিকার কথাটি নানাভাবেই বিশিষ্ট ও তাৎপর্যপূর্ণ : (১) অধিকার ছাড়া আত্মবিকাশের সুযোগ নেই। (২) সমাজের মধ্যেই অধিকারের মূল্য। তবে সমাজ যদি বৈষম্যমূলক হয় তবে সে সমাজে অধিকার মূল্যহীন। (৩) ব্যক্তি, গোষ্ঠী সবার ক্ষেত্রেই অধিকার প্রযোজ্য। (৪) অধিকার স্থান, কাল ও সময়ের আপেক্ষিক। (৫) কর্তব্য ছাড়া অধিকার থাকতে পারে না। সমাজ বা রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব পালন না করলে, একে অপরের অধিকার সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল না হলে ব্যক্তির অধিকারের দাবি থাকতে পারে না। (৬) নানা সামর্থ্যেই ব্যক্তি অধিকার লাভ করে। পৌর অধিকারের মধ্যে আছে স্বাধীন জীবনের নিরাপত্তা। জীবনের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার এই শ্রেণির অধিকারের মধ্যে পড়ে। রাজনৈতিক অধিকার হল নাগিরক হিসাবে ব্যক্তির অধিকার। ভোটদানের অধিকার, নির্বাচিত হবার অধিকার এই অর্থেই তাৎপর্যপূর্ণ। জীবনধারণের জন্য কর্মের বিনিময়ে, শ্রমদানের বিনিময়ে ব্যক্তি যে ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা দাবি করে সেটি হল অর্থিনৈতিক অধিকার। কর্মের অধিকার, পর্যাপ্ত মজুরির অধিকার, অবকাশের অধিকার—এই শ্রেণির অধিকার। নাগরিক যখন তার বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ ঘটাতে চায়, সমাজ ও সমষ্টির কল্যাণ সম্পর্কে সচেতন হতে চায় তখন তার প্রয়োজন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার।

অধিকারকে শুধু ঘোষণার স্তরে আবদ্ধ রাখলে চলবে না। অধিকার সুরক্ষিত না হলে, সরকার ও শাসক অধিকার প্রয়োগ ও কার্যকর করার ক্ষেত্রে তাৎপর্য না হল অধিকার কথাটিই মূল্যহীন হয়ে পড়ে। অধিকার রক্ষার প্রশ্নে রাষ্ট্র তার দায়িত্বকে অবহেলা করতে পারে না। শুধু তাই নয়, অধিকার রক্ষার প্রশ্নে রাষ্ট্রের পক্ষপাতমূলক আচরণও কাম্য নয়। রাষ্ট্র যদি নাগরিক অধিকার সুনিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয় বা রাষ্ট্রের আইন যদি অধিকার সুরক্ষার ক্ষেত্রে নাগরিকের মধ্যে বৈষম্য করে সেক্ষেত্রে সরকারি আইন ও ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বা বিরোধিতা করার অধিকারও নাগরিকের আছে।

ভারতের সংবিধান ও শাসনব্যবস্থায় নাগরিক অধিকার কীভাবে সুরক্ষিত হয়েছে পরবর্তী আলোচনা থেকে সেই বিশেষত্ব সম্পর্কে প্রসঙ্গত কিছু ধারণা লাভ করা যাবে।

২৪.৩ ভারতে নাগরিকের মৌলিক অধিকার

ভারতের সংবিধানের তৃতীয় অংশে 'মৌলিক অধিকার' (Fundamental Rights) এই শীর্ষে' নাগরিক অধিকার লিপিবন্ধ ও সুরক্ষিত হয়েছে। যেসব সুযোগ-সুবিধা ছাড়া ব্যক্তির পক্ষে কোনভাবেই সুস্থ সমাজ-জীবনযাপন সম্ভব নয় তাকেই বলে মৌলিক অধিকার। সাংবিধানিক অর্থে মৌলিক অধিকার হল দেশের সর্বোচ্চ আইনের দ্বারা সংরক্ষিত অধিকার। সবিধান-বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে মৌলিক অধিকার হল গুরুত্বপূর্ণ আইনগত অধিকার। এই অধিকার আইন দ্বারা সংরক্ষিত ও আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য। সাধারণ আইনগত অধিকার (Ordinary legal rights) ও মৌলিক অধিকারের মধ্যে পার্থক্য হল প্রথমটি দেশের সাধারণ আইন দ্বারা সংরক্ষিত। সাধারণ পদ্ধতিতে আইন পাশ করে এই অধিকার রদবদল করা যায়। মৌলি অধিকার সংবিধান দ্বারা সংরক্ষিত এবং সংবিধান-সংশোধন ছাড়া অর্থাৎ সংবিধানের নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ না করে এই অধিকারের রদবদল সম্ভব নয়। ইংলন্ডে ব্যক্তির অধিকার সাধারণ আইনের ভিত্তিতেই সুরক্ষিত এবং আদালত দ্বারা সংরক্ষিত। পার্লামেন্ট এই অধিকার সার্বভৌম সভা বলে পরিবর্তন করতে পারে। অর্থাৎ শাসনবিভাগের ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে নাগরিক অধিকার সুরক্ষিত হলেও; পার্লামেন্টের ক্ষমতার বিরুদ্ধে এখানে কোন রক্ষাকবচ নেই। মার্কিন সংবিধানে শাসনবিভাগ ও আইনবিভাগ উভয়ের হাত থেকেই নাগরিক অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত।

ভারতে সাইমন কমিশন বা ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে মৌলিক অধিকার ঘোষণায় বা লিপিবন্ধ করার ধারণা গুরুত্ব পায়নি কারণ অধিকার কার্যকর করার ইচ্ছা বা পন্থা না থাকলে এই ঘোষণা মূল্যহীন। তবে বর্তমান শতকের বিশেষ দশক থেকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও জনমত প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অধিকারের দাবিতে এদেশের মানুষ সরব হয়। ১৯২৮ সালে মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে সর্বদলীয় সম্মেলনে অধিকারের দাবি ওঠে। সংবিধানপ্রণেতারা মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের প্রশ্নে ব্রিটিশ নেতিবাচক ধারণার চেয়ে মার্কিনী ইতিবাচক ভাবনার দ্বারাই বেশি প্রভাবিত হয়েছেন। মৌলিক অধিকার লিপিবন্ধ করার প্রয়োজন নেই, ভারতে এই তত্ত্ব গৃহীত হয়নি। আদালত অধিকার, বক্তার জন্য আবেদন ও মামলা থেকেও একটা প্রমাণিত হয়েছে লিখিত অধিকারের মূল্য এদেশে আছে। সরকারি হস্তক্ষেপ এবং আইনসভার হস্তক্ষেপ থেকে অধিকারগুলিকে সুরক্ষিত করতেই এগুলি লিপিদ্ধ হওয়া প্রয়োজন বলে সংবিধানপ্রণেতারা মনে করেছেন। সংবিধানের ১৩ ধারা মৌলিক অধিকার সম্পর্কে সংবিধানপ্রণেতাদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে। সংবিধানের ১৩(২) ধারায় বলা হয়েছে এই অংশে প্রদত্ত কোন অধিকার হরণ বা ক্ষুণ্ণ করার জন্য রাষ্ট্র কোনও আইন প্রণয়ন করবে না। কোনও আইন মৌলিক অধিকারের বিরোধী হলে তা বাতিল হয়ে যাবে। কোন আইন অংশত মৌলিক অধিকারের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ হলে, আইনের সেই অসঙ্গতিপূর্ণ অংশটি বাতিল হয়ে যাবে ("The State shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by his part and any law in contravention of this clause, shall, to the extent of the contravention, be void."—Art 13(2)

তবে মৌলিক অধিকার সুরক্ষার প্রশ্নে মার্কিন মডেলের দ্বারা প্রভাবিত হলেও মৌলিক অধিকারের পবিত্রতা নিয়ে ভারতে বিতর্ক থেকেই গেছে। এক্ষেত্রে বিচারবিভাগের রায় ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারেনি। শংকরী প্রসাদ বনাম ভারত সরকারের মামলায় (১৫১) সুপ্রিমকোর্ট বলেছে সংবিধান সংশোধন করে পার্লামেন্ট মৌলিক অধিকার পরিবর্তন করতে পারবে। আবার গোলকনাথ বনাম পঞ্জাব রাজ্য মামলায় (১৯৬৭) সুপ্রিমকোর্ট সম্পূর্ণ বিপরীত রায় দেয় এবং বলে পার্লামেন্ট মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করতে পারে না। ১৯৭১ সালে ২৪তম সংশোধনী আইনে বলা হয় পার্লামেন্ট মৌলিক অধিকার সমেত সংবিধানের যে কোনো অংশ সংশোধন করতে পারবে। ২৫তম সংশোধনী আইনে বলা হয় ৩৯(খ) ও (গ) ধারায় উল্লিখিত নির্দেশমূলক নীতিকে কার্যকর করতে মৌলিক অধিকারের বিরোধী হলেও ঐ আইন বাতিল হবে না। কেশবানন্দ ভারতী মামলায় ২৪ ও ২৫তম সংশোধন আইনকে বৈধ ঘোষণা করে সুপ্রিমকোর্ট বলে মৌলিক অধিকার সংশোধনের অধিকার পার্লামেন্টের আছে তবে সংবিধানের মৌল কাঠামোর (basic structure) পরিবর্তন করা যাবে না। সংবিধান সংশোধনের বৈধতা বিচারের ক্ষমতা আদালতের আছে। ১৯৭৬ সালে ৪২তম সংশোধন আইন পাশ করে বলা হয় পার্লামেন্ট নির্দেশমূলক নীতিকে প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে কোন আইন প্রণয়ন করলে, সেই আইনের বৈধতা বিচারের ক্ষমতা আদালতের থাকবে না। ১৯৮০ সালে মিনার্ভা মিলস্ মামলার কেশবানন্দ ভারতী মামলায় অভিমত সমর্থন করে এবং ৪২তম সংবিধান সংশোধনের বক্তব্যকে চ্যালেঞ্জ করে। ১৯৭৮ সালে জনতা সরকার ৪৪তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সম্পত্তির অধিকার (৩১ ধারা) মৌলিক অধিকার থেকে বাদ দেয়।

মৌলিক অধিকারের সাংবিধানিক পবিত্রতা নিয়ে সংশয় বা এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম কিছু থাকলেও সংবিধানে মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ আছে, মৌলিক অধিকারের বিশেষত্ব বা বৈশিষ্ট্যগুলি হল ঃ

(১) মৌলিক অধিকারগুলির সাধারণ আইনগত অধিকারের মতো নয় দেশের সর্বোচ্চ আইন সংবিধান দ্বারা এগুলি সংরক্ষিত।

(২) সব মৌলিক অধিকার সমানভাবে কার্যকর নয়। ১৪ অনুচ্ছেদে গৃহীত আইনের চোখে সমানাধিকার সরাসরি কার্যকর হয়। আবার ২৩ অনুচ্ছেদে বর্ণিত শোষণের বিরুদ্ধে অধিকারকে কার্যকর করতে হলে বিশেষ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৩) নাগরিকেরা সব মৌলিক অধিকার ভোগের অধিকারী হলেও বিদেশিদের ক্ষেত্রে কিছু সীমা আছে। সরকারি চাকরি পাবার অধিকার (১৬ ধারা) বিদেশীয়দের নেই।

(৪) ভারতবর্ষে ব্যক্তি, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী সবার ক্ষেত্রেই মৌলিক অধিকার প্রযোজ্য।

(৫) সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারগুলি কোন কোন ক্ষেত্রে নেতিবাচক। যেমন ১৪ ধারায় বর্ণিত সাম্যের অধিকারের রাষ্ট্রের প্রতি বিধিনিষেধ (রাষ্ট্র কোনও ব্যক্তিকে আইনের চোখে সমানাধিকার থেকে বঞ্চিত করবে না) আবার ২৫ বা ২৯ ধারায় ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার বা সংস্কৃতি ও শিক্ষার অধিকার ব্যক্তিকে সরাসরি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সুযোগ প্রদান। ওই অর্থে এই দুটি অধিকার ইতিবাচক।

(৬) কতকগুলি অধিকার শাসনবিভাগের প্রতি সীমা বা শাসনবিভাগের উদ্দেশ্যেই বলা। যেমন, সংবিধানের ২১ ধারায় বলা হয়েছে আইন নির্দিষ্ট পদ্ধতি ছাড়া কোনও ব্যক্তিকে তার জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না (No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.)। অন্যদিকে ১৭ ধারায় বর্ণিত, অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে অধিকার বা ১৮ ধারায় খেতাব বিলুপ্তির বিষয়টি আইনবিভাগীয় ক্ষমতার প্রতি সীমা হিসাবেই সংবিধানে দেখা হয়।

(৭) মৌলিক অধিকারগুলি মূলত রাজনৈতিক, সামাজিক প্রকৃতির। অর্থনৈতিক অধিকার মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

(৮) মৌলিক অধিকারগুলি নাগরিকের দাবি হিসেবে স্বীকৃতি পেলেও স্বীকৃত কর্তৃপক্ষের (শাসনবিভাগ ও আইনবিভাগ) দায়িত্ব পালনের মধ্যেই এই অধিকারগুলির প্রয়োগযোগ্যতা বিচার্য।

(৯) মৌলিক অধিকারগুলি অবাধ বা নিরঙ্কুশ নয়। সংবিধান অধিকারগুলির উপর কী কী বাধানিষেধ থাকবে তা নির্দেশ করেছে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, বিচারালয়ের অবমাননা ইত্যাদি যুক্তিসঙ্গত কারণে (Reasonable grounds) অধিকারগুলির উপর সীমা আরোপ করা যেতে পারে। সংবিধান এক্ষেত্রে ব্যক্তির অধিকার এবং সামাজিক স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য করেছে।

(১০) পার্লামেন্ট আইন করে অধিকারগুলিকে সীমিত করতে পারে না মৌলিক অধিকারের সংশোধন করতে পারে। ৪৪তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে বর্জন করা হয়েছে।

(১১) ভারতের সংবিধানে মৌলিক অধিকার স্বীকার করা হলেও এগুলিকে কার্যকর করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। চীন দেশের সংবিধানের অধিকারগুলির উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে এগুলিকে বাস্তবায়িত করতে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলা আছে।

(১২) মৌলিক অধিকারের সঙ্গেই শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকারকে একটি অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে এই অধিকার লঙ্ঘিত হলে নাগরিক কী প্রতিবিধান পেতে পারে তার উল্লেখ আছে। সন্দেহ নেই ভারতের সংবিধানের ক্ষেত্রে এটি এক অভিনব ব্যবস্থা। এখানেই মৌলিক। অধিকারের সঙ্গে সংবিধানের অন্যান্য অনুচ্ছেদে বর্ণিত নাগরিক অধিকারের পার্থক্য। মৌলিক অধিকার ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার প্রযোজ্য নয়।

(১৩) পূর্বে ভারেতর সংবিধানে নাগরিকের অধিকার সংরক্ষিত হলেও নাগরিকের মৌলিক কর্তব্য যুক্ত হয় নি। ৪২তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে (১৯৭৬) মৌলিক কর্তব্যও সংবিধানে যুক্ত হয়েছে [৫১(ক) ধারা]

ভারতীয় সংবিধানে গৃহীত মৌলিক অধিকারগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য বা বিশেষত্বগুলি আপনারা জেনেছেন। এবার আসুন প্রতিটি মৌলিক অধিকারের রূপ ও বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে আমরা পরিচিত হই।

২৪.৪ মৌলিক অধিকারগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ভারতের সংবিধানে নাগরিকের ৬টি মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ হয়েছে। অধিকারগুলি হল (১) সাম্যের অধিকার; (২) স্বাধীনতার অধিকার; (৩) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার; (৪) ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার; (৫) সংস্কৃতি ও শিক্ষার অধিকার এবং (৬) শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার।

২৪.৪.১ সাম্যের অধিকার

সাম্য একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আদর্শ। আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা (১৭৭৬) ও ফরাসি জাতীয় সংসদের অধিকার ঘোষণায় (১৭৮৯) সাম্যের কথা ছিল। সাম্য বলতে বোঝায় আত্মোপলব্ধির জন্য সকলের সমান সুযোগ-সুবিধার স্বীকৃতি। ব্যাপক অর্থে, সাম্য হল আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্যের অনুপস্থিতি। ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় (preamble) মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধার সমতা (Equality of status and of opportunity) সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। সংবিধানের ১৪-১৮ অনুচ্ছেদে নাগরিকের সাম্যের অধিকারের রূপ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রান্তলিপি ঃ
পূর্বে সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকার বলে গণ্য করা হত। ৪২তম সংবিধান সংশোধনে সম্পত্তির অধিকার মৌলিক অধিকার থেকে বাদ পড়েছে।

সংবিধানের ১৪ ধারা বা অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ভারতের ভূখণ্ডের মধ্যে রাষ্ট্র কোন ব্যক্তিকে আইনের দৃষ্টিতে সাম্য অথবা 'আইনসমূহের দ্বারা সমভাবে সংরক্ষিত হবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না (“The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within

the territory of India" Art 14)। সংবিধানের এই ধারায় সাম্য সম্পর্কে দুটি ধারণা ব্যক্ত হয়েছে—আইনের দৃষ্টিতে সাম্য এবং আইনের সমান সংরক্ষণ। আইনের দৃষ্টিতে সাম্য নীতিটি ব্রিটিশ সংবিধান-বিশেষজ্ঞ ডাইসির আইনের অনুশাসন তত্ত্বের দ্বিতীয় নীতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। এই নীতি অনুসারে উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী থেকে সাধারণ নাগরিক সকলেই আইনের চোখে সমান। শাসনবিভাগের স্বৈরাচার থেকে নাগরিককে রক্ষা করার জন্যই এই নীতি—ডাইসির এই ভাবনাই প্রতিফলিত হয়েছে ভারতের সংবিধানে। আইনের সমান সংরক্ষণের ধারণাটি মার্কিন সংবিধানের অনুসরণে গ্রহণ করা হয়েছে। এর অর্থ হল অবস্থা বা প্রকৃতির ভিন্নতা বিচার না করে প্রত্যেক আইনকেই সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রয়োগ করতে হবে। প্রাথমিক দৃষ্টিতে 'আইনের দৃষ্টিতে সাম্য' ও 'আইনের সমান সংরক্ষণ' কথা দু'টি সদৃশ্য মনে হলেও উভয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। আইনের দৃষ্টিতে সাম্য কথাটি নেতিবাচক। এখানে বিশেষ সুযোগ-সুবিধার অনুপস্থিতির কথাই বলা হয়েছে। অন্যদিকে আইনের সমান সংরক্ষণ অর্থ সব পরিস্থিতিতে সকলের প্রতি সমান আচরণ। এক্ষেত্রে সাম্যের ধারণা ইতিবাচক।

আইনের দৃষ্টিতে সাম্য নীতির ব্যতিক্রমগুলিই সংবিধান নির্দিষ্ট করেছে। সংবিধানে বলা হয়েছে (১) রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপাল তাঁদের পদের ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য আদালতের কাছে দায়িত্বশীল থাকেন না। (২) সরকারি কর্মচারীরা কর্তব্যপালনের সময় ফৌজদারি অপরাধ করলেও, রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের অনুমতি ছাড়া তাদের আদালতে অভিযুক্ত করা যাবে না। (৩) বিদেশি রাষ্ট্রদূত বা কূটনীতিবিদের বিরুদ্ধে আদালতে কোনও অভিযোগ আনা যায় না।

আইনের সমান সংরক্ষণ পাবার অধিকারের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হল রাষ্ট্র যুক্তিসঙ্গত ভিত্তিতে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে শ্রেণীবিভাগ করতে পারে এবং আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রভেদ করতে পারে। আনোয়ার আলি বনাম পশ্চিমবঙ্গ (১৫২), চিরঞ্জিতলাল চৌধুরী বনাম ভারত সরকার ও অন্যান্য (১৯৫০), বোম্বাই রাজ্য বনাম বালসারা (১৯৫১) ইত্যাদি মামলায় শ্রেণীবিভাজন ও আইন প্রয়োগেরক্ষেত্রে প্রভেদের পক্ষে আদালত ব্যাখ্যা দিয়েছে। তবে শ্রেণীবিভাজনের সুস্পষ্টতা, সহজবোধ্যতা এবং আইনের উদ্দেশ্যের সঙ্গে শ্রেণীবিভাজনের যুক্তিপূর্ণ সম্পদ থাকা উচিত বলে আদালত মনে করে।

সাম্যের অধিকার সম্পর্কে সংবিধানের আরও ৪টি অনুচ্ছেদ আছে। সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে রাষ্ট্র—ধর্ম, জাতি, বর্ণ, নারী-পুরুষ ও জন্মস্থান ভেদে কোনোরকম বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না (The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them—Art 15(1)। দোকান, রেস্তরাঁ, হোটেল আমোদপ্রমোদের জায়গায় প্রবেশের ক্ষেত্রে বৈষম্য করা চলবে না। রাষ্ট্রের বা রাষ্ট্রের অর্থসাহায্যে চলছে এমন কুয়ো, পুকুর, স্নানের জায়গা, রাস্তা এবং জনসাধারণের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্র বৈষম্যমূলক আচরণ করতে পারবে না। ১৫(২), ১৫(৩) ও ১৫(৪) ধারায় এই অধিকারের ব্যতিক্রমের কথা বলা হয়েছে। ১৫(৩) ধারায় বলা হয়েছে নারী ও শিশুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজনে রাষ্ট্র তাদের অনুকূলে বৈষম্যমূলক আচরণ করতে পারে। ১৫(৪) ধারায় বলা হয়েছে শিক্ষায় ও সামাজিকভাবে অনুন্নত শ্রেণিসমূহ তপশিল বর্ণ ও তফসিল উপজাতিদের অনুকূলে রাষ্ট্র বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

১৬ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে সরকারি চাকরি বা নিয়োগের ব্যাপারে ধর্ম, জাতি, বর্ণ, বংশ, বসবাসের স্থান, জন্মস্থান বা নরনারী বিচার করা চলবে না। তবে কতকগুলি সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে বসবাসের শর্ত আরোপ করা হয়েছে। চাকরি ও নিয়োগের ক্ষেত্রে অনগ্রসর শ্রেণির জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। ধর্মীয় ও ধর্মসম্প্রদায়গত কোনও কাজের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ধর্ম বা সম্প্রদায়ের লোক নিয়োগ বৈধ বলে বিবেচিত হয়েছে।

১৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে অস্পৃশ্যতা দূর হয়েছে এবং এর যে কোনও প্রয়োগই নিষিদ্ধ (Untocuhability is abolished and its practice in any form is forbidden.) অস্পৃশ্যতার জন্য যদি কোনোরকম অসামর্থ্য

সৃষ্টি করা হয় তবে তা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। ১৯৫৫ সালে অস্পৃশ্যতা সংক্রান্ত অপরাধ আইন (The Untouchability (Offences) Act, 1955) পাশ হয়েছে এই অধিকারকে কার্যকর করার জন্য।

১৮ অনুচ্ছেদে সামরিক বা বিদ্যাচর্চা বিষয় ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে খেতাব বা উপাধি প্রদান নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

১৭ ও ১৮ অনুচ্ছেদে সামাজিক সমতার ধারণাকে প্রসারিত করেছে সন্দেহ নেই। ভারতের সংবিধানে আর্থিক সমতা প্রসঙ্গে কিছু বলা হয় নি। সাম্যের অধিকার যতটা ঘোষণার স্তরে আছে, কার্যকারিতার দিক থেকে ততটা গুরুত্ব পায় নি বলে অনেকে প্রশ্ন তোলেন।

প্রান্তলিপি ঃ
সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের স্বার্থ বিবেচনার জন্য সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের ১৬(৪) ধারার সঙ্গে সংবিধানের ৩৩৫ ধারাটির কথাও বিবেচনা করতে বলেছে। ১৯৭৬ সালে অস্পৃশ্যতা সংক্রান্ত অপরাধ আইনের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে।

২৪.৪.২ স্বাধীনতার অধিকার

স্বাধীনতা হল ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক পরিবেশ। সাম্যের মতোই স্বাধীনতা একটি জনপ্রিয় আদর্শ হিসাবে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় গৃহীত হয়েছে। এই আদর্শকে বাস্তবায়িত করতেই ভারতীয় সংবিধানে স্বাধীনতাকে একটি মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের ১৯ থেকে ২২ ধারায় স্বাধীনতার অধিকারের যে সূচি আছে তার মধ্যে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য ১৯ ধারায় বর্ণিত নাগরিকের ৬টি স্বাধীনতার অধিকার। মূল সংবিধানে 'সাতটি' স্বাধীনতার স্বীকৃতি ছিল। ১৯৭৮ সালে ৪৪তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সম্পত্তির স্বাধীনতা বাদ দেওয়া হয়েছে। ১৯(১) ধারায় যে ৬টি স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে সেগুলি হল (ক) বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা (খ) শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সম্মিলিত হবার স্বাধীনতা (গ) সমিতি বা সংঘ গঠনের স্বাধীনতা (ঘ) ভারতের যে কোনো স্থানে স্বাধীনভাবে চলাফেরার স্বাধীনতা (ঙ) ভারতের যে কোনো স্থানে বসবাসের স্বাধীনতা এবং (ছ) পছন্দমতো পেশা, বৃত্তি বা জীবিকা গ্রহণ করার স্বাধীনতা, (১৯(খ) ধারাভুক্ত 'সম্পত্তি ভোগদখল ও ক্রয়-বিক্রয়ের স্বাধীনতা' বাতিল বলে গণ্য হয়েছে।

কোনো আধুনিক রাষ্ট্রই ব্যক্তির অবাধ অধিকারকে স্বীকার করে না। ভারতবর্ষও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। প্রতিটি স্বাধীনতার অধিকারই গুরুত্বপূর্ণ। বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা স্বাধীন সমাজের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য স্বাধীনতার অধিকারগুলিও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। তবে সমাজরে বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভেবেই ভারতীয় সংবিধানে স্বাধীনতার উপর যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ (Reasonable restrictions) আরোপ করা হয়েছে। বাক্ ও মতামত প্রকাশের উপর সাংবিধানিক বাধানিষেধ হল রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, ভারতের সার্বভৌমিকতা ও সংহতি রক্ষা, বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রী, জনশৃঙ্খলা, সদাচার, বিচারালয়ের অবমাননা, মানহানি এবং অপরাধ অনুষ্ঠানে প্ররোচনা। সমবেত হবার স্বাধীনতা, জনশৃঙ্খলা, ভারতের সার্বভৌমিকতা ও অখণ্ডতার স্বার্থে ক্ষুণ্ণ হতে পারে। সমিতি গঠনের ক্ষেত্রেও একই শর্ত আরোপ করা হয়েছে। চলাফেরা, বসবাসের অধিকারের ক্ষেত্রে জনস্বার্থ, তপশিলী উপজাতির স্বার্থ-সংরক্ষণ ইত্যাদির কথা বিচার্য। পেশা, বৃত্তি বা উপজীবিকা গ্রহণের ক্ষেত্রে বৃত্তি বা পেশা বিষয়ে প্রায়োগিক যোগ্যতা রাষ্ট্র আইন দ্বারা নির্দিষ্ট করে দিতে পারে। রাষ্ট্র বা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত কোনো সংস্থাও এক্ষেত্রে আইন করতে পারে। [সংবিধানের (১৯)২) ধারা]

স্বাধীনতার অধিকারের উপর সীমা আরোপ করে ভারতীয় সংবিধান কার্যত ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে এক ভারসাম্য বিধান করেছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের দর্শনকে অনুসরণ করে অবাধ ব্যক্তি সুখ বা স্বাধীনতা নাগরিককে দেবার কথা সংবিধানপ্রণেতারা ভাবেন নি। সংবিধানপ্রণেতারা চেয়েছেন ব্যক্তিস্বাধীনতা সাধারণের স্বার্থে, সাধারণের কল্যাণের বৃহত্তর লক্ষ্যে রাষ্ট্র দ্বারা সীমিত হোক। রাষ্ট্র বলতে শুধুমাত্র কেন্দ্র বা রাজ্যের আইনগত বা শাসনকর্তৃপক্ষ বোঝাবে না, স্থানীয় শাসনকর্তৃপক্ষকেও বোঝাবে। গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য মামলায় (১৯৫০)

বিচারপতি মুখার্জী বলেছেন অবাধ বা অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা বলে কিছু থাকতে পারে না। এই ধরনের স্বাধীনতার অস্তিত্ব নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলার সামিল। অধিকার ঘোষণার ক্ষেত্রে সংবিধান ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং সামাজিক নিরাপত্তার মধ্যে ভারসাম্য বিধান করেছে। সংবিধানের ১৯ ধারায় একদিকে যেমন ব্যক্তিস্বাধীনতার একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে অন্যদিকে তেমনি কিছু নিয়ন্ত্রণের কথা হয়েছে। এর অর্থ জনকল্যাণ ও সাধারণ নৈতিকতার সঙ্গে স্বাধীনতাগুলির কোনও বিরোধ নেই।

সংবিধানের ২০, ২১ ও ২২ ধারায় স্বাধীনতার অধিকার সংক্রান্ত অন্যান্য কিছু ঘোষণা আছে। ২০ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে (১) দোষী ব্যক্তিকে তার অপরাধকালীন সময়ের আইন অনুসারে অপরাধী সাব্যস্ত করতে হবে। অপরাধ যে সময়ে করা হয়েছে সেই সময়ের আইন অনুযায়ী যে শাস্তি প্রাপ্য তারচেয়ে বেশি শাস্তি অপরাধীকে দেওয়া চলবে না। (২) কোন ব্যক্তিকে একই অপরাধের জন্য একবারের বেশি শাস্তি দেওয়া চলবে না। (৩) অপরাধী বলে অভিযুক্ত কোনও ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাবে না।

প্রান্তলিপি ঃ
সংবাদপত্রের স্বাধীনতা (Freedom of The Press) সম্পর্কে ভারতের সংবিধানে আলাদা কোন ধারা নেই। সংবিধানের ১৯(১) (ক) ধারায় বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার মধ্যেই এটি অন্তর্ভুক্ত। এটি অবাধ স্বাধীনতা নয়। ১৯(২) ধারা অনুসারে এটি নিয়ন্ত্রিত।

২১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি ছাড়া কাউকে তার জীবন বা ব্যক্তিস্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। সুপ্রিম কোর্ট ২১ অনুচ্ছেদকে ১৯ অনুচ্ছেদের পরিপূরক মনে করেছে। মানেকশা বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন (১৯৭৮)। তবে আইন নির্ধারিত পদ্ধতি যুক্তিযুক্ত কি না আদালতকে তার বিচার করার অধিকার দেওয়া হয় নি, অর্থাৎ এক্ষেত্রে শাসনবিভাগের স্বৈরাচার থেকে রক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও আইনবিভাগের স্বৈরাচার থেকে ব্যক্তিকে রক্ষা করার কোনও নিশ্চয়তা নেই।

২২ অনুচ্ছেদে গ্রেপ্তার ও আটকের বিরুদ্ধে নাগরিককে সুরক্ষার অধিকার দেওয়া হয়েছে (Protection against Arbitary Arrest and Detention)। বলা হয়েছে, কোনও ব্যক্তিকে আটক করলে তাকে গ্রেপ্তারের কারণ জানাতে হবে [২২(২) অনুচ্ছেদ]। শত্রুভাবাপন্ন বিদেশি বা নিবর্তনমূলক আটক আইনে (Preventive Detention Act) অভিযুক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযুক্ত হবে না [২২(২) অনুচ্ছেদ]। সংবিধান অনুসারে পার্লামেন্ট বা রাজ্য আইনসভা, দেশরক্ষা, বৈদেশিক বিষয়সমূহ, ভারতের নিরাপত্তা সম্পর্কিত কোনও কারণে, জনশৃঙ্খলা বজায় রাখা, অত্যাবশ্যক জোগান ও সেবা অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়োজনে নিবর্তনমূলক আটক আইন প্রণয়ন করতে পারে। নিবর্তনমূলক আটক আইনে অবরুদ্ধ ব্যক্তিকে তিন মাসের বেশি আটক রাখা যাবে না। এর বেশি সময় আটক রাখতে হলে সরকারকে একটি উপদেষ্টা বোর্ডের পরামর্শ নিতে হবে। দ্বিতীয়ত, অবরুদ্ধ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের কারণ জানাতে হবে। তৃতীয়ত গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে আবেদনের সুযোগ তাকে দিতে হবে। নিবর্তনমূলক আটক আইন অপব্যবহারের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন আছে বলে সংবিধানবিদরা মনে করেন। আইনটিকে প্রয়োজনীয় অনিষ্ট (necessary evil) বলা হয়।

২৪.৪.৩ শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার যে আদর্শ ব্যক্ত হয়েছে শোষণের বিরুদ্ধে অধিকারকে একটি মৌলিক অধিকার হিসাবে গণ্য করে সেই আদর্শকে রূপায়িত করার আইনগত এক ব্যবস্থা হয়েছে বলা যায়। সংবিধানের ২৩ ও ২৪ ধারা শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার লিপিবদ্ধ করেছে। ২৩ ধারায় বলা হয়েছে মানুষ নিয়ে ব্যাবসা, কাউকে বেগার-খাটানো চলবে না বা কাউকে জোর করে শ্রমদানে বাধ্য করা যাবে না। এই কাজ বেআইনি ও দণ্ডনীয় অপরাধ। ২৪ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ১৪ বছরের কম ছেলেমেয়েদের কারখানা, খনি বা অন্য কোনও বিপজ্জনক কাজে নিয়োগ করা যাবে না। অবশ্য জনস্বার্থে রাষ্ট্র কোনো কাজ নাগরিকের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক করতে পারে এবং এক্ষেত্রে নাগরিকের মধ্যে ধর্ম, বর্ণ বা শ্রেণির ভিত্তিতে বৈষম্য করা যাবে না।

২৪.৪.৪ ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার

ধর্ম-নিরপেক্ষতা ভারত রাষ্ট্রের মূল আদর্শের মধ্যে অন্যতম। ৪২তম সংবিধান সংশোধন ধর্ম-নিরপেক্ষতার আদর্শকে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনার অন্যতম নীতি হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নিয়ে ভাবে, মানুষের সঙ্গে ধর্মের অর্থাৎ ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিবেক বা বিশ্বাস নিয়ে ভাবে না। ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে বিবেচনা করে সংবিধান ধর্ম সম্পর্কে ভারত রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতাকেই নিরাপদ করতে চেয়েছে বলা যায়। সংবিধানের ২৫-২৮ অনুচ্ছেদে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারকে সুরক্ষিত করা হয়েছে।

২৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সব ব্যক্তি সমভাবে বিবেকের স্বাধীনতা, ধর্মস্বীকার, ধর্মাচরণ ও ধর্মপ্রচারের স্বাধীন অধিকার ভোগ করবে। ২৬ ধারায় বলা হয়েছে শুধুমাত্র ব্যক্তিরাই নয়, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ও এই অধিকার ভোগ করতে পারবে। ২৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে বিশেষ কোন ধর্ম বা ধর্মসম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা বা রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে কোনও ব্যক্তিকে অর্থদান করতে বাধ্য করা যাবে না। ২৮ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে সম্পূর্ণভাবে সরকারি অর্থ দ্বারা পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষা দেওয়া যাবে না। রাষ্ট্রস্বীকৃত বা রাষ্ট্রের অর্থসাহায্যে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানেও ধর্মীয় শিক্ষা বা উপাসনা বাধ্যতামূলক নয়।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের উদারতার সুযোগ নিয়ে সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা বা বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রবণতা সৃষ্টি হলে সেটি হবে রাষ্ট্রের প্রগতি ও জাতীয় স্বার্থের বিরোধী। ধর্মীয় সংখ্যালঘু, ধর্মীয় শিক্ষা এই সব ধারণা নিয়ে বিতর্কের সম্ভাবা থেকেই যায়। এই বিতর্ক মীমাংসার দায়িত্ব আদালতের।

২৪.৪.৫ সংস্কৃতি ও শিক্ষার অধিকার

ব্যক্তিত্ব বিকাশের স্বার্থেই সংস্কৃতি ও শিক্ষার অধিকার তাৎপর্যপূর্ণ। ব্যক্তির মানসিক বৃত্তি, বিবেক ও বিচারবুদ্ধির বিকাশে, ব্যক্তির নাগরিক গুণের উন্মেষে সাহায্য করে সংস্কৃতি ও শিক্ষার অধিকার। ভারতের কৃষ্টিগত বৈচিত্র্যকে সামনে রেখেই সংবিধানপ্রণেতারা সংস্কৃতি ও শিক্ষার অধিকারকে অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। সংস্কৃতি ও শিক্ষার অধিকারের মধ্যে ধর্ম-নিরপেক্ষতার নীতিটিও প্রতিফলিত। সংখ্যালঘুসহ সকলের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য যাতে সুরক্ষতি হয় সংবিধানপ্রণেতারা গণপরিষদে এ বিষয়টি নিয়ে নানা বিতর্ক ও মত-বিনিময়ের মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। ধর্মের অধিকারের মতো শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিরাককে কেন্দ্র করে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যালঘিষ্ঠের মতবিরোধ থাকা স্বাভাবিক এবং এ ব্যাপারে যাতে ন্যায়বিচার লঙ্ঘিত না হয়, সঠিক ভারসাম্য রক্ষিত হয় সংবিধানপ্রণেতারা এ কথা ভেবেছেন। সন্দেহ নেই সংস্কৃতি ও শিক্ষার অধিরাককে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতিদানের মধ্য দিয়ে সংবিধান ভারত রাষ্ট্রের বিবেক ও সামাজিক মূল্যবোধকেই প্রকাশ করেছে। পক্ষপাতিত্ব নিয়ে নয়, নিরপেক্ষতার দৃষ্টি নিয়ে দেশের সুমহান ঐতিহ্য ও কৃষ্টিকে রক্ষা করায় এক সংকল্প যেন ঘোষিত হয়েছে সংস্কৃতি ও শিক্ষায় অধিকারকে সাংবিধানিকভাবে সুরক্ষিত করার মধ্য দিয়ে।

সংবিধানের ২৯ ও ৩০ অনুচ্ছেদে সংস্কৃতি ও সিক্ষার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। ২৯(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ভারতের যে কোনো অংশে বসবাসকারী নাগরিকদের কোন এক অংশ যদি তাদের ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ করতে চান তবে তারা স্বচ্ছন্দে তা ভোগ করতে পারবেন। ৩০(১) অনুচ্ছেদে ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের পছন্দমতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার অধিকার দেওয়া হয়েছে। ৩০(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে অর্থ সাহায্য দেবার ব্যাপারে রাষ্ট্র ভাষাগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে বৈষম্য করতে পারবে না। ২৯(২)

অনুচ্ছেদে ২৯(১) অনুচ্ছেদে সুরক্ষিত কৃষ্টি ও শিক্ষার অধিকার সম্পর্কে বাধানিষেধ আরোপ করে বলা হয়েছে রাষ্ট্রের পরিচালনাধীন বা রাষ্ট্রের অর্থ সাহায্যে পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্ম, জাতি, ভাষা ইত্যাদির ভিত্তিতে কোনও নাগরিককে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

সংস্কৃতি ও শিক্ষার অধিকারকে অপপ্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয় নয়। ভাষাগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা এই অধিকারের দাবিতে সংগ্রাম করেছে সাফল্যও পেয়েছে। তবে রাষ্ট্রের ঐক্য ও সংহতি বিপন্ন করে এই অধিকারের নামে প্রাদেশিকতা ও বিচ্ছিন্নতার উগ্রদাবি ও আন্দোলন অবশ্যই এক বিপজ্জনক প্রবণতা। ভাষার দাবিতে রাজ্য ভাগ হয়েছে কিন্তু এই কারণে দেশভাগ কখনই সমর্থনযোগ্য নয়। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সমস্যা আজ ভারতবর্ষে এক নতুন সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে। এই সমস্যার সতর্ক ও সাংবিধানিক সমাধান প্রয়োজন।

২৪.৪.৬ শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার

শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার মৌলিক অধিকারগুলিকে রক্ষা করার জন্য নাগরিকের এক সাংবিধানিক অধিকার। মৌলিক অধিকারের ঘোষণার কোনও অর্থই থাকে না যদি না এই অধিকারগুলিকে কার্যকর করায় কোনও উপায় থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে অধিকারের বাস্তবতা আদালতে এগুলির পরীক্ষা বা বিচারের মধ্যেই প্রমাণিত হয়। ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক অধিকারের সুরক্ষার প্রশ্নে তিনটি বিষয় লক্ষণীয়—(১) শাসনবিভাগ এবং আইনবিভাগের হস্তক্ষেপ থেকে অধিকারগুলি রক্ষা করার জন্যই এই মৌলিক অধিকার; (২) এই অধিকারগুলিকে রক্ষা করবে আদালত তার আদেশ-নির্দেশের মাধ্যমে; (৩) জরুরি অবস্থা ছাড়া অন্য কোনো সময় অধিকারগুলি স্থগিত রাখা যাবে না। সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদে শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ডঃ আম্বেদকর সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ বলে বর্ণনা করেছেন। এই অনুচ্ছেদটিকে বাদ দিলে সংবিধান স্কিল বা শূন্য বলে প্রমাণিত হবে। এই অধিকারটি হল সংবিধানের আত্মা এবং অন্তরাত্মা ("If I was asked to name any particular article of the Constitution as the most important—an article without which this Constitution would be a nullify—I would not refer to any other article except this one. It is the very soul of the Constitution and the very heart of it." Dr. B. R. Ambedkar) সংবিধান মৌলিক অধিকারকে সুরক্ষিতি ও সুনিশ্চিত করতে সুপ্রিম কোর্টকে বিশেষ ভূমিকা দান করেছে। মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ এলে সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের ৩২ ধারার আদেশ বা নির্দেশ অনুসারে এই অভিযোগের বিচার করবে। এই অর্থে সুপ্রিম কোর্ট হল মৌলিক অধিকারের অভিভাবক (Supreme Court is the guardian of Fundamental Rights)।

সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার সম্পর্কে সংবিধানের নির্দেশ অত্যন্ত স্পষ্ট। সংবিধানের ৩২(১) ধারায় বলা হয়েছে, সুপ্রিমকোর্টে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে এই অংশে প্রদত্ত অধিকারগুলিকে বলবৎ করার জন্য নাগরিকের আবেদন করার অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছে ["The right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of rights conferred by this part is guaranteed." Art 32(1)] সংবিধানের ৩২(২) ধারায় বলা হল সুপ্রীমকোর্ট এই অধিকারগুলি রক্ষা করার জন্য বন্দিপ্রত্যক্ষীকরণ (Habeas Corpus), পরমাদেশ (Mandamus), প্রতিষেধ (Prohibition), অধিকারপৃচ্ছা (Quowarranto) এবং উৎপ্রেষণ (Certiorari) ধরনের আদেশ, নির্দেশ বা লেখ (directions or orders or writs) জারি করতে পারে। সংবিধানের ৩২(৩) ধারায় বলা হয়েছে পার্লামেন্ট আইন করে অন্য যে কোনো আদালতকে নিজস্ব এলাকার মধ্যে আদেশ, নির্দেশ বা লেখ জারি করার ক্ষমতা প্রয়োগ করার অনুমতি দিতে পারে। ৩২(৪) ধারায় বলা হল সংবিধানে অন্য কোনোভাবে বলা না থাকলে এই অধিকার স্থগিত রাখা যাবে না।

৩২(২) ধারায় সুপ্রিমকোর্টকে যে-সব নির্দেশ, আদেশ বা লেখ জারি করার অধিকার দেওয়া হয়েছে সেগুলির প্রকৃতি নিম্নরূপ ঃ

বন্দিপ্রত্যক্ষীকরণ (Habeas corpus) ঃ কী কারণে আটক করা হয়েছে তা জানবার জন্য সুপ্রিমকোর্ট অবরুদ্ধ ব্যক্তিকে আদালতে হাজির করবার জন্য যে লেখ জারি করে তাকে বলে বন্দিপ্রত্যক্ষীকরণ।

পরমাদেশ (Mandamus) ঃ এটি হল সেই আদেশ যার দ্বারা সুপ্রিমকোর্ট কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, অধস্তন আদালত বা সরকারকে নিজ দায়িত্ব পালনের কথা বলতে পারে।

প্রতিষেধ (Prohibition) ঃ এই আদেশের মাধ্যমে উর্ধ্বতন আদালত অধস্তন আদালতকে নিজে এলাকায় সীমিত থাকতে বাধ্য করে।

অধিকারপৃচ্ছা (Quowarranto) ঃ কোনো ব্যক্তি কোনো পদের যোগ্য না হয়েও যখন ওই পদে দাবিদার হতে চান তখন আদালত এই নির্দেশ বলে তার দাবির বৈধতা বিচার করে।

উৎপ্রেরণ (Certiorari) ঃ এটি হল কোন বিচারালয়ের ক্ষমতাবহির্ভূত সিদ্ধান্তকে বাতিল করার উদ্দেশ্যে জারি করা আদেশ।

সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার নাগরিকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকার। এক অর্থে এই অধিকার হল মৌলিক অধিকার খর্বের বিরুদ্ধে নাগরিকের আদালতের কাছে প্রতিকারের মৌলিক অধিকার। নাগরিকের এই অধিকারকে সুনিশ্চিত করবে যে আদালত সেই আদালত যাতে স্বাধীনভাবে, নির্ভীকভাবে তার দায়িত্ব পালন করতে পারে সেই পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আদালত নাগরিককে অধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে প্রতিকারের ব্যবস্থা না করলে এই মৌলিক অধিকারটি মূল্যহীন হয়ে পড়ে। আদালতের কাছে আবেদন করার জন্য সরকারি ব্যবস্থা না থাকলে সংবিধানের ঘোষণায় কোনো কার্যকারিতাই থাকে না।

ভারতীয় সংবিধানের নাগরিকদের জন্য প্রদত্ত মৌলিক অধিকারগুলিকে নীচের তালিকা থেকে একঝলকে দেখে নিন ঃ

মৌলিক অধিকার

(১) সাম্যের অধিকার (১৪-১৮ অনুচ্ছেদ)	আইনের চোখে সমানাধিকার সমান সংরক্ষণ পাবারঅধিকার (১৪ অনুচ্ছেদ)	রাষ্ট্র কর্তৃক বৈষম্যমূলক আচরণের অনুপস্থিতি (১৫ অনুচ্ছেদ)	সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে সাম্য (১৬ অনুচ্ছেদ)	অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে অধিকার (১৭ অনুচ্ছেত)	খেতাব বা উপাধির বিলুপ্তি (১৮ অনুচ্ছেদ)
(২) স্বাধীনতার অধিকার (১৯-২২ অনুচ্ছেদ)	ছ'দফা স্বাধীনতা (১৯ অনুচ্ছেদ) বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা; শান্তিপূর্ণভাবে সমবেত হবার স্বাধীনতা; সংঘবন্ধ হবার স্বাধীনতা; দেশের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরার স্বাধীনতা; দেশের যে কোন অংশে বসবাসের স্বাধীনতা; পেশা-নির্বাচন ও ব্যাবসা-বাণিজ্যের স্বাধীনতা		অপরাধের জন্য দণ্ডিত হবার ক্ষেত্রে সংরক্ষণের অধিকার (২০ অনুচ্ছেদ)	জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার (২১ অনুচ্ছেদ)	গ্রেপ্তার ও আটকের বিরুদ্ধে অধিকার (২২ অনুচ্ছেদ)

(৩) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (২৩-২৪ অনুচ্ছেদ)	মানুষকে নিয়ে ব্যাবসা বা বেগার-খাটানো নিষিদ্ধ (২৩ অনুচ্ছেদ)	বিপজ্জনক কাজে শিশুদের নিয়োগ নিষিদ্ধ (২৪ অনুচ্ছেদ)

(৪) ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার (২৫-২৮ অনুচ্ছেদ	বিবেকের স্বাধীনতা, স্বাধীন ধর্মাচরণ ও ধর্মপ্রচারের স্বাধীনতা (২৫ অনুচ্ছেদ)	ধর্মীয় কার্যকলাপ পরিচালনার অধিকার (২৬ অনুচ্ছেদ)	ধর্মের প্রচার ও প্রসারের কর আরোপ নিষিদ্ধ (২৭ অনুচ্ছেদ)	সরকারী অর্থে পরিচালিত শিক্ষা- প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষা বা উপাসনা বাধ্যতামূলক নয় (২৮ অনুচ্ছেদ)

(৫) সংস্কৃতি ও শিক্ষার অধিকার (২৯-৩০ অনুচ্ছেদ)	সংখ্যালঘুর ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের অধিকার (২৯ অনুচ্ছেদ)	ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘুর শিক্ষা- প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার অধিকার

(৬) সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার (৩২ অনুচ্ছেদ)	সুপ্রিমকোর্টে নাগরিকের আবেদন করার অধিকার মৌলিক অধিকার রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন নির্দেশ, আদেশ বা লেখ
	বন্দিপ্রত্যক্ষীকরণ, পরমাদেশ, প্রতিষেধ, অধিকারপৃচ্ছা, উৎপ্রেষণ

আসুন এবার আমরা সংবিধানে লিপিবদ্ধ মৌলিক কর্তব্যগুলিকে শনাক্ত করি এবং এই কর্তব্যগুলির গুরুত্বকে বোঝার চেষ্টা করি।

২৪.৫ ভারতীয় নাগরিকের মৌলিক কর্তব্য

কর্তব্য ছাড়া অধিকার অর্থবহ হয় না। নাগরিক যদি রাষ্ট্রের কাছে অধিকার দাবি করে, বিনিময়ে রাষ্ট্রেরও নাগরিকের কাছে কিছু দাবি থাকতে পারে। কর্তব্য হল নাগরিকের রাষ্ট্র বা সমাজের প্রতি কিছু দায়িত্ব পালন। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে সংবিধানে নাগরিক অধিকারের সঙ্গে কর্তব্যও নির্দিষ্ট থাকে। ভারতে সংবিধানপ্রণেতারা অধিকারকে বিধিবদ্ধ করলেও, কর্তব্যকে বিধিবদ্ধ করার কথা ভাবেন নি। ১৯৭৬ সালে ৪২তম সংবিধানসংশোধনে নাগরিকের মৌলিক কর্তব্যগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সংবিধানের চতুর্থ অংশের ক শীর্ষে ৫১ ক অনুচ্ছেদে নাগরিকের নিম্নলিখিত দশটি কর্তব্য নির্দেশ করা হয়েছে ঃ

১। সংবিধান মেনে চলা, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় স্তোত্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন;

২। যে মহান আদর্শ স্বাধীনতার জন্য জাতীয় সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করেছে তাকে লালন করা ও অনুসরণ করা;

৩। ভারতের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও সংহতিকে সংরক্ষণ করা;

৪। দেশকে রক্ষা করা এবং দেশের আহ্বানে জাতীয় সেবায় আত্মনিয়োগ করা;

৫। দেশের মানুষের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রসারিত করা, নারীদের মর্যাদা হানিকর প্রথাকে পরিহার করা;

৬। দেশের সংমিশ্রিত কৃষ্টিসমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে (rich heritage of our composite culture) মূল্য দেওয়া সংরক্ষণ করা;

৭। প্রাকৃতিক পরিবেশের (বন, হ্রদ, নদী, বন্যপ্রাণী ইত্যাদি) সংরক্ষণ এবং প্রাণীদের প্রতি মমতা প্রদর্শন;

৮। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, মানবিকতাবোধ এবং অনুসন্ধান ও সংস্কারের মনোভাবের প্রসার সাধন;

৯। রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ এবং হিংসার পথ পরিহার করা; এবং

১০। দেশের কর্মপ্রচেষ্টা ও সাফল্য যাতে উন্নততর পর্যায়ে পৌঁছতে পারে তার জন্য ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সব কার্যকলাপের ক্ষেত্রে উৎকর্ষ আনার জন্য প্রয়াস চালানো।

গণপরিষদে মৌলিক অধিকার নিয়ে ভাবনা-চিন্তা বিতর্ক বা স্থির সিদ্ধান্ত হলেও, মৌলিক কর্তব্য যে স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের রূপায়ণে গুরুত্বপূর্ণ, সংবিধানপ্রণেতারা এতটা গভীর দৃষ্টি নিয়ে ভাবেননি। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে উদ্ভূত নানা সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা ও সংকটের কথা বিচার করে নাগরিক সচেতনা বৃদ্ধির বিষয়টি গুরুত্ব পায়। কর্তব্যবোধে জাগরিত জাতিই দেশ গঠন ও নির্মাণের কাজে সাফল্য পায়। ভারত রাষ্ট্রের সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক অগ্রগতির বিচারে কর্তব্যগুলি পালন করা আবশ্যিক। যদিও সংবিধানে কর্তব্যগুলিকে পালন করার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই বা কর্তব্যগুলি লঙ্ঘিত হলে তার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিষেধক ব্যবস্থাও নেই, তবে সাংবিধানিক নির্দেশই এক্ষেত্রে শেষ কথা নয়। রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিহানি, জাতীয় পতাকার অবমাননা, সংবিধানের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অবমাননা কখনই কাম্য নয়। সরকার, নাগরিক, রাজনৈতিক দল সকলকেই এ ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। অসামাজিক ও রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে আদালতের হাতেও কার্যকর ক্ষমতা দেওয়া দরকার।

২৪.৬ রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি ঃ অর্থ ও বৈশিষ্ট্য

গ্র্যানভিল অস্টিনের মতো সংবিধান-বিশেষজ্ঞ ও লেখকের মতে ভারতের সংবিধানের প্রথম এবং প্রধান পরিচয় হল এটি সামাজিক দলিল। ("The Indian Constitution is first and foremost a social doucment."—G. Austin)। সমাজবিপ্লবের এক লক্ষ্য এবং এই লক্ষ্যকে বিভিন্ন শর্ত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পরিপুষ্ট করার এক প্রয়াস ভারতীয় সংবিধানের অধিকাংশ অনুচ্ছেদে আছে। সংবিধানের অন্যান্য অংশে এর প্রতিফলন ঘটলেও মৌলিক অধিকার ও রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি অংশে (সংবিধানের তৃতীয় ও চতুর্থ অংশ) সমাজবিপ্লবের প্রতি এই অঙ্গীকার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই অর্থে এই দুটি অংশ সংবিধারে বিবেকও (conscience of the Constitution) বটে।

আপনি পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে জানতে পেরেছেন অধিকার বা কর্তব্যের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব কী। বর্তমান আলোচনায় আপনি জানতে পারবেন সংবিধাননির্দিষ্ট কিছু আদর্শ ও নীতির কথা যা সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে, নাগরিকের কল্যাণে রাষ্ট্র অর্জন করতে চায়। এক অর্থে এগুলি হল রাষ্ট্রকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার কিছু সহায়ক নীতি। দীর্ঘদিন ধরে ভারতের মানুষ যে বঞ্চনা, হীনতা, সামাজিক অবিচার, যন্ত্রণার শিকার হয়েছে এই নীতিগুলি তাকে উপশম করার, লাঘব করার সংবিধান-নির্দেশিত কিছু উপায়। ডঃ আম্বেদকার মনে করেন রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিগুলি একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক কর্মসূচির প্রতিফলন। নীতিগুলির মধ্যে গণতন্ত্রের সার্বিক প্রকাশ, সমাজতান্ত্রিক সমাজের ভাবনাও সুপ্ত বলে কোন কোন লেখক মনে করেন। পরিবর্তনশীল সমাজের চাহিদা বা প্রত্যাশ্যায় পরিপূরক হিসাবেও নীতিগুলিকে দেখা হয়।

সংবিধানে রাষ্ট্রপরিচালনায় নির্দেশমূলক নীতির কোন সংজ্ঞার্থ দেওয়া হয়নি। সংবিধান নীতিগুলির উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য ব্যক্ত করেছে মাত্র। সংবিধানের ৩৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, দেশ শাসন ব্যাপারে নীতিগুলি মৌলিক এবং আইন প্রণয়নে এইসব নীতি প্রয়োগ করা রাষ্ট্রের কর্তব্য, যদিও নীতিগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয়। ("The provisions contained in this part shall not be enforceable by any court, but the principles

therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws." Art 37)। সংবিধানের ৩৮(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে জনকল্যাণের নীতিকে উৎসাহিত করার জন রাষ্ট্র একটি সামাজিক বিন্যাস বা শৃঙ্খলাকে নিরাপদ করবে। এই শৃঙ্খলা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার সহায়ক। ["The state shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic and political shall inform all the institutions of the national life." Art 38(1)]। এই ধারাটির সঙ্গে একটি অতিরিক্ত ধারা সংবিধানের ৪৪তম সংশোধন দ্বারা যুক্ত করে বলা হয়েছে রাষ্ট্র আয়ের বৈষম্য লাঘব করতে সচেষ্ট হবে, মর্যাদা, সুবিধা ও সুযোগের ক্ষেত্রে অসাম্য দূর করতে প্রয়াসী হবে। শুধু ব্যক্তির ক্ষেত্রে নয়, বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী ও বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত গোষ্ঠীর মধ্যে আর্থিক ন্যায়, সুযোগের সমতা সৃষ্টিতে রাষ্ট্র উদ্যোগী হবে ["The State shall, in particular, strive to minimize the inequalities in income, and endeavour to eliminate inequalites in status, facilities and opportunities, not only amongst individuals but also amongst groups of people residing in different areas or engaged in different vocations." (Art 38(2)]।

রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিগুলির তিনটি দিককে শনাক্ত করা চলে। প্রথমত, এর মধ্যে আছে কিছু আদর্শ, বিশেষত অর্থনৈতিক আদর্শ যা রাষ্ট্র অর্জন করতে সচেষ্ট হয়। দ্বিতীয়ত, এগুলি শাসনবিভাগ ও আইনবিভাগের প্রতি কার্যপরিচালনার কিছু নির্দেশ। তৃতীয় এগুলির মধ্যে আছে নাগরিকের কিছু অধিকার যা মৌলিক অধিকারের মতো আদালত দ্বারা বলবৎযোগ্য না হলেও আনিগত ও প্রশাসনিক নীতির দ্বারা রাষ্ট্র সুনিশ্চিত করতে প্রয়াসী হবে। সংবিধানে নীতিগুলি অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে সংবিধানপ্রেণতারা ন্যা আদর্শ দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন সন্দেহ নেই। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে এদেশের শাসকপ্রধানদের জন্য যে নির্দেশ ছিল, রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতির মধ্যে সেই নির্দেশের প্রভাব ছিল। গান্ধীজির সমাজ-সংস্কার ও গ্রাম সমাজের আদর্শ, ১৯৩১ সালে কংগ্রেসের করাচী অধিবেশনের মানবিক ও সমাজতান্ত্রিক প্রস্তাব, সপ্রু কমিটির অধিকার সংক্রান্ত প্রস্তাব (১৯৪৫) আয়ারল্যান্ডের সংবিধানের অভিজ্ঞতা, ফ্যাবিয়ান সমাজতন্ত্রের আদর্শ—সব কিছুর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণাই নির্দেশমূলক নীতির পেছনে ছিল। নির্দেশমূলক নীতিগুলি ন্যায়বিচার আদর্শ, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের লক্ষ্য, সমাজসংস্কারের নীতি, জনকল্যাণের আদর্শ—এক কথায় প্রগতিশীল ও গতিশীল সমাজের এক পরিপূর্ণ দলিল।

নির্দেশমূলক নীতিগুলির সঙ্গে মৌলিক অধিকারের পার্থক্যগুলি সম্পর্কে আপনি অবশ্যই অবহিত হবেন। পার্থক্যগুলি নিম্নরূপ ঃ

১। ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অংশে লিপিবদ্ধ হয়েছে মৌলিক অধিকার আর সংবিধানের চতুর্থ অংশে স্থান পেয়েছে নির্দেশমূলক নীতি।

২। আইনের দিক থেকে নির্দেশমূলক নীতিগুলির তুলনায় মৌলিক অধিকারের তাৎপর্য বেশি। নির্দেশমূলক নীতিগুলি আদর্শ হিসাবে অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ।

৩। মৌলিক অধিকার রাষ্ট্রের উপর বাধানিষেধ নির্দেশমূলক নীতি সরকারের প্রতি সংবিধানের কর্তব্যপালনের নির্দেশ।

৪। মৌলিক অধিকার রাজনৈতিক গণতন্ত্রের সূচক, নির্দেশমূলক নীতি সামাজিক ও আর্থিক গণতন্ত্রের ধারণাকে প্রসারিত করে।

৫। মৌলিক অধিকারগুলি আদালতে বলবৎযোগ্য। নির্দেশমূলক নীতি আদালত দ্বারা বলবৎযোগ্য নয়।

৬। মৌলিক অধিকারগুলির ভোগের ক্ষেত্রে সংবিধান নাগরিককে যে নিশ্চয়তা দিয়েছে, নির্দেশমূলক নীতির ক্ষেত্রে তা দেয় নি।

৭। মৌলিক অধিকার ও নির্দেশমূলক নীতির মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হলে মৌলিক অধিকার প্রাধান্য পাবে। অবশ্য নির্দেশমূলক নীতি সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে।

এবার আসুন ভারতীয় সংবিধানে লিপিবন্ধ নির্দেশমূলক নীতিগুলির একটি তালিকা পেশ করে আমরা জানতে চেষ্টা করি নীতিগুলির ব্যাপক ও বিচিত্র সাংবিধানিক অবস্থানকে। সংবিধানের ৩৬ থেকে ৫১ ধারায় প্রাথমিকভাবে ১৪টি নির্দেশমূলক নীতির উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৭৬ সালে ৪২তম সংবিধান সংশোধন আইনের মাধ্যমে আরও ৪টি নির্দেশমূলক নীতি সংযোজিত হয়। ১৯৭৮ সালে ৪৪তম সংবিধান সংশোধন আইনে সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদকে প্রসারিত করা হয়েছে।

২৪.৬.১ নির্দেশমূলক নীতিগুলির পরিচয়

সংবিধানের অনুচ্ছেদগুলির ক্রমানুসারে রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিকে নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা যায় ঃ

(১) জনকল্যাণের স্বার্থে রাষ্ট্র সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ন্যায়ের ভিত্তিতে এক সমাজব্যবস্থা গঠন করবে। (৩৮(১) অনুচ্ছেদ)।

(২) রাষ্ট্র এমন নীতি অনুসরণ করবে যাতে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে নাগরিকগণ পর্যাপ্ত জীবিকার্জনের অধিকার ভোগ করতে পারেন; জনগণের কল্যাণে দেশের সম্পদ সুষ্ঠুভাবে বণ্টিত হয়; ধনসম্পদ ও উৎপাদনের উপায়সমূহ মুষ্টিমেয়ের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে জনসাধারণের স্বর্থের হানি না ঘটে; পুরুষ ও নারী উভয়েই সমান কাজের জন্য সমান বেতন পান; পুরুষ ও নারী শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও শক্তি, শিশুদের সুকুমারবয়সের অপব্যবহার না হয় ৩৯ ক-ঙ অনুচ্ছেদ)।

(৩) গ্রামের জনসাধারণকে কর্ম ও শিক্ষার অধিকার এবং বেকার, বার্ধক্য ও অসুস্থ অবস্থায় সরকারি সাহায্যপ্রাপ্তির অধিকার সুনিশ্চিত করবে (৪১ অনুচ্ছেদ)।

(৪) রাষ্ট্র জনসাধারণকে কর্ম ও শিক্ষার অধিকার এবং বেকার, বার্ধক্য ও অসুস্থ অবস্থায় সরকারি সাহায্যপ্রাপ্তির অধিকার সুনিশ্চিত করবে (৪১ অনুচ্ছেদ)।

(৫) কাজের শর্তাদি ন্যায়সঙ্গত ও মানবোচিত করতে এবং প্রসূতিদের সহায়তা করতে রাষ্ট্র ব্যবস্থা নেবে (৪২ অনুচ্ছেদ)।

(৬) রাষ্ট্র নাগরিকদের জন্য জীবনধারণোপযোগী মজুরি, জীবনযাত্রার উন্নতমান, কাজের উপযুক্ত পরিবেশ, অবসর, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা করবে (৪৩ অনুচ্ছেদ)।

(৭) রাষ্ট্র সমগ্র ভারতের সকল নাগরিকের জন্য একই রকমের দেওয়ানি আইন চালু করবার ব্যবস্থা করবে (৪৪ অনুচ্ছেদ)।

(৮) সংবিধান চালু হবার পর দশ বছরের মধ্যে বালক-বালিকারা যাতে ১৪ বৎসর পর্যন্ত অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা লাভ করতে পারে, তার জন্য রাষ্ট্র সচেষ্ট হবে (৪৫ অনুচ্ছেদ)।

(৯) অনগ্রসর ও দুর্বল শ্রেণির জন্য বিশেষত তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের আর্থিক ও শিক্ষা বিষয়ক স্বার্থের উন্নতির এবং সামাজিক অন্যান্যয় ও শোষণের হাত থেকে তাদের রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্র তৎপর হবে (৪৬ অনুচ্ছেদ)।

(১০) খাদ্য-পুষ্টিবৃদ্ধি, সকলের জীবিকার মান উন্নয়ন, জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য রাষ্ট্রকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর উত্তেজক পানীয় এবং ওষুধের প্রয়োজন ছাড়া মাদক দ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হবে (৪৭ অনুচ্ছেদ)।

(১১) বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষি ও পশুপালন সংগঠন এবং গবাদি পশুহত্যা নিবারণের জন্য রাষ্ট্রকে দৃষ্টি দিতে হবে (৪৮ অনুচ্ছেদ)।

(১২) চারুকলা ও ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত স্থান ও বস্তু সংরক্ষণে রাষ্ট্র দায়িত্বশীল ভূমিকা নেবে (৪৯ অনুচ্ছেদ)।

(১৩) বিচারবিভাগকে শাসনবিভাগ থেকে পৃথক করার জন্য রাষ্ট্রকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে (৫০ অনুচ্ছেদ)।

(১৪) আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি, জাতিসমূহের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত ও সম্মানজনক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপন আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তির প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং মধ্যস্থতার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসার ব্যাপারে রাষ্ট্র সচেষ্ট হবে।

সংবিধানের ৪২তম সংশোধনের যে অতিরিক্ত নির্দেশমূলক নীতি সংযোজিত হয়েছে সেগুলি হল ঃ

১। রাষ্ট্র আইন ব্যবস্থাকে এমনভাবে পরিচালনা করবে যাতে সাম্যের ভিত্তিতে ন্যায়বিচার পাওয়া যায়; আর্থিক বা অন্যভাবে অসমর্থ ব্যক্তিদের বিনা খরচনায় আইনের সাহায্য দেবার ব্যবস্থাও রাষ্ট্রকে করতে হবে (৩৯এ অনুচ্ছেদ)।

২। শিশুরা যাতে স্বাস্থ্যসম্মত মর্যাদাযুক্ত স্বাধীন পরিবেশে বেড়ে ওঠার সুযোগ পায় এবং শৈশব ও যৌবন যাতে শোষণ ও দুর্দশামুক্ত হয় সেই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা নেবে। (৩৯চ অনুচ্ছেদ)।

৩। প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নতিবিধান এবং বন ও বন্যপ্রাণীর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা (৪৩ এ অনুচ্ছেদ)।

৪। প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নতিবিধান এবং বন ও বন্যপ্রাণীর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা রাষ্ট্রকে করতে হবে (৪৮এ অনুচ্ছেদ)।

সংবিদানের ৪৪তম সংশোধন আইনে ৩৮(২) অনুচ্ছেদ সংযোজন করে বলা হয়েছে রাষ্ট্র এমন নীতি অনুসরণ করবে যাতে আয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্য লাঘব এবং মর্যাদা, সুবিধা ও সুযোগের ক্ষেত্রে অসাম্য দূর হয়।

এবার আসুন আমরা এই এককের মূল পাঠের শেষ অংশের আলোচনায় যাই। সংবিধানবিশেষজ্ঞ ও গবেষকদের মতামতের ভিত্তিতে ও ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির বাস্তব অভিজ্ঞতায় রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতির তাৎপর্য কী সেটা বুঝে নেওয়া প্রয়োজন।

২৪.৬.২ রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতির তাৎপর্য

রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতির তাত্ত্বিক মূল্য নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই। গণতান্ত্রিক ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের গঠন ও বিকাশের কথা ভেবেই গণপরিষদের সদস্যরা মৌলিক অধিকারের পাশাপাশি এই নীতিগুলিকে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। মৌলিক অধিকারের মধ্যে যে অপূর্ণতা আছে এই নীতিগুলির সাহায্যে সেই অপূর্ণতা দূর হবে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের পাশাপাশি সামাজিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের এই পরিবেশ স্বাধীন ভারতে রচিত হবে সংবিধানপ্রণেতারা এই আশা করেছিলেন। নীতিগুলির মধ্যে শাসনসংস্কার, সমাজ সংস্কারের পাশাপাশি নাগরিক অধিকার এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক সমস্যাগুলি সম্পর্কে সংবিধানপ্রণেতারাদের ভাবনাচিন্তার পরিচয় মেলে।

ভারতের সংবিধানে লিপিবন্ধ নির্দেশমূলক নীতিগুলির উপযোগিতা বা তাৎপর্য নানদিক থেকেই প্রতিষ্ঠিত ঃ

(১) নীতিগুলি সমাজ পরিবর্তন ও গতিশীল সমাজের ভাবনাকে প্রতিফলিত করে। ন্যায় ও সাম্যভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের প্রসার নিঃসন্দেহে সমাজ পরিবর্তনের এক গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।

(২) গ্রাম পঞ্চায়েতের গঠন, শিশুশ্রম আইন, মাদক দ্রব্য বর্জন, শ্রমিক নিরাপত্তা, পরিচালনায় শ্রমিকের অংশগ্রহণ, জনস্বাস্থ্যমূলক ব্যবস্থা, অনগ্রসর শ্রেণির উন্নতি, প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা—রাষ্ট্র-পরিচালনায় এইসব নীতিগুলির মধ্যে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার উদ্যোগ আছে।

(৩) নির্দেশমূলক নীতির মধ্যে ভারতের গ্রামীণ সমাজের বিকাশ ও গ্রামীণ অর্থনীতির সংস্কার ও সংগঠনের ধারণা আছে। সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন, উৎপাদনের উপায়ের কেন্দ্রীভবন রোধ, কুটিরশিল্পের প্রসার, সামাজিক অন্যায় ও শোষণ থেকে মুক্তি, কৃষি ও পশুপালন সংগঠন সকলের জন্য পর্যাপ্ত জীবিকার্জনের ব্যবস্থা ইত্যাদি নীতিগুলির মধ্যে গ্রামীণ সমাজের বিকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আছে।

(৪) মানবাধিকারের প্রসারে রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিগুলি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পুরুষ ও নারীর সমান কাজের জন্য সমান বেতন, শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও শক্তির অপ্যবহার রোধ, শৈশব ও যৌবনে শোষণ থেকে মুক্তি, কাজের মানবোচিত শর্তাদি, অনগ্রসর মানুষের অধিকার ও নিরাপত্তা, ইত্যাদি নীতির মধ্যে মানবাধিকার রক্ষার প্রতিশ্রুতি আছে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার নীতি, রাষ্ট্রসমূহের সহযোগিতায় ভাবনার মধ্যে বিশ্ব মানবিকতার নীতি প্রতিফলিত।

(৫) নির্দেশমূলক নীতিগুলি কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে রাষ্ট্র তথা সরকারকে সচেতন করে। নীতিগুলি এক অর্থে মানুষকে তাদের সামাজিক কর্তব্যবোধে, সমাজগঠনে, দেশগঠনের কাজে সচতনে করে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, নিরাপত্তা, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন—নাগরিক পরিষেবার সব দিকেই সরকারকে দৃষ্টি দিতে বলা হয়েছে। শিশু, নারী, বেকার, বৃদ্ধ, পীড়িত, প্রতিবন্ধী সকলের প্রতিই রাষ্ট্রকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে, দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের রাষ্ট্রের দায়িত্ব আছে।

(৬) নীতিগুলি রূপায়ণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবস্থা নিয়েছে। রাষ্ট্রের সাফল্যের ক্ষেত্রগুলি হল নানা ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্যের প্রসার, গ্রামীণ শিল্পের প্রসার, অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা, গ্রাম পঞ্চায়েত সংগঠন, অনুন্নত শ্রেণির উন্নয়ন, জনস্বাস্থ্যের উন্নতিবিধানের জন্য ব্যবস্থা, শিশু ও অসমর্থদের জন্য সাহায্য, আয়বৈষম্য হ্রাস। বেকার সমস্যা সমাধান, কৃষি উন্নয়ন, কুটিরশিল্পের প্রসারেও রাষ্ট্রের অবদান উল্লেখযোগ্য।

(৭) নীতিগুলির উপযোগিতা বুঝেই ভারত সরকার সংবিধানের ২৫, ৪২ ও ৪৪তম সংশোধনের মাধ্যমে নীতিগুলিকে বিশেষ সাংবিধানিক মর্যাদা দিয়েছেন। সংবিধানের ২৫তম সংশোধনে (১৯৭১) বলা হয়েছে—কয়েকটি নির্দেশমূলক নীতির প্রয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আইন মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করলেও ঐ আইন অবৈধ হবে না। সংবিধানের ৩৯(খ) (গ) অনুচ্ছেদে যে নির্দেশমূলক নীতির উল্লেখ আছে, তাকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত কোন অনুচ্ছেদ বাধা হবে না বলে সংশোধনটি জানিয়েছে। ৪২তম সংবিধান সংশোধনে (১৯৭৬) বলা হয়েছে নির্দেশমূলক নীতিকে কার্যকর করার জন্য রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করলে তা সাম্যের ও স্বাধীনতার অধিকার লঙ্ঘন করেচে বলে বেআইনি হবে না এবং আদালতেও এ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা যাবে না। ৪৪তম সংশোধনে (১৯৭৮) রাষ্ট্র আয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্য লাঘব করার ক্ষেত্রে সচেষ্ট হবে বলে জানিয়েছে।

মৌলিক অধিকারের মতো আইনগত স্বীকৃতি না পেলেও বা আদালতে বলবৎযোগ্য না হলেও নীতিগুলি যে সরকারকে কর্তব্যকর্মের ক্ষেত্রে কিছু ইতিবাচক নির্দেশ দিয়েছে অ্যালেন গ্লেডহিল (Allan Gledhill) সেকথা স্বীকার করেন। নীতিগুলিকে ডঃ আম্বেদকর বলেছেন নির্দেশ প্রদানের হাতিয়ার (instrument of instruction)। জি. এন. যোশী (G.. N. Joshi) বলেছেন নীতিগুলি আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ব্যাপক রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক কর্মসূচি (comprehensive political, social, economic programme for a modern democratic state)। আদালতের ব্যাখ্যায় সংবিধানের এই অংশটির গুরুত্ব স্বীকার করা হয়েছে। গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য মামলায় (১৯৫০) প্রধান বিচারপতি এইচ. এল. কানিয়া (H. L. Kania) বলেছেন নীতিগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠের কোনও ক্ষণস্থায়ী ইচ্ছার প্রকাশ নয়, জাতির সুবিবেচনাপ্রসূত জ্ঞানের পরিচায়ক। কামেশ্বর সিং মামলায় (১৯৫১) বিচারপতি মহাজন

সংবিধানের ৩৯ ধারার মধ্যে যে জন উদ্দেশ্য আছে তার প্রশংসা করেছেন। বালসারা ও বোম্বাই রাজ্য মামলায় (১৯৫১) সুপ্রিমকোর্ট মাদক দ্রব্য ব্যবহার নিষিদ্ধ করার নীতিটি জন-উদ্দেশ্যেই গৃহীত বলে মনে করেছে। কেশবানন্দ ভারতীয় মামলায় (১৯৭৩) নির্দেশমূলক নীতি ও মৌলিক অধিকার উভয়কেই সংবিধানের বিবেক (conscience of our Constitution) বলে অভিহিত করা হয়েছে।

সমালোচকেরা অবশ্য নির্দেশমূলক নীতিগুলিকে শাসনতান্ত্রিক হিতোপদেশ বা সাধু সংকল্প ছাড়া আর কিছু মনে করেন না। নীতিগুলিকে কার্যকর করার জন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, আদালতও নীতিগুলিকে মৌলিক অধিকারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং এর পরিপূরক হিসাবেই দেখেছে। নীতিগুলির প্রাধান্যের যে ব্যবস্থা ২৫তম ও ৪২তম সংশোধন আইনের মাধ্যমে করা হয়েছিল সুপ্রিমকোর্ট কেশবানন্দ ভারতী মামলা (১৯৭৩) ও মিনার্ভা মিলস বনাম ভারত সরকার মামলায় (১৯৮০) তা বাতিল করে দিয়েছে। অধ্যাপক কে. টি. শাহ (K. T. Shah) নীতিগুলিকে তুলনা করেছেন সেই চেকের সঙ্গে যা ব্যাংকের সুবিধামতোই দেয় (something comparable with a cheque payable by a concerned bank as per its convenience)। স্যার আইভর জেনিংস নীতিগুলির মধ্যে ফ্যাবিয়ান ভূতের সদর্প পদক্ষেপ (ghosts of the Fabians, stalk) আছে বলে মনে করেন। অস্পষ্ট, পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট, সামাজিক বিপ্লবের গবাক্ষ সজ্জা ছাড়া আর কিছু নয় বলে নীতিগুলির বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে। নীতিগুলিকে বাস্তবায়িত করার সরকারি সদিচ্ছা নেই। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জন-নিরাপত্তা, নারীপ্রগতি, শিশুকল্যাণ, ভূমিসংস্কার ইত্যাদি ক্ষেত্রে অগ্রগতি তেমন ঘটেনি। সামাজিক ন্যায় ও শোষণহীন সমাজপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও সরকারের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার ধীরগতি ও শিথিলতার কথাও সমালোচকেরা বারবার বলেন। সরকারের উদ্যোগ, বিচারবিভাগের নৈতিক চাপ ও জনসাধারণের শ্রদ্ধা ছাড়া নীতিগুলির বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব নয়।

২৪.৭ সারাংশ

অধিকার হল ব্যক্তিত্ববোধের সহায়ক সামাজিক শর্ত। নাগরিক অধিকার সুনিশ্চিত করতে রাষ্ট্রের বিশেষ দায়িত্ব আছে। ভারতের সংবিধানে মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত করা হয়েছে। সাম্যের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার, সংস্কৃতি ও শিক্ষার অধিকার, শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার ভারতের সংবিধান-স্বীকৃত ছয়টি মৌলিক অধিকার। মৌলিক অধিকারগুলি নিরঙ্কুশ নয়। সংবিধান প্রতিটি মৌলিক অধিকারের উপরই যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ আরোপ করেছে।

ভারতীয় সংবিধানের ৪২তম সংশোধন দ্বারা ভারতের নাগরিকের দশটি মৌলিক কর্তব্য নির্দেশ করা হয়েছে। সংবিধান মেনে চলা, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় স্তোত্রের প্রতি শ্রদ্ধা, দেশের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও সংহতি রক্ষা, দেশের আহ্বানে জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করা, বিভেদ ভুলে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধকে প্রসারিত করা, প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ, জাতীয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি ভারতীয় সংবিধান-নির্দেশিত কয়েকটি মৌলিক অধিকার।

ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক অধিকারের পাশাপাশি কতকগুলি নির্দেশমূলক নীতি রাষ্ট্রপরিচালনার অঙ্গ হিসাবে গৃহীত হয়েছে। এই নীতিগুলি একাধারে রাষ্ট্রের কর্তব্য, নাগরিক অধিকার এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সংস্কারের ধারণাকে প্রকাশ করে। আদর্শ হিসেবে গুরুত্ব পেলেও নীতিগুলি আইনগত বিচারে মৌলিক অধিকারের মতো তাৎপর্যপূর্ণ নয়। নীতিগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয়। সকলের জন্য পর্যাপ্ত জীবিকার্জনের ব্যবস্থা, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমান কাজের জন্য সমান বেতন, ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়ের অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা, গ্রাম পঞ্চায়েত গঠনকাজের ন্যায়সঙ্গত ও মানবিক শর্ত, কৃষি ও পশুপালন সংগঠন, শাসনবিভাগ থেকে বিচারবিভাগের পৃথকীকরণ, আন্তর্জাতিক শান্তি ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধি ভারতীয় সংবিধানে গৃহীত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নির্দেশমূলক নীতি।

২৪.৮ অনুশীলনী

(১) সঠিক উত্তর বেছে নিয়ে বাক্যটি সম্পূর্ণ করুন ঃ

(ক) ভারতের সংবিধানের বর্তমানে সম্পত্তির অধিকার (i) একটি মৌলিক অধিকার (ii) মৌলিক অধিকার নয়।

(খ) ভারতের সংবিধানে শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (i) একটি মৌলিক অধিকার (ii) নির্দেশমূলক নীতি।

(গ) কর্মের অধিকার ভারতের সংবিধান দ্বারা সুরক্ষিত একটি (i) মৌলিক অধিকার (ii) মৌলিক অধিকার নয়।

(ঘ) ভারতীয় সংবিধানে প্রদত্ত রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিগুলি (i) আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য (ii) বলবৎযোগ্য নয়।

(ঙ) ভারতের সংবিধান নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্য (i) নির্দেশ করে (ii) করে না।

(চ) রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতির মধ্যে আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শ (i) প্রতিফলিত হয়েছে (ii) হয় নি।

(২) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(ক) মৌলিক অধিকারগুলি ———— নয়।

(খ) ভারতের সংবিধানে আইনের চোখে ———— একটি মৌলিক অধিকার।

(গ) ———— কারণে রাষ্ট্র মৌলিক অধিকারের উপর সীমা আরোপ করতে পারে।

(ঘ) বাক্ ও মতামত প্রকাশের অধিকার ভারতীয় সংবিধান-স্বীকৃত নাগরিকের একটি ———— অধিকার।

(ঙ) নির্দেশমূলক নীতিগুলি আদালত দ্বারা ———— নয়।

(৩) ক স্তম্ভের নাম বা শব্দগুচ্ছের সঙ্গে খ স্তম্ভের নাম বা শব্দগুচ্ছের মিল দেখান ঃ

	স্তম্ভ ক		**স্তম্ভ খ**
(i)	সংবিধান মান্য করা	(i)	স্বাধীনতার অধিকার
(ii)	বন্দীপ্রত্যক্ষীকরণ	(ii)	সাম্যের অধিকার
(iii)	গ্রেপ্তার ও আটকের বিরুদ্ধে অধিকার	(iii)	নির্দেশমূলক নীতি
(iv)	খেতাবের বিলুপ্তি	(iv)	লেখ
(v)	সকলের জন্য পর্যাপ্ত জীবিকার্জনের ব্যবস্থা	(v)	মৌলিক কর্তব্য

(৪) দু-এক বাক্যে উত্তর করুন ঃ

(ক) ভারতীয় সংবিধানে সংরক্ষিত দুটি সাম্যের অধিকার উল্লেখ করুন।

(খ) সংবিধান স্বীকৃযত ছ'দফা স্বাধীনতার অধিকারগুলির মধ্যে যে কোনো দুটির উল্লেখ করুন।

(গ) ভারতীয় নাগরিকের দুটি মৌলিক কর্তব্যের দৃষ্টান্ত দিন।

(ঘ) মৌলিক অধিকার ও নির্দেশমূলক নীতির মূল পার্থক্য কী?

(ঙ) ভারতীয় সংবিধানে প্রদত্ত নিদের্শমূলক নীতিগুলির মধ্যে যে কোনো দুটির উল্লেখ করুন।

(চ) সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার বলতে কী বোঝেন?

(ছ) ভারতের সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারগুলি কি অবাধ?

(জ) মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের জন্য সুপ্রিমকোর্ট যে নির্দেশ, আদেশ বা লেখ জারি করতে পারে তার মদ্যে যে-কোনো দুটির উল্লেখ করুন।

(৫) নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর করুন (অনধিক ৫০ শব্দে) ঃ

(ক) সংবিধানের ১৪ ধারায় সংরক্ষিত সাম্যের অধিকারটি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(খ) মৌলিক অধিকা ও নির্দেশমূলক নীতির পার্থক্য বিচার করুন।

(গ) সংবিদানের ২২ অনুচ্ছেদে স্বাধীনতার অধিকার সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?

(ঘ) ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক কর্তব্যগুলি কী কী?
(ঙ) সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(৬) নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন (অনধিক ১৫০ শব্দে) ঃ
(ক) মৌলিক অধিকার কাকে বলে? ভারতের সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করুন।
(খ) ভারতের সংবিধান-স্বীকৃত নাগরিকের সাম্যের অধিকার অথবা স্বাধীনতার অধিকার সম্পর্কে কিছু লিখুন।
(গ) ভারতের সংবিধান স্বীকৃত ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করুন।
(ঘ) রাষ্ট্রপরিচালনায় নির্দেশমূলক নীতি বলতে কী বোঝায়? নির্দেশমূলক নীতিগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
(ঙ) রাষ্ট্রপরিচালনায় নির্দেশমূলক নীতিগুলির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন।

২৪.৯ উত্তরমালা

[৩.৫ অংশের প্রশ্নগুলির উত্তর বর্তমান উত্তরমালা/উত্তরসংকেত দেখে মিলিয়ে নিল।]

(১) (ক) ভারতের সংবিধানর বর্তমান সম্পত্তির অধিকার একটি মৌলিক অধিকার নয়।
(খ) ভারতের সংবিধানে শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার একটি মৌলিক অধিকার।
(গ) কর্মের অধিকার ভারতের সংবিধান দ্বারা সুরক্ষিত একটি মৌলিক অধিকার নয়।
(ঘ) ভারতীয় সংবিধানে প্রদত্ত রাষ্ট্রপরিচালনায় নির্দেশমূলক নীতিগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয়।
(ঙ) ভারতীয় সংবিধান নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্য নির্দেশ করে।
(চ) রাষ্ট্রপরিচালনায় নির্দেশমূলক নীতির মধ্যে আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে।

(২) (ক) মৌলিক অধিকারগুলি অবাধ নয়।
(খ) ভারতের সংবিধানে আইনের চোখে সমানাধিকার একটি মৌলিক অধিকার।
(গ) যুক্তিসংগত কারণে রাষ্ট্র মৌলিক অধিকারের উপর সীমা আরোপ করতে পারে।
(ঘ) বাক্ ও মতামত প্রাশের অধিকার ভারতীয় সংবিধান-স্বীকৃত নাগরিকের একটি স্বাধীনতার অধিকার।
(ঙ) নির্দেশমূলক নীতিগুলি আদালত দ্বারা বলবৎযোগ্য নয়।

(৩)

	স্তম্ভ ক		**স্তম্ভ খ**
(i)	সংবিধান মান্য করা	(i)	মৌলিক কর্তব্য (v)
(ii)	বন্দিপ্রত্যক্ষীকরণ	(ii)	লেখ (iv)
(iii)	গ্রেপ্তার ও আটকের বিরুদ্ধে অধিকার	(iii)	স্বাধীনতার অধিকার (i)
(iv)	খেতাবের বিলুপ্তি	(iv)	সাম্যের অধিকার (ii)
(v)	সকলের জন্য পর্যাপ্ত জীবিকার্জনের ব্যবস্থা	(v)	নির্দেশমূলক নীতি (iii)

(৪) (ক) ভারতীয় সংবিধানে সংরক্ষিত দুটি সাম্যের অধিকার হল (১) আইনের চোখে সমানাধিকার ও আইনের সমান সংরক্ষণ পাবার অধিকার; (২) সরকারী চাকরীর ক্ষেত্রে সাম্য।
(খ) সংবিধানে স্বীকৃত ছ'দফা স্বাধীনতার মধ্যে দুটি হ'ল (১) বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা; (২) শান্তিপূর্ণভাবে সমবেত হবার স্বাধীনতা।
(গ) ভারতের নাগরিকের দুটি মৌলিক কর্তব্য হল (১) সংবিধান মেনে চলা, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় স্তোত্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন; (২) ভারতের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও সংহতিকে সংরক্ষণ করা।
(ঘ) মৌলিক অধিকার ও নির্দেশমূলক নীতির মূল পার্থক্য হল—মৌলিক অধিকার আদালত দ্বারা বলবৎযোগ্য, নির্দেশমূলক নীতি আদালত দ্বারা বলবৎযোগ্য নয়।
(ঙ) ভারতীয় সংবিধানে প্রদত্ত নির্দেশমূলক নীতিগুলির মধ্যে দুটি অন্যতম নীতি হল (১) রাষ্ট্র নাগরিকদের জন্য জীবনধারণোপযোগী মজুরি, জীবনযাত্রার উন্নতমান, কাজের উপযুক্ত পরিবেশ,

অবসর, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করবে। (২) রাষ্ট্র সমগ্র ভারতের সকল নাগরিকের জন্য একই রকমের দেওয়ানি আইন চালু করবার ব্যবস্থা করবে।

(চ) সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার হল মৌলিক অধিকারগুলিকে সুরক্ষিত করার জন্য নাগরিকের সুপ্রিমকোর্টের কাছে আবেদন করার অধিকার।

(ছ) ভারতের সংবিধান-স্বীকৃত মৌলিক অধিকারগুলি অবাধ নয়।

(জ) মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের জন্য সুপ্রিমকোর্ট যে আদেশ, নির্দেশ বা লেখ জারি করতে পারে তার মধ্যে দুটি হল বন্দিপ্রত্যক্ষীকরণ ও পরমাদেশ।

২৪.১০ গ্রন্থপঞ্জি

1. Druga Das Basu: *Introduction to the Constitution of India* (1999).
2. Granville Austin : *The Indian Constitution Cornerstone of a Nation* (1985).
3. J. C. Johari: *Indian Government and Politics,* Vol-I (1996).
4. J. C. Johari : *The Constitution of India. A Politico-legal Study* (1995).
5. Subhas C. Kashyap (ed) : *Perspective on the Constitution* (1993).

একক ২৫ ❑ সংবিধান সংশোধন

গঠন

২৫.০ উদ্দেশ্য
২৫.১ প্রস্তাবনা
২৫.২ মূল আলোচনা
  ২৫.২.১ সংবিধান সংশোধনের প্রশ্নে গণপরিষদের দৃষ্টিভঙ্গি
২৫.৩ ভারতের সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি
২৫.৪ সারাংশ
২৫.৫ অনুশীলনী
২৫.৬ উত্তরমালা
২৫.৭ গ্রন্থপঞ্জি

২৫.০ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করলে আপনি

- সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা কী তা জানতে পারবেন।
- সংবিধান সংশোধনের বিচারে ভারতীয় সংবিধানের প্রকৃতি উপলব্ধি করতে পারবেন।
- ভারতে সংবিধান সংশোধনের পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির মূল্যায়ন করতে পারবেন এবং এই প্রশ্নে আপনার নিজস্ব সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবেন।

২৫.১ প্রস্তাবনা

সংবিধান দেশের সর্বোচ্চ ও মৌলিক আইন বলে পরিচিত। ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর গণপরিষদ ভারতের জনগণের পক্ষে সংবিধান গ্রহণ করে এবং এই সংবিধান আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয় ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি। মৌলিক আইন হিসাবে সংবিধানের পবিত্রতা ও মর্যাদার কথা সংবিধানপ্রণেতারা বারবার বলেছেন। মূল প্রশ্ন হল সংবিধানের এই পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখা যাবে কী করে! অধিকাংশ লেখকের ধারণা হল সংবিধানের ঘন ঘন পরিবর্তন সংবিধানের মর্যাদা ও পবিত্রতাবিরোধী। তবে ভারতের সংবিধানপ্রণেতারা লর্ড মেকলের ভাবনায় প্রভাবিত হয়ে পরিবর্তনশীল সমাজের গতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্য সংবিধানকে নমনীয় করতে চেয়েছিলেন। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধনের ব্যাপারে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বনের কথাও তাঁরা ভেবেছিলেন। সম্ভবত নমনীয়তা এবং অনমনীয়তার মাঝামাঝি অবস্থানের নীতিতেই তাঁরা আস্থাশীল ছিলেন। সংবিধান সংশোধনের ব্যাপারে, তাই তারা সাধারণ ও বিশেষ দুটি পদ্ধতিকেই অনুসরণ করেছিলেন। বর্তমান পাঠে শিক্ষার্থী পাঠক ভারতে সংবিধানে সংশোধনের এই পদ্ধতিগুলি বিচার করে ভারতীয় সংবিধানের প্রকৃতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। তিনটি অংশে সমগ্র আলোচনাটিকে ভাগ করা হয়েছে। সংক্ষেপে সংবিধান সংশোধনের প্রয়োনজীয়তা বিচার করে ভারতে সংবিধান সংশোধনের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। সবশেষে এই সংশোধন পদ্ধতির যথার্থতা বিচার করা হবে।

২৫.২ মূল আলোচনা

২৫.২.১ সংবিধান সংশোধনের প্রশ্নে গণপরিষদের দৃষ্টিভঙ্গি

আসুন, মূল আলোচনার শুরুতেই সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা কেন এবং ভারতে বিষয়টি কিভাবে বিবেচনা করা হয়েছে সে প্রশ্নে সংবিধানবিশেষজ্ঞগণের মতামত কী আমরা তা জানতে চেষ্টা করি। একটি বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপটেই কোন দেশের সংবিধান রচিত হয়। অনেকেই মনে করেন সংবিধান একটি পবিত্র দলিল। সংবিধানের ঘন ঘন পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বৃহত্তর স্বার্থে, ক্ষমতাবণ্টনের ব্যবস্থাকে অটুট রাখতে সংবিধানকে অনমনীয় রাখার পক্ষেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংবিধানপ্রণেতারা। তবে বিশেষ প্রয়োজনে, জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছায় এবং রাজ্যগুলির মিলিত সিদ্ধান্তে অত্যন্ত দ্রুত সংবিধান পরিবর্তন যে সম্ভব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সে দৃষ্টান্ত রেখেছে সংবিধানের অষ্টাদশ এবং একবিংশ সংশোধনের মধ্য দিয়ে সুইট্জারল্যান্ডে সংবিধান পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নমনীয়তার তার নীতিই গুরুত্ব পেলেও কানাডায় সংবিধান পরিবর্তনের প্রশ্নে অনমনীয় নীতি প্রাধান্য পেয়েছে। তুলনামূলকভাবে মার্কিন সংবিধান অনমনীয়তার নীতিতে আস্থা রাখলেও বিশেষ পরিস্থিতিতে সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজনকে অস্বীকার করেনি। এক্ষেত্রে বিচারবিভাগীয় সমীক্ষা ও সরকারি স্তরে সহযোগিতা ও ঐক্যমত্যের ভিত্তিতেই সংবিধান সংশোধনের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অগ্রসর হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া সাধারণভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতিকেই অনুসরণ করলেও কানাডা এক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে রক্ষণশীলতার নীতি নিয়েই চলেছে। অর্থনীতির উপর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্যের পক্ষে এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে, বিশেষত ব্যাবসা ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্ষমতা ভাগাভাগির বিপক্ষে কানাডার অবস্থান সম্পূর্ণ রক্ষণশীল।

প্রান্তলিপি ঃ
অষ্টাদশ সংশোধনের দেশের ভেতরে উত্তেজক মাদক উৎপাদন, বিক্রয় এবং দেশের বাইরে থেকে আমদানী নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে কংগ্রেস ও রাজ্য আইনসভার উপযুক্ত আইন প্রণয়নের যুগ্ম ক্ষমতা থাকবে। রাজ্য আইনসভার দ্বারা এই সংশোধন অনুমোদিত না হ'লে আইনটি কার্যকর হবে না। একবিংশ সংশোধনে রাজ্যগুলির সম্মেলন আহ্বান করে এই আইনকে আরও ব্যাপকভাবে প্রয়োগের সিদ্ধান্ত হয়।

ভারতের সংবিধান অবশ্য এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের প্রচলিত রনীতিকে অনুসরণ না করে সম্পূর্ণ নিজস্ব পথ পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। গণপরিষদের বিভিন্ন সদ্যসরা গতিশীল ও পরিবর্তনশীল ভারতীয় সমাজের কথা ভেবে, নতুন রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির চাহিদার কথা বিবচনা করে প্রয়োজনমতো সংবিধানের পরিবর্তনের কথা ভেবেছেন। সংবিধানকে সময়োপযোগী করার জন্য সংবিধান পরিবর্তনের বা সংশোধনের এক সাংবিধানিক ব্যবস্থার পক্ষেই তাঁরা মত দিয়েছেন। ড. দেশমুখ মন্তব্য করেছেন, বাতাস বেরোবার ব্যবস্থা না থাকলে বা বায়ুনিবারণযন্ত্র না থাকলে জাহাজটিই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। সংবিধানের ক্ষেত্রেও পরিবর্তনের পথ বা ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। বিপ্লবের কারণ অনুসন্ধান করে মেকলে বলেছিলেন, জাতি যখন এগিয়ে যায় সংবিধান তখন স্থিতিশীল থাকে। সুতরাং সংবিধান নমনীয় হওয়াই বাঞ্ছনীয় সংবিধান যে লক্ষ্য নয়, লক্ষ্যসাধনের পন্থা মাত্র, নতুন পরিস্থিতিতে এর পরিবর্তন অপরিহার্য সংবিধানবিশেষজ্ঞ এম. ভি. পাইলী (M. V. Pylee) সে কথা বলেছেন। ড. আম্বেদকরের নেতৃত্বে সংবিধান খসড়া কমিটি একটি নমনীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সুপারিশ করে। কে. এম. মুন্সী, কে. টি. শাহ, কে. এম. পানিক্কর, আলাদি কৃষ্ণস্বামী আয়ার, এন. ডি. আয়েঙ্গার, বি. এন. বাউ, জওহরলাল নেহরু, ভি. টি. কৃষ্ণমাচারী প্রমুখরা দীর্ঘ আলোচনা, নানা প্রস্তাব, স্মারকলিপি সংশোধনী পেশের পর একটি নমনীয় সংবিধানের পক্ষে একমত হন। অনমনীয়তা ও আইন সিদ্ধতায় জটিল আবর্তে অবস্থান না করে সংবিধানে নমনীয়তা ও উদারতার নীতিকে আহ্বান করা হলেও সংবিধানপ্রণেতারা কতকগুলি ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন এবং সংশোধনের বিশেষ পদ্ধতিকে সমর্থন করেছেন। আম্বেদকর স্বীকার করেছেন, সংবিধান একটি মৌলিক দলিল।

সাধারণ সংসদীয় ভোটাধিক্যে এর পরিবর্তন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে একথা ভেবেই সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে অপরিবর্তনীয় রাখাই বিধেয়।

তবে চূড়ান্ত বিচারে সংবিধান যে অনমনীয় হবে না, দেশের লিখিত সংবিধানের সঙ্গে পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্বকেও যে স্বীকার করে নিতে হবে সে কথা সংবিধানপ্রণেতারা মেনে নিয়েছেন। পণ্ডিত নেহরু গণপরিষদের বিতর্কে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেচেন অত্যন্ত স্পষ্টভাবে। নেহরু বলেছেন, আমরা চাই ভারতের সংবিধান দৃঢ় ও স্থায়ী হোক, কিন্তু সংবিধানের স্থায়িত্ব বলে কিছু নেই। সংবিধানের নমনীয়তা আবস্যক। অতিমাত্রায় কঠোর ও স্থায়ী হলে জাতির, জনগণের বৃদ্ধি, বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হবে। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করতেই সংবিধানকে অতিমাত্রায় কঠোর বা অনমনীয় রাখা ঠিক নয়। (“While we want this Constitution to be as solid and permanent as we can make if, there is no permanence in constitutions. There should be a certain flexibility. If you make any thing rigid and permanent, you stop, the nation’s growth, the growth of a living, vital organic people.... In any event, we could not make the Constitution as rigid that it cannot be adapted to changing conditions.” Pandit Nehru).

সন্দেহ নেই মেকলের আদর্শকে পুরোপুরি মেনে না নিলেও ভারতের সংবিধানপ্রণেতারা তাঁর ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়েছেন। সাধারণভাবে নমনীয় ও অনমনীয় সংবিধান উভয়ের মাঝামাঝি পথটিকেই তাঁরা বেছে নিয়েছেন। সংবিধানের পবিত্রতা বা মর্যাদাকে মেনে নলেও নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতিনিধিসভা পার্লামেন্টের সার্বভৌমিকতাকে এঁরা গুরুত্ব দিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রচলিত রীতি বা তত্ত্ব মেনে সংবিধান সংশোধনের বিষয়টিকে সাধারণ আইনসভার বাইরে কোনও সংস্থার হাতে না রেখে বা যুক্তরাষ্ট্রীয় ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সংশোধনের বিশেষ কোনও পদ্ধতির ব্যবস্থা না রেখে ভারতের সংবিধানপ্রণেতারা সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে পার্লামেন্টকে প্রয়োজনীয় দায়িত্ব দিয়েছেন এবং পরিবর্তনশীল সমাজের চাহিদা ও প্রয়োজনের সঙ্গে সংবিধানকে সুসঙ্গত করার ভাবনাকেও লালন করেছেন। সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সংবিধান প্রণেতাদের কোনো সন্দেহই ছিল না।

সংবিধান সংশোধনের খসড়া প্রস্তুতের কাজ শুরু হয়ে যায় ১৯৪৭ সাল থেকেই। সংবিধানের সংশোধন-প্রণালী রচনার কাজ প্রধানত কমিটি স্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল। গণপরিষদে আলোচনা হলে প্রস্তাব গ্রহণের পূর্বে কয়েক ঘণ্টার জন্য আলোচনা হয়েছে। সংবিধান সংশোধনের প্রণালী নমনীয় হবে না অনমনীয় হবে এ প্রশ্নে বিতর্ক ছিল, কিন্তু শেষপর্যন্ত এক্ষেত্রে মীমাংসা হয়েছে সহজেই। কেন্দ্রীয় সংবিধান কমিটির (Union Constitution Committee) কোনও কোনও সদস্য প্রাথমিকভাবে সংশোধনের প্রশ্নে রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিলেও, সংশোধনের প্রশ্নে আইনসভার প্রতিটি কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন এবং রাজ্যগুলির অধিকাংশের সম্মতির পক্ষে মত দিলেও, শেষ পর্যন্ত সংশোধনের ক্ষেত্রে উদার ও নমনীয় নীতির পক্ষেই বলেছেন। সংবিধান চালু হবার পরে প্রথম পাঁচবছর সাধারণ ভোটাধিক্যের ভিত্তিতেই আইনসভার সাধারণ আইন পাশের পদ্ধতিকেই সংবিধান সংশোধনের ব্যবস্থা থাকবে নেহরু, বি. এন. রাউ মুন্সী, আইয়ার এমনকি ড. আম্বেদকারও সেটা চেয়েছেন। জটিল এবং স্পর্শকাতর প্রশ্নে যেমন, সংখ্যালঘুর সংরক্ষণ বা ভাষাগত রাজ্যের দাবি বা অন্তর্বর্তীকালীন কিছু কিছু অনুচ্ছেদের ক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধনের উদার ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন প্রায় সকলেই এটা বলেছেন। সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত জনপ্রতিনিধিসভার ভূমিকা যে সংশোধনের প্রশ্নে গণপরিষদের মতো পরোক্ষভাবে নির্বাচিত একটি সভা বা সংস্থার চেয়ে কম নয় সংবিধানপ্রণেতারা প্রায় সকলেই সেটা উপলব্ধি করেছেন।

এবার আসুন ভারতীয় সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতি নিয়ে আমরা আলোচনা করি।

২৫.৩ ভারতের সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি

সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে বিধিবদ্ধ পদ্ধতির কথাই সংবিধানরচয়িতারা ভেবেছিলেন। ভারতের মতো যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় এবং লিখিত সংবিধানে বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে সংবিধান সংশোধনের গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁদের কোনও সন্দেহ ছিল না। সংবিধানের ৩৬৮ ধারায় সংবিধান সংশোধনের এই বিধিবদ্ধ পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। সংবিধানের অন্যান্য কিছু বিষয় আছে যেখানে সাধারণ আইন পাশের পদ্ধতিতে পার্লামেন্ট পরিবর্তন করতে পারে।

ভারতীয় সংবিধানের ৩৬৮ অনুচ্ছেদে সংবিধানসংশোধনের দুটি পদ্ধতির উল্লেখ আছে। ৩৬৮(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে (ক) সংশোধনী প্রস্তাব বিল আকারে পার্লামেন্টের যে কোনো কক্ষে উপস্থিত করতে হবে, (খ) ঐ বিল পার্লামেন্টের উভয়কক্ষে পৃথকভাবে মোট সদস্যসংখ্যার অধিকাংশ এবং উপস্থিত ও ভোটপ্রদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের দ্বারা পাশ হওয়া প্রয়োজন, (গ) উভয় কক্ষের অনুমোদন পাবার পর বিলটি রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পাঠানো হবে এবং রাষ্ট্রপতির সম্মতি পেলে বিলটি পাশ হবে। সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ের মৌলিক অধিকার বা চতুর্থ অধ্যায়ের নির্দেশমূলক নীতি এবং সংবিধানের অনেক অংশই এই পদ্ধতিতে পরিবর্তন করা যায়।

সংবিধানের ৩৬৮(২) ধারায় উল্লিখিত সংশোধনের দ্বিতীয় পদ্ধতিটি অপেক্ষাকৃত জটিল। এই পদ্ধতি অনুসারে (ক) সংশোধনী প্রস্তাব বিল আকারে পার্লামেন্টের যে কোনো কক্ষে উত্থাপিত হবে, (খ) ঐ বিল পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে পৃথকভাবে মোট সদস্যসংখ্যায় অধিকাংশ এবং উপস্থিত ও ভোটপ্রদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াশের সমর্থনে পাশ হবে, (গ) এর পর রাজ্য আইনসভার অন্তত অর্ধেকের সম্মতির জন্য বিলটি পাঠানো হবে, (ঘ) রাজ্য আইনসভার প্রয়োজনীয় সম্মতি পাওয়া গেলে বিলটি রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হবে। রাষ্ট্রপতির সম্মতি পেলেই সংবিধান সংশোধন হবে। সংবিধান সংশোধনের এই বিশেষ পদ্ধতি দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে প্রভাবিত করে এমন সব বিষয়গুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এগুলি হল রাষ্ট্রপতির নির্বাচন প্রণালী (৫৪, ৫৫ অনুচ্ছেদ), কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসনবিভাগীয় ক্ষমতার সীমানির্ধারণ (৭৩, ১৬২ অনুচ্ছেদ), সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্ট (২৪১ অনুচ্ছেদ, পঞ্চম অংশের চতুর্থ অধ্যায়, ষষ্ঠ অংশের পঞ্চম অদ্যায়) কেন্দ্র ও রাজ্যের আইন সংক্রান্ত ক্ষমতাবণ্টন (নবম অংশের প্রথম অধ্যায়), ৭ম তপশিলের তালিকার কোন অংশ পার্লামেন্টে রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব (৮০-৮১ অনুচ্ছেদ), ৪র্থ তপশিল এবং সংবিধানের ৩৬৮ অনুচ্ছেদ)।

৩৬৮ অনুচ্ছেদে বর্ণিত সংবিধান সংশোধনের দুটি বিশেষ পদ্ধতি ছাড়া সংবিধান সংশোধনের একটি সরল পদ্ধতি আছে। সাধারণ আইন পাশের পদ্ধতিতে সংসদের উভয় কক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে এ ক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধন করা যায়। নতুন রাজ্যের সৃষ্টি (২-৪ অনুচ্ছেদ), নাগরিকতা (৫-৮ অনুচ্ছেদ), বিধান পরিষদের সৃষ্টি ও বিলোপ (১৬৯ অনুচ্ছেদ), সাংসদদের বিশেষ অধিকার, বেতন, ভাতা (১০৫, ১০৬ অনুচ্ছেদ), সুপ্রিমকোর্টের এলাকা সম্প্রসারণ (১০৫ অনুচ্ছেদ), সরকারি ভাষা (৩৪৮ অনুচ্ছেদ), নির্বাচন (৩২৭ অনুচ্ছেদ) ইত্যাদি বিষয় এই পদ্ধতিতে সংশোধন করা যায়।

॥ এক নজরে ভারতের সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি ॥

(ক) বিশেষ পদ্ধতি (৩৬৮ অনুচ্ছেদ)	(খ) সাধারণ পদ্ধতি (৩৬৮ অনুচ্ছেদ)	(গ) অতি সাধারণ পদ্ধতি
সংসদের উভয় কক্ষে মোট সদস্যসংখ্যার অধিকাংশ এবং উপস্থিত ও ভোট প্রদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের ভোট, রাজ্যগুলির অর্ধেক আইনসভার সম্মতি এবং রাষ্ট্রপতির সম্মতিতে সংবিধান সংশোধন। (ইউনিয়ন ও রাজ্যগুলির আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতাবণ্টন, সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি ইত্যাদি)	সংসদের উভয় কক্ষে মোট সদস্য সংখ্যার অধিকাংশ এবং উপস্থিত ও ভোটপ্রদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে এবং রাষ্ট্রপতির সম্মতিতে সংবিধান সংশোধন। (মৌলিক অধিকার নির্দেশমূলক নীতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে সংশোধন)	সংসদের উভয় কক্ষে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সংবিধান সংশোধন। (নতুন রাজ্যের সৃষ্টি, রাজ্যের পুনর্গঠন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সংশোধন)

সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে আপনি প্রসঙ্গত কিছু ধারণা লাভ করতে পারবেন।

পৃথিবীর অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানে সংশোধনের যে পদ্ধতি আছে তার সঙ্গে তুলনা করলে ভারতের সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতির কিছু অভিনব বৈশিষ্ট্য আপনারা শনাক্ত করতে পারবেন।

(১) ভারতের সংবিধান সংশোধন পদ্ধতিকে একাধারে অনমনীয় ও নমনীয় দু'ভাবেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এক অর্থে ভারতের সংবিধান মনীয়তা ও অনমনীয়তার এক অপূর্ব মিশ্রণ বলা যেতে পারে। সংবিধান সংশোধনের বিশেষ পদ্ধতি (৩৬৮ অনুচ্ছেদ) অনমনীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্যকেই প্রকাশ করে। আবার সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভোটে সাধারণ আইন পাশের পদ্ধতিতে পার্লামেন্টে সংবিধান সংশোধনের পদ্ধতি নমনীয় সংবিধানেরই দৃষ্টান্তকে উপস্থিত করে।

(২) সংবিধান সংশোধনের বিশেষ পদ্ধতি ভারতীয় সংবিধানের অনমনীয়তার দৃষ্টান্ত হলেও মার্কিন সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির মতো এটি অতটা অনমনীয় বা জটিল নয়।

(৩) সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে ভারতে কোনও পৃথক সংবিধানিক সভা বা সংস্থার কথা বলা হয়নি। ভারতে সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা পার্লামেন্টের হাতেই ন্যস্ত।

(৪) রাজ্য আইনসভার সংবিধান সংশোধনী বিল উত্থাপন বা সংশোধনের কোনও প্রস্তাব পেশ করার অধিকার নেই।

(৫) সাধারণ বিলের মতোই পার্লামেন্টে সংবিধান সংশোধনের বিল উত্থাপন, পেশ ও অনুমোদিত হয়। ৩৬৮ ধারায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিশেষ পদ্ধতি ছাড়া সাধারণ বিলের সঙ্গে সংবিধান সংশোধন বিলের পার্থক্য নেই। তবে সাধারণ বিলের ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের উভয় সভার মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হলে পার্লামেন্টের যৌথ অধিবেশন আহ্বান করে এই বিরোধ নিষ্পত্তির যে ব্যবস্থা আছে সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে তেমন কোনও ব্যবস্থা নেই।

(৬) সংবিধান সংশোধনের জন্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদন প্রয়োজন হলেও সংবিধান সংশোধন বিলে অসম্মতি প্রকাশে ক্ষমতা তাঁর নেই (২৪তম সংবিধান সংশোধন আইন ১৯৭১) বিল উত্থাপনের জন্যও তাঁর পূর্বানুমতির প্রয়োজন নেই।

(৭) সংবিধান সংশোধনের বিশেষ পদ্ধতিতে [৩৬৮(২) অনুচ্ছেদ] রাজ্য আইনসভার সম্মতি নেবার যে ব্যবস্থা আছে তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় উদার ব্যবস্থা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজ্যগুলির তিনি-চতুথাংশের সম্মতি না পেলে সংশোধন বিল পাশ হয় না। ভারতে মোট রাজ্যের অর্ধেকের সম্মতি পেলেই সংশোধনী বিল পাশ হতে পারে।

(৮) বিগত ৫০ বছরে প্রায় ৮০টি সংবিধান সংশোধন বিল উত্থাপন এবং অধিকাংশ বিল পাশ হবার ঘটনা প্রমাণ করে ভারতের সংবিধান অত্যন্ত নমনীয় সংবিধান। তপশিলী জাতি ও উপজাতিদের স্বার্থরক্ষা, রাজ্য পুনর্গঠন, মৌলিক অধিকারের উপর যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ আরোপ, নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা সংকোচন, সম্পত্তির অধিকারের মৌলিক অধিকার হিসাবে বিলুপ্তি নির্দেশমূলক নীতির প্রাধান্য, রাজন্যভাতা বিলোপ, কিছু অনুচ্ছেদ বাতিল ও নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজন, লোকসভায় আসনসংখ্যা বৃদ্ধি, প্রস্তাবনার পরিবর্তন, নাগরিকের মৌলিক কর্তব্য উল্লেখ, সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের ক্ষমতা পরিবর্তন, ৪২তম সংশোধন আইন ৪৪তম সংশোধন আইন অনুসারে ৪২তম সংশোধন আইনের কিছু অংশ বাতিল, পঞ্চায়েত ও পৌরসভা গঠন—সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে বহু ক্ষেত্রেই পরিবর্তন আনা হয়েছে, সংবিধান বৈচিত্র্য ও গতিশীলতার সঞ্চার হয়েছে।

(৯) সংবিদান সংশোধনের প্রশ্নে একটি উল্লেখযোগ্য প্রবণতা মৌলিক অধিকারের সংশোধন বিষয়ে সুপ্রিমকোর্টের পরস্পরবিরোধী রায় প্রদান। শঙ্করী প্রসাদ বনাম ভারত সরকার মামলায় (১৯৫১) সুপ্রিমকোর্ট রায় দেয় সংবিধানের সকল অংশই সংশোধন করা যায়। গোলকনাথ বনাম পঞ্জাব রাজ্য মামলায় (১৯৬৭) সুপ্রিমকোর্ট রায় দেয় পার্লামেন্ট মৌলিক অধিকারসহ সংবিধানের যে কোনো অংশের সংশোধন করার ক্ষমতা লাভ করে। ১৯৭৩ সালে কেশবানন্দ ভারতী মামলায় সুপ্রিমকোর্ট রায় দেয় সংবিধানের ২৪তম সংশোধন বৈধ তবে মৌলিক কাঠামো পরিবর্তনের ক্ষমতা পার্লামেন্টের নেই। ১৯৭৬ সালে ৪২তম সংবিধান সংশোধনী আইনে আবার বলা হয়েছে পার্লামেন্টের সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতার উপর কোনও বিধিনিষেধ থাকবে না। একথাও এই সংশোধনী আইনে বলা হল, সংবিধান সংশোধনের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগেই আদালতে কোনও মামলা করা যাবে না। ১৯৮০ সালে মিনার্ভা মিলস্ মামলায় সুপ্রিমকোর্ট ৪২তম সংশোধন বাতিল করে দেয় এবং বলে পার্লামেন্ট সংবিধানের মৌলিক কাঠামো সংশোধন করতে পারে না এবং যে কোনো সংবিধান সংশোধনই বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার (Judicial Review) এক্তিয়ারভুক্ত। সংবিধানের ৪২তম সংশোধনীতে ৩৬৮ অনুচ্ছেদের সঙ্গে (৪) ও (৫) উপধারা সংযোজন করে বলা হল আদালতে সংবিদান সংশোধনের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন করা চলবে না এবং পার্লামেন্টের সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতার উপর কোনো সীমা আরোপ করা চলেব না। মিনার্ভা মিলস্ মামলায় বিচারবিভাগীয় সমীক্ষাকে সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্য বলে বর্ণনা করে বলা হল সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে একে কেড়ে নেওয়া যায় না। সুপ্রিমকোর্ট ৩৬৮(৪) ও (৫) অনুচ্ছেদকেই বাতিল বলে ঘোষণা করে। সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্য (basic feature) কী সরাসরি এ ব্যাপারটি না জানালেও কোর্টের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত থেকে মোটামুটি এটা বোঝা যায় সংবিধানের প্রাধান্য আইনের অনুশাসন, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি, সংবিধানের প্রস্তাবনার উদ্দেশ্যগুলি, বিচারবিভাগীয় সমীক্ষা, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, ধর্মনিরপেক্ষতা দেশের সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্রী কাঠামো, ব্যক্তির স্বাধীনতা ও মর্যাদা, জাতির ঐক্য ও সংহতি, পার্লামেন্টীয় ব্যবস্থা, অবাধ ও ন্যায্য নির্বাচন, বিচারবিভাগের নিরপেক্ষতা এগুলিই সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্য বলে সুপ্রিমকোর্ট মনে করে।

এবার আসুন ভারতে সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি, সংশোধনের বৈশিষ্ট্য ও নীতিগুলি সম্পর্কে সমালোচক ও রাজনৈতিক মহলের প্রতিক্রিয়া কী—মূল আলোচনার শেষ অংশে সংক্ষেপে সে বিষয়ে কিছু আলোকপাত করি।

২৫.৩.১ সংবিধানসংশোধন-পদ্ধতির সমালোচনা ও প্রতিক্রিয়া

ভারতে সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির প্রধান তাৎপর্য নমনীয়তা ও অনমনীয়তার নীতির ভারসাম্য বিধান। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও দেশের পরিবর্তিত সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিচারে এই ধরনের সংশোধন নীতি বাস্তব এবং গ্রহণযোগ্য বলেই অধিকাংশ লেখক মনে করেন। নেহরু, আম্বেদকার, মুন্সী বা আইয়ার গণপরিষদের অধিকাংশ সদস্যের চোখে সংবিধান সংশোধনের এই ব্যবস্থাই আদর্শ মনে হয়েছে। একটি নমনীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আদর্শই সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা সংবিধানপ্রণেতারা এ ব্যাপারে একটি বৈজ্ঞানিক সমাধানই চেয়েছিলেন যা ভারতের মতো যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে সুবিধাজনক এবং উপযুক্ত।

তবে সংবিধানের ৩৬৮ ধারাকে সংশোধনের ক্ষেত্রে একটি সম্পূর্ণ বিধি বলে মেনে নিতে কোনও কোনও মহলে আপত্তি আছে। শঙ্করী প্রসাদ বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন মামলায় (১৯৫১) সুপ্রিমকোর্ট সংবিধানের এই অনুচ্ছেদটিকে পর্যাপ্ত বলে মনে করেনি। অনুচ্ছেদটি সংশোধনের সব ক্ষেত্রকে আবৃত করে না বা এর অর্থও সব পর্যায়ে স্পষ্ট নয়। বিচারপতি হিদায়াতুল্লা (Justice Hidayatullah) গোলকনাথ মামলায় (১৯৬৭) বলেছেন সংবিধানের ৩৬৮ অনুচ্ছেদকে সব দিক দিয়ে উপযুক্ত মনে করা বিরাট ভুল।

সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের একাধিপত্যকেও সুপ্রিমকোর্ট মেনে নিতে পারেনি। মৌলিক অধিকারকে খর্ব করে পার্লমেন্ট কখনই সংবিধান সংশোধন করতে পারে না গোলকনাথ মামলায় সুপ্রিমকোর্টের এটাই ছিল চূড়ান্ত অভিমত। পার্লামেন্ট সংবিধানের মূল কাঠামোকে ধ্বংস করতে পারে না কেশবানন্দ ভারতী মামলায় (১৯৭৩) সুপ্রিমকোর্টের এই রায় ছিল, যদিও মৌলিক অধিকার সংশোধনের ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের ক্ষমতাকে এই মামলায় অস্বীকার করা হয়নি।

সংবিধান সংশোধনের প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্রের মূলনীতিকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে বলেও কোনও কোনও সমালোচক অভিযোগ করেন। সংবিধান সংশোধনের প্রশ্নে রাজ্যের ভূমিকা একান্তই গৌণ। পার্লামেন্টের একক সিদ্ধান্তেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধনের ব্যবস্থা আছে। রাজ্য আইনসভা সংশোধনের কোনো প্রস্তাব করতে পারে না। বিশেষ ক্ষেত্রে রাজ্য আইনসভার পার্লামেন্ট প্রস্তাবিত আইনকে অনুমোদনের আনুষ্ঠানিক একটা ব্যবস্থা আছে মাত্র। রাজ্যের এলাকা পরিবর্তন বা নতুন রাজ্য গড়ার ক্ষেত্রে কেন্দ্রের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

সংবিধান সংশোধনের প্রশ্ন নিয়ে পার্লামেন্ট ও সুপ্রিমকোর্টের বিতর্ক ও সংবিধানের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়। পার্লামেন্ট সংশোধনের প্রশ্নে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রতিপত্তি ও ইচ্ছা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে বলে যেমন অভিযোগ আছে আবার সংবিধান সংশোধনের প্রশ্নে বিচারবিভাগের রায় ও পরস্পরবিরোধিতার দোষে দুষ্ট বলে অভিযোগ কথা হয়েছে। ৪২তম, ৪৩তম ও ৪৪তম সংবিধান সংশোধন আইন (১৯৭৬) আগেকার আইনজ্ঞ মহলে বিরাট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ৪২তম সংবিধান সংশোধন আইন (১৯৭৬) আগেকার সমস্ত সংবিধান সংশোধনের ব্যাপারকে তাৎপর্যহীন করে তুলেছে বলে মন্তব্য করা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের সংশোধন ক্ষমতা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং কত সহজেই যে সংবিধানের অত্যাবশ্যক অনুচ্ছেদকে পার্লামেন্ট শাসকদলের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে সহজেই পরিবর্তন করা যায় ৪২তম সংশোধন তার অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত। ''All previous amendments paled into insignificiance after the passing of the 42nd Amendment Act, 1976, which alone would illustrate how momentous is the amending power under the Constitution, and how easy it is to change extensive and vital provisions of the Constitution, without any elaborate formalities when the ruling party has a comfortable majority in the two houses of Parliament.'' D. Basu ৪২তম সংশোধনে সংবিধানের প্রস্তাবনা, ৫৩টি অনুচ্ছেদ, সপ্তম তপশিলের পরিবর্তন চাওয়া হয়েছে এবং ১৯৪৯ সালে যে সংবিধান গণপরিষদ উপস্থিত করেছে এই সংশোধন তার মূলনীতিকে পরিবর্তন করতে চেয়েছে। এই আইনে মৌলিক অধিকারের অবমূল্যায়ন ঘটেছে, বিচারবিভাগের ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে। ৪৩তম ও ৪৪তম সংশোধন ৪২তম সংশোধনের ক্ষতিকর দিকগুলি সংশোধনের চেষ্টা করলেও, পার্লামেন্টে (রাজ্যসভায়) প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাবে এক্ষেত্রে আংশিক সাফল্য অর্জন করেছে।

সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে নমনীয়তা কাম্য কিন্তু সমাজ পরিবর্তনের বৃহত্তর স্বার্থেই সংবিধান নমনীয় হবে। সমাজের স্বার্থ, নাগরিক স্বার্থের কথা মনে রেখেই সংবিধান সংশোধন হবে, রাজনৈতিক ক্ষুদ্র স্বার্থে সংবিধান সংশোধন বাঞ্ছনীয় নয়। পার্লামেন্ট এবং আদালত উভয়কেই এক্ষেত্রে গঠনমূলক ভূমিকা নিতে হবে।

২৫.৪ সারাংশ

সংবিধানে সংশোধনের ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা কানাডার মতো কঠোর, অনমনীয় নীতি ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতারা গ্রহণ করেননি। পরিবর্তনশীল ভারতীয় সমাজের চাহিদা ও নতুন সামাজিক-আর্থিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে ড. আম্বেদকরের নেতৃত্বে খসড়া সংবিধান কমিটি এক নমনীয় সংবিধানের সুপারিশ করে। তবে প্রধানত নমনীয় হলেও কতকগুলি ক্ষেত্রে—সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থার কথাও সংবিধানপ্রণেতারা বিবেচনা করেছিলেন। এককথায় নমনীয় ও অনমনীয় সংবিধানের মাঝামাঝি একটি ব্যবস্থার কথাই তাঁরা ভেবেছিলেন। তবে সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে পার্লামেন্টকেই তাঁরা মূল দায়িত্ব বা ক্ষমতা অর্পণ করেছিলেন।

সংবিধানের ৩৬৮ অনুচ্ছেদে সংশোধনের সংশোধনের মূল পদ্ধতি কী হবে সে কথা বলা হয়েছে। এই অনুচ্ছেদে প্রধানত দুটি পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের হাতেই যে মূল ক্ষমতা থাকবে একথা বলার পর এই অনুচ্ছেদে সংশোধনের সাধারণ পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। এই সাধারণ পদ্ধতিটি হল সংসদের উভয়কক্ষে মোট সদস্যসংখ্যার অধিকাংশ এবং উপস্থিত ও ভোটপ্রদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে এবং এর পর রাষ্ট্রপতির সম্মতিতে সংবিধান সংশোধন হবে। এর পর এই অনুচ্ছেদে এদেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পাদিত কিছু বিষয়ের উল্লেখ করে বলা হয়েছে এইসব বিষয়গুলির সংশোধনের ক্ষেত্রে পূর্ব-উল্লিখিত সাধারণ পদ্ধতি ছাড়াও রাজ্যগুলির অন্তত অর্ধেক আইনসভায় সম্মতি প্রয়োজন। ৩৬৮ ধারায় লিপিবদ্ধ সংবিধানের এই দুটি সংশোধন পদ্ধতি ছাড়া সংবিধান সংশোধনের একটি অতি সাধারণ পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। এই পদ্ধতিটি হল সংসদের উভয় কক্ষে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সংবিধান সংশোধন।

সংবিধান সংশোধনের উল্লেখযোগ্য নীতিগুলি হল সংবিধানের যে কোনো অংশই (মৌলিক অধিকারসহ) পরিবর্তনযোগ্য; পার্লামেন্টই সংশোধনের প্রশ্নে সার্বভৌম সংস্থা; সংশোধন আনার জন্য রাষ্ট্রপতির অনুমতির প্রয়োজন নেই; সংবিধান সংশোধন বিলে রাষ্ট্রপতি ভিটো ক্ষমতা (veto power) প্রয়োগ করতে পারবেন না। রাজ্য আইনসভা বিশেষ ক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধনে অনুমোদন দিতে পারে, কিন্তু সংশোধনের কোনো প্রস্তাব করতে পারে না।

ভারতীয় সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতি যুক্তরাষ্ট্রের নীতি মেনে চলে না ও অভিযোগ যেমন আছে, তেমনি সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের একাধিপত্য, রাজনৈতিক প্রভাব ইত্যাদি নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। সংবিধান সংশোধন নিয়ে পার্লামেন্ট-সুপ্রিমকোর্টের বিতর্ক, সুপ্রিমকোর্টের পরস্পরবিরোধী রায়সম্পর্কেও সমালোচকেরা দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

২৫.৫ অনুশীলনী

(১) সঠিক উত্তর বেছে নিয়ে বাক্যটি সম্পূর্ণ করুন ঃ

(ক) জাতি যখন এগিয়ে যায়, সংবিধান তখন স্থিতিশীল থাকে—বলেছিলেন (i) আম্বেদকর (ii) লর্ড মেকলে (iii) জওহরলাল নেহরু।

(খ) ভারতের সংবিধান (i) নমনীয় (ii) অনমনীয় (iii) নমনীয়তা ও অনমনীয়তার মিশ্রণ।

(গ) সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে ভারতে চূড়ান্ত ক্ষমতা (i) সংবিধানসভার (ii) পার্লামেন্টের (iii) সুপ্রিমকোর্টের।

(ঘ) ভারতে সংবিধান সংশোধনের জন্য (i) সব ক্ষেত্রে (ii) কতকগুলি বিশেষ ক্ষেত্রে রাজ্য আইনসভার অনুমোদন প্রয়োজন।

(ঙ) ভারতে সংবিধান সংশোধন বিল উত্থাপনের জন্য রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমতি (i) আবশ্যিক (ii) আবশ্যিক নয়।

(২) একটি বা দুটি বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন ঃ
   (ক) ভারতের সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে সার্বভৌম সংস্থা কে?
   (খ) ভারতে সংবিধান সংশোধনের পদ্ধতিটি এককথায় কী রকম?
   (গ) সংবিধানের কত নম্বর অনুচ্ছেদে সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে?
   (ঘ) ৪২তম সংবিধান সংশোধনে কী বলা হয়েছিল?
   (ঙ) সংবিধান সংশোধনের অতি সাধারণ পদ্ধতি কী?
(৩) অনধিক ৫০টি শব্দে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করতে হবে?
   (ক) সংবিধান সংশোধনের প্রশ্নে জওহরলাল নেহরু গণপরিষদে কী মত ব্যক্ত করেছিলেন?
   (খ) সংবিধানে ৩৬৮ অনুচ্ছেদে সংবিধান সংশোধনের যে দুটি পদ্ধতি লিপিবদ্ধ আছে সংক্ষেপে তা বর্ণনা করুন।
   (গ) সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির চারটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছু লিখুন।
   (ঘ) সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির দুটি সমালোচনা করুন।
(৪) অনধিক ১৫০ শব্দে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন ঃ
   (ক) সংবিধান সংশোধন প্রশ্নে গণপরিষদের দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল আলোচনা করুন।
   (খ) ভারতে সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি আলোচনা করুন।
   (গ) সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করুন।
   (ঘ) ভারতে সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির মূল্যায়ন করুন।

২৫.৬ উত্তরমালা

[৪.৫ অংশের প্রশ্নগুলির উত্তর বর্তমান উত্তরমালা/উত্তরসংকেত দেখে মিলিয়ে নিল।]

(১) (ক) জাতি যখন এগিয়ে যায়, সংবিধান তখন স্থিতিশীল থাকে—বলেছিলেন লর্ড মেকলে।
   (খ) ভারতের সংবিধান নমনীয়তা ও অনমনীয়তার মিশ্রণ।
   (গ) সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে ভারতে চূড়ান্ত ক্ষমতা পার্লামেন্টের।
   (ঘ) ভারতে সংবিধান সংশোধনের জন্য কতকগুলি বিশেষ ক্ষেত্রে রাজ্য আইনসভার অনুমোদন প্রয়োজন।
   (ঙ) ভারতে সংবিধান সংশোধন বিল উত্থাপনের জন্য রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমতি আবশ্যিক নয়।
(২) (ক) ভারতের সংবিদান সংশোধনের ক্ষেত্রে সার্বভৌম সংস্থা হল পার্লামেন্ট।
   (খ) ভারতে সংবিধান সংশোধন পদ্ধতিটি এককথায় নমনীয়তা ও অনমনীয়তার সংমিশ্রণ।
   (গ) সংবিধানের ৩৬৮ অনুচ্ছেদে সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে।
   (ঘ) ৪২তম সংবিধান সংশোধনে বলা হয়েছিল পার্লামেন্টের সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতার উপর কোনও বিধিনিষেধ থাকবে না এবং সংবিধান সংশোধনের বিরুদ্ধে আদালতে কোনও মামলা করা যাবে না।
   (ঙ) সংবিধান সংশোধনের অতি সাধারণ পদ্ধতিটি হল সাধারণ আইন পাশের পদ্ধতিতে সংসদের উভয় কক্ষে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সংবিধান সংশোধন।

২৫.৭ গ্রন্থপঞ্জি

1. Druga Das Basu: *Introduction to the Constitution of India* (Latest Edition).
2. J. C. Johari: *Indian Government and Politics,* (Vol-I, 1996).
3. Granville Austin—*The Indian Constitution Cornerstone of a Nation* (1985).
4. Hari Chand : *Amending Process in the Indian Constitution* (1972).
5. K. C. Markandan : *The Amending Process and Constitutional Amendments in the Indian Constitution* (1992).

পর্যায় ৭ ঃ ভূমিকা

বর্তমান পর্যায়ে ভারতের শাসনব্যবস্থায় শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের অবস্থান ও রূপ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের শাসন বিভাগ সম্পর্কে শিক্ষার্থী পাঠক এই আলোচনার সূত্রে প্রয়োজনীয় ধারণা লাভ করতে পারবেন। একইভাবে কেন্দ্রীয় আইনসভা ও রাজ্য আইনসভার কাঠামো, কার্যাবলি, সংসদীয় পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনার আলোচনা থেকে এদেশের সংসদীয় ব্যবস্থার রূপ ও গতিটি সম্পর্কে পাঠক অবহিত হতে পারবেন।এই পর্যায়ের এককগুলির বিষয়বস্তুকে এইভাবে সাজানো হয়েছে ঃ

- **একক ২৬ ঃ** এই এককে ভারতে কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগরে সর্বোচ্চ শাসন কর্তৃপক্ষ হিসাবে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও পদমর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।রাষ্ট্রপতি সাংবিধানিক দৃষ্টিতে সর্বোচ্চ শাসন কর্তৃপক্ষ হলেও কার্যক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিপরিষদ শাসন পরিচালনার জন্য দায়িত্বশীল। বর্তমান এককে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদ ও প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা সম্পর্কে শিক্ষার্থী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।
- **একক ২৭ ঃ** এই এককের বিষয়বস্তু হল ভারতের পার্লামেন্ট। পার্লামেন্ট হল ভারতীয় ইউনিয়নের আইনসভা। পার্লামেন্টের গঠন, কার্যাবলি, আইন প্রণয়ন পদ্ধতি, অর্থ বিষয়ক কার্যপদ্ধতি, কমিটি ব্যবস্থা এদেশের সংসদীয় শাসনব্যবস্থার গতিবিধিকে বুঝতে বিশেষভাবে সাহায্য করবে।
- **একক ২৮ ঃ** এই এককে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যের শাসন বিভাগের পরিচয় পাওয়া যাবে। কেন্দ্রের শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রপতির মতো অঙ্গরাজ্যের শাসন বিভাগের শীর্ষে অবস্থান করেন রাজ্যপাল। রাজ্যপালের ক্ষমতা, পদমর্যাদা, রাজ্য মন্ত্রিসভার সঙ্গে তার সম্পর্ক এই এককের আলোচনার অত্যন্ত কৌতূহলপ্রদ অংশ। রাজ্যের মন্ত্রিপরিষদ ও মুখ্যমন্ত্রী শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে অবশ্যই কার্যকরী শক্তি। মন্ত্রিপরিষদ ও মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য সরকার ও প্রশাসনে কী ভূমিকা পালন করেন শিক্ষার্থী এই এককের আলোচনা থেকে সে বিষয়ে স্বচ্ছ একটা ধারণা তৈরি করতে পারবেন।
- **একক ২৯ ঃ** এই এককে রাজ্যের আইনসভা বিষয়ে আলোচনা স্থান পেয়েছে। রাজ্য, আইন সভার গঠন, কার্যাবলি, রাজ্য আইনসভার পরিচালনা ও আইন প্রণয়ন পদ্ধতি, অর্থ বিষয়ক কার্যপদ্ধতি, কমিটি ব্যবস্থা বর্তমান এককের আলোচনায় প্রতিটি প্রশ্নই গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করা হবে।

২৬ তম ও ২৭ তম এককের আলোচনায় কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসন বিভাগের এবং ২৮ তম ও ২৯ তম এককের আলোচনায় কেন্দ্র ও রাজ্যের আইন বিভাগের মধ্যে প্রয়োজনমতো তুলনা করায় একটা সুযোগ শিক্ষার্থী পাঠক গ্রহন করতে পারেন। ভারতের শাসন বিভাগ ও সংসদীয় ব্যবস্থার সঙ্গে অন্যান্য দেশের সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থার তুলনা টানাও প্রসঙ্গত সম্ভব।

একক ২৬ ❐ রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদ

গঠন

২৬.১ উদ্দেশ্য
২৬.২ প্রস্তাবনা
২৬.৩ ভারতের রাষ্ট্রপতি
২৬.৩.১ রাষ্ট্রপতির নির্বাচন, কার্যকাল, পদচ্যুতি
২৬.৪ ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা
২৬.৪.১ শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা
২৬.৪.২ আইন বিভাগীয় ক্ষমতা
২৬.৪.৩ বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা
২৬.৪.৪ রাষ্ট্রপতির অন্যান্য ক্ষমতা
২৬.৪.৫ জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা
২৬.৫ ভারতের রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা ও প্রকৃত ভূমিকা
২৬.৬ কেন্দ্রীয় পরিষদ
২৬.৭ ভারতের প্রধানমন্ত্রী
২৬.৭.১ প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা
২৬.৭.২ পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা
২৬.৮ সারাংশ
২৬.৯ অনুশীলনী
২৬.১০ উত্তরমালা
২৬.১১ গ্রন্থপঞ্জি

২৬.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি—

- ভারতীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় তথা ইউনিয়ন শাসন বিভাগের (Union Executive) রূপটি সম্পর্কে পরিচিত হতে পারবেন।
- কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হিসাবে রাষ্ট্রপতির (The President) নির্বাচন, ক্ষমতা ও পদমর্যাদা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- কেন্দ্রের শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ কী ভূমিকা পালন করে সেটি বিচার করতে পারবেন।
- কেন্দ্রের প্রদত্ত শাসক প্রধান হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা কী, ভারতের পার্লামেন্টীয় শাসন ব্যবস্থায় তিনি কী ভূমিকা পালন করেন তার একটি যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারবেন।

২৬.২ প্রস্তাবনা

ভারতে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত। প্রধানত ব্রিটেনের পার্লামেন্টীয় ব্যবস্থাকে অনুসরণ করেই এদেশের সংসদীয় ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। পার্লামেন্টীয় ব্যবস্থার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল দ্বৈত শাসন বিভাগের উপস্থিতি। এদের মধ্যে একজন প্রধানত আইনগত বা আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব পালন করেন। সাংবিধানিকভাবে ভারতের কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগের শীর্ষে রয়েছেন একজন রাষ্ট্রপতি। ব্রিটেনের রাজা বা রানীর মতো পদটি বংশানুক্রমিক নয়। একটি বিশেষ পদ্ধতিতে পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। সংবিধান অনুসারে তিনিই প্রধান কার্যপালিকা শক্তি। শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা তাঁর হাতেই ন্যস্ত থাকবে এবং তিনি প্রত্যক্ষভাবে বা অধীনস্থ কর্মচারীর সাহায্যে এই ক্ষমতা ব্যবহার করবেন। শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা তাঁর হাতেই ন্যস্ত থাকবে এবং তিনি প্রত্যক্ষভাবে বা অধীনস্থ কর্মচারীর সাহায্যে এই ক্ষমতা ব্যবহার করবেন। শাসন বিভাগীয় প্রধান হিসাবে নানা ক্ষেত্রে ক্ষমতা ব্যবহারের অধিকারী হলেও রাষ্ট্রপতি কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ওই ক্ষমতা ভোগ করেন না। কার্যক্ষেত্রে শাসন পরিচালনা করেন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিপরিষদ। ওই মন্ত্রিপরিষদ আইন সভার কাছে দায়িত্বশীল। শাসননীতি নির্ধারণ, আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, প্রশাসন পরিচালনা, বিদেশ নীতি নির্ধারণ, সব কিছুর ক্ষেত্রেই প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদ হল প্রকৃত কার্যপালিকা শক্তি।

বর্তমান এককের প্রথম অংশে রাষ্ট্রপতির নির্বাচন, ক্ষমতা ও পদমর্যাদার উপর আলোচনা আছে। এই আলোচনা থেকে শিক্ষার্থী পাঠকর ভারতের রাষ্ট্রপতি সমপর্কে সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে, ভারতের শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির প্রকৃত অবস্থান কি, সে বিষয়ে কিছু ভাবনার খোরাক পাবেন। আলোচনার দ্বিতীয় অংশে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদের গঠন ও কার্যাবলির বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। এই আলোচনায় সূত্রে রাষ্ট্রপতির ও মন্ত্রীপরিষদের সাংবিধানিক সম্পর্কটিও জানা সম্ভব হবে। আলোচনার শেষ অংশে আছে প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে কিছু কৌতূহলপদ ধারণা। ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রের সাফল্য অনেকটাই যে প্রধানমন্ত্রীর যোগ্য নেতৃত্ব প্রদান ও দায়িত্ব পালনের উপর নির্ভরশীল, ভারতের সংবিধান বিশেষজ্ঞ এবং রাষ্ট্র বিশেষজ্ঞরা সে ব্যাপারে একমত।

২৬.৩ ভারতের রাষ্ট্রপতি

ভারত সরকারের সবচেয়ে কর্মব্যস্ত বিভাগ হল শাসন বিভাগ। রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান কাজকর্মকে সফলভাবে রূপায়ণের দায়িত্ব প্রধানত শাসন বিভাগের। পার্লামেন্টীয় শাসনের নিয়ম অনুসারে পার্লামেন্টের নির্বাচিত তথা জনপ্রিয় কক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে যে রাজনৈতিক দল সেই দলই শাসনাধিকার লাভ করে। কোনো একটি দল বা মিলিতভাবে কয়েকটি দল সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সরকার গঠন করতে পারে। ভারতবর্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদের অন্যান্য সদস্য থেকে শুরু করে উচ্চপদস্থ আমলা, রাষ্ট্রীয় কর্মচারী, পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর কর্মী সকলেই শাসন বিভাগের দায়িত্বশীল প্রতিনিধি। তবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, যাঁরা শাসন বিভাগের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত সরকারের নীতি নির্ধারণের জন্য তাঁরাই প্রধানত দায়িত্বশীল। এই দায়িত্ব প্রধানত জনসাধারণ ও আইন সভার কাছে। শাসন বিভাগরে নির্বাচিত অংশ (রাজনৈতিক অংশ) হলেন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদ। প্রশাসনের স্থায়ী কর্মচারীবর্গ ও আমলারা নীতি নির্ধারণের কাজে রাজনৈতিক শাসন কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করেন।

ভারতে কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগের শীর্ষে রয়েছেন একজন রাষ্ট্রপতি। সংবিধানের ৫২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ভারতে একজন রাষ্ট্রপতি থাকবেন ("There shall be a President of India"—Act 52) সংবিধানের ৫৩ অনুচ্ছেদ অনুসারে ইউনিয়নের শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত হয়েছে। রাষ্ট্রপতি সরাসরিভাবে অথবা

তাঁর অধীনস্ত কর্মচারীর মাধ্যমে সংবিধান অনুসারে এই ক্ষমতা ব্যবহার করবেন। ("The Executive power of the Union shall be vested in the President and shall be exercised by him either directly of through officers subordinate to him in accordance with this constitution." Act 53(1))

এবার আসুন আমরা দেখি ভারতের রাষ্ট্রপতি কীভাবে নির্বাচিত হন।

২৬.৩.১ রাষ্ট্রপতির নির্বাচন, কার্যকাল, পদচ্যুতি

রাষ্ট্রপতি এক বিশেষ নির্বাচকমণ্ডলী দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। এই নির্বাচক মণ্ডলী (Electoral College) গঠিত হয় ঃ

(ক) কেন্দ্রীয় আইনসভা বা সংসদের উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যগণ এবং (খ) রাজ্যগুলির বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে। (সংবিধানের ৫৪ অনুচ্ছেদ)

রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতির বিষদ বর্ণনা আছে সংবিধানের ৫৫ অনুচ্ছেদে। ৫৫ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে।

(১) যথাসম্ভব ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব একই হারে হবে অর্থাৎ বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে যেন ভোটের ব্যাপারে যতদূর সম্ভব সমতার নীতি বজায় থাকে।

(২) একদিকে সমষ্টিগতভাবে রাজ্যগুলি এবং অন্যদিকে ইউনিয়ন (কেন্দ্র)—এই দুই পক্ষের মধ্যে ভোটের সমতা রক্ষা করতে হবে।

রাজ্য বিধানসভা ও সংসদের সদস্যদের ভোট সংখ্যা নির্ধারণের পদ্ধতিও সংবিধানে বলা আছে।

রাজ্য বিধানসভার সদস্যদের ভোটসংখ্যা নির্ণয়ের পদ্ধতি এইরকম ঃ

$$\frac{\text{রাজ্যের জনসংখ্যা}}{\text{বিধানসভার নির্বাচিত সদস্য}} \div ১০০০$$

দ্বিতীয়বার ভাগের পর ভাগশেষ যদি ৫০০ বা তার বেশি হয় তবে ভোটসংখ্যা আরও ১ বেড়ে যাবে। একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে ব্যাপারটি বোঝানো যেতে পারে—

ধরা যাক পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা ৪,০০,০০,০০০। বিধানসভার সদস্য সংখ্যা ২৯৪।

এক্ষেত্রে প্রথমে রাজ্যের জনসংখ্যাকে বিধানসভার সদস্যসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে সংখ্যাটি হবে (৪,০০,০০,০০০ ÷ ২৯৪) = ১,৩৬,০৫৪

এবার এই সংখ্যাটিকে ১০০০ দিয়ে ভাগ করলে সংখ্যাটি দাঁড়ায় (১,৩৬,০৫৪ ÷ ১০০০) = ১৩৬ (ভাগফল) এবং ভাগশেষ থাকবে ৫৪। এখানে ভাগশেষ ভাজকের অর্ধেকের কম। সুতরাং ১ যোগ হবে না।

দেখা গেল পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার প্রত্যেক নির্বাচিত সদস্যের ভোট ১৩৬টি করে। অর্থাৎ ১ জন সদস্যের ভোটমূল্য ১৩৬।

সংসদের নির্বাচিত সদস্যের ভোটসংখ্যা নির্ণয়ের পদ্ধতি হল ঃ

প্রথমে রাজ্যসমূহের বিধান সভাগুলির সদস্যদের মোট ভোটসংখ্যা নির্ণয় করে ঐ সংখ্যাকে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের নির্বাচিত মোট সদস্য সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হবে। এবার যে ভাগফল পাওয়া যাবে সেটাই হবে সংসদের প্রত্যেক নির্বাচিত সদস্যের ভোটসংখ্যা। ভাগশেষ যদি ভাজকের অর্ধেক বা তার বেশি থাকে তবে এক্ষেত্রেও ভাগফলের সঙ্গে এক যোগ করতে হবে।

রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের ভোটদান পদ্ধতি হল একক হস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নীতি। গোপন ব্যালটের মাধ্যমেই ভোটদান চলবে। রাষ্ট্রপতি পদের জন্য যতজন নির্বাচন প্রার্থী থাকবেন প্রত্যেক ভোটদাতার ততগুলি ভোট থাকবে। ভোটদাতা তাঁর পছন্দের প্রার্থীর নামের পাশে ১, ২, ৩ প্রভৃতি সংখ্যা লিখে ব্যালট কাগজটি গোপনে ব্যালট বাক্সে জমা দেবেন। প্রছম পছন্দ ভোট দাতাকে জানাতেই হবে। অন্যান্য পছন্দ তিনি নাও জানতে পারেন। প্রথম পছন্দ না জানালে তার ব্যালট পত্রটি বাতিল হয়ে যাবে।

ভোটদান শেষ হলে প্রার্থীর প্রথম পছন্দের বৈধ ভোট কত তা প্রথমে দেখা হবে। প্রার্থীর প্রথম পছন্দের মোট ভোট সংখ্যাকে দুই দিয়ে ভাগ করে ভাগফলের সঙ্গে ১ যোগ করলে যে সংখ্যা পাওয়া যাবে তাকে বলা হয় কোটা (Quota)। ধরা যাক কোন প্রার্থীর বৈধ প্রছম পছন্দের ভোটের সংখ্যা ১,০০০। এক্ষেত্রে কোটা হল (১০০০ ÷ ২) + ১ = ৫০১।

যদি দেখা যায় প্রথমবার ভোট গণনার সময় কোন প্রার্থী কোটা বা তার অধিক ভোট পেয়েছেন তখন তাঁকেই নির্বাচিত বলে ঘোষণা করা হবে। প্রথম পছন্দের বোটে যদি কেউ কোটা না পান তবে প্রথম পছন্দের গণনায় যিনি সবচেয়ে কম ভোট পেয়েছেন তার ব্যালটগুলি দ্বিতীয় পছন্দ অনুসারে অবশিষ্ট প্রার্থীদের মধ্যে হস্তান্তরিত করা হবে। যে পর্যন্ত, কোন প্রার্থী কোটা লাভ না করবেন বা একজন প্রার্থী অবশিষ্ট থাকবেন, সে পর্যন্ত ভোট হস্তান্তর ও গণনা চলবে।

পার্লামেন্ট বা বিধানসভায় কোন দলের স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সেই দলের প্রার্থীর নির্বাচিত হবারই সম্ভাবনা থাকে। প্রার্থী ২ জন থাকলে এই সম্ভাবনা অবশ্যই আছে। যে ক্ষেত্রে প্রার্থী ২ এর অধিক, নির্বাচক মণ্ডলীর মধ্যে কোন বিশেষ দলের স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই সেখানেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যাপারটি হয়ে দাঁড়ায় কৌতূহলজনক। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। নির্বাচক মণ্ডলীর সংখ্যা ১০০০, প্রার্থী সংখ্যা ৩। প্রথম পছন্দের বৈধ ভোট গণনা করে দেখা গেল—

প্রার্থী	**প্রথম পছন্দের ভোট**
ক	৪০০
খ	৩৫০
গ	২৫০

বৈধ ভোট অনুসারে কোটা হল (১০০০ ÷ ২) + ১ = ৫০১। এক্ষেত্রে কোন প্রার্থীই কোটা সংখ্যক ভোট পাননি। সুতরাং প্রথম পছন্দের ভোটে যিনি সবচেয়ে কম ভোট পেয়েছেন সেই গ প্রার্থীর প্রথম পছন্দের

ভোট গুলিকে ক ও খ প্রার্থীর নিকট হস্তান্তরিত করা হল দ্বিতীয় পছন্দ অনুসারে। এবার পরিবর্তিত অবস্থাটি দাঁড়ালো এরকম ঃ

প্রার্থী	প্রথম পছন্দ	দ্বিতীয় পছন্দ	মোট
ক	৪০০	৯০	৪৯০
খ	৩৫০	১৬০	৫১০
গ	২৫০	--	--

প্রথম ও দ্বিতীয় পছন্দের ভোট সংখ্যা যোগ করলে দেখা যাচ্ছে খ কোটা বা প্রয়োজনীয় ভোট পেয়েছেন। সুতরাং তিনিই রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হবেন।

রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতির সমালোচনা করে বলা হয় পদ্ধতিটি অত্যন্ত জটিল। বিষয়টি সাধারণের তো বটেই, ভোটদাতাদের কাছে সংসয়পূর্ণ মনে হতে পারে। এমন প্রশ্নও ওঠে, নির্বাচনে বুদ্ধি বিবেচনার চেয়ে দলীয় পছন্দ বেশি গুরুত্ব পায়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ হল, ভোট হস্তান্তরের ক্ষেত্রে তৃতীয় প্রার্থীর সুযোগ নেই। প্রছম পছন্দে কম ভোট পাবার ফলে তাকে বাতিল করা হচ্ছে। তার ক্ষেত্রেও দ্বিতীয় পছন্দ থাকবে না কেন? এমনও হতে পারে প্রথম ও দ্বিতীয় পছন্দের মিলিত ভোটে তিনি ক ও খ অপেক্ষা বেশি ভোট পেতে পারেন। রাষ্ট্রপতির নির্বাচন সরাসরি জনসাধারণের ভোট হতে বাধা কোথায়—ওটিও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

ডঃ আম্বেদকর বলেছেন রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে যাতে সংখ্যালঘিষ্ঠের একটা ভূমিকা থাকে। সেইজন্য ভোটাধিক্যের নীতিকে বর্জন করে একটা হস্তান্তরযোগ্য ভোট দ্বারা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। তবে ডঃ আম্বেদকরের এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের পদ্ধতি অনুসরণের পেছনে প্রধান যুক্তি হল রাষ্ট্রপতি কখনই মোট ভোট সংখ্যার অর্ধেকের কম ভোট পেলে নির্বাচিত হবেন না। রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী নির্বাচিত হবেন বৈধ ভোটের অধিকাংশ ভোট পেয়ে। রাষ্ট্রপতির নির্বাচনকে পরোক্ষ করার পেছনে অবশ্য প্রধান যুক্তি হল রাষ্ট্রপতিকে সংবিধান প্রণেতৃবর্গ মন্ত্রিসভার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দেখতে চান নি। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে অযথা বিপুল অর্থব্যয়ও কাম্য নয়।

রাষ্ট্রপতির কার্যকাল ঃ

রাষ্ট্রপতি পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। তিনি পুনর্নির্বাচিত হতে পারেন। সংবিধানে এ ব্যাপারে কোন বাধা নেই। মার্কিন রাষ্ট্রপতি কখনই দুবারের বেশি (প্রতিবার ৪ বছরের জন্য) নির্বাচিত হতে পারেন না। কার্যকাল অতিবাহিত হবার আগে ভারতের রাষ্ট্রপতি উপরাষ্ট্রপতিকে লিখিতভাবে জানিয়ে পদত্যাগ করতে পারেন।

রাষ্ট্রপতির পদচ্যুতি (Impeachment) ঃ

সংবিধান ভঙ্গের অভিযোগে বিশেষ পদ্ধতিকে রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করা যায়। সংবিধানের ৬১ অনুচ্ছেদ অনুসারে ভারতের পার্লামেন্টের যে কোনো পরিষদে সংবিধান ভঙ্গের অভিযোগে রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে পদচ্যুতির প্রস্তাব আনা যায়। প্রস্তাবাকারে অভিযোগটি আনতে হয়। প্রস্তাব উত্থাপনের আগে সংশ্লিষ্ট পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যার কমপক্ষে এক-চতুর্থাংশ সদস্যের স্বাক্ষরিত চোদ্দো দিনের একটি নোটিশ দিয়ে প্রস্তাব উত্থাপনের ইচ্ছা জানাতে হবে।

এর পর প্রস্তাবটি সংশ্লিষ্ট পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যার অন্তত দুই তৃতীয়াংশের ভোটে পাশ হওয়া প্রয়োজন। এইভাবে পার্লামেন্টের এক পরিষদে প্রস্তাব গৃহীত হবার পর অন্য পরিষদ অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান করে। অনুসন্ধানের পর এই পরিষদ মোট সদস্য সংখ্যার অন্তত দুই তৃতীয়াংশের ভোটাধিক্যে যদি প্রস্তাব পাশ করে যে রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হয়েছে তা হলেই রাষ্ট্রপতিকে তার পদ থেকে অপসারণ করা যায়।

রাষ্ট্রপতির কার্যকালের মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার আগেই পরবর্তী রাষ্ট্রপতির নির্বাচন কার্য সমাধা করতে হবে। মৃত্যু, পদত্যাগ বা অপসারমের ফলে রাষ্ট্রপতিপদ শূন্য হলে ৬ মাসের মধ্যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের কাজ শেষ করতে হবে।

১৯৭৪ সালে একটি প্রশ্ন উঠেছিল এক বা একাধিক রাজ্যের বিধানসভা ভেঙে দেয়ো হলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের নির্বাচন সংস্থার গঠন বৈধ হবে কিনা? সুপ্রিম কোর্টের এ বিষয়ে অভিমত ছিল রাজ্যের বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হলেও তাঁর কার্যকাল শেষ হবার পূর্বেই পরবর্তী রাষ্ট্রপতির নির্বাচন শেষ করতে হবে। সংবিধানের ৭১(৪) ধারায় বলা হয়েছে, নির্বাচনী সংস্থার সভ্যপদ শূন্য হলে ঐ কারণে রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচনের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যাবে না।

এ পর্যন্ত ১৩ জন রাষ্ট্রপতি এই মর্যাদাপূর্ণ পদটি অলঙ্কৃত করেছেন। নীচে তার একটি তালিকা দেওয়া হল ঃ

নাম	কার্যকাল
১। ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ (১৮৮৪—১৯৬৩)	২৬শে জানুয়ারি ১৯৫০—১৩ মে, ১৯৬২
২। ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন (১৮৮৮—১৯৭৫)	১৩ মে, ১৯৬২—১৩ মে, ১৯৬৭
৩। ডঃ জাকির হোসেন (১৮৯৭—১৯৬৯)	১৩ মে, ১৯৬৭—৩ মে, ১৯৬৯
৪। বরাহগিরি ভেঙ্কটগিরি (১৮৮৪—১৯৮০)	৩ মে, ১৯৬৯—২০শে জুলাই, ১৯৬৯ (অস্থায়ী)
৫। বিচারপতি মহম্মদ হিদায়েতুল্লা (১৯০৫-'৯২)	২০শে জুলাই, ১৯৬৯—২৪ আগস্ট, ১৯৬৯(অস্থায়ী)
৬। বরাহগিরি ভেঙ্কটগিরি (১৮৮৪—১৯৮০)	২৪ আগস্ট, ১৯৬৯—২৪ আগস্ট, ১৯৭৪
৭। ফকরুদ্দীন আলি আহমদ (১৯০৫—১৯৭৭)	২৪ আগস্ট, ১৯৭৪—১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৭
৮। বি. ডি. জাত্তি (১৯১৩—)	১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৭—২৫শে জুলাই, ১৯৭৭
৯। নীলম সঞ্জীব রেড্ডী (১৯১৩—১৯৯৬)	২৫শে জুলাই, ১৯৭৭—২৫শে জুলাই, ১৯৮২
১০। গিয়ানী জৈল সিং (১৯১৬—১৯৯৪)	২৫শে জুলাই, ১৯৮২—২৫শে জুলাই, ১৯৮৭
১১। আর. ভেঙ্কটরমন (১৯১০—)	২৫শে জুলাই, ১৯৮৭—২৫শে জুলাই, ১৯৯২
১২। ডঃ শঙ্কর দয়াল শর্মা (১৯১৮—১৯৯৯)	২৫শে জুলাই, ১৯৯২—২৫শে জুলাই, ১৯৭৭
১৩। কে. আর. নারায়নন (১৯২০ —)	২৫শে জুলাই, ১৯৭৭—

রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীর যোগ্যতা ও অন্যান্য শর্ত ঃ

সংবিধানের ৫৮ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীর যোগ্যতা হল ঃ (১) ৩৫ বছর বয়স, (২) ভারতীয় নাগরিকত্ব এবং (৩) লোকসভায় সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হবার যোগ্যতা। এ ছাড়াও রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন প্রার্থীকে ভারত সরকার বা রাজ্য বা স্থানীয় সরকারেরর অধীনে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকা চলবে না।

সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলে কোন ব্যক্তি পার্লামেন্ট বা রাজ্য বিধানসভার সদস্য থাকতে পারবেন না। যদি রাষ্ট্রপতি পদে নিযুক্ত ব্যক্তি পার্লামেন্ট বা রাজ্য বিধানসভার সদস্য থাকেন তাহলে যেদিন থেকে তিনি রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হবেন সেদিন থেকেই তাঁর পার্লামেন্টের বা রাজ্য আইনসভার পদ শূন্য হয়েছে বলে ধরা হয়। রাষ্ট্রপতির কোন লাভজনক পদে যুক্ত থাকা চলবে না।

সংবিধানে রাষ্ট্রপতির বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার কথা বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে পার্লামেন্ট আইন করে স্থির করবে। কার্যকালে থাকাকালীন তার পক্ষে অসুবিধাজনকভাবে বেতন-ভাতাদি হ্রাস করা যাবে না। রাষ্ট্রপতির বেতন ও ভাতা ভারতের সঞ্চিত তহবিলের (Consolidated Fund of India) উপর ধার্য।

কার্যভার গ্রহণের আগে রাষ্ট্রপতিকে ভারতের প্রধান বিচারপতি অথবা তাঁর অবর্তমানে সুপ্রিম কোর্টের প্রবীণতম বিচারপতির সমক্ষে ঈশ্বরের নামে বা সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করতে হয় যে, তিনি বিশ্বস্ততার সঙ্গে এবং সংবিধান ও আইন নির্দেশিত পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে শপথ গ্রহণ করতে হয় যে, তিনি বিশ্বস্ততার সঙ্গে এবং সংবিধান ও আইন নির্দেশিত পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপতির কাজ সম্পন্ন করবেন এবং নিজেকে তাঁর সামর্থ্যমতো সংবিধান সুরক্ষায় ও জনগনের সেবা ও কল্যাণে নিয়োজিত করবেন।

রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য পালনের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী মামলা রজ্জু করা যাবে না বা আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করা যাবে না। পদে অধিষ্ঠিত হবার পূর্বে বা পরে ব্যক্তিগত কাজের জন্য দুমাসের নোটিশ না দিয়ে আদালতে তার বিরুদ্ধে দেওয়ানি মামলা রজ্জু করা যাবে না।

এবার আসুন ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বিষয়ে আমরা আলোকপাত করি।

২৬.৪ ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা

ক্যাবিনেট শাসনব্যবস্থায় রীতি মেনেই সংবিধান প্রণেতারা ভারতের জন্য যে দ্বৈত শাসন বিভাগের ব্যবস্থা রেখেছিলেন, সেই শাসন বিভাগের আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব গ্রহণের জন্যই সৃষ্টি হয়েছিল রাষ্ট্রপতির পদটির। অবশ্য ইতিপূর্বেই মতিলাল নেহরু কমিটির রিপোর্টে রাষ্ট্রনেতা হিসাবে গভর্নর জেনারেলের কথা বা সাপ্রু কমিটির রিপোর্টে সাংবিধানিক রাষ্ট্রনেতার (Constitutional head of State) কথা বলা হয়েছিল। কে. এম. মুন্সী তাঁর খসড়া সংবিধানে ব্রিটেনের রানীর মতোই এদেশে একজন রাষ্ট্রনেতার সুপারিশ করেছেন। শেষপর্যন্ত কেন্দ্রীয় সংবিধান কমিটি একজন সাংবিধানিক শাসন কর্তৃপক্ষসহ ক্যাবিনেট শাসনব্যবস্থার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়। শাসন বিভাগের পরিষদীয় রূপটির প্রতি গুরুত্ব দিয়ে রাষ্ট্রপতির প্রকৃত কোন ক্ষমতা (real power) নেই এই ধরনের উপলব্ধি প্রকাশ করেও জওহরলাল নেহেরু কেন্দ্রীয় সংবিধান কমিটির রিপোর্ট পেশ করে জানালেন এই পদটি বিশেষ ক্ষমতা ও মর্যাদার (great authority and dignity) পরিচয় বহন করে। সন্দেহ নেই রাষ্ট্রপতির পদটিকে সংবিধান প্রণেতারা বিশেষ মর্যাদার আসনে বসিয়েছেন এবং রাজনীতি ও সরকারি কর্মক্ষেত্রের কর্দমাক্ত আবর্তের ঊর্ধ্বেই রাখতে চেয়েছেন।

ভারতে সংসদীয় বা ক্যাবিনেট শাসনব্যবস্থায় নিয়মতান্ত্রিক শাসক হিসাবে রাষ্ট্রপতির প্রধান পরিচয় তিনি শাসন বিভাগীয় প্রধান কার্যপালিকা শক্তি (Head of the executive power of the Union)। সংবিধান অনুসারে শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা (কেন্দ্রের) তাঁর হাতে ন্যস্ত। শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা বলতে সাধারণত বোঝায় আইনসভা যেসব আইন প্রণয়ন করে তাকে বলবৎ করার কাজ। তবে আধুনিক রাষ্ট্রে শাসন বিভাগের দায়িত্ব এতটাই বেড়ে গেছে যে সরকারের বহু খুঁটিনাটি দায়দায়িত্ব তাকেই বহন করতে হয়। দুর্গাদাস বসু যথার্থই বলেছেন শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা হল এক কথায় সরকারের কাজকর্ম সম্পাদন (The power of carrying on the business of government)—এর বাইরেও অন্য সামর্থ্যেও সংবিধান রাষ্ট্রপতির হাতে আরও ক্ষমতা দিয়েছে। অর্থাৎ শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা ছাড়াও রাষ্ট্রপতির আইন বিভাগীয়, বিচার বিভাগীয় এবং জরুরি ক্ষমতা (Emergency power) আছে। তবে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার আগে এটা জানা দরকার যে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার কিছু সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতা (Constitutional limitations) আছে। প্রথমত, সংবিধানের ৫৩(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে সংবিধান অনুসারেই তিনি তাঁর ক্ষমতা ব্যবহার করবেন। দ্বিতীয়ত, শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা ব্যবহারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার পরামর্শ মতোই চলবেন (৭৪(১) অনুচ্ছেদ)। ৪২ তম সংবিধান সংশোধনে এই পরামর্শ নেওয়া একরকম বাধ্যতামূলক (obligatory) একথা বোঝানো হয়েছে। ("There shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President who shall in the exercise of his functions, act in accordanmce with such advice." Art 74(1)। ৪৪তম সংবিধান সংশোধনে একটি নতুন ধারা যোগ করে বলা হয়েছে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার কাছে পরামর্শ পুনর্বিবেচনার জন্য, পাঠাতে পারেন, তবে মন্ত্রিসভার পুনর্বিবেচনার পর তাকে ঐ পরামর্শ মেনে চলতে হবে। সোজা কথায়, দুই একটি ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের কাছে পরামর্শ চাওয়া ছাড়া রাষ্ট্রপতির স্ব-বিবেচনা অনুসারে কোন ক্ষমতা ব্যবহারের এক্তিয়ার নেই।

এবার আসুন আমরা দেখি কোন কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কী ক্ষমতা ভোগ করেন। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে আমরা প্রধানত চারটি শীর্ষে ভাগ করে আলোচনা করতে পারি। এগুলি হল—(১) শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা (Executive Power), (২) আইন বিভাগীয় ক্ষমতা (Legislative Power), (৩) বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা এবং (৪) জরুরি ক্ষমতা (Emergency Powers)।

২৬.৪.১ শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা

রাষ্ট্রপতির শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা বলতে আমরা প্রধানত তিনটি ক্ষেত্রে প্রযুক্ত ক্ষমতার কথাই বলতে পারি। এগুলি হল প্রশাসনিক ক্ষমতা (Administrative Powers), প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত ক্ষমতা (Powers over Defence) এবং কূটনৈতিক ক্ষমতা (Diplomatic Power)।

(ক) প্রশাসনিক ক্ষমতা ঃ মার্কিন রাষ্ট্রপতির মতো ভারতের রাষ্ট্রপতির প্রশাসনক ক্ষমতা ব্যবহার বা সরকারি দপ্তরের উপর তদারকি ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা নেই এ কথা ঠিক তবে মন্ত্রিদের দায়িত্বে ও নিয়ন্ত্রণে সরকারি দপ্তর পরিচালিত হলেও রাষ্ট্রপতিই হলেন প্রশাসনের আনুষ্ঠানিক নেতা। কেন্দ্রীয় সরকারের সব শাসন বিভাগীয় কাজই রাষ্ট্রপতির নামেই সম্পাদিত হয়। ভারত সরকারের কোন নির্দেশ (Order) রাষ্ট্রপতির নামেই প্রকাশিত হয়। সব রকমের চুক্তি বা সম্পত্তি বিষয়ক আশ্বাস সরকারের তরফে রাষ্ট্রপতির নামেই দেওয়া হয়। এক কথায় কেন্দ্রের সব আধিকারিকরাই, তাঁর অধীনস্থ (অনুচ্ছেদ ৫৩(১)) এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাজকর্ম সম্পর্কে জানবার অধিকারও তাঁর আছে (অনুচ্ছেদ ৭৮(৮))।

রাষ্ট্রপতির প্রশাসনিক ক্ষমতার মধ্যেই পড়ে নিয়োগ ও অপসারণ সংক্রান্ত ক্ষমতা (Power to appoint and remove)।এই ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য, অ্যাটর্নী জেনারেল, নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষক (The Comptroller and Auditor General), সুপ্রিম কোর্ট ও হাই কোর্টের বিচারপতি রাজ্যের রাজ্যপাল, জল সরবরাহ কমিশনের সদস্য, অর্থ কমিশন, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সদস্য, নির্বাচন কমিশনের সদস্য, তপশিল জাতি ও উপজাতি বিষয়ক আধিকারিক, তপশিলভুক্ত এলাকা সংক্রান্ত কমিশন, অনুন্নত জাতি বিষয়ক কমিশন, ভাষা কমিশন, ভাষা সংক্রান্ত সংখ্যালঘু কমিশনের সদস্য ইত্যাদিদের নিয়োগ করতে পারেন।তবে মন্ত্রিসভার সদস্য নিয়োগে এবং সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতি নিয়োগে যথাক্রমে প্রধানমন্ত্রী এবং ভারতের প্রধান বিচারপতির পরামর্শ রাষ্ট্রপতি গ্রহণ করকবেন। ব্যক্তিগতভাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, অ্যাটর্নী জেনারেল, রাজ্যের গভর্নর, কেন্দ্র ও রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সভাপতি (সুপ্রিমকোর্টের পরামর্শে) সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতি, নির্বাচন কমিশনারকে পদচ্যুত করার ক্ষমতাও রাষ্ট্রপতির আছে।

ভারতবর্ষে রাষ্ট্রপতির পৃষ্ঠপোষকতার কোন ব্যবস্থা (Spoil system) নেই অর্থাৎ কোন পদে অযোগ্য কোন ব্যক্তিকে তিনি নিয়োগ করতে পারেন না।একসময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই ধরনের নিয়োগের প্রচলন ছিল।রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনকে পরামর্শ না করেই যুক্তরাষ্ট্রীয় দেওয়ানী কার্যালয়ে (Civil Office) রাষ্ট্রপতির ২০ ভাগ সদস্য নিয়োগের ক্ষমতা ছিল। ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রে বিশেষ কেউ ছাড়া কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক এবং রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সদস্য নিয়োগে রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের পরামর্শ গ্রহণ সংবিধান অনুসারে বাধ্যতামূলক [অনুচ্ছেদ ৩২০(৩)]। রাষ্ট্রপতি এই পরামর্শ গ্রহণ না করলে সরকারকে পার্লামেন্টে তার কারণ দর্শাতে হয়।অপসারণের ক্ষেত্রে সংবিধান রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টি (President’s pleasure) কথাটি উল্লেখ করে বলেছে সরকারি আধিকারিকদের পদে থাকা তাঁর সন্তুষ্টির উপর নির্ভরশীল।

(খ) প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ ৫৩(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে প্রতিরক্ষা বাহিনীর চূড়ান্ত নির্দেশ গ্রহণের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত। তবে এই ক্ষমতার ব্যবহার আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যুদ্ধ, শান্তি বা প্রতিরক্ষা বাহিনীকে নিয়োগের ক্ষমতা থাকলেও পার্লামেন্ট এই ক্ষমতার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করার অধিকারী। প্রতিরক্ষা বিষয়ক প্রশ্নে কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে (যেমন অর্থ সংক্রান্ত ব্যয় ইত্যাদি) পার্লামেন্টের অনুমোদন ছাড়া রাষ্ট্রপতি তাঁর ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারেন না।

(গ) কূটনৈতিক ক্ষমতা ঃ কূটনৈতিক ক্ষমতা বলতে বোঝায় সেই সব ক্ষমতা যা বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কে চিহ্নিত করে। বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধি, চুক্তি, বিদেশে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ, বিদেশি রাষ্ট্রের কূটনৈতিক প্রতিনিধি গ্রহণ ইত্যাদি কাজ রাষ্ট্রপতির মাধ্যমেই সম্পাদিত হয়।

২৬.৪.২ আইন বিভাগীয় ক্ষমতা

ভারতের রাষ্ট্রপতি ইংল্যান্ডের রাজশক্তির মতোই আইন সভার অঙ্গ। লক্ষণীয় এক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান মতো ভারতে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি প্রযোজ্য নয়। রাষ্ট্রপতির আইন বিভাগীয় ক্ষমতাগুলি হল (ক) পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান, স্থগিত রাখা ও লোকসভা ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতা, (খ) পার্লামেন্টে বাণী পাঠানো (sending message)।(গ) পার্লামেন্টের উচ্চ কক্ষ রাজ্যসভায় ১২ জন সদস্য মনোনীত করা।(ঘ) পার্লামেন্টের যুগ্ম অধিবেশনের উদ্বোধনী সভায় ভাষণ প্রদান, (ঙ) লোকসভায় ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের দুই প্রতিনিধি (যদি এদের প্রতিনিধিত্ব তাঁর মতে যথোপযুক্ত মনে না হয়) নিয়োগ, (চ) অস্থায়ী জরুরি আইনজারি করার ক্ষমতা যখন

পার্লামেন্টে অধিবেশন থাকে না তখনই রাষ্ট্রপতি এই ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারেন। পার্লামেন্ট অধিবেশনে বসার পর এই আইন পেশ করতে হয়। ৬ সপ্তাহের মধ্যে আইনটি পার্লামেন্ট অগ্রাহ্য না করলে কার্যকর থাকে। (ছ) পার্লামেন্টে সরকারের পক্ষে রিপোর্ট ও বিবৃতি পেশ (অডিটর জেনারেল, অর্থ কমিশন, রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন, সংখ্যালঘু কমিশনের রিপোর্ট ইত্যাদি) (জ) আইন প্রণয়নের বা উপস্থাপনার পূর্বানুমতি প্রদান এবং (ঝ) আইন পাশে সম্মতি প্রদান। তিনি বিলে সম্মতি দিতে পারেন, নাও দিতে পারেন অথবা অর্থবিল ছাড়া অন্য বিলকে পুনর্বিবেচনার জন্য সংসদের উভয় কক্ষে ফেরত পাঠাতে পারনে। কেন্দ্রীয় আইনসভা প্রণীত কোন আইন পুনর্বিবেচনার পর রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হলে তিনি ঐ বিলে সম্মতি জানাতে বাধ্য থাকবেন। (১১১ অনুচ্ছেদ) (ঞ) রাজ্যের আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রপতির সম্মতি প্রয়োজন। সরাসরি অসম্মতি প্রকাশ না করলেও রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য বিলটি সংরক্ষিত করতে পারেন। বিলটিকে পুনর্বিবেচনার জন্য রাজ্যপালকে নির্দেশও তিনি দিতে পারেন। অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতাকে রাষ্ট্রপতির আইন বিষয়ক ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত করা যায়। রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার ব্যয় বরাদ্দের দাবি করতে পারে না। রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ছাড়া অর্থ সম্বন্ধীয় কোন বিলই লোকসভায় আনা যায় না।

প্রান্তলিপি ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীককরণ নীতির প্রথম প্রবক্তা হলেন ফরাসি দার্শনিক মন্টেস্কু (Charles Louis-de Montesquieu)। এই নীতি অনুসারে সরকারের তিনটি বিভাগ অর্থাৎ আইনবিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ স্বতন্ত্রভাবে তাদের ক্ষমতা ব্যবহার করবে এবং এক বিভাগ অন্য বিভাগের কাজে হস্তক্ষেপ করবে না।

২৬.৪.৩ বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা

রাষ্ট্রপতিকে ইংলন্ডের রানীর মতোই ন্যায় বিচারের উৎস (Fountain of Justice) বলা যেতে পারে। ন্যায় বিচার লঙ্ঘিত হলে তাঁর কাছে আবেদন করা যেতে পারে। রাষ্ট্রপতি দণ্ডিত ব্যক্তির দণ্ডাদেশ মকুব করতে পারেন, হ্রাস করতে পারেন, পরিবর্তন করতে বা স্থগিত রাখতে পারেন। সামরিক আদালত প্রদত্ত দণ্ডাদেশ কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকারভুক্ত বিষয় সম্বন্ধীয় আইনভঙ্গের জন্য প্রাপ্ত দণ্ড বা মৃত্যুদণ্ডের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি ক্ষমা প্রদর্শনের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন।

২৬.৪.৪ রাষ্ট্রপতির অন্যান্য ক্ষমতা

রাষ্ট্রপতির অবশিষ্ট ধরনের কিছু ক্ষমতা আছে (Residuary Powers)। এইসব ক্ষমতার মধ্যে পড়ে ঃ

(ক) বিভিন্ন বিষয়ে আইনকানুন প্রবর্তনের ক্ষমতা (Rule Making Power) এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হল সরকারি অর্থ জমা ও প্রত্যাহার, রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সদস্য স্থির, তাদের কার্যকাল ও কাজের শর্ত স্থির, পার্লামেন্টের ও সরকারের সচিবালয়ের কর্মী নিয়োগ ও তাদের কাজের শর্ত স্থির, রাজ্য আইনসভা ও পার্লামেন্টের একই সঙ্গে সদস্য হবার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ, পার্লামেন্ট যুগ্ম অধিবেশনের ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশ, সুপ্রিম কোর্টের আদেশ কার্যকর করার পদ্ধতি ইত্যাদি।

(খ) রাজ্যের রাজ্যপালকে কোন অস্থায়ী বিল জারির নির্দেশ দেওয়া।

(গ) রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় সুপ্রিমকোর্টের কাছে পরামর্শের জন্য পেশ করা।

(ঘ) বিভিন্ন কমিশন নিয়োগ করা।

(ঙ) কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল সম্পর্কে তাঁর বিশেষ ক্ষমতা আছে। এক্ষেত্রে কোন প্রশাসকের (Administrator) মাধ্যমে তিনি ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারেন।

(চ) তপশিল এলাকা, উপজাতি এলাকা, আসামের উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা সম্পর্কে তাঁর বিশেষ ক্ষমতা আছেথ। কোন লোকাকে উপজাতি এলাকা হিসাবে ঘোষণা করা বা উপজাতি এলাকার সীমানা বদলের ক্ষমতাও রাষ্ট্রপতির আছে।

(ছ) তপশিল জাতি ও উপজাতি সম্পর্কে তাঁর বিশেষ ক্ষমতা ও দায়িত্ব আছে। প্রত্যেক রাজ্যে ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে তপশিল জাতি ও উপজাতির সূচি স্থির ও এ সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি জারির ক্ষমতা তপশিল জাতি ও উপজাতির কল্যাণের জন্য বিশেষ আধিকারিক নিয়োগ তাঁর এই ক্ষমতার মধ্যে পড়ে।

উপরোক্ত সব ক্ষমতাগুলিই রাষ্ট্রপতির স্বাভাবিক ক্ষমতার মধ্যে পড়ে (Normal Powers)। সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে বিশেষ ক্ষমতা দান করা হয়েছে। এই ক্ষমতাগুলিকে জরুরি অবস্থাকালীন ক্ষমতা বলা হয় (Emergency Powers)। এবার আমরা রাষ্ট্রপতির এই বিশেষ ক্ষমতার উপর সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করব।

২৬.৪.৫ জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা

তিনটি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা জারি করতে পারেন ঃ (ক) যুদ্ধ বা আপৎকালীন অবস্থায়, (খ) কোন রাজ্যে সাংবিধানিক অচলাবস্থায় এবং (গ) দেশের আর্থিক সংকটাবস্থায়।

প্রথম ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে যুদ্ধ, বহিরাক্রমণ বা আভ্যন্তরীণ সশস্ত্র বিদ্রোহের ফলে সমস্ত, ভারতের অথবা ভারতের কোন অংশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে বা হতে পারে তা হলে তিনি এই মর্মে সমস্ত ভারতে বা তার অংশবিশেষে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। ক্যাবিনেটের লিখিত অনুমতি ছাড়া, রাষ্ট্রপতি এই ঘোষণা করতে পারেন না। জরুরি অবস্থার ঘোষণা পার্লামেন্টের উভয় সভার কাছে উপস্থিত করতে হয়। উভয় কক্ষের মোট সদস্যের অর্ধেকের বেশি এবং উপস্থিত ও ভোটপ্রদানকারী সদস্যের দুই তৃতীয়াংশের ভোটে অনুমোদিত না হলে এই ঘোষণা একমাসের বেশি বলবৎ থাকে না। অনুমোদিত হলে এই ঘোষণা প্রতিবারে ছ'মাস করে বলবৎ থাকবে। পার্লামেন্ট দুই তৃতীয়াংশের ভোটে অনুমোদন করলে মেয়াদ আরও বাড়ানো যেতে পারে। (অনুচ্ছেদ ৩৫২)।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কোন রাজ্যের রাজ্যপালের কাছ থেকে রিপোর্ট পেয়ে অথবা অন্য কোনভাবে রাষ্ট্রপতির যদি মনে হয় যে, রাজ্যে এমন অবস্থার উদ্ভব হয়েছে যার ফলে শাসনকার্যের বিধান অনুযায়ী ঐ রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা সম্ভব নয়, তবে তিনি ঐ রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। এই ঘোষণা পার্লামেন্টের উভয়কক্ষের কাছে উপস্থিত করতে হয় এবং পার্লামেন্টের অনুমতি ছাড়া দুমাসের বেশি স্থায়ী হয় না। পার্লামেন্টের উভয়কক্ষে অনুমোদিত হলে প্রতিবারে ছ মাস করে এই ঘোষণা বাড়ানো যাবে এবং এক বছরের বেশি সময় থাকবে না। আদালত এই ঘোষণার যৌক্তিকতা সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে পারে (অনুচ্ছেদ ৩৫৬)।

তৃতীয় ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে ভারতের বা ভারতের কোন অংশের আর্থিক স্থায়িত্ব বা সুনাম বিনষ্ট হয়েছে বা বিনষ্ট হবার সম্ভাবনা আছে, তাহলে তিনি আর্থিক জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। পার্লামেন্টের সম্মতিক্রমে ঘোষণাটি অনির্দিষ্টকালের জন্য বলবৎ করা যায় (অনুচ্ছেদ ৩৬০)।

ফলাফল ঃ আপৎকালীন অবস্থার ঘোষণা (Proclamation of Emergency) হলে কেন্দ্রীয় সরকার যে কোনো রাজ্যকে নির্দেশ দিতে পারে উক্ত রাজ্যের শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা কীভাবে প্রয়োগ করতে হবে। পার্লামেন্ট এই সময় রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত যে কোনো বিষয় সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করতে পারে। ইউনিয়ন ও রাজ্যগুলির প্রচলিত রাজস্ব বণ্টন ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতির আদেশ বলে পরিবর্তন করা যায়। মৌলিক অধিকারের প্রয়োগও এই সময় রাষ্ট্রপতির নির্দেশে স্থগিত রাখা যায়।

রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষিত হলে (Proclamation of Failure of Constitutional Machinery in a State) সংশ্লিষ্ট রাজ্যের শাসন সংক্রান্ত সব কাজ রাষ্ট্রপতি নিজের হাতে তুলে নিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি আদেশ বলে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের বিধানসভা ভেঙে দিতে পারেন অথবা স্থগিত রাখতে পারেন। রাজ্য আইন সভার ক্ষমতা তিনি পার্লামেন্টের হাতে তুলে দিতে পারেন। আজ পর্যন্ত বহুবার ৩৫৬ ধারা অনুসারে বিভিন্ন রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি হয়েছে। কেরালা, পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট প্রায় সব প্রদেশেই এই আইন কম-বেশি জারি হয়েছে।

আর্থিক সংকটাবস্থার ঘোষণা (Proclamation of Financial Emergency) বলবৎ থাকাকালীন কেন্দ্রীয় সরকার অঙ্গরাজ্যগুলিকে নির্দেশ দিতে পারে। রাষ্ট্রপতি রাজ্য বিধানসভায় গৃহীত অর্থবিল তার বিবেচনার জন্য রেখে দেবার নির্দেশ দিতে পারেন। এই সময়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কর্মচারী এমনকি সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের ভাতা ও বেতনাদি রাষ্ট্রপতির নির্দেশে হ্রাস করা যেতে পারে।

পরবর্তী আলোচনা থেকে আপনারা রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা অর্থাৎ ভারতের সংবিধান ও রাজনীতিতে তাঁর প্রকৃত অবস্থান কী সে বিষয়ে জানতে পারবেন।

২৬.৫ ভারতের রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা এবং প্রকৃত ভূমিকা

ভারতের রাষ্ট্রপতির বিভিন্ন ক্ষমতাগুলির দিকে তাকিয়ে অনেকেই এই সিদ্ধান্তে আসতে পারেন সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রপতি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। সন্দেহ নেই সংবিধান রাষ্ট্রপতিকে স্বাভাবিক অবস্থায় এবং জরুরি ভিত্তিতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেছে। শাসন বিভাগের চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ হলেও আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগের সঙ্গেও তাঁর গভীর সম্পর্ক। জাতীয় ও সমাজজীবনেও তার প্রভাব বড় কম নয়। কে. টি. শাহ'র (K. T: Shah) মতো সংবিধানবিদের চোখে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। মার্কিন রাষ্ট্রপতির মতো অতটা ক্ষমতাশালী না হলেও ব্রিটেনের রানীর মতো নামসর্বস্ব ও আনুষ্ঠানিক শাসক তাঁকে বলা যায় না। ডঃ আম্বেদকর অবশ্য রাষ্ট্রপতিকে ব্রিটেনের রানীর মতোই আনুষ্ঠানিক শাসকের আসনেই বসাতে চান ("Under the constitution the President occupies the same position as the king under the English constitution"--B. R. Am,bedkar) কোন কোন লেখক আবার দেশের রাজনৈতিক জীবনে রাষ্ট্রপতির একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে, সংবিধানের 'Safety Value' হিসাবে তাঁর ভূমিকা আছে নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে এ কথা বলতে চান।

ভারতের রাষ্ট্রপতিকে যাঁরা নিয়মতান্ত্রিক শাসক হিসাবে উপস্থিত করতে চান তাঁদের যুক্তি হল ঃ

(১) রাষ্ট্রপতি জনসাধারণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত নন। জনগণের কাছে তাঁর দায়িত্বশীলতা প্রমাণিত নয়। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদই লোকসভার কাছে দায়িত্বশীল, সংবিধানের ৭৫ (৩) অনুচ্ছেদে এ কথা

বলা হয়েছে। সংবিধান রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতা দিয়েছে বটে, কিন্তু ক্ষমতার সঙ্গে তাঁর দায়িত্ব কী একথা স্পষ্টভাবে বলেনি।

(২) আইন সভার সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত থাকলেও আইন সভার বিতর্কে রাষ্ট্রপতি অংশগ্রহণ করনে না।

(৩) শাসন বিভাগের চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ হলেও সংবিধানের ৭৪(১) ধারায় বলা হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এই মন্ত্রিসভার সাহায্য ও পরামর্শ নিয়েই তিনি শাসন পরিচালনা করবেন এবং এই সাহায্য ও পরামর্শ নেওয়া তাঁর ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক। প্রশাসনিক, প্রতিরক্ষা, কূটনৈতিক, আইনগত সব প্রশ্নেই ক্যাবিনেটের পরামর্শ মেনেই রাষ্ট্রপতি চলেন। কোন আইন সাময়িকভাবে অগ্রাহ্য করলেও শেষপর্যন্ত মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তিনি যেতে পারেন না। পুনর্বিচারের পর মন্ত্রিসভা কোন সিদ্ধান্ত তাঁর কাছে পাঠালে তাকে তা অনুমোদন করতেই হয়।

(৪) রাষ্ট্রপতির জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা বা অস্থায়ী আইন জারির ক্ষমতা কার্যত মন্ত্রিসভার (ক্যাবিনেট) পূর্ব সিদ্ধান্তের অনুমোদন মাত্র। তাঁর বাজেট বক্তৃতা সরকারি অর্থনৈতিক নীতির প্রতিফলন মাত্র।

(৫) জাতির নেতা বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে বা সংবাদমাধ্যম ও প্রচারযন্ত্রের চোখে রাষ্ট্রপতির চেয়ে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা বা দায়িত্বটিই বড় করে দেখানো হয়।

(৬) সংবিধানের ৭৮ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে বটে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে শাসন সংক্রান্ত ও আইন সংক্রান্ত প্রশ্নে খবরাখবর সরবরাহ করবেন কিন্তু এই অনুচ্ছেদটি সম্ভবত এ কথা প্রমাণ করে এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীকেই তৎপরতা দেখাতে হবে এবং দেশের সমস্যা সম্পর্কে প্রতিক্ষেত্রে অবহিত হতে হবে। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর সূত্রে সমস্যাটি জানবেন মাত্র। অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির ভূমিকা একান্তই পরোক্ষ। সরাসরি সমস্যাকে জানা বা সমাধান করার দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির নয়, প্রধানমন্ত্রীর।

মন্ত্রিসভার সঙ্গে রাষ্ট্রপতির সম্পর্ককে যাচাই করলে দেখা যায়—

(ক) রাষ্ট্রপতির কাছে নয়, লোকসভার কাছেই তাঁরা দায়িত্বশীল।

(খ) ৪২ তম সংশোধন অনুসারে মন্ত্রিসভার পরামর্শ মত চলা রাষ্ট্রপতির পক্ষে বাধ্যতামূলক।

(গ) সরকারের স্থিতিশীলতা এবং দায়িত্বশীলতার স্বার্থে মার্কিনী রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থার মডেল গ্রহণ না করে ব্রিটিশ পার্লামেন্টীয় মডেলটি গ্রহণ করা হয়েছে। দায়িত্বের দৈনন্দিন পর্যালোচনার (Daily assessment of responsibility) স্বার্থে এই ব্যবস্থাই গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে এবং রাষ্ট্রপতির চেয়ে মন্ত্রিসভার দায়িত্বের প্রশ্নটিকেও বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

(ঘ) বিভিন্ন বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত এ কথা প্রমাণ করেছে ভারতের রাষ্ট্রপতি সাংবিধানিক নেতার অধিক কিছু নন [রামজাওয়া বনাম পাঞ্জাব রাজ্য (১৯৫৫) সঞ্জিবী বনাম মাদ্রাজ রাজ্য (১৯৭০) রাও বনাম ইন্দিরা (১৯৭১), সামসের সিং বনাম পঞ্জাব রাজ্য (১৯৭৪)]।

তবে রাষ্ট্রপতির ভূমিকা সাংবিধানিক বা নিয়মতান্ত্রিক, এই যুক্তিতে সকলের আস্থা নেই। সংবিধানের ৫৩ অনুচ্ছেদে স্পষ্টই বলা হয়েছে শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত এবং তিনি প্রত্যক্ষভাবে বা তাঁর অধীনস্থ

কর্মচারীর সাহায্যে এই শাসন ক্ষমতা ব্যবহার করবেন। এই অর্থে প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী, আমলা, সরকারি কর্মচারী সকলেই তাঁর অধীনস্ত।

সংবিধানের ৭৫(১) ও ৭৫ (২) অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপতির ভূমিকা সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে। ৭৫(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীর নির্বাচন রাষ্ট্রপতিই করেন। ৭৫(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে মন্ত্রীরা শাসনকার্যে ততদিনই বহাল থাকবেন যতদিন রাষ্ট্রপতি তাদের উপর খুশি থাকবেন ("The Ministers shall hold office during the pleasure of the President" Act 75 (3)। ৭৮ অনুচ্ছেদটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় প্রধানমন্ত্রীকে মন্ত্রিসভার সব সিদ্ধান্ত (প্রশাসনিক ও আইনগত) রাষ্ট্রপতিকে জানানো কর্তব্য। কোন বিষয় সম্পর্কে কোন মন্ত্রীর সিদ্ধান্ত মন্ত্রীসভায় বিবেচিত না হলে রাষ্ট্রপতি তা বিবেচনার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন।

সংবিধানের ৬১ অনুচ্ছেদের কথা উল্লেখ করে অ্যালান গ্লেডহিল (Alan Gledhill) মন্তব্য করেছেন, এই অনুচ্ছেদে যে ফাঁক (Gap) আছে তার সুযোগ নিয়ে রাষ্ট্রপতি তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পারেন। ৬১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করবার কোন প্রস্তাব আনবার আগে চোদ্দো দিনের একটা নোটিশ দেওয়া দরকার। এই ১৪ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি সংবিধান লঙ্ঘন করে নিজের খেয়ালখুশি মতো চলার সুযোগ নিতে পারেন। কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাষ্ট্রপতি এই অবসরে নিজের ইচ্ছামতো পরিচালিত হতে পারেন।

রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ ১৯৬০ সালের ২৮ নভেম্বর Indian Law Institute-এর একটি সভায় বর্ক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছেন রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শমতো কাজ করতে বাধ্য ভারতের সংবিধানে এমন কোন বিধান নেই। ড. দুর্গাদাস বসু মনে করেন ১৯৭৬ ও ১৯৭৮ সালে সংবিদান সংশোধনের পর অবশ্য ড. রাজেন্দ্র প্রসাদের এই বক্তব্য আর কার্যকর নয়। তবে সংবিধান সংসাধনে কিছু কিছু বিশেষ পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করা হয় নি। যেমন, প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যু হলে বা কোন প্রধানমন্ত্রী যদি সঠিক পরামর্শ না দেন সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির কী করণীয়? প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পর এ রকম পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে।

রাষ্ট্রপতির জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা বা অর্ডিন্যান্স জারির ক্ষমতা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। এই ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত মতোই গ্রহণ করেন। প্রশ্ন হল মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত যদি সঠিক না হয় বা অগণতান্ত্রিক হয় তবে রাষ্ট্রপতি সেই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার জন্য মন্ত্রিসভায় পাঠাতে পারেন কি না? রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার ঘোষণা যদি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়, রাজ্যের স্বার্থের বিরোধী হয় সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির ভূমিকা কী হবে এটাও প্রশ্ন।

এবার আমরা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদ সম্পর্কে কিছু জানবার চেষ্টা করি।

২৬.৬ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদ

ভারতে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা (Parliamentary government) প্রচলিত। ব্রিটেনের পার্লামেন্টীয় ব্যবস্থার অনুসরনেই ভারতে সংসদীয় ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। সংসদীয় রীতি অনুসারে শাসন ক্ষমতা একজনের হাতে ন্যস্ত, কার্যক্ষেত্রে শাসন ক্ষমতা ব্যবহার করেন অন্য একজন। ভারতে কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগের শীর্ষে আইনত আছেন রাষ্ট্রপতি। কার্যক্ষেত্রে শাসনকার্য পরিচালনা করেন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিপরিষদ। রাষ্ট্রপতি চূড়ান্ত শাসন

কর্তৃপক্ষ হলেও মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শমতোই কাজ করেন। ভারতীয় সংবিধানে মন্ত্রিপরিষদ সম্পর্কে কোন বিস্তৃত ব্যাখ্যা না থাকলেও, শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদই যে সক্রিয় শক্তি সংবিধানবিদ বা প্রশাসন বিশেষজ্ঞদের সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই :

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদের গঠন বিষয়ে বা অবস্থান সম্পর্কে ভারতের সংবিধানে যা বলা হয়েছে তা হল ঃ

(১) রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেবার জন্য এবং তাঁকে শাসনকার্যে সহায়তা করবার জন্য প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিপরিষদ থাকবে। ৪২তম সংশোধন অনুসারে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করতে বাধ্য। (সংবিধানের ৭৪(১) অনুচ্ছেদ)।

(২) প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদের নেতা। প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে। (সংবিধানের ৭৫(১) অনুচ্ছেদ)।

(৩) মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের পদে টিকে থাকার বিষয়টি নির্ভর করে তাঁরা রাষ্ট্রপতির কতটা আস্থাভাজন তার উপর। ["The Ministers shall hold office during the pleasure of the President."—Act 75 (2)].

(৪) মন্ত্রীগণ লোকসভার কাছে যৌথভাবে দায়িত্বশীল ["The Council of Ministers shall be collectively responsible to the House of the People." Act 75(3)].

(৫) কোন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যদি পার্লামেন্টে কোন এক কক্ষের সদস্য না হন তবে তাঁকে ৬ মাসের মধ্যে পার্লামেন্টের যে কোনো কক্ষের সদস্য হতে হবে (সংবিধানের ৭৫(৫) অনুচ্ছেদ)।

মন্ত্রিপরিষদে সাধারণত তিন স্তরের মন্ত্রী থাকেন।—(ক) ক্যাবিনেট মন্ত্রী (Cabinet Ministers), কোন দপ্তরের পূর্ণ ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, (খ) রাষ্ট্রমন্ত্রী (Ministers of State) কোন পূর্ণমন্ত্রীর দপ্তরের সহায়ক মন্ত্রী হিসাবে অথবা কোন দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্ব নিয়ে ওই স্তরের মন্ত্রীগণ নিযুক্ত হন, (গ) উপমন্ত্রী (Deputy Ministers)—ক্যাবিনেট মন্ত্রীর অধীনস্থ কোন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। পদমর্যাদায় রাষ্ট্রমন্ত্রী বা উপমন্ত্রীগণ ক্যাবিনেট মন্ত্রীর তুলনায় কিছুটা নিম্নে অবস্থিত। ১৯৯৯ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৩৫টি মন্ত্রীসভা, ৪টি বিভাগ (Department), একটি মন্ত্রীমণ্ডল সচিবালয় (Cabinet Secretariat), একটি রাষ্ট্রপতি সচিবালয় (President's Secretariat), একটি প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় (Prime Minister's Office) এবং একটি যোজনা আয়ুগ (Planning Commission) আছে।

সংসদীয় শাসনের রীতি অনুসারে কেন্দ্রে একটি মন্ত্রিপরিষদ থাকবে সংবিধানে একথা বলা হলেও মন্ত্রিপরিষদের সদস্যসংখ্যা বা মন্ত্রিদের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্ক সংবিধানে কিছু বলা হয় নি। ব্রিটেনের রীতি মেনেই মন্ত্রিপরিষদ ও ক্যাবিনেটের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য এদেশে করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ক্যাবিনেট মন্ত্রীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শদেবার কাজে ক্যাবিনেট প্রধানত মুখ্য দায়িত্ব পালন করে। সংবিধান রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য ও পরামর্শ দেবার দায়িত্ব মন্ত্রিসভার উপর অর্পন করলেও কার্যত ক্যাবিনেটই ওই দায়িত্ব বহন করে। নীতি নির্ধারণ এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা দপ্তরের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা ও সমন্বয়সাধনের ক্ষেত্রে ক্যাবিনেটই মূল শক্তি।

২৬.৬.১ মন্ত্রীপরিষদের কাজ

সংবিধান অনুসারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদের সঙ্গে পরামর্শ করেই রাষ্ট্রপতিকে কাজ করতে হয়। সুতরাং মন্ত্রিপরিষদের প্রধান কাজ হল রাষ্ট্রপতিকে তাঁর শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সাহায্য করা। সংবিধানকে রক্ষা করা বা জনকল্যাণ ও জনসেবার যে শপথ রাষ্ট্রপতি গ্রহণ করেন সেই শপথ রক্ষার্থে রাষ্ট্রপতিকে সহায়তা করা মন্ত্রিপরিষদের প্রধান কাজ। লোকসভার আস্থাভাজন মন্ত্রিপরিষদকে অগ্রাহ্য করে কাজ করা রাষ্ট্রপতির পক্ষে সহজ নয় বলেই রাজনৈতিক মহলে মনে করা হয়। সাধারণত লোকসভার আস্থাভাজন মন্ত্রিপরিষদকে অগ্রাহ্য করার অর্থ রাজনৈতিক সংকটকে আহ্বান করা। ভারতের সংবিধানে রাষ্ট্রপতির কোন স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা নেই। মূল সংবিধানে মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ নেওয়া রাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক ছিল না। তবে এ কথাও ঠিক রাষ্ট্রপতি যাতে এক একনায়কে পরিণত হতে না পারেন সেরকম কোন ব্যবস্থা বা সতর্কতাও সংবিধানে ছিল না। দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থার নীতি নির্দেশ মেনেই রাষ্ট্রপতিকে মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ মেনে চলতে হবে ইংল্যান্ডের এই রীতিই এতকাল ভারতে চলে এসেছে। রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক শাসকপ্রধান হিসাবে কাজ করবেন এবং শাসনকার্য পরিচালনার প্রকৃত ক্ষমতা ভোগ করবে লোকসভার আস্থাভাজন ও তার কাছে যৌথভাবে দায়িত্বশীল মন্ত্রিপরিষদ এ কথা সুপ্রিমকোর্টেও স্বীকার করেছে। ("The President has been made a formal or constitutional head of the executive and the real executive powers are vested in the Ministers or the Cabinet" Ram Jaways V. State of the Punjab)। ১৯৭৬ সালে ৪২তম সংবিধান সংশোধনে সুস্পষ্টভাবে বলা হয় রাষ্ট্রপতি তাঁর সফল কার্য সম্পাদনে মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুসারে চলতে বাধ্য থাকবেন। তবে আশী বা নব্বই-এর দশকে পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে রাষ্ট্রপতি কোন কোন ক্ষেত্রে সংবিধানের নিয়ামক ও রাজনীতির নিয়ন্ত্রক হয়ে দাঁড়িয়েছেন বলে এম. ভি. পাইলির (M. V. Pylee) মত কোন কোন সংবিধান বিশেষজ্ঞ মনে করেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদের অন্যতম দায়িত্ব হল ব্যক্তিগতভাবে মন্ত্রীর নেতৃত্বে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের কাজ সুসম্পন্ন করা। নিজ নিজ দপ্তরের নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে মন্ত্রীদেহর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। বিশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত অবশ্য মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে আলোচতি হয় এবং এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর পরামশ গ্রহণ করা হয়। মন্ত্রীগণ আইনসভার নিজ নিজ দপ্তরের জন্য আইনের প্রস্তাব পার্লামেন্টে উপস্থিত করেন। পার্লামেন্টের সদস্যরা এ ব্যাপারে জানতে চাইলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে তা জানাতে হয়।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার প্রতিটি সদস্যকে পরিষদ বা সভার সিদ্ধান্তের গোপনীয়তা রক্ষা করতে হয়। মন্ত্রিপরিষদের ঐক্য রক্ষায় তাদের বিশেষ দায়িত্ব আছে। মন্ত্রিপরিষদের সংহতি রক্ষার ক্ষেত্রে অবশ্য প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা উল্লেকযোগ্য।

মন্ত্রিপরিষদের প্রধান ভূমিকা হল সংসদ তথা পার্লামেন্টের কাছে তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে দায়িত্বশীল থাকা। সংবিধানের ৭৫(৩) ধারায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে মন্ত্রিপরিষদ লোকসভার (পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ বা জনপ্রিয় কক্ষ) কাছে যৌথভাবে দায়িত্বশীল। এই দায়িত্ব প্রমাণ করতে ব্যর্থ হলে মন্ত্রিপরিষদকে পদত্যাগ করতে হয়। মন্ত্রী বা ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের কাজের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে দায়িত্বশীল। ইংলন্ডে আদালতের কাছে মন্ত্রীদের যে আইনগত দায়িত্বশীলতা আছে ভারতে অবশ্য তা নেই।

ভারতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন প্রধানমন্ত্রী। পরবর্তী অংশের আলোচনা থেকে আপনারা ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা, পদমর্যাদা ও ভূমিকা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

২৬.৭ ভারতের প্রধানমন্ত্রী

ভারতের পার্লামেন্টীয় ব্যবস্থায় প্রকৃত শাসনক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতেই ন্যস্ত। রাষ্ট্রপতিকে নিয়মতান্ত্রিক শাসকপ্রধান হিসাবেই সাধারণভাবে গণ্য করা হয়। প্রধানমন্ত্রী হলেন প্রকৃত শাসকপ্রধান। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীকে ধরে এ পর্যন্ত ১৫ জন প্রধানমন্ত্রী এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এর মধ্যে শ্রী গুলজারীলাল নন্দা দুবার, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী দুবার, এবং শ্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী তিনবার এই পদে আসীন হয়েছেন। ভারতের সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা বিষয়ে তেমন কিছু বলা না হলেও ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রীর মতো ভারতের প্রধানমন্ত্রী শাসন বিভাগের গুরুদায়িত্ব বহন করেন। ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রীর মতোই তিনি হলেন 'Keystone of the Cabinet arch' অর্থাৎ ক্যাবিনেট তোরণের প্রধান স্তম্ভ। লর্ড মোর্লে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে বলেছেন সমানাধিকারীদের মধ্যে অগ্রগণ্য (Primus inter pares)। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রেও এই কথা প্রযোজ্য। আইনসভার জনপ্রিয় কক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে, অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে, মন্ত্রীদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টনের ক্ষেত্রে, ক্যাবিনেট পরিচালনের ক্ষেত্রে, ক্যাবিনেট ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে সংযোগ রক্ষায় এবং সরকারি নীতির সমন্বয়সাধনের ক্ষেত্রে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ক্যাবিনেট ব্যবস্থার রীতি বা ঐতিহ্য মেনেই প্রধানমন্ত্রীকে ভারতের শাসনব্যবস্থায় ও রাজনীতিতে গুরুদায়িত্ব পালন করতে হয়। তবে সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা যে লিপিবদ্ধ হয় নি তা নয়। সংবিধানের ৭৪ (১) ধারায় প্রধানমন্ত্রীকে মন্ত্রিপরিষদের নেতা হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। সংবিদানে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে "There shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President in the exercise of his function." অর্থাৎ রাষ্ট্রপতিকে তাঁর কার্যসম্পাদনে সহায়তা করবার ও পরামর্শ দানের জন্য প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিপরিষদ থাকবে। সংবিধানের ৭৫(১) ধারায় বলা হয়েছে অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ নেবেন। সংবিধানে ৭৮ ধারায় প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিপরিষদের সংযোগরক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

সংবিধানের ৭৫(১) ধারা অনুসারে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির দ্বারা নিযুক্ত হবেন। সাধারণত পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করেন। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ নেই। বিশেষ কোন দল পার্লামেন্টে (লোকসভায়) সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে বা দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব বা অন্য কোন কারণে সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারালে বা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত হলে পরিস্থিতির উপর সতর্ক নজর রেখে রাষ্ট্রপতিকে অবশ্য এক্ষেত্রে সক্রিয় হতে হয় এমন নজির আছে। জনতা দলের ভাঙনের পর (১৯৭৯) প্রধানমন্ত্রী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি সঞ্জিব রেড্ডী সংশ্লিষ্ট পদপ্রার্থীকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে বলেছিলেন। ইন্দিরা গান্ধীর প্রয়াণের পর প্রধানমন্ত্রী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জৈল সিং এর ভূমিকাও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য নজির।

প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ সংক্রান্ত অন্যান্য নীতিগুলি হল ঃ (১) তিনি সাধারণত ৫ বছরের জন্য নিযুক্ত হন। তবে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে বা তাঁর মৃত্যু হলে বা রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভা বাতিল করে দিলে বা লোকসভা ভেঙে দেওয়া হলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যকাল পূর্বেই শেষ হয়। (২) প্রধানমন্ত্রী লোকসভা বা রাজ্যসভা যে কোন সভার সদস্য হতে পারেন। (৩) লোকসভার পরবর্তী নির্বাচন হবার পূর্ব পর্যন্ত অবশ্য রাষ্ট্রপতির পরামর্শমতো তিনি তদারকি মন্ত্রিসভার নেতা হিসাবে কাজ চালিয়ে যাবেন। (৪) সংসদের কোন সভার সদস্য না হলেও রাষ্ট্রপতি কোন ব্যক্তিকে ছ মাসের জন্য প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করতে পারেন।

২৬.৭.১ প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর মতোই ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে বলা যায় তিনি যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারকার মধ্যে চন্দ্রের মত (a moon among lesser stars)। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোনের উদ্ধৃতি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ঃ কোথাও এমন মানুষ পাওয়া যাবে না যার এত ক্ষমতা অথচ যে ক্ষমতার কোন বহিঃপ্রকাশ নেই ("…. no where is there a man who has so much power, with so little to show for it….." W. A,. Gladstone)। এ কথা সত্য সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীর কোন ক্ষমতার কথাই তেমনভাবে বলা হয়নি অথচ বাস্তবে প্রধানমন্ত্রীই হলেন ভারতীয় রাজনীতির সর্বপ্রধান ব্যক্তিত্ব।

প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাকে কতকগুলি শীর্ষে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে ঃ

১. দলের নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রী ঃ লোকসভায় প্রধানমন্ত্রীই হল সংখ্যাগরিষ্ঠের নেতা। দলের নেতা হিসাবে দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষা ও পার্লামেন্টের ভেতরে ও বাইরে দলের কর্মসূচিকে প্রচার ও কার্যে রূপায়িত করা প্রধানমন্ত্রীর কাজ। প্রধানমন্ত্রীর যোগ্যতা ও জনপ্রিয়তার গুণেই দলের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি পায়। দলের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি, দলীয় যোগাযোগ রক্ষা, দলীয় প্রচার সব ক্ষেক্ষত্রেই প্রধানমন্ত্রীকে বিশেষ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। নির্বাচনে দলীয় কার্যক্রম ও মতাদর্শকে প্রতিষ্ঠা করার বিশেষ দায়িত্বও তিনি বহন করেন। বিরোধী দলের নেতার সঙ্গে সংযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

২. পার্লামেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী ঃ পার্লামেন্টে সরকারের নেতৃত্ব দেন প্রধানমন্ত্রী। সরকারের নেতা হিসাবে পার্লামেন্টে সরকারি কার্যক্রম ও প্রস্তাব পেশ, সরকারি নীতির ব্যাখ্যা করা, দলীয় হুইপের মাধ্যমে নিজ দলের সদস্যদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা, সংসদের সদস্যদের মধ্যে সুযোগ সুবিধা বিতরণ (rewards and patronage), সরকারি কাজকর্মের সমর্থনে বিতর্কে অংশগ্রহণ প্রধানমন্ত্রীর উল্লেখযোগ্য কাজ। সরকারের মুখপত্র লোকসভার অধিবেশন পরিচালনার ও কর্মসূচি নির্বাচনে অধ্যক্ষকে (speaker) সাহায্য করা প্রধানমন্ত্রীর অন্যতম কাজ। পার্লামেন্টে দলীয় সংহতি রক্ষায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। পার্লামেন্টে গুরুত্বপূর্ণ বিল উত্থাপনেও তাঁর কার্যকরী ভূমিকা আছে।

৩. ক্যাবিনেট ও প্রধানমন্ত্রী ঃ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর মতোই ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে ক্যাবিনেটের মূল পরিচালন-শক্তি হিসাবে বর্ণনা করা যায়। তিনি ক্যাবিনেটের নেতা। ক্যাবিনেটের নেতা হিসাবে তিনি ক্যাবিনেট ও অন্যান্য মন্ত্রীদের নাম সুপারিশ করনে, তাঁদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন, ক্যাবিনেটের সভায় সভাপতিত্ব করেন, সরকারি সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা করেন। ক্যাবিনেটের বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়সাধন করাও তাঁর অন্যতম কাজ। ক্যাবিনেটের নেতা হিসাবে অন্যান্য মন্ত্রীদের উপর প্রভাব খাটানো তাঁর কাজ নয়, তাঁর কাজ হল ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ঐকমত্য সৃষ্টি করা এবং সরকারি কাজকর্ম সম্পর্কে মন্ত্রীদের সচেতন ও উদ্যোগী করা। ক্যাবিনেটের দায়িত্বশীলতা সৃষ্টিতে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ অবদান থাকে। ক্যাবিনেট বা মন্ত্রসভার সদস্যরা প্রধানমন্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকবেন, এবং প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেট সদস্যদের কাজকর্মে আস্থা রাখবেন—পার্লামেন্টীয় গণতন্ত্রের এটাই রীতি। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর প্রাধান্য এবং ঘরোয়া ক্যাবিনেটের (Kitchen Cabinet) অবশ্য ভারতেও স্বীকৃত। ক্যাবিনেটের কাজকর্ম তদারকির জন্য প্রধানমন্ত্রীকে

> **প্রান্তলিপি ঃ** ঘরোয়া ক্যাবিনেট হল ক্যাবিনেটের কয়েকজন প্রভাবশালী মন্ত্রীকে নিয়ে গঠিত প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে পরিচালিত একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী।

সহায়তা করে ক্যাবিনেট দপ্তরখানা ও তার কর্মসচিব (Cabinet Secretariat and Cabinet Secretary)। এছাড়া বিভিন্ন ক্যাবিনেট কমিটিও আছে, যেগুলির অধিকাংশের সভাপতি প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর অবশ্য নিজস্ব একটি দপ্তর আছে। এই দপ্তর (Prime Minister's Office) ক্যাবিনেট সংক্রান্ত ও অন্যান্য কাজকর্মে প্রধানমন্ত্রীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে। ক্যাবিনেটে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের দিকে চেয়ে অনেকে ক্যাবিনেট শাসিত সরকারকে প্রধানমন্ত্রী পরিচালিত সরকার (Prime Ministerial Government) বলে গণ্য করেন।

৪. জাতির নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রী ঃ ভারতের প্রধানমন্ত্রী কোন বিশেষ নির্বাচনী ক্ষেত্র বা অঞ্চলের প্রতিনিধি নন, তিনি সমগ্র দেশের জাতির নেতা। জাতীয় সংকটে বা রাষ্ট্রের সমস্যার সমাধানে তিনি কী ভূমিকা পালন করেন, আর্থিক সামাজিক ক্ষেত্রে তিনি কিভাবে নেতৃত্ব প্রদান করেন এগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। সীমান্ত প্রশ্ন, উগ্রপন্থী সমস্যা, উপজাতিদের অধিকার, মানবিক অধিকারের প্রশ্ন, সাম্প্রদায়িক সমস্যা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, সংরক্ষণ ইত্যাদি নানা উদ্ভূত পরিস্থিতির দিকে তাকে নজর রাখতে হয়, সমাধানের কথা ভাবতে হয়।

৫. আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী ঃ শুধুমাত্র দেশের পরিস্থিতি বিচার বা জাতীয় সমস্যা সমাধানেই প্রধানমন্ত্রী নেতৃত্ব দেন না, পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণে, কূটনৈতিক প্রশ্নে তাঁকে উপযুক্ত ভূমিকা পালন করতে হয়। বিশ্বশান্তি, নিরস্ত্রীকরণ, মানবাধিকার নানা প্রশ্নে ভারতের প্রধানমন্ত্রী অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতি, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনীতি, উন্নয়নশীল দেশগুলির জোট গঠনে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। জোট নিরপেক্ষতার নীতি প্রচারে জওহরলাল নেহরুর অবদান বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করেছে।

৬. প্রচারযন্ত্র ও প্রধানমন্ত্রী ঃ ভারতের প্রধানমন্ত্রী সরকারি ও দলীয় নীতিকে সফলভাবে কার্যকর করার জন্য নানাভাবে প্রচার চালান। এক্ষেত্রে দূরদর্শন, রেডিয়, সংবাদপত্র ইত্যাদি প্রচার মাধ্যমের সাহায্য তিনি গ্রহণ করেন। ব্যক্তিত্ব, প্রচার কৌশল, জনসংযোগ ইত্যাদি এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর সম্পদ। নির্বাচনের সময়, সংকটকালীন পরিস্থিতিতে প্রচার মাধ্যমই জনসংযোগের প্রধান মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। সংসদে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ, বিভিন্ন জাতীয়. ও আন্তর্জাতিক উৎসব ও অনুষ্ঠানে তার উপস্থিতি প্রচার মাধ্যমের সূত্রেই জনসাধারণের উপর প্রভাব ফেলে। প্রধানমন্ত্রীর সাংবাদিক বৈঠক (Press Conference), জাতির উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ, প্রধানমন্ত্রীর লবি গুরুত্বপূর্ণ দেশীয় ও বিদেশি পদাধিকারীর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সভায় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতি ও বক্তব্য সব কিছুই প্রচার যন্ত্রে বিশেষ গুরুত্ব পায়। সন্দেহ নেই প্রধানমন্ত্রীর প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে প্রচারযন্ত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৭. ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি ঃ প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির প্রধান পরামর্শদাতা, মন্ত্রিসভা বা ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্তে রাষ্ট্রপতিকে জানানো প্রধানমন্ত্রীর কাজ। ক্যাবিনেটে গৃহীত কেন্দ্রীয় সরকারের কোন সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতি জানতে চাইলে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে তা জানাবেন। কোন মন্ত্রীর প্রস্তাব মন্ত্রিসভায় গৃহীত না হলে রাষ্ট্রপতি সেই প্রস্তাব মন্ত্রিসভার বিবেচনা করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে নির্দেশ পাঠাতে পারেন। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন, প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ মতোই অন্যান্য মন্ত্রী, উচ্চপদস্থ কর্মচতারী নিয়োগ করেন। প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ অনুসারে রাষ্ট্রপতি লোকসভা ভেঙে দিতে পারেন। প্রধানমন্ত্রীর মতামতকে রাষ্ট্রপতি যেমন সাধারণভাবে উপেক্ষা করেন না, অনুরূপভাবে রাষ্ট্রপতির মতামত বা পরামর্শ গ্রহণও প্রধানমন্ত্রীর সৌজন্যের মধ্যে পড়ে। তবে পার্লামেন্টীয় ব্যবস্থার নিয়ম অনুসারে রাষ্ট্রপতি যে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ মেনেই চলতে বাধ্য সংবিধানের ৪৪তম সংশোধনে সে কথা বলা হয়েছে।

২৬.৭.২ পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা

ভারতের রাজনীতিতে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা যে ব্যাপক তাতে কোন সন্দেহ নেই। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার বিচিত্র ও বহুমুখী অবস্থানের দিকে তাকিয়ে তাঁকে 'Chief Political Strategist', 'Guardian of the Indian People', 'Spokesman of the Nation' নানাভাবে উপস্থিত করা হয়। সন্দেহ নেই ভারতের মতো সংসদীয় গণতন্ত্রে তিনিই হলেন প্রধান আকর্ষণ। ক্ষমতার ব্যাপক প্রবণতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এমনকি মার্কিন রাষ্ট্রপতির সমগোত্রীয় বলে অনেকে বিচার করেন।১৯৭০-র পূর্ববর্তী সময়ে, বিশেষ করে কংগ্রেস দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় কেন্দ্রে যে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বিভিন্ন সময় জওহরলাল নেহরু, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রমুখেরা নানাক্ষেত্রে তাঁদের ক্ষমতাকে ব্যবহার করেছেন অত্যন্ত দক্ষভাবে। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁরা নিজেদের বিবেচনাবোধকে কাজে লাগিয়েছেন। পররাষ্ট্রক্ষেত্রে নেহরুর বিবেচনাবোধ ও দক্ষতা ছিল সবিচিত। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পরিস্থিতিতে ইন্দিরা গান্ধী অত্যন্ত দক্ষভাবে তাঁর কূটনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করেন। এই পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রবণতাকে রাজনৈতিক মহলে তেমন সহজভাবে গ্রহণ করা হয় নি। কেউ কেউ এই পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ক্যাবিনেটের কর্তৃত্বকে 'Super Cabinet' Shadow Cabinet' এর কর্তৃত্ব হিসাবে দেখেছেন। কোন কোন মহলে ইন্দিরা গান্ধীর সময়কালে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব লক্ষ্য করে বলে হয়েছে 'Presidentialization of Prime Minister's Office, ক্যাবিনেট, পার্লামেন্ট, দল, প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রবণতা ছিল দৃষ্টান্তসূচক। মন্ত্রী নিয়োগে, অনুগত ও আমলাদের পৃষ্ঠপোষকতা দানে, রাজ্যের রাজ্যপাল ও মন্ত্রী নিয়োগ, বিচারপতি নিয়োগে, রাজ্য-রাজনীতিতে হস্তক্ষেপে প্রধানমন্ত্রী যে গণতান্ত্রিক রীতি অনুসরণ করেছেন তা বলা যাবে না। তবে অনেক ক্ষেত্রেই প্রধানমন্ত্রীর এই ক্ষমতা ব্যবহারের প্রবণতাকে তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দক্ষতা, ব্যক্তিত্ব, কার্যসম্পাদনের শক্তি, দ্রুতসিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা হিসাবেই দেখা হয়েছে। মন্ত্রিসভার সমর্থন, দলের সমর্থন, পার্লামেন্টের দলের একাধিপত্য, ইত্যাদিও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে বলে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা মনে করেন।

১৯৭৯ সালের পরবর্তীকালে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপটের যে পরিবর্তন ঘটে সেই পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্য পূর্বের মতো প্রধানমন্ত্রী তাঁর একাধিপত্যে বা প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন তা বলা যাবে না। ১৯৮০-৮৪ এবং ১৯৮৪-১৯৮৮ এই দুটি সময় বাদ দিলে দেখা যাবে পরবর্তী সময়ে লোকসভায় কোন একটি দলের চূড়ান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না। বিগত দশ বছরে প্রধানমন্ত্রী কোন বিশেষ দলের সরকার নয়, নেতৃত্ব দিয়েছেন একটি জোট সরকারের। জোট সরকারের নেতা হিসাবে ক্যাবিনেটে, পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী তাঁর অপ্রতিহত ক্ষমতা ব্যবহার করা সুযোগ পান নি, বিভিন্ন দলের মতামত ও পরামর্শ নিয়েই তাঁকে সরকার পরিচালনা করতে হয়েছে। এই পর্যায়ে রাজনীতিকে নিজের পছন্দ বা তাঁর নিজ দলের অভিরুচিমতো পরিচালনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। ভারতীয় রাজনীতিতে এতকাল যে কেন্দ্রীয় প্রবণতা ছিল বর্তমানে তা নেই। রাজ্যে রাজ্যে পৃথক সরকার, আঞ্চলিক রাজনীতির প্রভাব, ক্রমবর্ধমান আর্থিক ও সামাজিক সংকট সবকিছুর দিকে লক্ষ্য রেখেই বর্তমানে সতর্কভাবে প্রধানমন্ত্রীকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও অর্থনীতির চাপ, দেশের ভিতরকার প্রতিকূল শক্তি, সীমান্তের অস্থিরতা, আমলাতন্ত্রের বাধা-বিপত্তি, পার্লামেন্ট ও বিচার বিভাগের প্রভাব সমস্ত সীমাবদ্ধতাকে সামনে রেখেই প্রধানমন্ত্রীকে কাজ করতে হয়। রজনী কোঠারীর মতো রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মনে রকরেন তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতিতে আন্তর্জাতিক

প্রভাব বা চাপ যে ভাবে বাড়ছে তার ফল ভারতের উপরেও পড়ছে। বিশ্ব ব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার, আর্থ-প্রযুক্তিগত হস্তক্ষেপ, সামরিক কৌশলগত চাপ সব কিছুই আজ ভারতীয় রাজনীতিকে প্রভাবিত করছে। প্রধানমন্ত্রীকে বিশ্ব রাজনীতির এইসব গতি প্রকৃতির দিকে লক্ষ রেখেই, নানা চাপ ও প্রভাবের সঙ্গে সংগতি বিধান করেই চলতে হয়। এস. এল. সিকরী (S. L. Sikri) মনে করেন ভারতের শাসন কাঠামো যেভাবে ভারাক্রান্ত, ত্রুটিপূর্ণ ও অযোগ্য হয়ে পড়েছে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্র যে ভাবে বেড়ে গেছে তার ফলে সরকারের পক্ষে অনেক গুরু দায়িত্ব সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে না। ভারতীয় পুঁজির অবৈধ স্থানান্তরন, দেশের নানা স্থানে বিদেশি অনুপ্রবেশ, কর ফাঁকির প্রবণতা ইত্যাদি রোধের ক্ষেত্রে ভারতীয় প্রশাসনের দুর্বলতা একান্ত প্রকট হয়ে উঠেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সফল কার্য প্রতিপালনের পথে এটি একটি বড় বাধা।

২৬.৮ সারাংশ

ভারতে সংসদীয় শাসনব্যবস্থার ধারা অনুসারে কেন্দ্র বা ইউনিয়ন শাসনব্যবস্থার শীর্ষে আছেন রাষ্ট্রপতি। এক বিশেষ নির্বাচক মণ্ডলীর দ্বারা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত। কেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট ও রাজ্য বিধানসভার সদস্যদের নিয়ে এই নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত। রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীর যোগ্যতা হল ৩৫ বছর বয়স, ভারতীয় নাগরিকত্ব এবং লোকসভার সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হবার যোগ্যতা। রাষ্ট্রপতি পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। সংবিধান ভঙ্গের অভিযোগে পার্লামেন্ট তাঁকে পদচ্যুত করতে পারে। সংবিধানে রাষ্ট্রপতির শপথ গ্রহণ, বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার কথা বলা হয়েছে। রাষ্ট্রপতির শাসন বিভাগীয়, আইন-সংক্রান্ত, বিচার সংক্রান্ত ও জরুরি অবস্থা বিষয়ক ক্ষমতা আছে। সংসদীয় ব্যবস্থার রীতি অনুসারে রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক শাসক। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভার সাহায্য ও পরামর্শ নিয়েই তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করেন। রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা বা প্রকৃত ভূমিকা নিয়ে অবশ্য সংবিধানিবিদ ও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহলে বিতর্ক আছে। একটি গোষ্ঠী তাঁকে নিয়মতান্ত্রিক শাসকের অতিরিক্ত কিছু ভাবেন না। অন্য আর এক দল পর্যবেক্ষকের অভিমত হল ব্রিটেনের রাজা বা রানীর মতো রাষ্ট্রপতি নামসর্বস্ব শাসক নন। মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শ অনুসারে রাষ্ট্রপতি চলবেন এ কথা মেনে নিয়েও বলা হয় সংবিধানে রাষ্ট্রপতির স্ববিবেচনা অনুসারে কাজ করার যথেষ্ট সুযোগ আছে। ইংলন্ডের সংসদীয় ব্যবস্থার নজীর সামনে রেখে ভারতের রাষ্ট্রপতির অবস্থান ব্যাখ্যা করা ঠিক নয়। ১৯৭৬ সালের পূর্ব সংসদীয় শাসনের সুস্পষ্ট রীতিকে বিধিবদ্ধ করে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করা হয়নি। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় রাষ্ট্রপতি যে রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে উঠতে পারেন এমন দৃষ্টান্ত কিন্তু ভারতে আছে।

রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেবার জন্য এবং তার কাজে সহায়তা করবার জন্য কেন্দ্রে একটি মন্ত্রিপরিষদ আছে। প্রধানমন্ত্রী এই মন্ত্রিপরিষদের নেতা। মন্ত্রিপরিষদ লোকসভার কাছে যৌথভাবে দায়িত্বশীল। প্রধানমন্ত্রী হলেন ভারত রাষ্ট্রের প্রকৃত শাসন প্রধান। দলের নেতা হিসাবে, ক্যাবিনেটের নেতা হিসাবে, আইনসভায় সরকারি দলের নেতা হিসাবে, জাতির অভিভাবক হিসাবে এবং পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রধানমন্ত্রী হলেন প্রধান আকর্ষণ। সময় ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে সন্দেহ নেই, তবে নতুন পরিস্থিতি ও অবস্থায় তার একাধিপত্য বা প্রভাব বেড়েছে এ কথা বলা যাবে না। আঞ্চলিক রাজনীতিক প্রসার, জোট সরকারের প্রবণতা, নতুন আর্থসামাজিক পরিস্থিতি ও সংকট প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা বা প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে বাধা বা সীমা হিসাবে কাজ করেছে।

২৬.৯ অনুশীলনী

(১) সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে নিম্নলিখিত বাক্যগুলি আবার লিখুন।

(ক) ভারতে কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগের শীর্ষে রয়েছেন (i) রাষ্ট্রপতি (ii) প্রধানমন্ত্রী।

(খ) রাষ্ট্রপতি প্রত্যক্ষ/পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন।

(গ) কার্যকাল অতিবাহিত হবার আগে রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করতে চাইলে তিনি পদত্যাগপত্র জমা দেবেন (ক) সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে, (খ) উপরাষ্ট্রপতির কাছে, (গ) প্রধানমন্ত্রীর কাছে।

(ঘ) ভারতের রাষ্ট্রপতি তার মন্ত্রিসভায় পরামর্শমতো চলতে বাধ্য / বাধ্য নন।

(ঙ) কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা (i) লোকসভা, (ii) প্রধানমন্ত্রী, (iii) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন।

(চ) ভারতের শাসনব্যবস্থা (i) রাষ্ট্রপতি শাসিত, (ii) সংসদীয়।

(ছ) ক্যাবিনেটের সভায় সভাপতিত্ব করেন রাষ্ট্রপতি/প্রধানমন্ত্রী।

(জ) পার্লামেন্টে সরকারি পক্ষের নেতৃত্ব দেন রাষ্ট্রপতি/প্রধানমন্ত্রী।

(২) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির দু-এক কথায় উত্তর দিন। (উত্তরগুলি ১.৬ অংশের উত্তরমালা দেখে মিলিয়ে নিন।)

(ক) ভারতের রাষ্ট্রপতিকে কারা নির্বাচন করেন?

(খ) রাষ্ট্রপতির পদপ্রার্থীর যোগ্যতা কী?

(গ) রাষ্ট্রপতির আইন বিষয়ক দুটি ক্ষমতা উল্লেখ করুন।

(ঘ) জাতীয় জরুরি অবস্থা বলতে কী বোঝায়?

(ঙ) ঘরোয়া ক্যাবিনেট কাকে বলে?

(চ) প্রধানমন্ত্রীর দুটি প্রধান ক্ষমতা কী কী?

(৩) নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর করুন। (৫০টি শব্দের অনধিক)

(ক) ভারতের রাষ্ট্রপতি কীভাবে নির্বাচিত হন?

(খ) রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আইনসভার সম্পর্ক কী?

(গ) রাষ্ট্রপতির জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতাকে কিভাবে শ্রেণিবিভাগ করবেন।

(ঘ) মন্ত্রিপরিষদের কাজ সম্পকের্গ সংক্ষেপে লিখুন।

(ঙ) ক্যাবিনেটের নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর কাজ কী?

(চ) ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রাষ্ট্রপতির সম্পর্ক বিচার করুন।

(৪) অনধিক ১৫০ শব্দে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন।

(ক) ভারতের রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

(খ) ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাগুলি বর্ণনা করুন।

(গ) ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও পদমর্যাদা আলোচনা করুন।

(ঘ) ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা সম্পর্কে লিখুন।

২৬.১০ উত্তরমালা

(১) (ক) ভারতে কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগের শীর্ষে রয়েছেন রাষ্ট্রপতি।

(খ) রাষ্ট্রপতি পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন।

(গ) কার্যকাল অতিবাহিত হবার আগে রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করতে চাইলে তিনি পদত্যাগপত্র জমা দেবেন উপরাষ্ট্রপতির কাছে।

(ঘ) ভারতের রাষ্ট্রপতি তার মন্ত্রিসভার পরামর্শমত চলতে বাধ্য।

(ঙ) কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন।

(চ) ভারতের শাসনব্যবস্থা সংসদীয়।

(ছ) ক্যাবিনেটের সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী।

(জ) পার্লামেন্ট সরকারি পক্ষের নেতৃত্ব দেন প্রধানমন্ত্রী।

(২) (ক) ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন পার্লামেন্টের উভয় সভার সদস্য ও রাজ্য বিধানসভার সদস্যদের নিয়ে গঠিত একটি নির্বাচক মণ্ডলী দ্বারা।

(খ) ভারতীয় নাগরিকত্ব ৩৫ বছর বয়স ও লোকসভায় নির্বাচিত হবার যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে ভারতের রাষ্ট্রপতিকে।

(গ) রাষ্ট্রপতির আইন বিষয়ক দুটি ক্ষমতা হল অর্ডিন্যান্স জারি করা ও বিলে সম্মতিদান।

(ঘ) রাষ্ট্রপতি কোন অংশের নিরাপত্তা বিঘ্নি হয়েছে বা হতে পারে তাহলে তিনি জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। জাতীয় জরুরি অবস্থা হল জাতি বা রাষ্ট্রের নিরাপত্তার কারণে জারি করা রাষ্ট্রপতির বিশেষ জরুরি ক্ষমতা।

(ঙ) ঘরোয়া ক্যাবিনেট হল প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ক্যাবিনেটের কতিপয় প্রভাবশালী মন্ত্রীকে নিয়ে গঠিত ক্ষুদ্র ক্যাবিনেট।

(চ) প্রধানমন্ত্রীর দুটি প্রধান ক্ষমতা হল তিনি ক্যাবিনেটের নেতৃত্ব দেন এবং পার্লামেন্টে সরকারের নেতৃত্ব দেন।

(৩) উত্তর সংকেত ঃ (ক) ৫-৬ পৃষ্ঠা (খ) ১২ পৃষ্ঠা (গ) ১৩-১৪ পৃষ্ঠা (ঘ) ১৯-২০ পৃষ্ঠা (ঙ) ২২-২৬ পৃষ্ঠা (চ) ২৪ পৃষ্ঠা।

(৪) উত্তর সংকেত ঃ (ক) ৫-৭ পৃষ্ঠা (খ) ১০-১৪ পৃষ্ঠা (গ) ১৫-১৭ পৃষ্ঠা (ঘ) ২১-২৪ পৃষ্ঠা।

২৬.১১ নির্বাচিত পাঠ্য পুস্তক

(১) **Durga Das Basu** : *Introduction to the Constitution of India (1999).*

(২) **Subhas C. Kashyap** : *Our Constitution—An Introduction to India's Constitution and Constitutional Law (NBT, 1995).*

(৩) **S. L. Sikri** : *Indian Government and Politics (1989).*

(৪) **Granville Austin** : *The Indian Constitution : Cornerstone of a Nation (1966).*

(৫) **Dhirendranath Sen** : *From Raj to Swaraj (1954).*

(৬) **M. P. Pylee** : *An Introduction to the Constitution of India (1995).*

একক ২৭ ❐ আইনসভা

গঠন

২৭.১ উদ্দেশ্য
২৬.২ প্রস্তাবনা
২৬.৩ মূল আলোচনা ঃ আইনসভা
২৭.৩.১ ভারতের আইনসভার গঠন
২৭.৩.২ ভারতে দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থা
২৭.৪ ভারতের সংসদের কার্যাবলি
২৭.৪.১ সংসদ ও আইনসভা সংক্রান্ত ক্ষমতা
২৭.৪.২ সংসদ ও আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ
২৬.৪.৩ শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা
২৭.৪.৪ সংসদের অন্যান্য ক্ষমতা
২৭.৪.৫ সংসদের উভয়কক্ষের সাংবিধানিক সম্পর্ক
২৭.৫ লোকসভার স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার ও রাজ্যসভার সভাপতি
২৭.৫.১ স্পিকারের নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতা
২৭.৫.২ স্পিকারের কার্যাবলি
২৭.৫.৩ ডেপুটি স্পিকার
২৭.৫.৪ রাজ্যসভার সভাপতি ও সহ-সভাপতি
২৭.৫.৫ সংসদের সদস্যদের অধিকার ও অব্যাহতি
২৭.৬ সংসদে বিরোধীদলের ভূমিকা
২৭.৭ সংসদে আইনপ্রণয়ন পদ্ধতি
২৭.৭.১ বিল ও বিলের শ্রেণিবিভাগ
২৭.৭.২ সরকারি বিল পাশের পদ্ধতি
২৭.৭.৩ বেসরকারি বিল পাশের পদ্ধতি
২৭.৭.৪ অর্থবিল পাশের পদ্ধতি
২৭.৭.৫ অন্যান্য অর্থসংক্রান্ত বিল
২৭.৮ সংসদের অর্থবিষয়ক কার্যপদ্ধতি
২৭.৮.১ কমিটি ব্যবস্থা
২৭.৯ সংসদীয় রীতি-পদ্ধতি
২৭.১০ সংসদীয় সংস্কার
২৭.১১ সারাংশ
২৭.১২ অনুশীলনী
২৭.১৩ উত্তরমালা
২৭.১৪ গ্রন্থপঞ্জি

২৭.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি—

- ভারতীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় আইনসভা অর্থাৎ পার্লামেন্টের গঠনপ্রণালী ও কার্যাবলি বিষয়ে ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- সংসদের অন্যতম পদাধিকারী হিসাবে লোকসভার স্পিকারের ক্ষমতা, পদমর্যাদা ও নিরপেক্ষতা সম্পর্কে সংবিধানগত ব্যবস্থা কী এবং এক্ষেত্রে বর্তমান রাজনৈতিক প্রবণতা কী সে সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- সংসদ ও সংসদ সদস্যদের অদিকার সম্পর্কিত সাংবিধানিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক প্রবণতা বিচার করতে পারবেন।
- সংসদে বিরোধীদলের অবস্থান কেমন সে বিষয়ে মূল্যায়ন করতে পারবেন।
- সংসদে আইনপ্রণয়ন ও অর্থবিষয়ক কার্যপদ্ধতির ধারাটি কেমন সেটি উপলব্ধি করতে পারবেন।

২৭.২ প্রস্তাবনা

ভারতে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ হল পার্লামেন্ট। দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক ঐক্যের কথা বিচার করেই গণপরিষদের সদস্যরা চেয়েছিলেন একটি প্রতিনিধিমূলক, দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করতে। আইনসভা তথা পার্লামেন্টই হবে এই দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থার ভিত্তি। সার্বিক প্রাপ্তবয়স্ক ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচিত জন প্রতিনিধিরা আইনসভায় দায়িত্বশীল শাসনের নীতিকে প্রতিফলিত করবেন এটাই ছিল তাঁদের আশা। সন্দেহ নেই সংসদ বিষয়ে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন যে সাংবিধানিক ব্যবস্থার নির্দেশ করেছে স্বাধীন ভারতের সংবিধানে অনেকটা সেই ব্যবস্থাই কার্যকর হয়েছে। এক্ষেত্রে ব্রিটিশ পার্লামেন্টীয় নীতির অনেকটাই স্বাধীন ভারতের সংবিধান গ্রহণ করেছে। অবশ্য দু-একটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নেই তা নয়।

ভারতের আইনসভা দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট। আলোচনার প্রথমেই ভারতের দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার রূপ অর্থাৎ দুটি কক্ষ—রাজ্যসভা ও লোকসভার গঠন, সামগ্রিকভাবে পার্লামেন্টের কার্যাবলি, উভয়সভার সম্পর্ক ইত্যাদির কথা এসেছে। লোকসভার পরিচালক হিসাবে স্পিকার গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী। স্পিকারের ক্ষমতা ও পদমর্যাদা সম্পর্কে শিক্ষার্থী পাঠকের ধারণা একান্ত আবশ্যক। স্পিকারের কর্মকুশলতা ও দক্ষতার উপর পার্লামেন্টের জনপ্রিয় কক্ষ লোকসভার কার্যকলাপ অনেকটাই নির্ভরশীল। বর্তমান এককের পরবর্তী আলোচনায় স্থান পেয়েছে সংসদ ও সংসদ সদস্যদের অধিকার ও অব্যাহতি বিশয়ক একটি অত্যন্ত কৌতূহলপ্রদ আলোচনা। বিরোধী দল সংসদীয় গণতন্ত্রের অন্যতম স্তম্ভ। ভারতের পার্লামেন্টে বিরোধী দলের অবস্থান কেমন বা তাদের ভূমিকা কী এ সম্পর্কে পাঠকের কৌতূহল থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক এ কথা ভেবেই বিরোধী দল সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা বর্তমান এককের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ভারতের পার্লামেন্টীয় ব্যবস্থার কার্যধারাকে বুঝতে সংসদের আইন প্রণয়ন পদ্ধতি, অর্থ বিষয়ক কর্মপদ্ধতি, কমিটি ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে পরিচিত হবার প্রয়োজন আছে।

২৭.৩ মূল আলোচনা

২৭.৩.১ ভারতের আইনসভার গঠন

ভারতীয় ইউনিয়নের আইনসভা সংসদ বা পার্লামেন্ট নামে পরিচিত। ব্রিটেনের আইনসভার মতই ভারতের আইনসভা দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট। ভারতের পার্লামেন্ট রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যসভা (The Council of States) ও লোকসভা—এই দুটি কক্ষ নিয়ে গঠিত।

রাজ্যসভা ঃ রাজ্যসভা ভারতীয় পার্লামেন্টের উচ্চতর বা দ্বিতীয় কক্ষ (Upper or Second Chamber)। সংবিধানে ৮০ ধারা অনুসারে রাজ্যসভার সদস্য ২৫০ জনের বেশি হবে না। এর মধ্যে ২৩৮ জন সদস্য রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের প্রতিনিধি। সাহিত্য, বিজ্ঞান, চারুকলা ও সমাজ সেবায় বিশেষ অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্য থেকে বাকি ১২ জনকে রাষ্ট্রপতি মনোনয়ন করেন। রাজ্যের প্রতিনিধিবর্গ রাজ্য বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট ও সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের পদ্ধতিতে নির্বাচিত হন। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে রাজ্যসভায় প্রতিনিধি নির্বাচনের পদ্ধতি পার্লামেন্ট আইন করে স্থির করে। জনসংখ্যাই রাজ্যসভায় আসন বণ্টনের ভিত্তি বলে রাজ্যসভায় উত্তরপ্রদেশের প্রতিনিধি সংখ্যাই বেশি। রাজ্যসভায় পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি সংখ্যা ১৬ রাজ্যসভা স্থায়ী পরিষদ। একে ভেঙে দেওয়া যাবে না। প্রতি দুবছর অন্তর রাজ্যসভার সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশকে অবসর নিতে হয়। উপরাষ্ট্রপতি পদাধিকার বলে রাজ্যসভার সভাপতি। সহ-সভাপতি রাজ্যসভার সদস্যবৃন্দ দ্বারা নির্বাচিত হন।

রাজ্যসভার সদস্য হবার যোগ্যতা হল ঃ (ক) ভারতীয় নাগরিকত্ব, (খ) কমপক্ষে ৩০ বছও বয়স (গ) পার্লামেন্টের বিধান অনুসারে অন্যান্য নির্দিষ্ট যোগ্যতা।

লোকসভা ঃ লোকসভা হল কেন্দ্রীয় বা ইউনিয়ন আইনসভার প্রথম বা নিম্নকক্ষ। লোকসভার সদস্যরা প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। সংবিধানের ৩১ সংশোধন অনুসারে লোকসভার সদস্য হবে অনধিক ৫৪৫। এর মধ্যে রাজ্যগুলি থেকে নির্বাচিত হবেন অনধিক ৫২৫ জন এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি থেকে অনধিক ২০ দন। এ ছাড়া ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায় থেকে ২ জন সদস্যকে রাষ্ট্রপতি লোকসভায় মনোনীত করেন। বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসন বন্টনের হিসাব অনুসারে উত্তরপ্রদেশ থেকে ৮৫ জন, পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৪২ জন, ত্রিপুরা থেকে ২ জন লোকসভায় নির্বাচিত হন। লোকসভায় নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে তপশিলজাতি ও উপজাতিদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। আসন সংরক্ষণের মেয়াদ ২০০০ সালের ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে (৬২ তম সংবিধান সংশোধন, ১৯৮৯)।

> *প্রান্তলিপি ঃ বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে লোকসভার আসন বণ্টন কার্য পূর্ববর্তী জনগণনার ভিত্তিতে নির্বাচন-এলাকা নির্ধারণ কমিশনের (Delimination Commission) সুপারিশ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্পাদিত হয়। ১৯৭৬ সালের ৪২ তম সংশোধন অনুসারে ২০০১ সালের জনগণনা পর্যন্ত লোকসভার আসন বণ্টন অপরিবর্তিত থাকবে।*

লোকসভায় সদস্য হবার যোগ্যতা হল ঃ (ক) ভারতীয় নাগরিকত্ব, (খ) কমপক্ষে ২৫ বৎসর বয়স, (গ) পার্লামেন্টের বিধান অনুসারে অন্যান্য নির্দিষ্ট যোগ্যতা। বিকৃত মস্তিষ্ক, দেউলিয়া বা কোন লাভজনক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি লোকসভার বা রাজ্যসভার সদস্য হতে পারবেন না। সংবিধানের ৫২ তম সংশোধনে (১৯৮৫) দলত্যাগ বিরোধী আইন পাশ করে বলা হয়েছে বিশেষ ক্ষেত্রে দলত্যাগী সদস্যরা

সংসদের সদস্য পদের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। লোকসভার স্পিকার ও রাজ্যসভার সভাপতি বিষয়টি নির্ধারণ করবেন। কোন ব্যক্তি একই সঙ্গে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের সদস্য হতে পারেন না বা একই সঙ্গে পার্লামেন্ট ও রাজ্য আইনসভার সদস্য হতে পারেন না (সংবিধানের ১০১(১) ও (২) ধারা।

লোকসভা ৫ বছরের জন্য গঠিত হয়। মেয়াদ শেষ হবার আগে রাষ্ট্রপতি লোকসভা ভেঙে দিতে পারেন। আজ পর্যন্ত ভারতে ১৩ বার লোকসভার নির্বাচন হয়েছে। লোকসভার কার্য পরিচালনার জন্য একজন অধ্যক্ষ (Speaker) ও সহকারী অধ্যক্ষ (Deputy Speaker) থাকবেন। স্পিকারের অনুপস্থিতিতে ডেপুটি স্পিকার লোকসভার কার্য পরিচালনা করেন। রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের এবং প্রয়োজনে উভয় কক্ষের মিলিত অধিবেশন আহ্বান করেন। উভয় কক্ষের মিলিত অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্পিকার। কোন কক্ষের প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশনের মধ্যে সময়ের ব্যবধান ৬ মাসের বেশি হতে পারে না। উভয়কক্ষের ক্ষেত্রেই মোট সদস্য সংখ্যার এক-দশমাংশ উপস্থিত না হলে কোন সভা অনুষ্ঠিত হতে পারে না। সভার আবশ্যক সর্বনিম্ন এই উপস্থিতি সংখ্যাকে কোরাম (Quorum) বলে। পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পার্লামেন্ট আইন করে স্থির করে দেয়। সংবিধানের ৯৮ ধারায় বলা হয়েছে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের নিজস্ব সচিবালয় থাকবে। সচিবালয়ের কর্মীদের নিয়োগ ও কাজের শর্তাবলি পার্লামেন্ট স্থির করবে। যতদিন পার্লামেন্টে এ বিষয়ে কোন নিয়ম স্থিরও হয় না, ততদিন রাষ্ট্রপতি লোকসভার স্পিকার ও রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের সঙ্গে পরামর্শ করে নিয়োগ ও কাজের শর্তাবলি বিষয়ে আইন স্থির করবেন।

২৭.৩.২ ভারতের দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থা

ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই দ্বি-পরিষদ সম্পন্ন আইনসভার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। ভারতেও ইউনিয়ন পার্লামেন্টের দ্বিতীয় কক্ষ হিসাবে রাজ্যসভার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা তা নিয়ে সংবিধানবিদ মহলে বিতর্ক আছে। ভারতে ১৯১৯ সালের ভারতে শাসন আইন ও ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে কেন্দ্র ও কয়েকটি প্রদেশে দ্বিতীয় পরিষদ বজায় রাখার কথা বলা হয়। গণপরিষদে বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক হয়। সাপ্রু কমিটি (Sapru Committee), ইউনিয়ন ও প্রাদেশিক সংবিধান কমিটি, মতিলাল নেহরু রিপোর্ট ইত্যাদিতে দ্বিতীয় কক্ষের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। মতিলাল নেহরু রিপোর্টে সংশোধনী সভা হিসাবে দ্বিতীয় কক্ষের গুরুত্ব স্বীকার করা হয়েছে, সম-প্রতিনিধিত্বের নীতি নিয়েও আলোচনা হয়েছে। গণপরিষদে বি. এন. বাউ দ্বিতীয় প্রসঙ্গ অবতারণা করেছেন। বাউ স্বীকার করেন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিতীয় কক্ষ এক অপরিহার্য নীতি। ঐতিহ্য, বিভিন্ন স্বার্থের সংরক্ষণ, প্রথম কক্ষের অবিবেচনা প্রসূত আইন পাশের প্রবণতা ইত্যাদি যুক্তি নির্দেশ করে দ্বিতীয় কক্ষের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়। এন গোপাল স্বামী আয়েঙ্গার (N. Gopalswami Ayyanger) দ্বিতীয় কক্ষের পক্ষে বিশেষভাবে ওকালতি করেন। প্রাদেশিক সংবিধান কমিটির সভায় কে. এন. কাটযু (K. N. Katju), দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার পক্ষে বলেন। এন. ডি. আয়েঙ্গার দ্বিতীয় কক্ষকে বিশিষ্ট অভিজ্ঞদের বিতর্কসভা হিসাবে গুরুত্ব দেন। এইচ. ভি. কামাথ (H. V. Kamath) অবশ্য কেন্দ্রে হলেও প্রদেশে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভাকে সমর্থন করেন নি। কে. সান্তানম (K. Santhanam) দ্বিতীয় কক্ষের বিরুদ্ধেই বলেছেন তবে প্রদেশে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় হঠকারিতা বা অবিবেচনারোধে বাধাদানের প্রয়োজনে দ্বিতীয় কক্ষ প্রয়োজন সে কথা অস্বীকার করেননি। তবে গণপরিষদে শেষপর্যন্ত দ্বিতীয় পরিষদের ভাবনা স্বীকৃত হয়। প্রদেশে কিছুটা বিলম্বিত হলেও দ্বিতীয় কক্ষের পক্ষেই সিদ্ধান্ত হয়। রাজ্যসভা

এবং বিধানপরিষদ যে নিম্নকক্ষ থেকে পাঠানো বিলকে ছ মাস বিলম্বিত করতে পারবে এবং শেষপর্যন্ত উভয় কক্ষের যৌথ অধিবেশনে বিষয়টির মীমাংসা হবে খসড়া সংবিধানে এ কথা মেনে নেওয়া হয়। গণপরিষদে প্রাদেশিক প্রতিনিধিরা অবশ্য দ্বি-কক্ষের প্রশ্নে একমত হতে পারেন নি। মাদ্রাজ, বোম্বাই, বিহার, পূর্ব পঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশের প্রতিনিধিরা অবশ্য দ্বিতীয় কক্ষের পক্ষে প্রস্তাব দিলেও পশ্চিমবঙ্গ, অসম, মধ্যপ্রদেশের প্রতিনিধিরা এ প্রশ্নে স্পষ্টই দ্বিধাবিভক্ত ছিলেন। ভারতীয় পার্লামেন্টে দ্বিতীয় কক্ষের প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্রীয় সম প্রতিনিধিত্বের নীতি বা রাজ্যগুলির সম মর্যাদার নীতি গৃহীত হয়নি। অনেকে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত লোকসভার কাছে রাজ্যসভার বাদাদানকে কাম্যও মনে করেন নি। রাজ্যসভার সদস্যরা কতটা নিরপেক্ষ হবেন, সাধারনের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করবেন এ প্রশ্নও অনেকে তুলেছেন। তবে শেষ বিচারে এটাই বলা হয়েছে রাজ্যসভায় কোন বিশেষ সমস্যা নিয়ে বিতর্কের অতিরিক্ত সুযোগ আছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিলের সংশোধন বা আইন সংক্রান্ত কাজের চাপ লাঘব করার ক্ষেত্রে এই সভা কার্যকর হতে পারে।

এবার আসুন আমরা দেখি ভারতের পার্লামেন্টের কাজ কী এবং পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের সাংবিধানিক সম্পর্ক কী।

২৬.৪ ভারতের সংসদের কার্যাবলি

ব্রিটেনের পার্লামেন্টের মতো ভারতের পার্লামেন্টকে সার্বভৌম সংস্থা বলা যাবে না ঠিকই কিন্তু সংবিধানে এবং ভারতের রাজনীতিতে পার্লামেন্টের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আইনসভার নির্ধারিত ক্ষমতা ছাড়াও পার্লামেন্ট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে। ভারতের পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন, সরকারি আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রণ—এই তিনটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। বিতর্ক সভা হিসাবে অভিযোগ জ্ঞাপন ও তার প্রতিকারের সংস্থা, সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করার ক্ষেত্রে পার্লামেন্ট বিশেষ ভূমিকা নেয়।

২৭.৪.১ সংসদ ও আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা

ইউনিয়ন ও যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করবার ক্ষমতা পার্লামেন্টের। ইউনিয়ন তালিকাভুক্ত যে কোন বিষয়ে আইন প্রণয়নের অনন্য ক্ষমতা পার্লামেন্ট ভোগ করে। প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক নীতি, মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ইত্যাদি ইউনিয়ন তালিকাভুক্ত বিষয়ে পার্লামেন্টের আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা আছে। সংবিধান অনুসারে সমস্ত দেশ এবং ভারত ভূখণ্ডের যে কোনো অংশের উপর আইন প্রণয়নের ক্ষমতা পার্লামেন্টের আছে। যুগ্ম তালিকাভুক্ত কোন বিষয়ে রাজ্য আইনসভা প্রণীত আইন এবং পার্লামেন্টের আইনের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হলে পার্লামেন্টের আইনটিই বলবৎ হবে (রাজ্যের আইন যতদূর পর্যন্ত অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয় ততদূর পর্যন্ত বাতিল হয়ে যায়)।

রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়েও কোন কোন ক্ষেত্রে পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করতে পারে। এইসব ক্ষেত্রগুলি হল ঃ

(১) রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করলে, সেই অবস্থায় পার্লামেন্টকে রাজ্যতালিকাভুক্ত যে কোনো বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া যেতে পারে।

(২) আন্তর্জাতিক সন্ধির শর্তাদি পালনের জন্য প্রয়োজন হলে রাজ্য তালিকার যে কোনো বিষয় সম্পর্কে পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করতে পারে।

(৩) রাজ্যসভা যদি দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে স্থির করে রাজ্য তালিকাভুক্ত কোন বিষয়ে পার্লামেন্টের আইন প্রণয়ন করা উচিত তবে পার্লামেন্ট ঐ বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে।

(৪) দুই বা ততোধিক রাজ্যের আইনসভা প্রস্তাব করে যদি পার্লামেন্টকে রাজ্য তালিকাভুক্ত কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে অনুরোধ করে তবে পার্লামেন্ট সেই বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে।

সংবিধানের তিনটি তালিকার বাইরের কোন বিষয়ে পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করতে পারে। পার্লামেন্টের এই ক্ষমতাকে অবশিষ্ট ক্ষমতা (Residuary Powers) বলে।

আইন প্রণয়ন ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের দুটি কক্ষের ক্ষমতাই সাধারণভাবে সমান। পার্লামেন্টের যে কোনো কক্ষেই আইনের প্রস্তাব উত্থাপন করা যায় এবং উভয় কক্ষের সম্মতি ছাড়া কোন বিল পাশ হয় না। অর্থবিল অবশ্য কেবলমাত্র লোকসভাতেই উত্থাপন করা যায় এবং লোকসভায় পাশ হওয়া অর্থবিল রাজ্যসভা প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। অর্থবিলের উপর সংশোধনের প্রস্তাব অবশ্য রাজ্যসভা করতে পারে।

সংসদের দুটি কক্ষে বিল পাশ হবার পর রাষ্ট্রপতির সম্মতির প্রয়োজন হয়। রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিতেও পারেন আবার নাও দিতে পারেন। অর্থ বিলপ পুনর্বিবেচনা করার জন্য অবশ্য রাষ্ট্রপতি লোকসভায় সংশ্লিষ্ট বিল ফেরত পাঠাতে পারেন না। দ্বিতীয়বার পাসের পর অবশ্য রাষ্ট্রপতি সাধারণ বিলে সম্মতি দিতে বাধ্য থাকেন।

আধুনিক সংসদীয় শাসনের একটি রীতি হল আইন বিভাগের দ্বারা শাসন বিভাগকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ। রাষ্ট্রে কাজ যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তার সঙ্গে তাল রেখেই আইন প্রণয়ন করতে হয়। এক্ষেত্রে আইন বিভাগ তার ক্ষমতার চাপ কমানোর প্রয়োজনে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা কোন কোন ক্ষেত্রে শাসন বিভাগের হাতে অর্পণ করে। ভারতেও এই ধরনের ক্ষমতা অর্পণের রীতি আছে। পার্লামেন্ট এই উদ্দেশ্যে একটি অধস্তন আইন সংক্রান্ত কমিটি (Committee on Subordinate Legislation) গঠন করে অর্পিত ক্ষমতার অপপ্রয়োগ বন্ধের প্রবণতা রোধ করার উদ্দেশ্যে সতর্কতা অবলম্বন করে।

আইন প্রণয়ন পার্লামেন্টের কাজ হলেও আই্ প্রণয়ন সংক্রান্ত মুখ্য সিদ্ধান্ত কিন্তু সরকারই গ্রহণ করে। পার্লামেন্ট যে আইনকে অনুমোদন করে সেই আইনের অধিকাংশই রচিত হয় সরকারের উদ্যোগে। সরকার বা ক্যাবিনেটের তৎপরতা ছাড়া আইনগত পদ্ধতি সম্ভব নয়। অধিকাংশ বিলেরই উদ্যোক্তা সরকার। ক্যাবিনেটের অনুমোদন ছাড়া আইন উপস্থাপনা সম্ভভ নয়। আইনের খসড়া প্রস্তুতের ক্ষেত্রেও সরকারের অবদান লক্ষ্যণীয়। সুতরাং পার্লামেন্টকে আইন প্রণয়নকারী না বলে আইনের নিয়ন্ত্রক বা সমালোচক বলা যেতে পারে। পার্লামেন্টের নিয়ম বা রীতিকে অগ্রাহ্য করে সরকার আইন প্রণয়নে অগ্রসর হলে সেটি পার্লামেন্টীয় গণতন্ত্রের বিরোধ বলে প্রতিপন্ন হবে এ কথা ভেবেই সরকারকে এক্ষেত্রে সংযত হয়ে চলতে হয়।

২৭.৪.২ সংসদ ও আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ

ভারতে পার্লামেন্টের একটি উল্লেখযোগ্য কর্মক্ষেত্র হল আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার নিয়ম হল সরকার তার কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য অর্থ দাবি করে। পার্লামেন্টের কাজ হল এই অর্থ বরাদ্দ বা মঞ্জুর করা। সোজা কথায় পার্লামেন্টের সম্মতি ছাড়া সরকারের পক্ষে রাজস্ব আদায় বা অর্থ ব্যয় সম্ভব নয়। সংবিধানের ব্যবস্থা অনুসারে সংসদের আইন দ্বারা অনুমোদিত না হলে কোন ব্যয়, করধার্য বা কর সংগ্রহ সম্ভব নয়। পার্লামেন্টে উভয় পরিষদে প্রতি বছর, রাষ্ট্রপতিকে মন্ত্রী মারফত আনুমানিক আয় ব্যয়ের হিসাব বা বাজেট পেশ করতে হয়। পার্লামেন্টেই বাজেট অনুমোদিত হয়।

পার্লামেন্টের অনুমোদন ছাড়া সরকারের আয়-ব্যয় প্রস্তাব কার্যকর হয় না এ কথা ঠিক কিন্তু পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সীমাবদ্ধতাও আছে। প্রথমত, সরকার সুপারিশ না করলে কোন ব্যয় মঞ্জুরীর দাবি বা কর ধার্যের প্রস্তাব করা যায় না। দ্বিতীয়ত, অনেক ব্যয় আছে যা কেন্দ্রীয় সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয় (Expenditure Charged on the Consolidated Fund of India)—এই ব্যয় পার্লামেন্টের অনুমোদনের উপর নির্ভর করে না। রাষ্ট্রপতি রাজ্যসভার সভাপতি ও সহ-সভাপতি, লোকসভার স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার, সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি, নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষকের বেতন, ভাতা, আর্থিক সুবিধাদি কেন্দ্রীয় সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয়। তৃতীয়ত, সরকারি আয়-ব্যয় সম্পর্কে লোকসভার ক্ষমতা হল ব্যয়-হ্রাস বা না-মঞ্জুর করার অথবা কর হ্রাস বা বিলোপ করার ক্ষমতা, ব্যয় বৃদ্ধি বা কর বৃদ্ধির কোন ক্ষমতা এর নেই।

পার্লামেন্টের অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা বলতে প্রকৃতপক্ষে লোকসভার ক্ষমতাকে বোঝায়। রাজ্যসভায় অর্থবিল উত্থাপন করা যায় না। এই বিলের সংশোধনের প্রস্তাব রাজ্যসভা দিলেও তা গ্রহণ করার বা না করা লোকসভার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। সরকারি আয়-ব্যয় ব্যবস্থা ঠিকমতো পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা দেখবার জন্য লোকসভার দুটি কমিটি আছে—সরকারি গণিতক কমিটি (Committee on Public Accounts) ও আনুমানিক ব্যয় হিসাব কমিটি (Committee on Estimates)। মন্ত্রী বা এই কমিটি দুটির সদস্য হতে পারেন না। সংসদের নির্দেশ উপেক্ষিত হলে, অর্থের অপচয় হলে, বে-আইনি অর্থব্যয় হলে এই দুটি কমিটি সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে।

২৭.৪.৩ শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা

দুর্গাদাস বসু (D. D. Basu), এন. এন. মাল্লা (N. N. Mallya) প্রভৃতিদের অনুসরন করে বলা যায়, সরকার গঠন, সরকার নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। সরকার গঠন বা ক্যাবিনেট গঠনের ক্ষেত্রে পার্লামেন্টেরই ভূমিকা থাকে। পার্লামেন্টের জনপ্রিয় কক্ষ লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করেই কোন দলকে সরকার গঠন করতে হয়। মন্ত্রিপরিষদের সকল সদস্যকে পার্লামেন্টের উভয় সভার কোন একটির সদস্য হতে হয়। সংবিধান অনুসারে মন্ত্রিপরিষদ লোকসভার কাছে যৌথভাবে দায়িত্বশীল [৭৫(৩)] লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হলে অথবা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মন্ত্রিসভার পরাজয় ঘটলে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়।

পার্লামেন্টের আইন সংক্রান্ত কাজ ঐতিহাসিক দিক থেকে হ্রাস পেয়েছে, কারণ আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা মুখ্য। অন্যদিকে পার্লামেন্টের পর্যবেক্ষণ ও তদারকির ক্ষমতা বেড়েছে। এই ক্ষমতার অস্ত্রেই পার্লামেন্ট সরকারকে সংযত করে, দায়িত্বশীল রাখে। সংসদের সমালোচনা ও বিতর্কের মাধ্যমে পার্লামেন্ট সরকারকে সংযত করে। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, রাষ্ট্রপতির উদ্বোধনী ভাষণের উপর বিতর্ক, মূলতবী প্রস্তাব (Adjournment Motion), নিন্দাসূচক প্রস্তাব (Censure Motion), বাজেট আলোচনা, অনাস্থা প্রস্তাব (No-confidence Motion) ইত্যাদির সাহায্যে পার্লামেন্ট অভিযোগ জানানো ও সরকারকে সমালোচনা করার কাজ করে থাকে। রাষ্ট্রপতির ভাষণে সরকারি নীতি ও কর্মসূচির উল্লেখ থাকে। পার্লামেন্টে বিরোধীপক্ষ এই নীতি ও কর্মসূচির উপর আলোচনা ও সমালোচনার সুযোগ পায়। জরুরি কোন বিষয়ের উপর আলোচনার প্রয়োজনে মুলতবি প্রস্তাব ওঠে এবং এই বিষয়ে সরকার যথেষ্ট সতর্ক থাকে। ১৫ দিনের নোটিশ দিয়ে জনসাধারণের স্বার্থ সম্পর্কিত কোন বিষয় নিয়ে আলোচনার প্রস্তাব সংসদের সদস্যরা করতে পারেন। অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হবার পর ভোটাভুটিতে সরকারের পরাজয় ঘটলে সরকারকে পদত্যাগ করতে হয়। সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের আর একটি অস্ত্র হল সরকারি প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত কমিটি (Committee on Government Assurrence)। মন্ত্রীরা লোকসভায় যে প্রতিশ্রুতি দেন এই কমিটি তার

কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখে। শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রণের কাজে অর্পিত আইন সংক্রান্ত কমিটিও (Committee on Subordinate Legislation) বিশেষ ভূমিকা নেয়। এই কমিটি দেখে অর্পিত আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সরকার সঠিকভাবে ব্যবহার করছে কিনা। বেশ কিছুকাল ধরে মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের অনুসন্ধানের জন্য পার্লামেন্টে লোকপাল বিল এনে লোকপাল নিয়োগের প্রস্তাব করার চেষ্টা হচ্ছে। বিষয়টি অবশ্য এখনও পর্যন্ত কার্যকর হয়নি।

শাসনবিভাগের নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা প্রধানত লোকসভার ক্ষমতা। অনাস্থা প্রস্তাব লোকসভায় গৃহীত হলেই সরকারকে পদত্যাগ করতে হয়। তবে সরকারের সমালোচনা বা সরকারি কাজের সমীক্ষায় রাজ্যসভার ভূমিকা কম নয়। বিতর্ক সভা হিসাবে জনমত প্রতিফলনের ক্ষেত্রে রাজ্যসভার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। খবরাখবরের মাধ্যমে হিসাবে, সংশোধনী কক্ষ হিসাবে, লোকসভার সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাজ্যসভার বিশেষ ভূমিকা থাকে। অভিজ্ঞ মতামতের গুরুত্ব, রাজ্যের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব লোকসভার কর্মভারকে লাঘব করা ইত্যাদির কথা বিচার করেও অনেকে রাজ্যসভার গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেন।

২৭.৪.৪ সংসদের অন্যান্য ক্ষমতা

(i) আইন সংক্রান্ত এবং অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতার অতিরিক্ত পার্লামেন্টের একটি উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা হল সংবিধানগত ক্ষমতা (Constituent Power)। সংবিধান পার্লামেন্টকে রাজ্যের সীমানা নির্ধারণ ও পরিবর্তনের ক্ষমতা দিয়েছে। এই ক্ষমতাবলে পার্লামেন্ট রাজ্যের সীমানা নির্ধারণ করেছে, নতুন রাজ্য গঠন হয়েছে। (ii) সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রেও পার্লামেন্টের বিশেষ ভূমিকা আছে। রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে পার্লামেন্ট সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। পার্লামেন্টের উভয় সভার সদস্যরা রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে নির্বাচক মণ্ডলী হিসাবে কাজ করে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিধানসভার (Legislative Assemblies of State) সদস্যরাও অবশ্য পার্লামেন্টের সদস্যদের সঙ্গে ভোট দেন। (iii) পার্লামেন্টের আধা বিচারবিভাগীয় কাজও (Semi-Judicial Function) কিছু আছে। রাষ্ট্রপতিকে অপসারণের ক্ষেত্রেও পার্লামেন্টের ভূমিকা আছে। রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগের বিচার, হাইকোর্ট বা সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনা পার্লামেন্টের কাজ। অ্যাটর্নী জেনারেল (Attorney General), রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সদস্যদের (Members of the Public Service Commission) অপসারণের ক্ষেত্রেও পার্লামেন্টের বিশেষ ভূমিকা আছে। (iv) পার্লামেন্টের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল জনসাধারণ তথা নির্বাচক মণ্ডলীর স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করা।

আইনগতভাবে ভারতের পার্লামেন্ট গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। আইন প্রণয়ন, আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে পার্লামেন্ট অবশ্যই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী। তবে কার্যক্ষেত্রে পার্লামেন্টের ভূমিকা নিয়ে কিছু সন্দেহ বা সংশয় থেকেই যায়। অনেকে প্রশ্ন তোলেন দলীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি ও চাপের কাছে পার্লামেন্টীয় গণতন্ত্র একরকম অসহায়। পার্লামেন্ট নয়, পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃত্ব ও কার্যকলাপই সরকারি নীতি ও কার্যকলাপের প্রতিফলিত হয়। অনেকে এমন অভিযোগ করেন ক্যাবিনেট একনায়কত্বের চাপে পার্লামেন্টীয় নীতি ও পদ্ধতি মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। শক্তিশালী বিরোধী দলের অনুপস্থিতি, বিরোধী দলের গঠনমূলক ভূমিকার অভাব, আইন সভার সাধারণ সদস্যদের প্রতিনিধিত্বের অবমূল্যায়ন, দল বদলের রাজনীতি, অস্বাস্থ্যকর জোটের রাজনীতি ত্রিশঙ্কু সংসদ ও অনাবশ্যক মধ্যবর্তী নির্বাচন—নানা কারণেই সংসদীয় পন্থা ও পদ্ধতি সম্পর্কেও প্রশ্ন উঠেছে। পার্লামেন্টের আলোচনার মান, জনপ্রতিনিধিত্বের নীতির সুষ্ঠু ব্যবহার নিয়েও।

পার্লামেন্টকে প্রকৃত প্রতিনিধি সভা ও দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলতে সংসদীয় পন্থা ও পদ্ধতি সম্পর্কে সরকার ও বিরোধী দল উভয়কে শ্রদ্ধাশীল হতে হবে, আইন সভার গঠনমূলক ও দায়িত্বশীল ভূমিকা নিতে হবে।

২৭.৪.৫ সংসদের উভয়কক্ষের সাংবিধানিক সম্পর্ক

পার্লামেন্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলি প্রসঙ্গে একটি কৌতূহলপ্রদ, প্রশ্ন হল পার্লামেন্টের উভয় সভা অর্থাৎ রাজ্যসভা ও লোকসভার সম্পর্ক। গঠনের দিক থেকে বিচার করলে বলা যায় লোকসভা রাজ্যসভার তুলনায় জনপ্রিয় ও গণতান্ত্রিক কক্ষ। লোকসভার সদস্যরা জনসাধারণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত, অন্যদিকে রাজ্যসভার সদস্যরা রাজ্য বিধানসভার সদস্য দ্বারা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভোটে নির্বাচিত অর্থাৎ রাজ্যসভার গঠনে জনসাধারণের কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেই।

সাধারণ সুযোগ-সুবিধা ও ক্ষমতার দিক থেকে রাজ্যসভা ও লোকসভার মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। সদস্যদের সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার উভয় সভার ক্ষেত্রেই সমান। বয়স ছাড়া লোকসভার বা রাজ্যসভার সদস্যদের যোগ্যতা বা অযোগ্যতার প্রশ্নে বা অন্যান্য বিষয়ে তারতম্য নেই। উভয় সভার কর্মদপ্তর, কর্মচারী আছে, মন্ত্রিসভার সদস্যদের পার্লামেন্টের যে কোনো কক্ষের সদস্য হতে হয়। রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচনে উভয় সভার সদস্যরা নির্বাচক মণ্ডলীর সদস্য হিসাবে কাজ করেন। সাধারণ বিল পার্লামেন্টের যে কোনো কক্ষে উপস্থাপিত করা যায়। সংবিধান সংশোধন রাষ্ট্রপতির জরুরি অবস্থার ঘোষণা উভয় সভার দ্বারা অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন।

কতকগুলি ক্ষেত্রে লোকসভার অগ্রাধিকার লক্ষণীয় : (১) সংবিধান মন্ত্রিসভাকে লোকসভার কাছে দায়িত্বশীল করেছে। লোকসভার অনাস্থা প্রস্তাবের ভোটাভুটিতে পরাজয় ঘটলে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। (২) সরকারি আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে লোকসভার ভূমিকা বেশি। অর্থবিল রাজ্যসভায় উত্থাপন করা যায় না। (৩) লোকসভায় আলাপ-আলোচনা ও বিতর্ক জনমনে অধিক প্রভাব ফেলে।

তবে রাজ্যসভার অভিজ্ঞ মতামত ও গুরুত্ব মূল্যহীন নয়। লোকসভার কর্মভার লাঘব করা, রাজ্যগুলির স্বার্থে প্রতিনিধিত্ব প্রয়োজনে লোকসভায় প্রণীত বিলের সংশোধন ইত্যাদির ক্ষেত্রে রাজ্যসভার গুরুত্ব আছে। দুটি ক্ষেত্রে রাজ্যসভা বিশেষ গুরুত্ব পায়—(১) রাজ্যসভা যদি দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে প্রস্তাব নেয় রাজ্য তালিকাভুক্ত কোন বিষয়ে পার্লামেন্টে আইন পাশ করা উচিত তাহলে ঐ বিষয়ে পার্লামেন্ট আইন পাশ করতে পারে। (২) সর্বভারতীয় কৃত্যক (All India Service) সৃষ্টির ব্যাপারে রাজ্যসভার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

পরবর্তী আলোচনা থেকে লোকসভার পরিচালক স্পিকার এবং রাজ্যসভায় সভাপতির ক্ষমতা ও পদমর্যাদা সম্পর্কে আপনাদের পরিচয় হবে।

২৭.৫ লোকসভার স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, রাজ্যসভার সভাপতি

স্পিকার হলেন লোকসভার সভাপতি (Presiding Officer of Lok Sabha), ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের একটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ পদ হল লোকসভার অধ্যক্ষের পদ। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর কথায়, লোকসভার অধ্যক্ষ হলেন সবার মর্যাদার রক্ষক, ভারতের জনগণের সার্বভৌমিকতাকেও সুরক্ষিত করেন তিনি। লোকসভার অধ্যক্ষ সমস্ত জাতির স্বাধীনতার প্রতীক। ("The Speaker is the custodian of the dignity of the House, as also of

the sovereignty of the Indian people. He is the symbol of nation's liberty and freedom" —Pandit Neharu)। সন্দেহ নেই অধ্যক্ষের পদ বা কার্যালয় একই সঙ্গে ক্ষমতা, মর্যাদা ও দায়িত্বের এক অভিনব ক্ষেত্র হিসাবে চিহ্নিত।

লোকসভার নির্বাচনের পর লোকসভার প্রথম অধিবেশনে সভার সদস্যরা নিজেদের মধ্য থেকে লোকসভার কাজকর্ম পরিচালনার জন্য একজন স্পিকার নির্বাচন করেন। (সংবিধানের ৯৩ ধারা)। লোকসভার কার্যকালের মতো স্পিকারেরও কার্যকাল ৫ বছর। কার্যকাল শেষ হবার আগে তিনি পদত্যাগ করতে পারেন। আবার লোকসভার সদস্যরা স্পিকারকে পদচ্যুত করতে পারেন। স্পিকারকে পদচ্যুত করার জন্য ১৪ দিনের নোটিশ দিতে হয় এবং লোকসভার অধিকাংশের দ্বারা প্রস্তাব গৃহীত হতে হয় (৯৪ ধারা)। নির্দিষ্ট সময়কালের আগে পদত্যাগ করতে চাইলে স্পিকার ডেপুটি স্পিকারের কাছে পদত্যাগ পত্র জমা দেবেন। স্পিকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আলোচনা হবার সময় স্পিকার সাময়িকভাবে সভা পরিচালনার কাছ থেকে অব্যাহতি নেন। এই সময় ডেপুটি স্পিকার লোকসভার কাজকর্ম পরিচালনা করেন।

> ***প্রান্তলিপি ঃ*** *মাভালাংকার (Mavalanker), হুকুম সিং (Hukum Singh) , সঞ্জীব রেড্ডী (Sanjeeva Reddy), বলরাম জাখর (Balaram Jakhar), শিবরাজ পাতিল (Sivraj Patil) প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি স্পিকারের পদ অলংকৃত করেছেন।*

স্পিকারের বেতন, ভাতা ভারতের সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য হয়। তাঁর আর্থিক সুযোগ সুবিধার বিষয়টি পার্লামেন্টের অনুমোদন সাপেক্ষ নয়।

২৭.৫.১ স্পিকারের নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতা

ব্রিটেনে স্পিকার নির্বাচিত হবার পর দল ও মতের ঊর্ধ্বে থেকেই কাজ করেন। সাধারণত সৎ, অভিজ্ঞ, নিষ্ঠাবান, জনপ্রিয়, কোন ব্যক্তিকেই ব্রিটেনে স্পিকার হিসাবে নির্বাচন করা হয়। স্পিকারের নির্বাচনে কমন্স সভার সদস্যদের মধ্যে ঐকমত্য থাকে। বর্তমান স্পিকার যদি পরবর্তীকালে তাঁর পদে অধিষ্ঠিত তবে তাঁকে সে সুযোগ দেওয়া হয়। পরবর্তী নির্বাচনে স্পিকারের বিরুদ্ধে কোন দল প্রার্থী দেয় না। ভারতে অবশ্য স্পিকারের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ ঐতিহ্য বা রীতি সবক্ষেত্রে মানা হয় না। ভারতে স্পিকারের পদ নিয়ে সভায় যে সবক্ষেত্রে ঐকমত্য হয় বা হয়েছে এমন নয়। পূর্ববর্তী স্পিকারের ইচ্ছা থাকলেও তিনি যে আবার ঐ পদে বসতে পারবেন এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। সাধারণভাবে স্পিকারের নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সাংবিধানিক ব্যবস্থা যা আছে তা হল ঃ

(১) তাঁর বেতন ও ভাতা সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য।

(২) একটি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে, প্রস্তাব এনেই স্পিকারকে পদচ্যুত করা চলে।

(৩) লোকসভার শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া বা লোকসভার কার্যপরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলা ছাড়া স্পিকার কক্ষের তর্কবিতর্কে অংশ নেন না।

(৪) তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার সময় স্পিকার সভায় সভাপতিত্ব করেন না তবে এই সময় প্রয়োজন হলে তিনি নিজের সমর্থনে কথা বলতে পারেন।

(৫) ভোটাভুটির সময় পক্ষে ও বিপক্ষে সমানসংখ্যক ভোট পড়লে স্পিকার অবশ্য নির্ণায়ক ভোট দিতে পারেন, অন্য সময়ে ভোটদানের অধিকার তার নেই।

সাংবিধানিক ব্যবস্থা থাকলেও রাজনীতির ঊর্ধ্বে গিয়ে নিরপেক্ষভাবে স্পিকার সবক্ষেত্রে সফলভাবে তাঁর কাজ পরিচালনা করতে পেরেছেন এ কথা বলা যাবে না। লোকসংখ্যা মুখপাত্র হিসাবে ভারতে সংসদীয় ব্যবস্থার ভাবমূর্তি

গড়ে তুলতে বা সংসদীয় গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী হিসাবে নিরপেক্ষভাবে স্পিকার তাঁর দায়িত্ব পালন করতে পেরেছেন এ কথা বলা যাবে না। দলীয় পক্ষপাতিত্ব, সিদ্ধান্ত গ্রহণে দ্বিধা, সঠিক নেতৃত্বের অভাব—ভারতে লোকসভার স্পিকারের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ বিরোধীরা প্রায়ই করেছেন। স্পিকারের পদের সম্মান রক্ষার্থে লোকসভার সদস্যরাও সচেতন ও দায়িত্বশীলভাবে কাজ করেছেন কিনা এ প্রশ্নও ওঠে। স্পিকারকে নির্ভীক, নিরপেক্ষ, স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেয়ো লোকসভার সদস্যদের গুরু দায়িত্ব।

২৭.৫.২ স্পিকারের কার্যাবলী

ভারতে লোকসভার স্পিকারের ক্ষমতা ও কর্তব্য ব্যাপক।

(১) লোকসভার আলোচনা ও বিতর্ক নিয়ন্ত্রণ করা এবং সভার শৃঙ্খলা বজায় রাখা স্পিকারের প্রথম ও প্রধান কাজ। লোকসভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্পিকার। সভাপতি হিসাবে তাঁর কাজ সভার নিয়মকানুন ব্যাখ্যা করা, লোকসভার আলোচনার বিষয়সূচি নির্ধারণ, লোকসভার বিতর্ক পরিচালনা করা, বিতর্কের সময় নির্বাচন করা, লোকসভার অধিবেশন মূলতুবি রাখা ইত্যাদি। ব্যক্তিগত সদস্যের বিল ও প্রস্তাব পেশের সময় স্থির, সভার ভোটদান ও ফলাফল পরিচালনা ও জ্ঞাপন তাঁর কাজ।

(২) লোকসভার মুখপাত্র (Spokesman) হিসাবে সভার সদস্যদের, বিশেষত সংখ্যালঘু মতামত প্রদানের স্বাধীনতা যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় তা দেখা স্পিকারের কর্তব্য। কক্ষের নেতার (Leader of the House) সঙ্গে পরামর্শ করে লোকসভার কার্যক্রম স্থির করা, রাষ্ট্রপতির উদ্বোধনী বক্তৃতার বিষয়বস্তু আলোচনার জন্য সময় ধার্য করা, স্পিকারের কাজ। স্পিকার সবার মুখপাত্র হিসাবে রাষ্ট্রপতি ও লোকসভার মাধ্যম হিসাবে কাজ করেন—রাষ্ট্রপতির বক্তব্য সভায় জানানো বা সভার প্রস্তাব রাষ্ট্রপতিকে প্রেরণ করা। সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে মধ্যস্থতার (mediation) দায়িত্বও তিনি পালন করেন। বিভিন্ন কমিটির সভাপতি নিয়োগ, বিভিন্ন কমিটির গঠন ও পদ্ধতির সাধারণ তত্ত্বাবধান স্পিকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। স্পিকার নিজেও কোন কোন কমিটির সভাপতি হিসাবে কাজ করেন।

(৩) বৈধতার প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা করা স্পিকারেরই দায়িত্ব। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, প্রস্তাব, বিল উত্থাপন, অন্যান্য নানা প্রশ্নের গ্রহণযোগ্যতার বিচার এবং বৈধতার প্রশ্ন উঠলে তিনিই তার মীমাংসা করেন।

(৪) কোন বিল অর্থবিল কিনা সে সম্পর্কে প্রশ্ন উঠলে স্পিকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলে বিবেচিত হয়। অর্থবিষয়ক কার্যপদ্ধতি সঠিকভাবে সম্পন্ন হবার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পন্থা তাঁকেই অবলম্বন করতে হয়।

(৫) স্পিকারের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল ঃ

ক. উভয় সভার যুগ্ম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করা।

খ. প্রয়োজনে নির্ণায়ক ভোট (Casting Vote) প্রদান এবং মতানৈক্যের ক্ষেত্রে রায় দান (Ruling)।

গ. লোকসভার বিরুদ্ধে অবমাননাকর উক্তি বা মন্তব্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ।

ঘ. লোকসভার সচিবালয় কর্মীদের কাজকর্ম তদারকী ও নিয়ন্ত্রণ।

ঙ. পর্যটক, সংবাদমাধ্যম ইত্যাদি বা স্পিকার নির্দেশিত নিয়ম মেনেই সভার আসার ও সভার কাজকর্ম পরিদর্শনের সুযোগ পাবেন।

স্পিকারের পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি একাধারে লোকসভার বিবেক, বিধানকর্তা, সংযোগ রক্ষার মাধ্যম এবং প্রশাসক। তিনি পুলিশের মতো নিয়ন্ত্রণ করেন না, তিনি হলেন লোকসভার নেতা, পরামর্শদাতা। তাঁর কর্মকুশলতা ও যোগ্যতার উপরই নির্ভর করে লোকসভার মান ও মর্যাদা। নিরপেক্ষভাবে কাম্য রীতি মেনে তিনি যাতে কাজ করতে পারেন, দলীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে, প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে তিনি যাতে চলতে পারেন সেদিকে সতর্ক থেকেই স্পিকারকে কাজ করতে হবে। স্পিকারের গুণগত মান এবং সংসদীয় কাজকর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে কী দৃষ্টান্ত তাঁরা স্থাপন করছেন এ নিয়ে রাজনৈতিক মহলে নানা বিতর্ক চলছে। মভলংকর বা অনন্তস্বামী আয়েঙ্গার স্পিকার হিসাবে অতীতে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, পরবর্তীকালে স্পিকারদের মধ্যে সেই নির্ভীক ও নিরপেক্ষতার দৃষ্টান্ত তেমনভাবে পাওয়া যায় নি বলেই পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন। স্পিকারের রুলিং এ দেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে তেমন উল্লেখযোগ্য নজির হয়ে উঠতে পারে নি।

২৭.৫.৩ ডেপুটি স্পিকার (Deputy Speaker)

স্পিকারের অনুপস্থিতিতে তাঁর দায়িত্ব পরিচালনা করেন ডেপুটি স্পিকার। লোকসভার সদস্যরাই তাঁকে নির্বাচিত করেন। স্পিকারের জন্য নির্দিষ্ট কাজগুলিই তিনি তাঁর অবর্তমানে করে থাকেন। ডেপুটি স্পিকারের পদচ্যুতির ক্ষেত্রেই স্পিকারের মতো একই সাংবিধানিক ব্যবস্থা কার্যকর।

২৭.৫.৪ রাজ্যসভার সভাপতি ও সহ-সভাপতি (Chairman and Deputy Chairman of the Council of States)

লোকসভার স্পিকারের মতো রাজ্যসভার কার্যপরিচালনা, সভার শৃঙ্খলা রক্ষা, সদস্যদের অধিকার রক্ষা, রাজ্যসভার মর্যাদা রক্ষা, রাজ্যসভার বিভিন্ন কমিটির সভাপতি নিয়োগ, রাজ্যসভার দপ্তরের তদারকী ইত্যাদি কাজ রাজ্যসভার সভাপতি করে থাকেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে এই কাজ করে সহ-সভাপতি। উপরাষ্ট্রপতি (Vice President) পদাধিকার বলে রাজ্যসভায় সভাপতি, সহ-সভাপতির নির্বাচন ও পদচ্যুতির ক্ষেত্রে রাজ্যসভার সদস্যদের সংখ্যা গরিষ্ঠের অভিমত প্রয়োজন।

পার্লামেন্ট সম্পর্কিত পরবর্তী তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা হল সংসদ ও সংসদ সদস্যদের অধিকার সম্পর্কিত সাংবিধানিক ব্যবস্থা।

২৭.৫.৫ সংসদের সদস্যদের অধিকার ও অব্যাহতি

ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রচলিত রীতি মেনে জনপ্রতিনিধিদের কিছু অধিকার ও সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে। সংসদে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য যাতে তাঁরা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারেন সংবিধানে সেই উদ্দেশ্যেই সাংসদদের এই অইধকার ও সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের ১০৫ ধারায় ১ ও ২ উপধারায় সংসদের সদস্যদের দুটি অধিকারের কথা বলা হয়েছে—(ক) সংসদের অভ্যন্তরে সদস্যদের বাক স্বাধীনতার অধিকার (Freedom of speech) এবং (খ) কাগজপত্র প্রদানের অধিকার (Right of publication)। অন্যান্য ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধার কথা যা বলা হয়েছে, সংবিধানের ৪৪ তম সংশোধনের (১৯৭৮) পূর্বে তার অবস্থান ছিল ঃ পার্লামেন্ট এক্ষেত্রে কোন আইন স্থির না করা পর্যন্ত কমন্সসভার সদস্যরা যে অধিকার ভোগ করেন ভারতের পার্লামেন্টের সদস্যরাও সেই অধিকার ভোগ করবেন।৪৪ তম সংশোধনে কমন্সসভার উল্লেখ প্রত্যাহার করে বলা হয়েছে, সংসদের আইন দ্বারা সংসদের উভয় কক্ষের সদস্যদের সুযোগ সুবিধা স্থির হবে।

বর্তমানে ভারতের পার্লামেন্ট বা সংসদের সদস্যরা অন্যান্য যে সুযোগ সুবিধা ভোগ করে থাকেন সেগুলি দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত—ক. ব্যক্তিগতভাবে সদস্যদের অধিকারগুলি হল ঃ

(১) সংসদের অধিবেশন চলাকালীন কোন ব্যক্তিকে দেওয়ানি দায়ে আটক করা চলবে না। অধিবেশন শুরু হবার ৪০ দিন আগে এবং অধিবেশন শেষ হবার ৪০ দিন পর পর্যন্ত এই অব্যাহতি পাওয়া যাবে। এই অব্যাহতি ফৌজদারি অভিযোগ অথবা নিবর্তনমূলক আটকের বেলায় প্রযোজ্য নয়।

(২) সংসদের অধিবেশন চলাকালীন জুরির কাজ থেকে এবং সাক্ষ্য দেবার জন্য আদালত হাজির থাকা থেকে সদস্য সংসদের অনুমতি সাপেক্ষে অব্যাহতি পেতে পারেন।

(৩) বাক্‌স্বাধীনতার অধিকার—সংসদের বা কমিটিতে কিছু বলার বা ভোট দেবার অধিকার।

যৌথভাবে সংসদ যে সব সুবিধা ভোগ করেন সেগুলি হল ঃ (১) প্রকাশনার অধিকার—বিতর্ক, কার্যবিবরণী প্রকাশ এবং অন্যান্যদের এই অধিকার থেকে বিরত করা।(২) সদস্য নয় এমন ব্যক্তিদের সংসদের কক্ষে উপস্থিতি নিষিদ্ধ করার অধিকার।(৩) আভ্যন্তরীণ কার্যপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার।(৪) পার্লামেন্টীয় অসদাচরণ প্রকাশের অধিকার এবং (৫) সংসদের অবমাননা বা অধিকার ভঙ্গের জন্য যে কোনো ব্যক্তিকে শাস্তি দানের অধিকার।

সংসদের অধিকার ভঙ্গ বা অবমাননার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তিরস্কার ও সতর্ক করা (admonition), কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করা (reprimand) বা চূড়ান্ত শাস্তি হিসাবে কারাগারে প্রেরণ করা যেতে পারে।১৯৬১ সালে ব্লিৎস পত্রিকায় (Blitz) লোকসভার সদস্য আচার্য কৃপালনীর বক্তৃতার তীব্র সমালোচনার জন্য সংশ্লিষ্ট সদস্যকে অবমাননা করা হয়েছে এই অভিযোগে উক্ত পত্রিকার সম্পাদককে লোকসভায় ডেকে তীব্র ভাষায় তিরস্কার করা হয়েছিল। ১৯৭৮ সালে লোকসভার অধিকার সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশে প্রয়াতা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে সংসদের অধিকার ভঙ্গ ও অবমাননার অভিযোগে কারাগারে পাঠানো হয়।১৯৯০ সালে রাজ্যসভা পূর্বতন মন্ত্রী কে. কে. তেওয়ারীর (K. K. Tewari) বিরুদ্ধে অধিকার ভঙ্গের অভিযোগে তাঁকে কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করে।

সংসদের বা সংসদ সদস্যদের অধিকার বা অব্যাহতি অবশ্যই যুক্তিযুক্ত, কিন্তু এই অর্থ এই নয়, আইন সভার অধিকার অনিয়ন্ত্রিত। সুপ্রীমকোর্ট এই অধিকারের পরিধি ও বিষয়বস্তু স্থির করার ক্ষমতা যে আদালতের আছে সে বিষয়ের স্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করে। অবমাননার জন্য শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা আইনসভাকে সতর্কতা ও বিবেচনার সঙ্গে প্রয়োগ করতে হবে। সংসদ বা আইনসভার অধিকার সম্পর্কে আরো একটি প্রশ্ন হল মৌলিক অধিকারগুলির সঙ্গে এইসব অধিকারের অসঙ্গতি দেখা দিলে বিষয়টির মীমাংসা কিভাবে হবে। শর্মা বনাম শ্রীকৃষ্ণ (Sharma V. Sri Krishna, 1959) মামলায় সুপ্রিমকোর্ট রায় দিয়েছিল আইনসভার সুযোগ সুবিধা বা অধিকার মৌলিক অধিকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে না। পরবর্তীকালে সুপ্রিমকোর্ট এই অভিমত দিয়েছে ১৯ অনুচ্ছেদের বাক্‌স্বাধীনতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হলেও আইন সভার সুযোগ সুবিধা ও অধিকার সংবিধানের ২০ ধারা (অপরাধী সাব্যস্ত সম্পর্কে সংরক্ষণ), ২১ ধারা (জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা সংরক্ষণ), ২২ ধারা (গ্রেপ্তার ও অধিকার) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।

> ***প্রান্তলিপি ঃ*** *সংসদের কক্ষদ্বয় বা তাদের সদস্য বা কর্মচারীদের কাজে বাধাবিঘ্নের সৃষ্টি হতে পারে অথবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংসদের কাজে বাধাবিঘ্নের সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে পারে এমন কোন কাজ করা বা না করাকেই সংসদের অবমাননা বলা যেতে পারে। (May : Parliamentary Practice)।*

ভারতের পার্লামেন্ট বা সংসদ সম্পর্কিত আলোচনার পরবর্তী অংশে সংসদে বিরোধী দলের অবস্থান বা ভূমিকা কী সে বিষয়ে আলোকপাত করা হবে।

২৭.৬ সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকা

পার্লামেন্ট সম্পর্কে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল বিরোধী দলের ভূমিকা। ভারতের মতো গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সঙ্গে সংখ্যালঘিষ্ঠ দল কী ভূমিকা পালন করে তা তাদের স্থান কী এটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় আলোচনা বলে পরিগণিত হয়। সাধারণভাবে বিরোধী দল সম্পর্কে একটি নেতিবাচক ধারণা প্রকাশ করে বলা হয় বিরোধী দল কোন প্রস্তাব করে না, কেবলমাত্র সরকারের বিরোধিতা করা ও সরকারকে ক্ষমতা থেকে অপসারিত করার কাজেই এর ব্যস্ততা লক্ষ করা যায়। কার্যক্ষেত্রে বিরোধী দলের ভূমিকা কিন্তু মোটেই নেতিবাচক নয়। আইনসভায় সরকার যাতে দায়িত্বশীলভাবে কাজ করতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই সরকারের সমালোচনা এবং গঠনমূলক বিরোধিতার মাধ্যমে সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করে বিরোধী দল। সংসদীয় শাসনে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে পারস্পরিকতা ও বোঝাপড়া থাকা অত্যন্ত জরুরি। বিরোধী দল শুধুমাত্র সমালোচনাই করে না, প্রয়োজনে সরকারকে দায়িত্বশীল পরামর্শ ও সাহায্য দেয়। সরকারের পরাজয় ঘটলে বিরোধী দলকে বিকল্প সরকার গড়ার জন্যও প্রস্তুত থাকতে হয়।

ব্রিটেনের মতো দ্বিদলীয় ব্যবস্থার বৃত্তে নয়, ভারতে বিরোধী দলের প্রকৃতি ও অবস্থানকে বুঝতে হবে এদেশের বহুদলীয় ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে। বিগত কয়েক দশকে ভারতের পার্লামেন্টে বিরোধী দলের অবস্থান লক্ষ্য করে এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সাধারণভাবে কিছু ধারণা লাভ করা যায় ঃ

(১) বিগত পঞ্চাশ বছরে বিরোধী দলের অবস্থান বদল হয়েছে। চতুর্থ লোকসভার নির্বাচন পর্যন্ত শাসক দল হিসাবে কেন্দ্রে জাতীয় কংগ্রেসের একাধিপত্য ছিল। এই পর্বে বিরোধী দল বলতে ছিল প্রধানত জনসংঘ, স্বতন্ত্র দল ও কমিউনিস্ট দল। সংসদে আসন সংখ্যার বিচারে এই দলগুলির তেমন গুরুত্ব ছিল না। নীতি বা কর্মসূচির প্রশ্নেও অধিকাংশ বিরোধীদল তেমন কোন স্পষ্ট অবস্থান নিতে পারেনি। সাধারণভাবে দক্ষিণপন্থী দলগুলি প্রচলিত সামাজিক সম্পর্কের মৌল পরিবর্তন চায়নি। অন্যদিকে কমিউনিস্ট দলের মতো বামপন্থী দলগুলি সমাজের আমূল সংস্কারের কথা বলেছে। ১৯৬৭ সালের পর এবং বিশেষত, ১৯৭৭ সালের পর সংসদে কংগ্রেসের একাধিপত্য কমে এবং সরকার গড়ার ক্ষেত্রে সাফল্য না পেলেও বিরোধী দল সংসদীয় রাজনীতিতে গুরুত্ব পেতে থাকে। ১৯৬৭ সালে কংগ্রেস দলে ভাঙনের সূত্রে কংগ্রেস (সংগঠনপন্থী), লোকদল, জনতা দল ইত্যাদি দল রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ করে। ইতিমধ্যে অবশ্য ডি. এম. কে, আকালীদল এবং রাজ্যভিত্তিক কিছু আঞ্চলিক দল গড়ে ওঠে। তবে এই সময় পর্যন্তও কংগ্রেসের বিকল্প হিসাবে একটি ঐক্যবদ্ধ, শক্তিশালী বিরোধী দল গড়ে ওঠে নি। ১৯৭৭ সালে জনসংঘ, সোস্যালিষ্ট দল, বি. এল. ডি ইত্যাদি বা মিলিতভাবে জনতা দলের নেতৃত্বে সরকার গঠন করে এবং এই পর্বে কংগ্রেস বিরোধী দলের ভূমিকা নেয়। ১৯৮৯ সালের পরবর্তীকালে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সূত্রে সংসদে ক্রমশ জনতা দল, ভারতীয় জনতা দল, এ. আই. ডি. এম. কে, তেলেগু দেশম, কাশ্মীরের জাতীয় সম্মেলন (National Conference) পাঞ্জাবের আকালীদল এবং কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)—এই দলগুলি প্রাধান্য লাভ করে। এই পর্বে সংহত না হলেও সংসদে বিরোধী দল শক্তিশালী ছিল। দশম, একাদশ ও দ্বাদশ লোকসভায় এবং অবশ্যই ত্রয়োদশ লোকসভায় বিরোধী দল মিলিতভাবে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেছে।

(২) বিরোধী দলের অন্য একটি বৈশিষ্ট্য হল অধিকাংশ বিরোধী দল সর্বভারতীয় রাজনীতিতে স্থান করে নিলেও আঞ্চলিক ভিত্তিতেই ওরা শক্তিশালী। জাতীয় রাজনীতিতে জোট বেঁধে বা বিশেষ কর্মসূচিভিত্তিক রাজনীতিকে সামনে রেখে এরা নিজেদের শক্তি প্রতিপন্ন করেছে।

(৩) দলত্যাগ, দুর্নীতি, নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব, সুবিধাবাদ, শৃঙ্খলার অভাব ভারতে প্রায় অধিকাংশ দলের মধ্যেই প্রকট—সংহত বিরোধী দলের অভাব ভারতীয় রাজনীতির প্রধান ত্রুটি এবং এই ত্রুটির পেছনে প্রধান শক্তি হিসাবে কাজ করেছে দলব্যবস্থার উপরক্ত ব্যাধিগুলি।

(৪) সংসদে আইন প্রণয়ন কার্যে, অর্থবিষয়ক প্রশ্নে, জন প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে বা সামগ্রিকভাবে পার্লামেন্টীয় গণতন্ত্রের প্রসারে কাগজে, কলমে বিরোধী দলগুলি সংগঠিত ভূমিকা পালনের প্রতিশ্রুতি দিলেও কার্যক্ষেত্রে বিরোধী দল গঠনমূলক ভূমিকা পালন করতে পারে নি। পার্লামেন্টে বিতর্কের মান বৃদ্ধিতে, পার্লামেন্টীয় কমিটিতে কার্যকরী ভূমিকা পালনে বিরোধী দলের সাফল্য তেমন তাৎপর্যপূর্ণ নয়। পার্লামেন্টীয় প্রথা, পদ্ধতি বা রীতি এবং পার্লামেন্টীয় শৃঙ্কলার প্রতি আনুগত্য প্রকাশের ক্ষেত্রেও বিরোধী দলের অবস্থান তেমন উল্লেখযোগ্য বলা চলে না।

এই এককেকর পরবর্তী অংশে সংসদের আইন প্রণয়ন ও অর্থসংক্রান্ত কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষার্থী পাঠকেরা ধারণা পাবেন।

২৭.৭ সংসদে আইন প্রণয়ন পদ্ধতি

পার্লামেন্টের বিভিন্ন কাজের মধ্যে আইন প্রণয়ন অন্যতম প্রধান কাজ বলে বিবেচিত হয়। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আনি বিষয়ক পদ্ধতি মেনেই পার্লামেন্টকে দায়িত্ব পালন করতে হয়। আইন বিষয়ক পদ্ধতি বলতে বোঝায় বিভিন্ন বিলের শ্রেণি বিভাগ, বিল পাশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কক্ষের নির্ধারিত দায়িত্ব, অসিদ্ধ বিল সম্পগের্ক সংবিধানের বিধান, সাধারণ বিল পাশের নিয়ম ও বিভিন্ন পর্যায়। আইন প্রণয়ন পদ্ধতির অন্যান্য দুটি ক্ষেত্র হল অর্থবিল সম্পর্কিত ব্যবস্থা এবং পার্লামেন্টের অর্থ বিষয়ক কার্যপদ্ধতি। পার্লামেন্টীয় কমিটি আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুতরাং কমিটি সম্পগের্ক পার্লামেন্টের ব্যবস্থা ও নিয়মাবলিও আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রক্রিয়ার অঙ্গ।

২৭.৭.১ বিল ও বিলের শ্রেণি বিভাগ ও বিল পাশের সাধারণ নিয়মাবলি

আইনের খসড়াকে বিল (Draft) বলে। বিল সাধারণত দু'ধরনের—জনস্বার্থ সম্বন্ধীয় বিল (Public Bill) এবং ব্যক্তিগত বা বিশেষ স্বার্থ সম্পর্কিত বিল (Private Bill)। জনস্বার্থ সম্বন্ধীয় বিল আবার দুধরনের—সরকারি বিল (Government Bill) এবং বেসরকারি বিল (Private Member's Bill)। যে সব বিল মন্ত্রীরা উত্থাপন করেন তাকে বলে সরকারি বিল। মন্ত্রীরা বাাদে পার্লামেন্টের সদস্যরা ব্যক্তিগতভাবে যে বিল উত্থাপন করেন তাকে বলে বেসরকারি বা ব্যক্তিগত সদস্যের বিল। সরকারি বিল পেশ করার জন্য অনুমতির প্রয়োজন হয় না। সরকারী গেজেটেই (Gazette) এই বিল প্রকাশিত হয়। বেসরকারি বিল পেশের জন্য অনুমতি প্রয়োজন। অনুমতি পাওয়া গেলে এই বিল গেজেটে প্রকাশিত হয়। সরকারি বিলকে আবার সাধারণ বিল (Ordinary Bill) এবং অর্থবিল (Money Bill) এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

বিল পাশের ক্ষেত্রে সাধারণ যে নিয়মাবলি অনুসরণ করা হয় তা হল ঃ (১) অর্থবিল এবং অন্যান্য অর্থ সম্বন্ধীয় বিল (Other Financial Bills) ছাড়া অন্যান্য বিল সংসদের দুই কক্ষের যে কোনো কক্ষে উপস্থিত করা যায় (সংবিধানের ১০৭ ধারা)।(২) কোন বিল বিনা সংশোধনে বা সংশোধিত আকারে দুই কক্ষ দ্বারা গৃহীত না হলে বিলটি পাশ হয়েছে বলা যাবে না।(৩) উভয় কক্ষের অনুমোদন পাওয়ার পর রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাওয়া গেলে বিলটি আইনে পরিণত হয়।(৪) এক কক্ষ কর্তৃক গৃহীত হবার পর বিল অপর কক্ষে যায়। অপর কক্ষ বিলটিকে প্রত্যাখ্যান করলে বা বিলটি সম্পর্কে দুই কক্ষের মতবিরোধ ঘটলে বা যদি বিল পাঠাবার ৬ মাসের মধ্যে অন্য কক্ষ বিলটি পাশ না করে তবে রাষ্ট্রপতি উভয় কক্ষের যুগ্ম অধিবেশন আহ্বান করে বিজ্ঞপ্তি দেবেন। উভয় কক্ষের যুগ্ম অধিবেশনে বিলটি সম্পর্কে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়।

সংবিধান বিল অসিদ্ধ (Lapsing of Bills) হওয়া সম্পর্কেও নির্দেশ দিয়েছে—(১) পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের অনুমোদন না পাওয়া পর্যন্ত বিল সিদ্ধ হবে না।(২) কোন বিল পার্লামেন্টে মুলতবি থাকলে পার্লামেন্টের অধিবেশন বন্ধ হয়ে যাবার কারণে বিলটি অসিদ্ধ হবে না।(৩) রাজ্যসভায় মুলতবি কোন বিল লোকসভা ভেঙে দেবার কারণে অসিদ্ধ হয়ে যাবে না, (৪) লোকসভার মুলতবি কোন বিল বা লোকসভায় পাশ হয়েছে এমন বিল লোকসভা ভেঙে যাবার কারণে অসিদ্ধ বলে গণ্য হবে।(৫) উভয় সভায় পাশ হয়ে যাওয়া কোন বিল রাষ্ট্রপতির বিবেচনাধীন থাকলে লোকসভা ভেঙে যাবার দরুন ঐ বিল অসিদ্ধ হবে না।

২৭.৭.২ সরকারি বিল পাশের পদ্ধতি

বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়েই পার্লামেন্টে সরকারি বিল পাশ হয়।

১. **আইনের প্রস্তাব ও খসড়া রচনা ঃ** সরকারি বিল পাশের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয় ক্যাবিনেট। নানা বিচার বিবেচনার পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিদপ্তর নির্দিষ্ট বিষয়ে আইন পাশের প্রস্তাব করে। এক্ষেত্রে আইনটি যদি অন্য কোন দপ্তরের স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত থাকে তবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিদপ্তরকে অন্য দপ্তরের সঙ্গেও এ ব্যাপারে পরামর্শ করতে হয়। আইন দপ্তর (Law Ministry) বা আইন ও বিচার দপ্তর (Ministry of Law and Justice) বিলটি সম্পর্কে আইনগত ও সংবিধানগত পরামর্শ দিয়ে থাকে। ক্যাবিনেট প্রস্তাবটিকে অনুমোদন করলে আইন দপ্তর সংশ্লিষ্ট আইনের খসড়া রচনা করে। এর পর বিলটি ছাপানো হয় ও পার্লামেন্টে উত্থাপনের ব্যবস্থা হয়।

২. **বিল উত্থাপন ও প্রথম পাঠ (Introduction and First Reading) ঃ** আইন সভার যে কোনো কক্ষে বিল উত্থাপন করা যায়। বিল উত্থাপনের জন্য মন্ত্রীকে অনুমতি নিতে হয়। অনুমতি পেলে বিল উত্থাপন করা হয় ও জনসাধারণের অবগতির জন্য বিলটি সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হয়। অবশ্য স্পিকারের অনুমতি থাকলেও বিল সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হয়। এই পর্যায়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিলের শিরোনাম (Title) পাঠ করা হয়। বিলের ভারপ্রাপ্ত সদস্য বিলের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারেন কিন্তু বিলটি সম্পর্কে এই পর্যায়ে কোন আলোচনা হয় না।

৩. **বিলের দ্বিতীয় পাঠ (Second Reading) ঃ** এই পর্যায়ের আইন সভার সংশ্লিষ্ট কক্ষে বিলটি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয়। সংশ্লিষ্ট কক্ষ আলাপ-আলোচনার পর বিলটি নিয়ে যে সিদ্ধান্ত নিতে পারে তা হল—(ক) বিলটি কক্ষে বিবেচিত হোক; (খ) বিলটিকে সিলেক্ট কমিটির কাছে পাঠানো হোক; (গ) জনসাধারণের মতামতের জন্য বিলটি প্রচার করা হোক; (ঘ) বিলটি দুই কক্ষের যুগ্ম কমিটির কাছে

পাঠানো হোক। বিতর্ক চললেও সব বিল নিয়ে বিশদ আলোচনা এই পর্বে নাও হতে পারে। বিলের সংশোধন প্রস্তাব করা চলে না তবে উপরন্তু চারটি বিকল্প প্রস্তাবের যে কোনটির সংশোধন উত্থাপন করা যায়।

৪. **কমিটি পর্যায় (Committee Stage) ঃ** বিলের উপর মতামত সংগৃহীত হলে এবং বিলটি সদস্যদের মধ্যে প্রচারিত হবার পর ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বিলটিকে সিলেক্ট কমিটি বা উভয় পরিষদের যুগ্ম কমিটিতে পাঠানোর প্রস্তাব করেন। সিলেক্ট কমিটিতে বিশেষজ্ঞরা বিলটিকে পরীক্ষা করেন। কমিটিতে বিরোধী দলের সদস্য সহ আইন সভার নির্বাচিত কতিপয় সদস্য প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পান। সংশ্লিষ্ট কক্ষ কমিটির সদস্যদের নাম অনুমোদন করেন। উভয় কক্ষের যুগ্ম কমিটিতে কারা আসবেন তা উভয় কক্ষের সদস্যরাই স্থির করেন। সিলেক্ট কমিটির চেয়ারম্যানকে নিযুক্ত করেন স্পিকার।

৫. **রিপোর্ট পর্যায় (Report Stage) ঃ** বিচার বিবেচনার পর কমিটি বিলটি সম্পর্কে তার রিপোর্ট রচনা করে এবং কমিটির চেয়ারম্যান রিপোর্টটি সংশ্লিষ্ট কক্ষে উপস্থিত করেন। রিপোর্ট পাবার পর ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী প্রস্তাব করতে পারেন ঃ (ক) কমিটি প্রেরিত বিলটিকে বিবেচনা করা হোক; (খ) বিলটিকে আবার সিলেক্ট কমিটির কাছে পাঠানো হোক অথবা (গ) বিলটি জনসাধারণের মতামতের জন্য প্রচার করা হোক।

৬. **বিচার বিবেচনা ও আলোচনার পর্যায় (Consideration and Discussion Stage) ঃ** বিচার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব ভোটের গৃহীত হলে বিলের বিভিন্ন ধারা নিয়ে আলোচনা শুরু হয় এবং ভোট গ্রহণ করা হয়। এই পর্যায়ে সংশোধনের প্রস্তাব করা যায়, তবে কোন্ কোন্ সংশোধন প্রস্তাব করা যাবে তা স্পিকার নির্ধারণ করবেন। অবশ্য স্পিকার এই ক্ষমতা প্রয়োগ নাও করতে পারেন।

৭. **বিলের তৃতীয় পাঠ (Third Reading) ঃ** বিলের সব ধারা নিয়ে বিচার বিবেচনা এবং ভোটগ্রহণ শেষ হলে বিলের শেষ বা তৃতীয় পাঠ হয়। তৃতীয় পাঠে প্রস্তাব হল বিলটি অথবা সংশোধিত বিলকে পাশ করা হোক। বিলের গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের প্রশ্ন নিয়ে এই পর্যায়ে বিতর্ক চলে। সাধারণভাবে সংশোধনের যে প্রস্তাব তা মৌখিক বা আনুষ্ঠানিক স্তরেই থাকে।

৮. **অন্য কক্ষের বিবেচনা (Consideration by the Other House) ঃ** বিলটি কোন এক পরিষদে পাশ হবার পর সেটিকে প্রেরণ করা হয় অপর কক্ষে। অপর কক্ষে একই পদ্ধতিতে বিলের বিচার বিবেচনা চলে। অপর কক্ষ বিলটিকে অনুমোদন করতে পারে, প্রত্যাখ্যান করতে পারে, সংশোধনী প্রস্তাব সহ বিলটি যে কক্ষে পাশ হয়েছে সেখানে ফেরত পাঠাতে পারে অথবা কোন সিদ্ধান্ত না নিয়ে বিলটিকে ফেলে রাখতে পারে। অপর কক্ষ অনুমোদন করলে বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পাঠানো হবে। বিলটি প্রত্যাখ্যাত হলে বা ৬ মাসের বেশি সময় বিলম্বিত হলে রাষ্ট্রপতি অচলাবস্থার অবসানের জন্য উভয় কক্ষের যুগ্ম অধিবেশন আহ্বান করেন এবং সংখ্যাধিক্যের ভোটে বিলটি পাশ হয়। অপর পরিষদ সংশোধিত আকারে বিলটি প্রথম পরিষদে ফেরত পাঠালে ঐ পরিষদ সংশোধিত বিল স্বীকার করতেও পারে আবার নাও পারে। সংশোধন স্বীকার না করলেই অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়।

৯. **রাষ্ট্রপতির সম্মতি (Presidential Assent) ঃ** সংসদের দুই কক্ষে পাশ হবার পর বিলটিকে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়। রাষ্ট্রপতির সম্মতি পেলেই বিলটি আইনে পরিণত হয়। রাষ্ট্রপতি বিলটিতে সম্মতি নাও দিতে পারেন। তবে উভয় কক্ষের পুনর্বিবেচনার পর বিলটি আবার রাষ্ট্রকপতির কাছে পাঠানো হলে দ্বিতীয়বার তিনি সম্মতি দিতে বাধ্য থাকেন।

২৭.৭.৩ বেসরকারি বিল পাশের পদ্ধতি

বেসরকারি বিল পাশের পদ্ধতি সরকারি বিলের মতোই, তবে এক্ষেত্রে বিশেষ কতকগুলি ব্যবস্থা থাকে। ব্যবস্থাগুলি হল ঃ

(১) বিল উত্থাপনের অনুমতি চেয়ে ১ মাসের নোটিশ দিতে হয়।

(২) স্পিকারের অনুমতি থাকলে ১ মাসের কম সময়েও বিল উত্থাপনের সুযোগ পাওয়া যায়।

(৩) বেসরকারি বিল আলোচনা জন্য নির্দিষ্ট দিন ধার্য থাকে।

(৪) লোকসভার বেসরকারি বিল ও প্রস্তাব সংক্রান্ত কমিটি (Committee of Private Members' Bills and Resolution) বিলটি সভায় বিবেচনার আগে পরীক্ষা করে এবং বিলের প্রকৃতি ও গুরুত্ব অনুসারে ক, খ এইভাবে শ্রেণিবিভক্ত করে। বিলের আলোচনার সময়ও কমিটি ঠিক করে। বিল সম্পর্কে কোন আপত্তি থাকলেও কমিটি তা পরীক্ষা করে দেখে। কমিটি লোকসভার কাছে তার রিপোর্ট প্রদান করে।

২৭.৭.৪ অর্থ বিল পাশের পদ্ধতি

অর্থবিল সম্পর্কে ভারতের সংবিধানে বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। ভারতীয় সংবিদানের ১১০ ধারায় অর্থবিলের সংজ্ঞা নির্দেশ করে বলা হয়েছে ঃ

(ক) কোন কর ধার্য, বিলোপ, পরিহার, পরিবর্তন বা নিয়ন্ত্রণ।

(খ) ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত ঋণ বা কোন প্রত্যাভূতি (Guarantee) প্রদানের নিয়ন্ত্রণ বা ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত বা গ্রহণীয় কোন আর্থিক দায়িত্ব সম্পাদিত আইনের সংশোধন।

(গ) ভারতের সঞ্চিত তহবিল (Consolidated Fund) বা আকস্মিক তহবিলের (Contingency Fund) জিম্মা (Custody), এই তহবিলে অর্থ প্রদান বা এই তহবিল থেকে অর্থ তোলা।

(ঘ) ভারতের সঞ্চিত তহবিল থেকে অর্থ বিনিয়োগ।

(ঙ) ভারতের সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয় বা ঐ ব্যয়ের বৃদ্ধি সম্পর্কিত ঘোষণা।

(চ) ভারতের সঞ্চিত তহবিল বা ভারতের সরকারি গাণিতক খাতে (Public Account) অর্থপ্রাপ্তি বা ঐ অর্থের জিম্মা বা নির্গমন বা ইউনিয়ন বা কোন রাজ্যের হিসাব পরীক্ষা।

(ছ) ক থেকে চ পর্যন্ত উপরোক্ত যে কোনো বিষয়ে প্রাসঙ্গিক (incidental) কোন বিষয় অর্থবিলের অন্তর্ভুক্ত।

অর্থের সঙ্গে সম্পর্কিত সব বিলই কিন্তু অর্থবিল নয়। ১১০ ধারায় বর্ণিত বিষয়গুলির বাইরে কোন বিলকে অর্থ বিলের মধ্যে ফেলা যাবে না। জরিমানা বা অন্য কোন আর্থিক দণ্ড, লাইসেন্স ফী দাবি বা প্রদান কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা কর্তৃক স্থানীয় উদ্দেশ্যে কোন কর ধার্য, বিলোপ, পরিহার, পরিবর্তন বা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি অর্থ বিল বলে গণ্য হবে না।

অর্থ বিল সম্পর্কিত সংবিধানের কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা হল ঃ

(১) সরকারই অর্থবিলের উদ্যোক্তা। কেবলমাত্র মন্ত্রীরাই এই বিল উত্থাপন করতে পারেন। বেসরকারি সদস্যরা এই বিল উত্থাপন করতে পারে না।

(২) রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ছাড়া অর্থবিল পেশ করা যাবে না।

(৩) লোকসভাতেই অর্থবিল উত্থাপিত হবে। কোন বিল অর্থবিল কিনা স্পিকার সেই মর্মে সার্টিফিকেট দেবেন।

(৪) লোকসভায় পাশ হওয়ার পর সুপারিশের জন্য রাজ্যসভায় অর্থবিল পাঠানো হয়। রাজ্যসভা তার সুপারিশ জানাতে পারে, অর্থবিলকে প্রত্যাখ্যান বা সংশোধন করতে পারে না। বিল পাওয়ার ১৪ দিনের মধ্যে রাজ্যসভা তার সুপারিশ সহ অর্থবিল লোকসভায় ফেরত পাঠাবে। লোকসভা ওই সুপারিশ গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই বিলটি দুই কক্ষ দ্বারা গৃহীত হয়েছে বলে ধরা হবে। রাজ্যসভা যদি বিলটি ফেরত নাও পাঠায় তাহলেও উভয় সভায় সম্মতিক্রমেই বিলটি পাশ হয়েছে ধরা হবে। রাজ্যসভা সুপারিশ না করলে লোকসভার কর্মসচিব (Secretary) লোকসভাতে তা জানাবেন।

(৫) রাষ্ট্রপতির সম্মতি নিয়ে বিলটি পাশ হবে।

(৬) অর্থ বিল পাশের নিয়ম অন্যান্য বিলের মতোই। বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়েই অর্থ বিল লোকসভায় গৃহীত হয়। অর্থবিলকে উভয় সভার যুক্ত কমিটিতে পাঠানোর প্রস্তাব করা যায় না।

২৭.৭.৫ অন্যান্য অর্থসংক্রান্ত বিল (Other Financial Bills)

অর্থবিলে কেবলমাত্র ১১০ ধারায় বর্ণিত (ক) থেকে (ছ) বিষয়গুলির সফল বা কোন একটি বিষয় থাকবে। সাধারণভাবে কর ও ব্যয় সংক্রান্ত বিষয় অর্থবিলে থাকে। অন্যান্য অর্থ সংক্রান্ত বিলে কর বা ব্যয়ের বাইরের বিষয় থাকতে পারে। অন্যান্য অর্থ সংক্রান্ত বিলের বৈশিষ্ট্য হল ঃ (১) এই বিলের একটি শ্রেণি হল এতে অর্থ বিলের বিষয়বস্তু এবং অন্যান্য বিষয় থাকে। অর্থবিলের মতোই এই বিলকে রাজ্যসভায় উত্থাপন করা যায় না এবং উত্থাপনের জন্য রাষ্ট্রপতির সুপারিশ প্রয়োজন হয়। কিন্তু এই শ্রেণির বিলকে রাজ্যসভা সংশোধন ও প্রত্যাখ্যান করতে পারে। এই বিল নিয়ে দু'কক্ষের মতবিরোধ হলে উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশন ডেকে সংখ্যাধিক্যের ভোটে বিল সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। (২) এই বিলের দ্বিতীয় একটি শ্রেণি আছে যেখানে অর্থবিলের কোন বিষয়বস্তু থাকে না, কিন্তু এগুলিকে কার্যকর করা হলে ভারতের সঞ্চিত তহবল থেকে অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হয়। এই বিল পাশের পদ্ধতি সাধারণ বিলের মতো। সাধারণ বিলের সঙ্গে এই বিলের পার্থক্য হল এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ছাড়া বিলটি বিচার বিবেচনা করা যায় না। (৩) রাষ্ট্রপতির সম্মতি পেলেই ওই বিল আইনে প্রণীত হয়। (৪) অন্যান্য অর্থ সংক্রান্ত বিল নাকচ করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির আছে। রাষ্ট্রপতি সংসদের কক্ষদ্বয়ের কাছে পুনর্বিবেচনার জন্য এই বিল ফেরত পাঠাতে পারেন। কক্ষদ্বয় দ্বিতীয়বার বিলটি রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠালে সেক্ষেত্রে তাতে সম্মতি দিতে তিনি বাধ্য থাকেন।

২৭.৮ সংসদের অর্থবিষয়ক কার্যপদ্ধতি

অনেকটা ব্রিটিশ ব্যবস্থার অনুসরণেই ভারতের পার্লামেন্টে অর্থ বিষয়ক কার্যপদ্ধতি (Financial Procedure in Parliament) স্থির হয়েছে। ইংলন্ডে যেমন সরকার সংসদের আইন ছাড়া কোন কর ধার্য বা সংগ্রহ করতে পারে না, ভারতেও তেমনি বলা হয়েছে আইনের ভিত্তি ছাড়া কোন প্রকারের কর ধার্য বা সংগ্রহ করা যাবে না (No tax shall be levied or collected except by authority of law—Art 265)। ইংলন্ডের মতোই ভারতের কর

ধার্য বা কর বৃদ্ধির প্রস্তাব একমাত্র সরকারই করতে পারে। আইন সভার বেসরকারি সদস্যরা (Private Members) নতুন কর ধার্য বা প্রচলিত কোন কর বৃদ্ধির প্রস্তাব করতে পারেন না। তবে কোন কর হ্রাস বা রহিত ককরার প্রস্তাব তাঁরা করতে পারেন। ইংলন্ডে যেমন রানীর সুপারিশ ছাড়া ব্যয় মঞ্জুরির দাবি করা যায় না, ভারতেও তেমনি রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ছাড়া ব্যয় মঞ্জুরির দাবি করা যাবে না। ইংলন্ডের মতো ভারতেও অর্থ বিষয়ক কার্যপদ্ধতির প্রকৃত নিয়ামক হল পার্লামেন্টের জনপ্রিয় কক্ষ অর্থাৎ লোকসভা। রাজ্যসভার ক্ষমতা এখানে একান্ত আনুষ্ঠানিক এবং লোকসভার তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ।

(ক) **বাজেট পাশের পদ্ধতি ঃ** সংসদের অর্থ বিষয়ক কার্যপদ্ধতি বলতে প্রধানত বাজেট পাশের পদ্ধতিকে Procedure of Passing the Budget) বোঝায়। সংসদে বাজেট পেশ, বাজেটের সাধারণ আলোচনা, ব্যয় মঞ্জুরির দাবি ও ভোট গ্রহণ (Demand for grants and voting), বিনিয়োগ আইন (Appropriation Act) এগুলিই বাজেট পাশের বিভিন্ন পর্যায়।

সরকারের নতুন আর্থিক বছরের সূচনা হল এপ্রিল মাসের ১ তারিখ থেকে। আগামী বৎসরের আয়-ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব প্রস্তুতের কাজ সরকারকে এই তারিখের আগে থেকেই শুরু করতে হয়। সরকারের আনুমানিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বা বাৎসরিক অর্থ বিবরণীকে (Annual Financial Statement) বাজেট বলা হয়। বাজেটের দুটি অংশ—ব্যয়ের অংশ ও আয়ের অংশ। ব্যয়ের বিষয়টি দুভাগে বিভক্ত— (ক) ভারতের সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ (The sums required to meet expenditure charged upon the Consolidated Fund of India)। এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ব্যয় সমূহের ক্ষেত্রে বাৎসরিক অনুমোদন বা ভোটাভুটির প্রয়োজন হয় না (Non-votable expenditure)। রাষ্ট্রপতি, লোকসভার স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার, রাজ্যসভার সভাপতি ও সহসভাপতি, সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি ইত্যাদিদের বেতন ও ভাতা, সরকারি ঋণের জন্য ব্যয়, নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষকের (Comptroller and Auditor General of India) বেতন, ভাতা ও পেনশন, আদালতের রায়ের ফলে দেয় অর্থ ইত্যাদি এই শ্রেণির ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। সংসদ মনে করলে আইন করে কোন ব্যয়কে সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয় বলে ঘোষণা করতে পারে। (খ) প্রথম শ্রেণির ব্যয়গুলি ছাড়া অন্যান্য সরকারি ব্যয় যেগুলি লোকসভার অনুমোদনসাপেক্ষ এবং লোকসভার ভোটে নির্ধারিত হয়।

সংবিধানের ১১২ ধারা অনুসারে বাজেট প্রস্তুতি ও লোকসভায় পেশ করার দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির। রাষ্ট্রপতিই অর্থমন্ত্রীর মারফত বাজেট পেশ করেন। অর্থমন্ত্রী বাজেট পেশ ও বাজেটের ব্যাখ্যা করেন। রাজ্যসভায়ও প্রায় একই সঙ্গে বাজেট পেশ হয়। প্রথা অনুসারে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ দিনে বাজেট পেশ হয়। এর কারণ বাজেটের প্রস্তাব নীতি নিয়ে আগামী আর্থিক বছর শুরু হবার আগেই আলোচনার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে এবং ব্যয় মঞ্জুরির দাবি নিয়ে ভোটাভুটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমাপ্ত হবে।

এরপর চলে বাজেটের সাধারণ আলোচনা। দুটি কক্ষেই এই আলোচনা চলে। বাজেট সম্পর্কিত সরকারি নীতির সমালোচনা ও আলোচনা পর্বের পর অর্থমন্ত্রী তার জবাবি ভাষণ দেন।

বাজেটের সাধারণ আলোচনার পর সরকার লোকসভায় ভোটযোগ্য **ব্যয়গুলি মঞ্জুরির দাবি** (Demand for grants) করে। এই দাবির ভিত্তিতে আলোচনা ও ভোট গ্রহণ করা হয়। আলোচনা ও ভোট গ্রহণের সময় স্পিকার লোকসভার নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যয়সংক্রান্ত আলোচনা শেষ না হলে

নির্দিষ্ট সময়ের শেষদিন অসমাপ্ত ব্যয়ের দাবি সম্পর্কে স্পিকার গিলোটিন পদ্ধতি (Guillotine) প্রয়োগ করেন এবং আলোচনা ছাড়াই ভোটরে ব্যবস্থা করেন। এইভাবে দেখা যায় অনেক ব্যয়ের প্রস্তাব বিনা আলোচনায় লোকসভায় পাশ হয়ে যায়। গিলোটিন পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে সরকারি ব্যয়ের উপর সংসদীয় নিয়ন্ত্রণ আদৌ থাকে কিনা এই নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তোলেন। লোকসভা অনুমোদন সাপেক্ষ ব্যয়গুলির ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত ব্যয় প্রত্যাখ্যান বা ব্যয় হ্রাসের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারে কিন্তু ব্যয়বৃদ্ধি বা নতুন কোন ব্যয়ের প্রস্তাব করতে পারে। ব্যয় হ্রাসের ক্ষেত্রে লোকসভা বিভিন্ন ধরনের ছাঁটাই প্রস্তাব (cut motion) নিতে পারে ঃ (১) নীতি অনুমোদন সংক্রান্ত ছাটাই প্রস্তাব (Disapproved of Policy cut); (২) ব্যয় সংক্ষেপ সংক্রান্ত ছাঁটাই প্রস্তাব (Economy Cut); (৩) প্রতীকী ছাঁটাই (Token Cut)। প্রথম ক্ষেত্রে সরকারি কোন ব্যয়ের দাবিকে ছাঁটাই করে ১ টাকায় নিয়ে আনার প্রস্তাব হয় ("That the demand be reduced to Rs. 1")। এই প্রস্তাবের অর্থ হল সরকারি দাবিকে অস্বীকার করা এবং এটি নিয়ে আলোচনা করা। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ছাঁটাই প্রস্তাবে সরকারের দাবিমতো অর্থ বরাদ্দ না করে তা কমাবার প্রস্তাব হয়। যেমন বলা হয় ব্যয়ের দাবির পরিমাণ ৫০,০০০ টাকা হ্রাস করা হোক ("That the amount of the demand be reduced by Rs. 50,000/-") লোকসভার এই প্রস্তাব সরকারের ব্যয় সংক্ষেপের একটি চেষ্টা মাত্র। তৃতীয় ক্ষেত্রে ব্যয় সম্পর্কে কোন অভিযোগ এনে অভিযোগটিকে গুরুত্ব দিতে সরকারের কোন ব্যয়ের দাবির সামান্য ছাঁটাই (১০০ বা ২০০ টাকা) করার প্রস্তাব হয়। এক্ষেত্রে অভিযোগটি নিয়ে আলোচনা সমালোচনা হতে পারে।

ব্যয় মঞ্জুরির দাবি অনুমোদিত হবার পর কক্ষের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বিনিয়োগ বিল (Appropriation Bill) প্রস্তুত হয়। বিনিয়োগ বিল আনার অর্থ ভারতের সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয় ও অনুমোদিত ব্যয়—এই দুই শ্রেণির ব্যয়ের প্রয়োজনে ভারতের সঞ্চিত তহবিল থেকে সরকারকে অর্থ তোলার ক্ষমতা প্রদান। সঞ্চিত তহবিল থেকে অর্থ তুলতে গেলে আইনের প্রয়োজন হয়। বিনিয়োগ বিল এই অর্থ তোলার জন্য লোকসভার অনুমতি সাপেক্ষ এক আইন (১১৪ (৩) ধারা)। এই আইন প্রণয়নের সময় মঞ্জুরিকৃত কোন ব্যয়ের পরিমাণ বা উদ্দেশ্য পরিবর্তন করে কোন সংশোধন আনা যায় না। বিনিয়োগ বিল নিয়ে আলোচনা কালে শাসন বিভাগীয় নীতি নিয়ে আলোচনার সুযোগ থাকলেও গুরুত্বপূর্ণ জনস্বার্থ সম্পর্কিত সরকারি বা প্রশাসনিক নীতি নিয়ে আলোচনা চলে না। বিনিয়োগ বিল নিয়েও অন্যান্য বিলের মতো তিনটি পাঠ চলতে পারে। এটি রাজ্যসভায়ও পাঠানো চলে তবে রাজ্যসভার প্রস্তাব গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান লোকসভার ইচ্ছা। রাষ্ট্রপতির সম্মতি পেলে বিলটি পাশ হয়।

যেহেতু বাৎসরিক আর্থিক বিবৃতি বা বাজেট এবং বিনিয়োগ আইনের আলোচনা ও এগুলি পাশ হতে হতে নতুন আর্থিক বছর এসে যায় অথচ সংবিধান অনুসারে আইন ছাড়া সরকার অর্থ ব্যয় করতে সমর্থ নয় তাই আর্থিক বছর আরম্ভ হবার আগেই বাজেট আলোচনা ও বিনিয়োগ আইন পাশ হবার আগেই লোকসভা সরকারকে অর্থব্যয়ের অনুমতি দেয়। একে **গণনানুদান** (Votes on Account) বলে। যদি দেখা যায় চলতি বছরের জন্য কোন বিষয় সম্পর্কে যে ব্যয় মঞ্জুর করা হয়েছে তা পর্যাপ্ত নয় এবং কোন বিষয় সম্পর্কে অনুপূরক (supplementary) বা অতিরিক্ত (additional) ব্যয়ের প্রয়োজন, এখন সরকারকে এই ব্যয়ের হিসাব লোকসভায় পেশ করে মঞ্জুর করিয়ে নিতে হয়। একে বলে অনুপূরক বা অতিরিক্ত অনুদান (Supplementary or additional grants)। অনুমোদিত অর্থের অধিক ব্যয় হলে গেলেও সরকারকে ঐ অধিক ব্যয়ের (excess grants) দাবি লোকসভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হয়। অধিক ব্যয়ের দাবি লোকসভায় পেশ করার আগে সরকারি গণিতক কমিটির (Public Accounts Committee) দ্বারা তা অনুমোদিত হওয়া দরকার। অনুপূরক ব্যয়ের দাবির ক্ষেত্রে অবশ্য এই অনুমোদনের

প্রয়োজন নেই। অনুপূরক অনুদান বা অধিক ব্যয়ের সরকারি প্রবণতা নিয়ে লোকসভায় সমালোচনা হলেও শেষ পর্যন্ত এই দাবি মেনে নিতে হয়। কোন কোন মহলে অভিযোগ ওঠে এক্ষেত্রে লোকসভার সরকারের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হয়। লোকসভা সরকারকে অনিশ্চিত ও অপ্রত্যাশিত ব্যয় মেটাবার জন্য অর্থব্যয়ের ক্ষমতাও দান করতে পারে। একে বলে প্রত্যাখানুদান (Votes of Credit)। ব্যতিক্রমী বা বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য সরকারকে ব্যয় করার যে ক্ষমতা লোকসভা দেয় তাকে বলে ব্যতিক্রমানুদান (Exception grants)।

রাজস্ব আইন ঃ সব শেষে রাজস্ব আইন সম্পর্কে শিক্ষার্থী পাঠকের কিছু ধারণা আবশ্যক। রাজস্ব আইন (Finance Act) হল সরকারের কর প্রস্তাব সমূহকে কার্যকর করার জন্য লোকসভা প্রণীত আইন। ব্যয়ের প্রস্তাবের মত সরকারের রাজস্ব সম্পর্কিত প্রস্তাব বাজেট পেশের সময়ই বিল আকারে উপস্থিত করা হয়। কর বৃদ্ধি বা নতুন কর ধার্য করার উদ্দেশ্যে কোন সংশোধন এলে রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ছাড়া তা কার্যকর হবে না। কর হ্রাস বা বিলোপসাধনের জন্য সংশোধন আনা যায়। রাজস্ব বিল নিয়ে সরকারি পক্ষের প্রস্তাবের উপর আলোচনা বা সমালোচনার ব্যাপক স্বাধীনতা পার্লামেন্টের আছে। যে কোনো অভিযোগ নিয়েও এই সময় আলোচনা হতে পারে। সরকার যদি পার্লামেন্টে সাময়িক কর সংগ্রহ বা শুল্ক স্থাপনের জন্য কোন প্রস্তাব আনতে চায় তবে সাময়িক কর সংগ্রহ আইন (Provisional Collection of Taxes Act) অনুসারে তা কার্যকর হতে পারে।

খ. অর্থের উপর পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ ঃ শিক্ষার্থী পাঠক লক্ষ করবেন অর্থ বিষয়ক কার্যপদ্ধতি বা বাজেট পেশের ব্যবস্থা এক অর্থে আয়-ব্যয়ের উপর সরকারি প্রস্তাব বা কাজকর্মকে পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণে আনার এক সাংবিধানিক ব্যবস্থা। আইন ছাড়া কর ধার্য বা সংগ্রহ করা যাবে না (২৬৫ ধারা)। সরকারের ব্যয় মেটাতে হবে আদায়ীকৃত অর্থ জমা পড়ে যে তহবিলে সেই সঞ্চিত তহবিল থেকে। আইন ছাড়া এই তহবিল থেকেও অর্থ তোলা যাবে না (২৬৩(৩) ধারা)। এই আইনই বিনিয়োগ আনি। এ ছাড়া সরকারি আয়ের উপযুক্ত ব্যবহার, ব্যয় সংক্ষেপ, অপচয় বোধ এদিকেও আইন সভাকে দৃষ্টি রাখতে হয়। সময়ের অভাব, হিসাবের জটিলতা, প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাবে পার্লামেন্টের পক্ষে এই নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা সম্ভব হয় না। সংসদকে এই কাজে সহায়তা করবার জন্য সংবিধান প্রতিষ্ঠানগত ব্যবস্থা (Institutional Arrangement) গ্রহণ করেছে। এই ব্যবস্থাগুলি হল—(১) পার্লামেন্টের অর্থবিষয়ক তিনটি কমিটি এবং (২) নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষক। পরবর্তী আলোচনায় শিক্ষার্থী পাঠক এ সম্পর্কে বিস্তৃত ব্যাখ্যা পাবেন।

১. নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষক (The Comtroller and Auditor General of India) ঃ আইন সভা যে উদ্দেশ্যে যে পরিমাণ অর্থব্যয় মঞ্জুর করে সেই উদ্দেশ্যে সেই পরিমাণ অর্থ ব্যয় সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য ভারতের নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষকের একটি পদের ব্যবস্থা সংবিধান করেছে। সংবিধানের ১৪৮-১৫১ ধারায় ভারতের নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষকের সাংবিধানিক অবস্থান ও ভূমিকার কথা বলা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পীরক্ষককে নিযুক্ত করেন। সংসদের উভয় সভার মোট সদস্য সংখ্যার অধিকাংশ এবং উপস্থিত ও ভোট প্রদানকারী সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশের দ্বারা সমর্থিত প্রমাণিত অসামর্থ্য ও অসদাচারের আবেদনের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি তাঁকে পদচ্যুত করতে পারেন। সংবিধান অনুসারে সংসদই আইন করে স্থির করে দেবে নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষকের কাজ হল কেন্দ্রের ও রাজ্যের হিসাব সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালের কাছে রিপোর্ট করা। আগে হিসাব প্রণয়নের দায়িত্ব তাঁর ছিল। বর্তমানে এই দায়িত্ব পালন করে প্রশাসনিক বিভাগ। কেন্দ্রের হিসাব রক্ষার দায়িত্বও বর্তমানে তাঁর নেই। তাঁর মূল দায়িত্ব নিয়ন্ত্রক ও পরীক্ষকের।

২. **পার্লামেন্টের অর্থ বিষয়ক কমিটি (Financial Committees of Parliament)** ঃ পার্লামেন্টের অর্থ বিষয়ক কমিটির মধ্যে আছে সরকারি গণিতক কমিটি (Public Accounts Committee), আনুমানিক ব্যয় হিসাব কমিটি (Estimates Committee) এবং জনদায়িত্ব সম্পন্ন বিষয়ক কমিটি (Public Undertakings Committee)। পার্লামেন্টের পদ্ধতিগত নিয়ম ও কার্যবিধি (Rules of Procedure and Conduct of Business) অনুসারে **সরকারি গণিতক কমিটির কাজ হল** বিধিবদ্ধভাবে বা সঠিক ক্ষেত্রে ব্যয় হয়েছে কিনা, কর্তৃপক্ষের ব্যয় করার অধিকার সঠিকভাবে প্রযুক্ত হয়েছে কিনা, আইন মেনে প্রতিটি ব্যয় ও বিনিয়োগ হয়েছে কিনা তা দেখা। সংসদের কাছে পেশ করা হিসাব এবং নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষকদের রিপোর্ট পরীক্ষা করা, আর্থিক লেন-দেনের হিসাব পরীক্ষা করা, সংসদ অনুমোদিত ব্যয় বরাদ্দ পরীক্ষা করা, সরকারি প্রকল্প ও প্রস্তাবের জন্য ধার্য ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করা এই কমিটির কাজ। কমিটি অপচয়, অমিতব্যয়, ক্ষতি ইত্যাদি সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ব্যয় সংক্ষেপ সম্পর্কে পরামর্শ দেয়। আয়-ব্যয়ের নৈতিকমান উন্নয়ন ও আর্থিক সমীচীনতার প্রশ্নে পরামর্শ দেওয়াও কমিটির কাজ। এই কমিটির সদস্য ২২ জন। সাধারণত বিরোধী দলের কোন সদস্যকে স্পিকার এর চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেন।

আনুমানিক ব্যয় হিসাব কমিটির সদস্য ৩০। স্পিকার কমিটির সদস্যদের মধ্য থেকেই একজনকে এর চেয়ারম্যান নিয়োগ করেন। কমিটির কার্যকাল একবছর। কমিটির এক-তৃতীয়াংশ সদস্য প্রতি বছরে অবসর নেন কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষার স্বার্থে। কোন মন্ত্রী এই কমিটির সদস্য হন না। এই কমিটির কাজ হল সরকারি দপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের মিতব্যয়িতা, সাংগঠনিক উন্নতি, নৈপুণ্যবৃদ্ধি ও প্রশাসনিক সংস্কার সম্পর্কে লোকসভায় প্রতিবেদন বা সুপারিশ পেশ করা, ব্যয় সংক্ষেপ ও দক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য বিকল্প নীতির সুপারিশ করা এবং নীতি অনুসারে সঠিকভাবে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা করা।

পরবর্তীকালে সরকারি উদ্যোগাধীন প্রতিষ্ঠানগুলির কাজকর্ম অনুসন্ধানের জন্য ১৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়েছে জন দায়িত্ব পালন সম্পর্কিত কমিটি। নির্দিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির রিপোর্ট ও হিসাব পরীক্ষা, প্রতিষ্ঠানগুলি সঠিকভাবে তাদের কাজকর্ম পরিচালনা করে কিনা সেটা দেখার উদ্দেশ্যে এই কমিটি গঠিত হয়েছে। এই কমিটি গড়ার পেছনে আর্থিক ক্ষেত্রে সরকারি প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠাই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য।

২৭.৮.১ কমিটি ব্যবস্থা

পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ শুধু আর্থিক ক্ষেত্রেই নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও আছে। পার্লামেন্টের কমিটি ব্যবস্থা আর্থিক ক্ষেত্রের বাইরেও প্রসারিত। সাধারণভাবে বলতে গেলে, দু রকমের কমিটি ব্যবস্থা প্রচলিত আছে—স্থায়ী কমিটি (Standing Committees) এবং অস্থায়ী বা তদর্থক কমিটি (Ad hoc Committees)। স্থায়ী কমিটিগুলি প্রতিবছর অথবা নির্দিষ্ট কালের ব্যবধানে (periodically) নির্বাচিত বা নিযুক্ত হয়। এবং তাদের কাজের ধারা হয় নিরবচ্ছিন্ন। অস্থায়ী কমিটিগুলি নির্দিষ্ট প্রয়োজনের ভিত্তিতে নিযুক্ত হয়, এবং প্রয়োজন শেষ হলে তাদের কার্যকালও শেষ হয়। স্থায়ী কমিটির সংখ্যা কম নয়। তিনটি অর্থবিষয়ক (Financial) কমিটি ছাড়া ১৭টি সরকারি বিভাগ সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি আছে, যেগুলি নির্দিষ্ট কার্যভিত্তিক। সংসদের কমিটিগুলির প্রয়োজন নানা কারণেই হতে পারে। (১) পার্লামেন্টের সময় সংক্ষেপ করা, (২) পার্লামেন্টের কাজে দক্ষতা আনা, (৩) সরকারি নীতির সূক্ষ্ম বিবেচনার জন্য তথ্য নিয়ে তদন্ত বা ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়ে তদন্ত করা, (৪) সরকারি কাজে দায়বদ্ধতা আনা প্রভৃতি নানা কারণেই কমিটির প্রয়োজন। নিম্নের সংক্ষিপ্ত সারণি থেকে পার্লামেন্টের কমিটিগুলির গঠন ও কাজ সম্পর্কে শিক্ষার্থী পাঠক ধারণা করতে পারবেন।

কমিটি	গঠন	কাজ
১. অর্থবিষয়ক কমিটি (Financial Committee)		
ক. সরকারি গণিতক কমিটি (The Public Accounts Committee)	২২ জন সদস্য, ১৫ জন লোকসভার, ৭ জন রাজ্যসভার; লোকসভার সদস্য বা নির্বাচিত রাজ্যসভার সদস্যরা স্পিকার কর্তৃক মনোনীত।	সরকারি বিনিয়োগ হিসাব ও সংসদে উপস্থাপিত অন্যান্য হিসাব পরীক্ষা, নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষকদের রিপোর্ট পরীক্ষা।
খ. আনুমানিক ব্যয় হিসাব কমিটি (The Public estimates Committee)	৩০ সদস্য; সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে এক বছরের জন্য নির্বাচিত।	সরকারের আনুমানিক ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা, ব্যয়সংক্ষেপ, সাংগঠনিক উন্নয়ন ইত্যাদি সম্পর্কে পরামর্শ, ব্যয় সংক্ষেপের বিকল্প নীতি পেশ।
গ. জন দায়িত্ব পালন সম্পর্কিত কমিটি (The Public Undertaking Committee)	১৫ জন সদস্য, লোকসভার ১০ ও রাজ্যসভার ৫।	নির্দিষ্ট সরকারি প্রতিষ্টানের রিপোর্ট ও হিসাব পরীক্ষা ও প্রতিষ্ঠান সমুচিত বাণিজ্যিক নীতির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা দেখা।
২. সাধারণ কমিটি (General Committes)		
ক. আবেদন সংক্রান্ত কমিটি (Committe on Petition)	১৫ জন সদস্য, স্পিকার মনোনীত।	জনসাধারণের বিল সম্পর্কিত আবেদনের বিচার বিবেচনা।
খ. কার্য পরিচালনা সংক্রান্ত পরামর্শদান কমিটি (Business Advisery Committee)	১৫ জন সদস্য, স্পিকার মনোনীত।	সরকারি বিল ও সরকারি কাজের পরিচালনার জন্য কতটা সময় ব্যয় করা হবে সে বিষয়ে সুপারিশ।
গ. নিয়মাবলি সংক্রান্ত কমিটি (Committee on Rules)	১৫ জন সদস্য, স্পিকার সভাপতি	লোকসভার কাজের পদ্ধতি ও পরিচালনা সম্পর্কে বিচার বিবেচনা ও নিয়মকানুন পরিবর্তনের সুপারিশ।
ঘ. অধিকার সংক্রান্ত কমিটি (Committee on Privileges)	১৫ জন সদস্য, সদস্যরা স্পিকার মনোনীত।	সদস্যদের অধিকার, অধিকারভঙ্গ ইত্যাদির প্রশ্নে বিচার ও সুপারিশ।
ঙ. সরকারি প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত কমিটি (Committee on Government Assurances)	১৫ জন সদস্য, সদস্যরা স্পিকার মনোনীত। ১ বছর কার্যকাল।	মন্ত্রীদের দেয় প্রতিশ্রুতি পরীক্ষা, প্রতিশ্রুতির কার্যকারিতা সম্পর্কে লোকসভায় রিপোর্ট দেওয়া।
চ. তপশিলি জাতি ও উপজাতির কল্যাণ সংক্রান্ত কমিটি (Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Tribers)	৩০ জন সদস্য, লোকসভার ২০, রাজ্যসভার ১০।	তপশিল জাতি ও উপজাতি কমিশনারের রিপোর্ট বিবেচনা, তপশিল জাতি ও উপজাতির স্বার্থরক্ষায় কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিশ্রুতির অগ্রগতি বিবেচনা।

কমিটি	গঠন	কাজ
৩. আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কমিটি (Legislative Committee)		
ক. অধস্তন আইন সংক্রান্ত কমিটি (Committee on Subordi-nate Legislation)	১৫ জন সদস্য, স্পিকার কর্তৃক মনোনীত, ১ বছরের জন্য গঠিত, মন্ত্রীরা এই কমিটির সদস্য নন।	যে আইন দ্বারা শাসন বিভাগের হাতে নিয়মকানুন প্রণয়ন ও প্রবর্তনের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সেই আইন অনুসারে ক্ষমতা প্রযুক্ত হয়েছে কিনা তা বিচার বিবেচনা ও লোকসভায় রিপোর্ট করা।
খ. সদস্যদের বৈঠকে অনুপস্থিতি সংক্রান্ত কমিটি (Committee on Absence of Members from Sitting of the House)	১৫ জন সদস্য, স্পিকার মনোনীত, ১ বছরের জন্য গঠিত।	বৈঠকে অনুপস্থিত হওয়ার জন্য সদস্যদের আবেদনপত্র পরীক্ষা দু মাসের অধিক সময় অনুপস্থিত সদস্যদের সদস্যপদ নিয়ে বিবেচনা।
গ. বিল সম্পর্কিত সিলেকট কমিটি (Select Committee on Bills)	২০-৩০ জন সদস্য, অস্থায়ী কমিটি ও বিশেষ সময়ে বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত; সভাপতি স্পিকার মনোনয়ন করেন।	বিলের বিস্তারিত পরীক্ষানিরীক্ষা ও সংশোধনের সুপারিশ করা। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লোকসভায় এ সম্পর্কে রিপোর্ট করা।
ঘ. বেসরকারি বিল ও প্রস্তাব সংক্রান্ত কমিটি (Committee on Private Members' Bills and Resolution)	১৫ জন সদস্য, স্পিকার মনোনীত, ১ বছরের জন্য গঠিত।	বেসরকারি বিলের পরীক্ষা ও গুরুত্ব অনুসারে শ্রেণি বিভাজন। বিলের আলোচনার সময় সম্পর্কে সুপারিশ।
৪. অন্যান্য কমিটি (Other Committees)		
ক. দুই কক্ষের যুক্ত সিলেকট কমিটি (Joint Select Committee of Both Houses)	উভয় কক্ষের বাছাই সদস্য নিয়ে গঠিত।	গুরুত্বপূর্ণ বিলের বিচার বিবেচনা।
খ. দুই কক্ষের স্থায়ী যুক্ত কমিটি (Standing Joint Committees of the Two Houses)	উভয় কক্ষের সদস্যদের মধ্য থেকে কতিপয়কে নিয়ে গঠিত।	কোন কমিটি সংসদ সদস্যদের বেতন ও ভাতা নিয়ে বিবেচনা করে; বেতনভুক্ত পদ সংক্রান্ত বিভিন্ন কমিটি, মন্ত্রী বা সদস্যরা লাভজনক কাজে লিপ্ত কিনা ইত্যাদি সম্পর্কে বিচার করে।

লোকসভার মতো রাজ্যসভারও কার্য পরিচালনা সংক্রান্ত কমিটি (Business Advisory Committee) আবেদন সংক্রান্ত কমিটি (Committee on Petitions), অধিকার সংক্রান্ত কমিটি (Committee on Privileges), নিয়মাবলি সংক্রান্ত কমিটি (Committee on Rules) এবং বিল সম্পর্কিত সিলেক্ট কমিটি (Select Committee on Bills) আছে। গঠন ও কাজের দিক থেকে এই কমিটিগুলি লোকসভার অনুরূপ।

বর্তমান এককের সব শেষে পার্লামেন্টের রীতি ও পদ্ধতির কতকগুলি বিষয় সম্পর্কে এবং পার্লামেন্টের সংস্কার সম্পর্কে কিছু প্রস্তাব নিয়ে সংক্ষেপে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। এর ফলে পার্লামেন্ট সম্পর্কিত কিছু ধারণা লাভ ও পার্লামেন্টের সংস্কার বিষয়ে কিছু বিচার বিবেচনা করার অবকাশ শিক্ষার্থী পাঠক পাবেন।

২৭.৯ সংসদীয় রীতি ও পদ্ধতি

বর্তমান এককের পূর্ববর্তী বিভিন্ন অংশের আলোচনা থেকে পার্লামেন্টের রীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে আপনাদের কিছু সাধারণ ধারণা হয়েছে। বর্তমান অংশের আলোচনায় কিছু বিশেষ পার্লামেন্টীয় রীতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে। পার্লামেন্টীয় রীতিগুলিক সহজে বোঝার জন্য এইভাবে ক্রমপর্যায়ে সাজিয়ে আলোচনা করা হল ঃ

- **সংসদের অধিবেশন আহ্বান (Summoning of the House)** ঃ পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করেন রাষ্ট্রপতি। পার্লামেন্টের দুটি অধিবেশনের মধ্যে ছ মাসের অধিক ব্যবধান থাকবে না। দুটি কক্ষের সেক্রেটারি জেনারেলেরা এ সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির আদেশ পান এবং এ সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে সদস্যদের অবহিত করেন।
- **প্রোটেম স্পিকার (Protem Speaker)** ঃ নতুন লোকসভা বসলে রাষ্ট্রপতি কক্ষের বয়োঃবৃদ্ধ সদস্যকে সাময়িকভাবে স্পিকার হিসাবে মনোনীত করেন। তিনিই সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান।
- **রাষ্ট্রপতির উদ্বোধনী ভাষণ (Inaugural Address of the President)** ঃ পার্লামেন্টের নতুন অধিবেশন (লোকসভা নির্বাচনের পর) রাষ্ট্রপতির উদ্বোধনী ভাষণ দিয়ে শুরু হয়। কেন্দ্রীয় ভবনে (Central Hall) দুই কক্ষের যৌথ অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি প্রারম্ভিক ভাষণ দেন। এই ভাষণ ক্যাবিনেট অনুমোদিত।
- **কোরাম (Quorum)** ঃ যে ন্যূনতম সংখ্যক সদস্যদের উপস্থিতি ছাড়া কোন কক্ষের কাজ পরিচালনা শুরু করা যায় না তাকে বলে কোরাম। সংশ্লিষ্ট কক্ষের এক-দশমাংশের উপস্থিতি না হলে কোরাম হয়। লোকসভার ক্ষেত্রে সংখ্যাটি ৫৫, রাজ্যসভার ক্ষেত্রে ২৫।
- **পার্লামেন্টের অধিবেশন মুলতবি করা (Adjournment of the House)** ঃ পার্লামেন্টের সংশ্লিষ্ট কক্ষের সভাপতি কোরামের অভাবে বা কক্ষের বিশৃঙ্খলার কারণে বা বিশেষ কোন কারণে কক্ষের অধিবেশন পুনরায় আদেশ ছাড়া মুলতুবি করে দিতে পারেন।
- **পার্লামেন্টের অধিবেশন স্থগিত** (Prarogation of the House) ঃ সাময়িক কালের জন্য পার্লামেন্টের অধিবেশন স্থগিত রাখা চলে। এ ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির আদেশ জারি হয়।

- **লোকসভা ভেঙে দেওয়া (Dissolution of Lok Sabha) ঃ** নির্দিষ্ট সময় (৫ বছর) অতিক্রান্ত হলে বা লোকসভায় সংখ্যাধিক্যের ভোটে কোন দলের বা জোটের সরকার গঠন সম্ভব না হলে লোকসভা ভেঙে দেওয়া হয়। রাজ্যসভা চিরস্থায়ী পরিষদ। একে ভেঙে দেওয়া চলে না।
- **শৃঙ্খলার প্রশ্ন (Point of Order) ঃ** সভার পদ্ধতি বা নিয়ম মেনে কাজ না হলে কোন সদস্য শৃঙ্খলার প্রশ্ন তুলে স্পিকার বা সভাপতির কাছে আবেদন করতে পারেন শৃঙ্খলা মেনে সভার কাজ হোক। যেমন খুশি বা ব্যক্তিগত ইচ্ছামতো শৃঙ্খলার প্রশ্ন তোলা যায়। এক্ষেত্রে স্পিকার বা সভাপতির রায়ই শেষ কথা।
- **প্রশ্ন, অতিরিক্ত প্রশ্ন (Questions and Supplementary Questions) ঃ** সভার কাজ আস্তে আরম্ভ হওয়ার প্রথম ঘণ্টায় প্রশ্ন-উত্তর পর্ব চলে। তারকা চিহ্ন ছাড়া প্রশ্নের উত্তর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে লিখিতভাবে জানাতে হয়। তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের (Starred Questions) জবাব মৌখিক দিতে হয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অতিরিক্ত প্রশ্নের সুযোগ আছে। সাধারণত ১০ দিনের মধ্যে মন্ত্রীকে প্রশ্নের জবাব তৈরি করতে হয়। স্বল্প সময়ের নোটিশেও প্রশ্ন করা যায়। প্রশ্ন করার জন্য ১০ থেকে ২১ দিনের মধ্যে কক্ষের সচিবকে (Secretary General) নোটিশ দিতে হয়। কোন কল্পনাপ্রসূত প্রস্তুত, অস্পষ্ট বা মানহানিকর প্রশ্ন করা যায় না। ১৫০ শব্দের অধিক দীর্ঘ প্রশ্ন করা চলবে না। ৫টির বেশি প্রশ্ন করা চলবে না। একই দিন তারকাখচিত প্রশ্ন কোন সদস্য লোকসভার ১টির বেশি করতে পারবেন না। একদিন ২০টির বেশি তারকাচিহ্ন যুক্ত প্রশ্ন গ্রহণ করা যাবে না। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্যে করা প্রশ্নকে ক, খ, গ এইভাবে শ্রেণিবিভাগ করা হয়। প্রশ্নের সময় প্রায় প্রতিটি লোকসভাতেই বেড়ে গেছে।
- **বিভিন্ন প্রস্তাব (Motions) ঃ** সভার বিভিন্ন প্রস্তাবগুলি হল মুলতবি প্রস্তাব (Adjournment motion), দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব (Calling attention motion), অনাস্থা প্রস্তাব (No confidence Motion)। মুলতবি প্রস্তাব হল কোন জরুরি কোন প্রশ্নের জন্য মন্ত্রীর জবাব আহ্বান। এক্ষেত্রে ঐ দিনেই সভা আরম্ভ হবার এক ঘণ্টা আগে নোটিশ দিতে হবে। অনাস্থা প্রস্তাব হল সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী দলের অনাস্থা প্রকাশের জন্য ভোটাভুটির দাবি। ৫০ জন সদস্য সমর্থন করলে ওই প্রস্তাব আনা যায়। সরকার পক্ষ পরাজিত হলে সরকারকে পদত্যাগ করতে হয়। কোন বিষয়ের নিন্দা করে প্রস্তাব আনলে তাকে নিন্দাসূচক (Censuie Motion) প্রস্তাব বলা হয়।
- **স্থির প্রস্তাব** (Resolutions) ঃ বিভিন্ন প্রস্তাব ছাড়া আইন সভায় নানা বিষয়ের উপর স্থির প্রস্তাব আনা যায়। মুলতবি প্রস্তাবের মতো বিষয়গুলি সব ভোটাভুটিতে যায় না, স্থির প্রস্তাবের ক্ষেত্রে সহবগুলিই ভোটাভুটিতে যায়। সংবিধানের বা পার্লামেন্টের আইন নিয়ে কোন প্রস্তাব এলে তাকে বিধিবদ্ধ (Statutory) প্রস্তাব বলা হয়। এই প্রস্তাবের জন্যও পূর্ব থেকে নোটিশ দিতে হয়। পাশ হলে এই সব প্রস্তাব সরকারের উপর বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করে।
- **জিরো আওয়ার (Zero Hour) ঃ** প্রশ্ন-উত্তর পর্ব শেষ হবার পর এবং প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা শুরু হবার মাঝামাঝি সময়টিকে জিরো আওয়ার বলে। এই সময় কোন নোটিশ ছাড়াই প্রশ্ন করা চলে।

২৬.১০ সংসদীয় সংস্কার

১৯৭৬ সালের পূর্ব পার্লামেন্টের সংস্কার (Reforms of Parliament) নিয়ে তেমন কোন প্রশ্ন ওঠে নি, যদিও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা ও বিতর্ক ছিল। ১৯৭৬ সালে এবং ১৯৮২ সালে পার্লামেন্টের সংস্কার নিয়ে বলিরাম ভগতের (Baliram Bhagat) পরিকল্পনায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সায় ছিল। পরবর্তীকালে মোরারজী দেশাই এ ব্যাপারে লোকসভার স্পিকার কে. এস. হেগড়ে (K. S. Hegde) এবং রাজ্যসভার সভাপতি বি. ডি. জাত্তির (B. D. Jatti) সঙ্গে পার্লামেন্টের নিয়মকানুন ও শৃঙ্খলার প্রশ্নে কঠোর ও স্পষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব কিনা তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। পার্লামেন্টের সংস্কারের প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী কমিটি ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব দেন।১৯৮৫ সালে লোকসভার স্পিকার বলরাম জাখর (Balaram Jakhar) এ প্রশ্নে উদ্যোগী হন।১৯৮৫ সালে লক্ষ্ণৌতে আইনসভার সভাপতিদের সর্বভারতীয় অধিবেশনে (All India Presiding Officer's Conference) বিষয়টি সমর্থিত হয়।কমিটি ব্যবস্থা, পার্লামেন্টের সদস্যদের অধিকার, পার্লামেন্টের মর্যাদা, বিতর্ক, আইন প্রণয়ন, পার্লামেন্ট ও আদালতে সম্পর্ক প্রতিটি প্রশ্নেই পরবর্তীকালে বিভিন্ন মহলে নানা বিতর্ক হয়েছে এবং সংস্কারের প্রস্তাব এসেছে।

২৬.১১ সারাংশ

সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে আইনসভা অর্থাৎ পার্লামেন্টের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আইনসভা হল জনপ্রতিনিধিসভা। দায়িত্বশীল গণতন্ত্রের নীতিটি আইনসভার কাজকর্মেই প্রতিফলিত হয়। ভারতীয় ইউনিয়নের আইনসভার নাম পার্লামেন্ট। পার্লামেন্টের দুটি কক্ষ—নিম্নকক্ষ বা প্রথম কক্ষ লোকসভা এবং উচ্চকক্ষ বা দ্বিতীয় কক্ষ রাজ্যসভা। রাজ্যসভার সদস্য সংখ্যা ২৫০ এর বেশি হতে পারে না। এদের মধ্যে ১২ জন রাষ্ট্রপতি মনোনীত এবং অন্যান্য সদস্যরা রাজ্য বিধানসভার সদস্যদের দ্বারা একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট ও সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের পদ্ধতিতে নির্বাচিত হন। লোকসভার সদস্যরা নির্বাচিত হন জনসাধারণের প্রত্যক্ষ ভোটে। রাজ্যসভা স্থায়ী পরিষদ। এর এক তৃতীয়াংশ সদস্য ২ বছর অন্তর পদত্যাগ করেন। লোকসভার সদস্যরা পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। ভারতে দ্বি-পরিষদ সম্পন্ন আইনসভা থাকা উচিত কিনা এ নিয়ে গণপরিষদে দীর্ঘ বিতর্ক হয়েছে এবং শেষপর্যন্ত ইউনিয়ন পার্লামেন্টে দ্বিতীয় কক্ষ থাকবে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে।

ভারতের পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন, আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাজ্যের সীমানা পরিবর্তন, সংবিধান সংশোধন এবং আধা-বিচার বিভাগীয় কিছু কাজও পার্লামেন্ট করে থাকে। পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের মধ্যে লোকসভার ক্ষমতাই বেশি। অর্থবিল রাজ্যসভায় উত্থাপন করা যায় না। শাসন বিভাগের উপর নিয়ন্ত্রণে ও রাজ্যসভার তেমন ভূমিকা নেই। রাজ্যসভার একটি উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা হল, এই সভার প্রস্তাব মতোই রাজ্যতালিকাভুক্ত কোন বিষয়ে পার্লামেন্ট আইন পাশ করতে পারে।

লোকসভার কার্য পরিচালনার জন্য একজন স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার থাকেন। এঁরা লোকসভার সদস্যদের দ্বারাই নির্বাচিত। রাজ্যসভার সভাপতি হলেন উপরাষ্ট্রপতি। তিনিই রাজ্যসভার কার্য পরিচালনা করেন। সংবিধানগতভাবে লোকসভার স্পিকারের পদটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। লোকসভার আলোচনা ও বিতর্ক নিয়ন্ত্রণ,

লোকসভার মুখপাত্র হিসাবে সভার মর্যাদা ও সদস্যদের অধিকার রক্ষা, বৈধতার প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা, অর্থ বিষয়ক কার্যপদ্ধতি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা স্পিকাররে দায়িত্ব। পার্লামেন্টের সদস্যরা ব্যক্তিগতভাবে এবং পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠানগতভাবে কিছু অধিকার বা স্বাধীনতা লাভ করে। বাক্‌স্বাধীনতা, প্রকাশনার স্বাধীনতা, সংসদের অধিবেশন চলাকালীন গ্রেপ্তার না হবার স্বাধীনতা যেমন ব্যক্তিগতভাবে সদস্যরা ভোগ করেন, তেমনি সমবেতভাবে পার্লামেন্টের অধিকার হল প্রকাশনার অধিকার, আভ্যন্তরীণ কার্যপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণের অধিকার, অধিকার ভঙ্গের বিরুদ্ধে সুরক্ষা পাবার সুবিধা ইত্যাদি। সংসদের অধিকার ভঙ্গ বা অবমাননার বিরুদ্ধে শাস্তিদানের অধিকার পার্লামেন্টের আছে। ভারতের পার্লামেন্টে বিরোধী দলের ভূমিকা নিয়ে সংবিধানবিদ ও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা বিশেষ উৎসাহী। সংসদের প্রথম দু-দশকের ইতিহাসে বিরোধী দল তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন না করলেও বিগত তিন দশকে বিরোধী দল তাদের শক্তি প্রতিপন্ন করেছে।

পার্লামেন্টের আইন প্রণয়ন পদ্ধতি, অর্থ বিষয়ক কার্যপদ্ধতি, কমিটি ব্যবস্থা পার্লামেন্টের কাজকর্ম সম্পর্কে গভীরভাবে জানতে সাহায্য করে। বিলের শ্রেণিবিভাগ, আইন পাশের বিভিন্ন পর্যায় অর্থবিল, বাজেট পাশের পদ্ধতি, নানা ধরনের কমিটি, পার্লামেন্টীয় কাজকর্মের নানা রীতি ও দেশের পার্লামেন্টীয় ব্যবস্থার গতিপ্রকৃতি ও প্রবণতা বুঝতে উৎসাহী পাঠককে সাহায্য করবে সন্দেহ নেই। পার্লামেন্টের কাজকর্মকে কেন্দ্র করে, পার্লামেন্টীয় রীতি ও আর্থিক পদ্ধতিকে সামনে রেখে বহু প্রায়োগিক ধারণার সঙ্গে পাঠক পরিচিত হতে পারেন।

২৬.১২ অনুশীলনী

(১) সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে নিম্নলিখিত বাক্যগুলি পুনরায় লিখুন।

(ক) ভারতের পার্লামেন্ট এককক্ষ বিশিষ্ট/দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট।

(খ) রাজ্যসভা/লোকসভার সদস্যরা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত।

(গ) রাজ্যসভার ১২ জন সদস্যকে মনোনীত করেন রাজ্যসভার সভাপতি/রাষ্ট্রপতি।

(ঘ) রাজ্যসভার সভাপতি রাজ্যসভার সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন/উপরাষ্ট্রপতি পদাধিকার বলে রাজ্যসভার সভাপতি হন।

(ঙ) রাজ্যসভা/লোকসভার সদস্য হতে গেলে কোন ব্যক্তিকে কমপক্ষে ২৫ বছর বয়স হতে হবে।

(চ) রাজ্যসভা/লোকসভা স্থায়ী পরিষদ।

(ছ) সংবিধান অনুসারে মন্ত্রিসভা পার্লামেন্ট/লোকসভা/রাজ্যসভার কাছে যৌথভাবে দায়িত্বশীল।

(জ) লোকসভার মুখপাত্র হলেন প্রধানমন্ত্রী/স্পিকার/রাষ্ট্রপতি।

(ঝ) সরকারি গণিতক কমিটি একটি সাধারণ/আইন বিষয়ক/অর্থ বিষয়ক কমিটি।

(ঞ) পার্লামেন্টের যৌথ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন রাষ্ট্রপতি/স্পিকার।

(ট) বাজেট প্রস্তুতি ও লোকভায় পেশ করার দায়িত্ব স্পিকারের/রাষ্ট্রপতির।

(২) দু-একটি বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন ঃ

(ক) ভারতের আইনসভার উচ্চকক্ষের নাম কী? এই কক্ষের সভাপতি কে?

(খ) রাজ্যসভার সদস্যদের যোগ্যতা কী?

(গ) পার্লামেন্টের অবশিষ্ট ক্ষমতা বলতে কী বোঝেন?

(ঘ) প্রত্যর্পিত আইন (Delegated legislation) বলতে কী বোঝায়?

(ঙ) সরকারি আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে গঠিত পার্লামেন্টের কমিটিগুলির নাম করুন।

(চ) কেন্দ্রীয় সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয় বলতে কী বোঝায়?

(ছ) বিনিয়োগ আইন কাকে বলে?

(জ) সরকারি বিল কাকে বলে?

(ঝ) বাজেট কাকে বলে?

(ঞ) রাজস্ব আইন বলতে কী বোঝেন?

(ট) সরকারি গণিতক কমিটির কাজ কী?

(ঠ) নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষকের দায়িত্ব কী?

(ড) পার্লামেন্টের দুটি আইন বিষয়ক কমিটির নাম করুন।

(ঢ) প্রোটেম স্পিকার বলতে কী বোঝেন?

(ণ) কোরাম (Quorum) বলতে কী বোঝেন?

(ত) অনাস্থা প্রস্তাব কাকে বলে?

(থ) জিরো আওয়ার বলতে কী বোঝায়?

(৩) প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিগন (৫০টি শব্দের মধ্যে)—

(ক) ভারতের পার্লামেন্টের গঠন পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

(খ) ভারতের পার্লামেন্টের আইন বিষয়ক কাজদ সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

(গ) পার্লামেন্ট কীভাবে আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে?

(ঘ) শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের ভূমিকা কী?

(ঙ) পার্লামেন্টের সদস্যদের অধিকার ও অব্যাহতিগুলি কী কী?

(চ) বিল বলতে কী বোঝায়? সংসদে উপস্থাপিত বিলগুলির কীভাবে শ্রেণিবিভাগ করা যাবে?

(ছ) অর্থ বিল কাকে বলে?

(জ) পার্লামেন্টের কমিটিগুলির নাম করুন।

(ঝ) অর্থ বিলের বৈশিষ্ট্য কী?

(ঞ) ভারতের পার্লামেন্টে বিরোধী দলের বৈশিষ্ট্য কী?

(৪) ১৫০টি বাক্যের মধ্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

(ক) ভারতে পার্লামেন্টের কাজগুলি বর্ণনা করুন।

(খ) লোকসভার স্পিকারের ভূমিকা আলোচনা করুন।

(গ) ভারতের সংসদের দুটি কক্ষের সাংবিধানিক সম্পর্ক আলোচনা করুন।

(ঘ) পার্লামেন্টে আইনপ্রণয়ন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন।

(ঙ) সংসদের অর্থ বিষয়ক কার্যপদ্ধতি আলোচনা করুন।

(৩ ও ৪ নং প্রশ্নগুলির জন্য ২.৬ অংশের উত্তর সংকেত দেখুন।)

২৭.১৩ উত্তরমালা

(১) (ক) ভারতের পার্লামেন্ট দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট।

(খ) লোকসভার সদস্যরা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত।

(গ) রাজ্যসভার ১২ জন সদস্যকে মনোনীত করেন রাষ্ট্রপতি।

(ঘ) উপরাষ্ট্রপতি পদাধিকার বলে রাজ্যসভার সভাপতি হন।

(ঙ) লোকসভার সদস্য হতে গেলে কোন ব্যক্তিকে কমপক্ষে ২৫ বছর বয়স্ক হতে হবে।

(চ) রাজ্যসভা স্থায়ী পরিষদ।

(ছ) সংবিধান অনুসারে মন্ত্রিসভা লোকসভার কাছে যৌথভাবে দায়িত্বশীল।

(জ) লোকসভার মুখপাত্র হলেন স্পিকার।

(ঝ) সরকারি গণিতক কমিটি একটি অর্থবিষয়ক কমিটি।

(ঞ) পার্লামেন্টের অধিবেশনে আহ্বান করেন রাষ্ট্রপতি।

(ট) পার্লামেন্টের যৌথ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্পিকার।

(ঠ) বাজেট প্রস্তুতি ও লোকসভায় পেশ করার দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির।

(২) (ক) ভারতের আইনসভার উচ্চকক্ষের নাম রাজ্যসভা। উপরাষ্ট্রপতি পদাধিকারবলে এই কক্ষের সভাপতি।

(খ) রাজ্যসভার সদজস্যদের যোগ্যতা হল (১) ভারতীয় নাগরিকত্ব (২) সমপক্ষে ৩০ বছর বয়স এবং (৩) পার্লামেন্টের বিধান অনুসারে অন্যান্য নির্দিষ্ট যোগ্যতা।

(গ) পার্লামেন্টের অবশিষ্ট ক্ষমতা বলতে বোঝায় সংবিধান নির্দিষ্ট তিনটি তালিকার বাইরে কোন বিষয়ের উপর ক্ষমতা।

(ঘ) প্রত্যর্পিত আইন হল সেই আইন যার দ্বারা পার্লামেন্ট শাসন বিভাগের হাতে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করে।

(ঙ) সরকারি আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রমের উদ্দেশ্যে গঠিত পার্লামেন্টের দুটি কমিটি হল সরকারি গণিতক কমিটি ও আনুমানিক আয়-ব্যয় হিসাব কমিটি।

(চ) কেন্দ্রীয় সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয় বলতে বোঝায় সেইসব ব্যয় যার ক্ষেত্রে বাৎসরিক অনুমোদন বা ভোটাভুটির প্রয়োজন হয় না। রাষ্ট্রপতি, লোকসভার স্পিকার ইত্যাদিদের ব্যয় এই শ্রেণিভুক্ত।

(ছ) বিনিয়োগ আইন হন সেই আইন যার বলে ভারতের সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয় ও অনুমোদিত ব্যয়, এই দুই শ্রেণির ব্যয়ের প্রয়োজনে ভারতের সঞ্চিত তহবিল থেকে অর্থ তোলার অনুমতি পাওয়া যায়।

(জ) সরকারি বিল হল জনস্বার্থ সম্পর্কিত সেইসব বিল যা মন্ত্রীরা উত্থাপন করেন।

(ঝ) সরকারের আনুমানিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বা বাৎসরিক অর্থ বিবরণীকে বাজেট বলা হয়।

(ঞ) রাজস্ব আইন হল সরকারের কর প্রস্তাব সমুহকে কার্যকর করার জন্য লোকসভা প্রণীত আইন।

(ট) সরকারি গণিতক কমিটির কাজ হল বিধিবদ্ধ ভাবে বা সঠিক ক্ষেত্রে সরকারি ব্যয় হয়েছে কিনা, কর্তৃপক্ষের ব্যয় করার অধিকার সঠিকভাবে প্রযুক্ত হয়েছে কিনা তা দেখা।

(ঠ) নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষকের দায়িত্ব হল পার্লামেন্ট যে উদ্দেশ্যে যে পরিমাণ ব্যয় মঞ্জুর করে সেই উদ্দেশ্যে সেই পরিমাণ অর্থব্যয় সরকার সঠিকভাবে করে কিনা তা দেখা। কেন্দ্রের ও রাজ্যের হিসাব সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালের কাছে রিপোর্ট করাও তাঁর কাজ।

(ড) পার্লামেন্টের দুটি আইন বিষয়ক কমিটির হল অধস্তন আইন সংক্রান্ত কমিটি ও বিল সংক্রান্ত সিলেকট কমিটি।

(ঢ) নতুন লোকসভা বসলে রাষ্ট্রপতি কক্ষের বয়োঃবৃদ্ধ সদস্যকে সাময়িকভাবে স্পিকার হিসাবে মনোনীত করেন। স্পিকার নির্বাচনের পূর্বে তিনিই সাময়িক ভাবে সভার কাজ পরিচালনা, সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করানো ইত্যাদি কাজ করেন।

(ণ) কোরাম হল সভার কার্য পরিচালনার জন্য ন্যূনতম সংখ্যক সদস্যদের উপস্থিতি জ্জ্বসভার এক দশমাংশ সদস্যদের উপস্থিতি না হলে কোরাম হয় না।

(ত) অনাস্থা প্রস্তাব হল সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী সদস্যদের আনীত অনাস্থার বিরুদ্ধে ভোটাভুটি দাবি। ভোটে পরাজিত হলে সরকারকে পদত্যাগ করতে হয়।

(থ) জিরো আওয়ার হল প্রশ্ন-উত্তর পর্ব এবং প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার মধ্যবর্তী সময়। স্পিকারের অনুমতি বা নোটিশ ছাড়াই এই সময় প্রশ্ন করা চলে।

(৩) উত্তর সংকেত ঃ (ক) ৩০-৩১ পৃষ্ঠা। (খ) ৩৩-৩৪ পৃষ্ঠা। (গ) ৩৪ পৃষ্ঠা। (ঘ) ৩৫ পৃষ্ঠা। (ঙ) ৪০ পৃষ্ঠা। (চ) ৪৩ পৃষ্ঠা। (ছ) ৪৫-৪৬ পৃষ্ঠা। (জ) ৫২-৫৩ পৃষ্ঠা। (ঝ) ৪৬ পৃষ্ঠা। (ঞ) ৪২ পৃষ্ঠা।

(৪) উত্তর সংকেত ঃ (ক) ৩২-৩৬ পৃষ্ঠা। (খ) ৩৭-৩৯ পৃষ্ঠা। (গ) ৩৬-৩৭ পৃষ্ঠা। (ঘ) ৪৩-৪৫ পৃষ্ঠা। (ঘ) ৪৭-৫০ পৃষ্ঠা।

২৭.১৪ গ্রন্থপঞ্জি

(১) Durga Das Basu : *Introduction to the Constitution of India (1999).*

(২) Subhas C. Kashyap : *Our Parliament (1995).*

(৩) S. L. Sikri : *Indian Government and Politics (1989).*

(৪) Granville Austin : *The Indian Constitution : Cornerstone of a Nation (1966).*

(৫) Dhirendranath Sen : *From Raj to Swaraj (1954).*

(৬) M. V. Pylee : *An Introduction to the Constitution of India (1995).*

একক ২৮ ❒ রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্য-মন্ত্রিপরিষদ

গঠন

২৮.১ উদ্দেশ্য
২৮.২ প্রস্তাবনা
২৮.৩ মূল আলোচনা ঃ রাজ্যের রাজ্যপাল
২৮.৩.১ রাজ্যপালের নিয়োগ ইত্যাদি
২৮.৪ রাজ্যপালের ক্ষমতা
২৮.৪.১ শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা
২৮.৪.২ আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা
২৮.৪.৩ বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা
২৮.৪.৪ অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা
২৮.৪.৫ জরুরি ক্ষমতা
২৮.৪.৬ স্ববিবেচনামূলক ক্ষমতা
২৮.৫ রাজ্যপালের প্রকৃত ভূমিকা
২৮.৬ রাজ্যের মন্ত্রিপরিষদ
২৮.৭ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী
২৮.৭.১ মুখ্যমন্ত্রীর নিয়োগ ঃ সাংবিধানিক ব্যবস্থা ও বাস্তব অভিজ্ঞতা
২৮.৭.২ মুখ্যমন্ত্রীর কার্যাবলি
২৮.৮ সারাংশ
২৮.৯ অনুশীলনী
২৮.১০ উত্তরমালা
২৮.১১ গ্রন্থপঞ্জি

২৮.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি—

- ভারতের শাসনব্যবস্থায় রাজ্যের শাসন বিভাগের (State Executive) রূপটি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- রাজ্যের শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হিসাবে রাজ্যপালের (The Governor) নিয়োগ, ক্ষমতা ও পদমর্যাদা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- রাজ্যের শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ কী ভূমিকা পালন করে সেটি বিচার করতে পারবেন।
- রাজ্যের প্রকৃত শাসক প্রধান হিসাবে মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা কী, রাজ্য-রাজনীতিতে এবং সর্ব ভারতীয় ক্ষেত্রে তিনি কী ভূমিকা পালন করে তার মূল্যায়ন করতে পারবেন।

২৮.২ প্রস্তাবনা

ভারতে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি পরিপূরক নীতি হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার ধারণাটি গ্রহণ করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার রীতি অনুসারে এদেশে একাধারে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের উপস্থিতি লক্ষণীয়। বর্তমান পর্যায়ের প্রথম এককে কেন্দ্রের শাসন বিভাগের রূপ বা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আপনারা কিছু ধারণা লাভ করেছেন। বর্তমান এককে রাজ্যের শাসনব্যবস্থার রূপটি কেমন সে বিষয়ে আপনারা পরিচিত হতে পারবেন। রাজ্যে শাসন ব্যবস্থার শীর্ষে থাকেন রাজ্যপাল। আইনত বা আনুষ্ঠানিকভাবে তিনিই রাজ্যের সর্বোচ্চ কার্যপালিকা শক্তি। ভারতীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রপতির মতোই সংবিধান অনুসারে রাজ্যের শাসনক্ষমতা রাজ্যপালের হাতে ন্যস্ত এবং তিনি এই ক্ষমতা প্রত্যক্ষভাবে অথবা তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীর মাধ্যমে প্রয়োগ করবেন। রাষ্ট্রপতির মতোই সংবিধান রাজ্যপালের নিয়োগ, কার্যকাল, যোগ্যতা, সুযোগসুবিধা ইত্যাদি নির্দেশ করেছে। প্রায় সবক্ষেত্রেই রাষ্ট্রপতির মতো আনুষ্ঠানিক দায়-দায়িত্ব পালন করলেও রাজ্যপালের ক্ষমতা অন্তত একটি ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এটি হল তাঁর স্ববিবেচনামূলক ক্ষমতা (Discretionalry Powers)। সংবিধান বিশেষজ্ঞ বা রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা রাজ্যপালকে নিয়মতান্ত্রিক শাসক হিসাবে সবক্ষেত্রে মেনে নিতে চান না। কেন্দ্রের মতো রাজ্যেও মন্ত্রিপরিষদ আছে এবং মন্ত্রিপরিষদের নেতা হিসাবে আছেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রীর মতো মুখ্যমন্ত্রীও বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন।

বর্তমান এককের প্রথম অংশে রাজ্যপালের ক্ষমতা ও পদমর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা আছে। রাজ্যপালের সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা সম্পর্কে শিক্ষার্থী পাঠক এই আলোচনার সূত্রে প্রয়োজনীয় মূল্যায়ন করতে পারবেন। বর্তমান এককের আলোচনার দ্বিতীয় অংশে রাজ্যের মন্ত্রিপরিষদের গঠন কার্যাবলি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। এই এককের শেষ অংশের আলোচনা থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা ও ভূমিকা সম্পর্কে শিক্ষার্থী পাঠক প্রয়োজনীয় ধারণা পাবেন।

২৮.৩ মূল আলোচনা ঃ রাজ্যের রাজ্যপাল

ভারত সরকারের মতোই রাজ্য সরকারের সবচেয়ে কর্মব্যস্ত বিভাগ হল রাজ্যের শাসন বিভাগ। ভারত রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান দায় দায়িত্বকে সফলভাবে রূপদানের ক্ষেত্রে ইউনিয়নের শাসন বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের শাসন বিভাগকেও প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করতে হয়। রাজ্যের রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদ, সচিবালয়, প্রত্যেককেই এক্ষেত্রে নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করতে হয়।

২৮.৩.১ রাজ্যপালের নিয়োগ ইত্যাদি

রাজ্যপাল হলেন রাজ্যের সর্বোচ্চ শাসন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ। ভারতের সংবিদানের ১৫৪ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে রাজ্যের শাসনক্ষমতা রাজ্যপালের হাতে ন্যস্ত এবং তিনি এই ক্ষমতা প্রত্যক্ষভাবে অথবা তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদের মাধ্যমে সংবিধান অনুসারে প্রয়োগ করবেন। "The executive power of the State shall be vested in the Governor and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with the constitution."—Art 154(1)]। রাজ্যপালের নিয়োগ, কার্যকাল, যোগ্যতা ও সুযোগসুবিধা সম্পর্কে সংবিধানের নির্দেশ হল ঃ

(১) ১৫৩ ধারায় বলা হয়েছে প্রত্যেক রাজ্যে একজন রাজ্যপাল থাকবেন। একই ব্যক্তির দুই বা ততোধিক রাজ্যের রাজ্যপাল হতে পারেন।

(২) রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন (১৫৫ ধারা)।

(৩) রাষ্ট্রপতি যতদিন সন্তুষ্ট থাকেন ততদিনই রাজ্যপাল নিজপদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ইতিমধ্যে রাষ্ট্রপতিকে লিখিতভাবে জানিয়ে তিনি পদত্যাগ করতে পারেন। সাধারণত পদে অধিষ্ঠিত হবার পর থেকে পাঁচ বছর হল রাষ্ট্রপতির কার্যকাল। পরবর্তী রাজ্যপাল কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত পূর্বের রাজ্যপালকে পদে অধিষ্ঠিত থাকতে হয় (১৫৬ ধারা)।

(৪) রাজ্যপালের পদের যোগ্যতা হল—(ক) ভারতীয় নাগরিকত্ব এবং (খ) ৩৫ বছর বয়স (১৫৭ ধারা)।

(৫) রাজ্যপালের পদে নিযুক্ত হতে হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে—(ক) পার্লামেন্ট বা রাজ্য বিধানমণ্ডলের সদস্য থাকা চলবে না। সদস্য হলেও রাজ্যপালের পদে যোগ দেবার পূর্বেই ঐ সদস্যপদ শূন্য হয়েছে বলে ধরা হবে। (খ) রাজ্যপাল অন্য কোন লাভজনক পদের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবেন না। (গ) বিনা ভাড়ায় কার্যক্ষেত্রে থাকার সুবিধা, বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা রাজ্যপাল ভোগ করবেন। তাঁর কার্যকালের মধ্যে অসুবিধাজনক ভাবে বেতন, ভাতা ইত্যাদি হ্রাস করা যাবে না (১৫৮ ধারা)।

রাজ্যপালকে মনোনীত করার সাংবিধানিক নির্দেশ নিয়ে বিতর্ক আছে। অনেকেই প্রশ্ন তোলেন রাজ্যপাল নির্বাচিত হলে অসুবিধা কোথায়? জনগণের দ্বারা নির্বাচিত রাজ্যপাল জনগণের সমস্যা বুঝবেন, নিজের বুদ্ধি বিবেচনা মতো শাসন পরিচালনায় অংশ নেবেন এটাই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। সংবিধান রচনার প্রথমদিকে নির্বাচিত রাজ্যপালের প্রস্তাব ছিল। সংবিধানের খসড়া কমিটি (The Drafting Committee) প্রস্তাব করে কোন রাজ্যের আইনসভা দ্বারা নির্বাচিত ৪ জন ব্যক্তির মধ্যে একজনকে রাষ্ট্রপতি ঐ রাজ্যের রাজ্যপাল হিসাবে নিয়োগ করবেন। গণপরিষদ এইসব সুপারিশ অগ্রাহ্য করে সরাসরি রাষ্ট্রপতি রাজ্যপাল নিয়োগ করবেন এই ব্যবস্থাই নির্দেশ করে। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি রাজ্যপালের সঙ্গে সংসদীয় শাসনে নির্বাচিত মন্ত্রিপরিষদ বা ক্যাবিনেটের ক্ষমতার বিবাদ বা প্রতিযোগিতা চলুক গণপরিষদ এটা চায়নি। বি. এন. রাউ-এর (B. N. Rau) মতো গণপরিষদের কোন কোন সদস্যরা মনে করেছেন যেক্ষেত্রে রাজ্যপাল মন্ত্রীদের পরামর্শমতোই চলবেন সেক্ষেত্রে তাঁর প্রত্যক্ষ নির্বাচন জটিলতাই সৃষ্টি করবে রাজ্যপাল আইনসভার দ্বারা নির্বাচিত হলে আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল তাঁকে প্রভাবিত করবে না এ কথা বলা যায় কী? গণপরিষদ রাজ্যপালকে দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বেই রাখতে চেয়েছে। রাজ্যপালকে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী হিসাবেই গণপরিষদ দেখতে চেয়েছে। রাজ্যপাল দলমত নিরপেক্ষ হবেন, আঞ্চলিকতার ঊর্ধ্বে থেকে দেশের স্বার্থে কাজ করবেন গণপরিষদ বিষয়টিকে এইভাবেও দেখেছে।

পরবর্তী আলোচনার রাজ্যপালের ক্ষমতা সম্পর্কে শিক্ষার্থী পাঠক অবহিত হতে পারবেন।

২৮.৪ রাজ্যপালের ক্ষমতা

সংবিধান অনুসারে রাজ্যপাল রাজ্যের সর্বোচ্চ কার্যপালিকা শক্তি, আইন বিভাগের অন্তর্নিহিত অংশ, ন্যায় বিচারের উৎস। রাজ্যপালের ক্ষমতার প্রশ্নে সংবিধান তাঁর স্ব-বিবেচনামূলক ক্ষমতা (Discretionary powers) ও অন্যান্য ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য করেছে। সংবিধানে বলা হয়েছে, যে সব বিষয়ে রাজ্যপালের স্ব-বিবেচনামূলক

ক্ষমতা ব্যবহারের প্রয়োজন হবে না সেই সব বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিপরিষদ রাজ্যপালকে পরামর্শদান ও কার্ড পরিচালনায় সহায়তা করবে। ["There shall be a Council of Ministers with the Chief Minister at the head to aid and advise the Governor in the exercise of his functions except in so far as he is by or under this constitution required to exercise his function or any of them in his discretion." Art 163 (1)] সংবিধান কোন প্রদেশ ও উপজাতি অঞ্চলের রাজ্যপালের হাতে বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করেছে (সংবিধানের ৩৭১ ক ও ৩৭১ জ)। সংবিধানের ১৬০ ধারায় বলা হয়েছে রাষ্ট্রপতি প্রয়োজনে রাজ্যপালের হাতে সংবিধানের উল্লেখ করা হয় নি অথচ সম্ভাব্য ক্ষেত্রে দায়িত্ব অর্পণ করতে পারেন। রাজ্যপালের শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা যে রাজ্যের আইন বিভাগীয় ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত হতে পারে সংবিধানের ১৬২ ধারায় সে কথারও উল্লেখ আছে। জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যপালের ক্ষেত্রে অবশ্য সংবিধান নির্দেশিত রাজ্যপালের শপথ গ্রহণ, বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা, রাষ্ট্রপতি আরোপিত সম্ভাব্য ক্ষমতা, আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা বা স্ব-বিবেচনাধীন ক্ষমতা (১.৫৯ থেকে ১৬৩ ধারা) সংক্রান্ত ব্যবস্থার প্রয়োগ হবে না।

রাজ্যের রাজ্যপালের ক্ষমতাগুলিকে এইভাবে শ্রেণিবিভাজন করে আলোচনা করা যেতে পারে ঃ

২৮.৪.১ শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা

রাজ্যপালের এই ক্ষমতার মধ্যে পড়ে নিয়োগ সংক্রান্ত ক্ষমতা ও অন্যান্য প্রশাসনিক ক্ষমতা। রাজ্যের মহাব্যবহারিক (Advocate General), রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের (State Public Service Commission) সদস্যদের তিনি নিয়োগ করেন। তবে রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সদস্যদের অপসারণের ক্ষমতা রাজ্যপালের নেই। মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ ও মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করা তাঁর আনুষ্ঠানিক কর্তব্য। রাজ্যপালের খুশির উপর এঁরা নিজপদে অধিষ্ঠিত থাকনে। রাজ্যের শাসন কার্যের সুপরিচালনার জন্য রাজ্যপাল নিয়মাবলি প্রণয়ন করেন। বিভিন্ন রাজ্যে তপশিলি জাতি ও উপজাতি, অনুন্নত শ্রেণির কল্যাণের ভার রাজ্যপালের উপর দেওয়া হয়েছে। কোন কোন রাজ্যে এই উদ্দেশ্যে রাজ্যপাল একজন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নিয়োগ করতে পারেন। রাজ্যপাল তপশিলি উপজাতি এবং তপশিলভুক্ত এলাকায় প্রশাসন সম্পর্কে প্রতি বৎসর কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রতিবেদন পাঠাতে পারেন।

> ***প্রান্তলিপি ঃ*** *জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের সংবিধান ঐ রাজ্যের গণপরিষদ রচনা করেছে। সুতরাং ভারতীয় সংবিধান দ্বারা ঐ রাজ্যের সংবিধান পরিচালিত নয়। ঐ রাজ্যের রাজ্যপ্রধানকে আগে বলা হত 'সদর-ই-রিয়াসৎ'। বর্তমানে অবশ্য তিনি রাজ্যপাল নামেই পরিচিত। রাজ্যের বিধানসভার সুপারিশ অনুসারেই রাষ্ট্রপতি তাঁকে স্বীকৃতি দেন।*

২৮.৪.২ আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা

রাজ্যপাল রাজ্য আইনসভার অঙ্গ (১৬৪ ধারা)। রাজ্যের আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করা, আইনসভার অধিবেশন স্থগিত রাখা এবং বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার অধিকার রাজ্যপালের আছে। রাজ্যপালের সম্মতি ছাড়া কোন বিল আইনে পরিণত হয় না। রাজ্যপাল সবক্ষেত্রে যে আইনসভা প্রণীত বিলে সম্মতি দেবেন তা নয়। বিলে তিনি সম্মতি নাও দিতে পারেন অথবা বিলটিকে পুনর্বিবেচনার জন্য আইনসভায় ফেরত পাঠাতে পারেন। আবার নিজস্ব কোন মতামত না দিয়ে তিনি রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য বিলটি পাঠাতে পারেন। অর্থবিলের ক্ষেত্রে অবশ্য রাজ্যপালের এ ধরনের ক্ষমতা নেই। রাজ্য আইনসভার সঙ্গে রাজ্যপালের সম্পর্কের অন্যান্য ক্ষেত্রগুলি হল ঃ

(ক) রাজ্য আইনসভায় বক্তৃতা দেওয়া বা বাণী পাঠানোর ক্ষমতা তাঁর আছে। (খ) আইনসভা অধিবেশনে না থাকলে রাজ্যপাল অস্থায়ী জরুরি আইন (Ordinance) জারি করতে পারেন। আইনসভা অধিবেশনে বসার ৬ সপ্তাহ পরে এই আইন আর কার্যকর থাকে না। (গ) যে রাজ্যের আইনসভায় দুটি পরিষদ আছে, সেখানে রাজ্যপাল উচ্চতর কক্ষ বা বিধান পরিষদে চারুকলা, সাহিত্য, সমাজসেবা প্রভৃতিচতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে মনোনীত করেন (১৭১(৫) ধারা)। (ঘ) রাজ্যপাল যদি মনে করেন যে রাজ্যের আইনসভায় ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায় পর্যাপ্তভাবে প্রতিনিধিত্ব পায় নি, তবে তিনি ঐ সম্প্রদায় থেকে ১ জন সদস্য বিধানসভায় মনোনীত করতে পারেন ৩৩০ ধারা)।

D

২৮.৪.৩ বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা

রাষ্ট্রপতির মতো রাজ্যপালকেও ন্যায় বিচারের প্রতীক (Symbol of Justice) বলা চলে। কয়েকটি ক্ষেত্রে অপরাধীকে ক্ষমা করবার বা অপরাধীর দণ্ডাদেশ স্থগিত বা হ্রাস করবার ক্ষমতা রাজ্যপালের আছে (১৬১ ধারা)। তবে মৃত্যুদণ্ডের ক্ষেত্রে রাজ্যপাল দণ্ডাদেশ হ্রাস বা স্থগিত করতে সমর্থ হলেও ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতা তাঁর নেই। এই ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির অনন্য ক্ষমতা (Exclusive Powers)। রাজ্যের হাইকোর্টের বিচারপতি নিয়োগের ক্ষমতাও তাঁর নেই। তবে রাষ্ট্রপতি এক্ষেত্রে রাজ্যপালের সঙ্গে পরামর্শ করেন (২১৭ ধারা)।

২৮.৪.৪ অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা

অর্থসংক্রান্ত কোন বিল বিধানসভায় উত্থাপন করতে হলে রাজ্যপালের অনুমতি প্রয়োজন। রাজ্যপাল আইনসভায় সরকারের পক্ষে বাৎসরিক আর্থিক বিবৃতি পেশ করেন। ব্যয়বরাদ্দের কোন দাবি রাজ্যপালের অনুমতি ছাড়া বিধানসভায় উপস্থিত করা যায় না।

২৮.৪.৫ জরুরি ক্ষমতা

রাষ্ট্রপতির মতো জাতীয় জরুরি অবস্থা জারি করা বা আর্থিক জরুরি অবস্থা জারির কোন ক্ষমতা রাজ্যপালের নেই। তবে রাজ্যের সরকার সংবিধান মেনে চলছে না এই মর্মে রাষ্ট্রপতির কাছে তিনি রিপোর্ট পাঠাতে পারেন। তাঁর রিপোর্টের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি রাজ্যে সাংবিধানিক অচলাবস্থা ঘোষণা করতে পারেন ও রাজ্যের শাসনভার নিজের হাতে তুলে নিতে পারেন। (সংবিধানের ৩৫৬ ধারা)।

২৮.৪.৬ স্ব-বিবেচনামূলক ক্ষমতা

সংবিধান একটি ক্ষেত্রে রাজ্যপালকে বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছে, যা রাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রে নেই। সংবিধান রাজ্যপালকে তাঁর স্ব-বিবেচনা অনুসারে (in his discretion) কিছু কিছু কাজ করার অধিকার দিয়েছে। এ সম্পর্কে সংবিধানের বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট। সংবিধানের ১৬৩(১) ধারায় বলা হয়েছে, যে ক্ষেত্রে রাজ্যপাল স্ব-বিবেচনা অনুসারে ক্ষমতা ব্যবহার করবেন সেই ক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্য প্রশ্নে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিপরিষদের সাহায্য ও পরামর্শ নিয়ে চলবেন। সংবিধানের ১৬৩(২) ধারায় বলা হয়েছে, কোন বিষয় সম্পর্কে রাজ্যপাল স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারবেন কিনা এ সম্পর্কে প্রশ্ন উঠলে রাজ্যপালের মীমাংসাই চূড়ান্ত বলে গণ্য

> ***প্রান্তলিপি*** *ঃ রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনে প্রদত্ত প্রাদেশিক গভর্নরের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা (Discretionary Power) ও স্ববিবেকমতো চলার ক্ষমতা (to act individual judgement) অনুসরণে গৃহীত।*

হবে এবং রাজ্যপালের সিদ্ধান্ত নিয়ে কোন প্রশ্ন তোলা যাবে না। ["If any question arises whether any matter is or is not a matter as respects which the Governor is by or under this constitution required to act in his discretion, the decision of the Governor in his discretion shall be final, and the validity of any thing done by the governor shall not be called in question on the ground that he ought or ought not to have acted in his discretion." Act 163(2)] সংবিধান অনুসারে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে রাজ্যপাল তাঁর স্ব-বিবেচনা অনুসারে কাজ করতে পারেন তা দেখা যাক ঃ

(ক) (i) ৬ তপশিলের ৯(২) অনুচ্ছেদ অনুসারে আসামের রাজ্যপাল জেলা পর্ষদকে (District council) কী পরিমাণ অর্থ খনি থেকে প্রাপ্ত লাইসেন্স থেকে দেওয়া হবে তা স্থির করবেন। (ii) সংবিধানে ২৩৯ (২) ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি রাজ্যপালকে কোন সংযুক্ত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসক (Administrator) হিসাবে নিযুক্ত করতে পারেন এবং এক্ষেত্রে রাজ্যপাল তাঁর মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ ছাড়া স্ব-বিবেচনা অনুসারে কাজ করতে পারেন।

(খ) সংবিধান সংশোধনের পর কতকগুলি ক্ষেত্রে রাজ্যপালকে বিশেষ দায়িত্ব সহকারে (On his special responsibility) কাজ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ নিলেও এসব ক্ষেত্রে রাজ্যপালের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত এবং এক্ষেত্রে আদালত কোনও প্রশ্ন তুলতে পারবে না। রাজ্যপালের এই কাজগুলি হল ঃ

(i) ৩৭১(২) ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি মহারাষ্ট্র অথবা গুজরাটের রাজ্যপালকে কতকগুলি অঞ্চলের উন্নতির স্বার্থে (বিদর্ভ, সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি) বিশেষ দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিতে পারেন।

(ii) ৩৭১ ক (১) খ ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি নাগাল্যান্ডের রাজ্যপালকে আইন ও নিরাপত্তা রক্ষার বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করতে পারেন।

(iii) ৩৭১ গ (১) খ ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি মণিপুরের রাজ্যপালকে সেই রাজ্যের বিধানসভার কমিটিতে পার্বত্য অঞ্চলের প্রতিনিধি নিয়োগের বিশেষ দায়িত্ব দিতে পারেন সংশ্লিষ্ট কমিটির দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের উদ্দেশ্যে।

(iv) ৩৭১ ছ ঞ ধারা অনুসারে সিকিমের রাজ্যপাল সেই প্রদেশের শান্তি রক্ষার্থে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে বিশেষ দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

এই সমস্ত বিশেষ দায়িত্ব পালনে রাজ্যপাল সময়ে সময়ে রাষ্ট্রপতির নির্দেশ মতো এবং নিজের বিবেচনামতো কাজ করবেন।

(গ) অন্য কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে রাজ্যপাল মন্ত্রিসভার পরামর্শ ছাড়া স্বীয় বিবেচনামতো কাজ করতে পারেন সংবিধানে তা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। এক্ষেত্রে কতকগুলি দৃষ্টান্ত হল ঃ

(i) সংবিধানের ৩৫৬ ধারা অনুসারে রাজ্যের সাংবিধানিক অচলাবস্থা সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে রিপোর্ট প্রদান।

(ii) রাষ্ট্রপতি রাজ্যপালের রিপোর্টের ভিত্তিতে রাজ্যে সাংবিধানিক অচলাবস্থার কারণে রাষ্ট্রপতির শাসন বলবৎ করলে রাজ্যপালকে রাষ্ট্রপতির এজেন্ট হিসাবে ঐ সমস্ত প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালন করতে হয়।

(iii) সংবিধানের ২০০ ধারা অনুসারে রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য রাজ্য আইনসভা প্রণীত কোন বিল মন্ত্রিসভার সঙ্গে পরামর্শ না করেই সংরক্ষিত রাখতে পারেন।

সন্দেহ নেই রাজ্যপালের স্ব-বিবেচনামূলক ক্ষমতা অথবা রাজ্যপালের বিশেষ দায়িত্ব উভয় ক্ষেত্রেই রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণেই তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন এটাই ধরে নেওয়া যায়। পরবর্তী আলোচনা থেকে রাজ্যপালের পদের প্রকৃতি এবং তার বাস্তব ভূমিকা কী এ বিষয়ে শিক্ষার্থী পাঠক ধারণালাভ করতে পারবেন। রাজ্য মন্ত্রিসভার সঙ্গে রাজ্যপালের সম্পর্ক কী এ প্রশ্নে রাষ্ট্রনীতিবিদ বা সাংবিধানিক বিশেষজ্ঞরা যে বিতর্কের অবতারণা করেছেন সে বিষয়েও পাঠক নিজস্ব অভিমত যাচাই করে নিতে পারেন।

২৮.৫ রাজ্যপালের প্রকৃত ভূমিকা

রাজ্যপালের প্রকৃত ভূমিকা কী এ প্রশ্নে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক ও সংবিদানবিদগণ একমত নন। একটি গোষ্ঠীর মত হল রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির নিয়মতান্ত্রিক শাসকপ্রধান মাত্র। ভারতের সংসদীয় ব্যবস্থার প্রয়োজনে কেন্দ্রে যেমন রাষ্ট্রপতি আনুষ্ঠানিক শাসক হিসাবে কাজ করেন রাজ্যেও তেমনি রাজ্যপাল আনুষ্ঠানিক শাসক প্রধান। সংবিধানের ১৬৩ (১) ধারা এ কথা স্পষ্ট বলেছে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ছাড়া অন্যান্য সমস্ত ক্ষমতা রাজ্যপালকে প্রয়োগ করতে হয় রাজ্য মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুসারে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে রাজ্যপালকে সংবিধান অনুসারেই চলতে হবে। ১৯৫৫ সালে রাম জওয়ায়া বনাম পাঞ্জাব রাজ্য মামলায় (Ram Jawaya V. State of Punjab 1955) বা ১৯৭৪ সালে হরগোবিন্দ বনাম রঘুকুল তিলক মামলায় (Hargoband V. Raghukul Tilak, 1974) সুপ্রিমকোর্ট রাজ্যের ক্ষেত্রে রাজ্যপালকে নিয়মতান্ত্রিক শাসক হিসাবে গণ্য করে এ কথাই স্মরণ করিয়েছে ইংলন্ডের মতোই আমাদের একই ধরনের সংসদীয় শাসন বিভাগের অস্তিত্ব আছে। (".... We have the same system of Parliamentary executive in England.........")। ড. আম্বেদকর বলেছেন রাজ্যপালের পদ রাষ্ট্রপতির পদেরই অনুরূপ (The position of the Governor is exactly the same as the position of the President)। দুর্গাদাস বসু মনে করেন যে ক্ষেত্রে কোন রাজ্যে বিশেষ রাজনৈতিক দলের স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে সেক্ষেত্রে রাজ্যপালকে নিয়মতান্ত্রিক এবং নিরপেক্ষ শাসক প্রধান হিসাবেই তাঁর ভূমিকা পালন করতে হয়। তবে যেক্ষেত্রে রাজ্যে একাধিক দলের প্রাধান্য থাকে এবং আইনসভায় তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অনিশ্চিত সেক্ষেত্রে রাজ্যপাল নিয়মতান্ত্রিক শাসকপ্রধান নন, কেন্দ্রের এজেন্ট হিসাবেই ভূমিকা পালন করেন। সম্ভবত এই কারণেই রাজ্যপালকে নিয়মতান্ত্রিক শাসক নয়, কেন্দ্রের এজেন্ট হিসাবেই অনেকে গণ্য করেন।

সন্দেহ নেই সংবিধানের কতকগুলি ব্যবস্থার জন্যই রাজ্যপালকে কেন্দ্রের এজেন্ট হিসাবে গণ্য করা হয়।

প্রথমত ঃ রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত। রাষ্ট্রপতির অপসারণ, বদলি এসবও রাষ্ট্রপতি তথা কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। রাজ্যপাল নিয়োগ অপসারণ এবং বদলির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার যে সবক্ষেত্রে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি মেনে চলেছে বা নিরপেক্ষ ভূমিকা নিয়েছে এ কথা বলা যাবে না। রাজ্যপাল নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক স্বার্থ বা প্রশ্নই গুরুত্ব পেয়েছে। জে. সি. জোহারি (J. C. Johari) কেন্দ্র নিযুক্ত রাজ্যপালের একটি তালিকা পেশ করে দেখিয়েছেন কেন্দ্রের অনুগত ব্যক্তি, সরকারের অনুগত আমলা, হতাশ ও ব্যর্থ রাজনীতিবিদ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নির্বাচিত বিশেষ বুদ্ধিজীবীকে রাজ্যপালের পদে নিযুক্ত করা হয়েছে। এস. আর মহেশ্বরী (S. R. Maheswari) মতো বিশিষ্ট রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকের মতে ১৯৬৭ সালের পর থেকে রাজ্যপাল বদলির যে প্রবণতা

শুরু হয়েছে তা অত্যন্ত অসম্মানজনক। নির্দিষ্ট সময়ের আগে রাজ্যপালের অপসারণ বা বদলির ঘটনা ঘটেছে প্রায় প্রতিটি রাজ্যেই। এই পাঞ্জাবেই ১৯৮১ সালের পরবর্তী পাঁচ বছরে রাজ্যপাল বদলের ঘটনা ঘটেছে ৭ বার। ১৯৮৯ সালে জাতীয় মোর্চা সরকার ক্ষমতায় আসার পর সব রাজ্যের রাজ্যপালকেই পদত্যাগের নির্দেশ দেয় এবং এক্ষেত্রে সর্বত্র যে সৌজন্য বা শালীনতার সীমারেখা মানা হয়েছে তা বলা যাবে না।

দ্বিতীয়ত, ৭৪(১) ধারা সংশোধন করে (৪২তম সংশোধন) সংবিধান রাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পরামর্শ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করলেও সংবিধানের ১৬৩ (১) ধারায় সংশোধন করে রাজ্যপালের ক্ষেত্রে রাজ্য মন্ত্রিসভার পরামর্শ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করে নি। সম্ভবত রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার কথা বিবেচনা করেই এই সংশোধন সম্ভব হয়নি। সংবিধান রাজ্যপালকে স্বেচ্ছাধীন বা স্ব-বিবেচনামূলক ক্ষমতা দিলেও রাষ্ট্রপতিকে দেয়নি অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার পরামর্শ ছাড়া তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করতে না পারলেও রাজ্যপাল কিছু কিছু ক্ষেত্রে পারেন।

তৃতীয়ত, রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার সাংবিধানিক অবস্থানের দিকে তাকিয়ে সাংবিধানিক বিশেষজ্ঞরা বলেন ১৬৩ (২) ধারা অনুসারে কোনটা রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার মধ্যে পড়ে আর কোনটা নয় সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার চূড়ান্ত অধিকার তাঁরই। এমনকি এই সিদ্ধান্তের বৈধতা বিচারের ক্ষমতা কারোর নেই, আদালতেরও নয়। সংবিধানের ষষ্ঠ তপশিলের নবম অনুচ্ছেদ ব্যতীত সংবিধান রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা নির্ধারণ করে নি বা চিহ্নিত করে নি। সমালোচকের প্রশ্ন, এক্ষেত্রে রাজ্যপাল স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার বর্মে নিজেকে রাজ্য সরকারের উর্ধ্বে স্থাপন করতে পারেন। কেন্দ্র নিযুক্ত রাজ্যপাল স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার প্রয়োগে কেন্দ্রের এজেন্ট হিসাবে কাজ করার পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন। এই সুযোগ যে তিনি গ্রহণ করেন নি তাও নয়। স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ব্যবহারের সুযোগ নিয়ে রাজ্যপাল বহু ক্ষেত্রেই গণতন্ত্রের রীতি লঙ্ঘন করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর নিয়োগে ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ ও রাজস্থানে, ১৯৭৮ সালে আসাম, ১৯৮২ সালে হরিয়ানায়, ১৯৮৪ সালে জম্মু ও কাশ্মীরে, ১৯৮৭ সালে পাঞ্জাবে রাজ্যপাল নিশ্চিত সংখ্যা গরিষ্ঠতায় নিয়ম না মেনেই নিজের ক্ষমতা ব্যবহার করেছেন। সিকিমে, জম্মু ও কাশ্মীরে, অন্ধ্রপ্রদেশে মন্ত্রিপরিষদকে অপসারণ করে রাজ্যপাল অগণতান্ত্রিক নজির স্থাপন করেছেন। কিছুকাল আগেও উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারানোর অজুহাতে নির্বাচিত রাজ্য সরকারকে বরখাস্ত করেছেন সরকারকে বিধানসভায় সংখ্যা গরিষ্ঠতার প্রমাণ করার সুযোগ না দিয়ে। অকারণে বিধানসভা ভেঙে দেওয়া, স্থগিত রাখা, রাজ্যের অচলাবস্থা নিয়ে রাষ্ট্রপতিকে রিপোর্ট করা, ৩৫৬ ধারার প্রয়োগ রাজ্যপালের ক্ষমতার অপপ্রয়োগ এবং কেন্দ্রের এজেন্ট হিসাবে কাজ করার অগণতান্ত্রিক নজির ভারতের রাজনীতিতে বার বার ঘটেছে।

স্বেচ্ছাধীন বা স্ব-বিবেচনামূলক ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে রাজ্যপাল অনেক ক্ষেত্রেই কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে তিক্ততার সৃষ্টি করেছেন। রাজ্যপালের দায়িত্বহীন কার্যকলাপের দিকে চেয়ে সমালোচকদের অভিমত, রাজ্যপালের পদের সাংবিধানিক গুরুত্ব বা মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত না হয়ে কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী হয়ে চলাটাই যেন প্রবণতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজ্যপালকে 'Veritable agent of the centre' (কেন্দ্রের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি) 'Subordinate agent of the Union Government' (কেন্দ্রীয় সরকারের অধস্তন এজেন্ট) 'Prime Minister's hatchetment' (প্রধানমন্ত্রীর কুঠার-বাহক) নানাভাবে উত্থাপিত করা হয়েছে। বিগত দিনে পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যপাল ধর্মবীরের আচরণ, কাশ্মীরে জগমোহনের কার্যকলাপ, অন্ধ্রপ্রদেশে রাজ্যপাল রামলালের পদক্ষেপ, সিকিমে হোমি তলিযারখানের প্রতিক্রিয়া, কিছুকাল আগে উত্তর প্রদেশে রমেশ ভাণ্ডারীর পদক্ষেপ বা অতি সম্প্রতি

বিহারের রাজ্যপাল বিনোদ পাণ্ডের ভূমিকা সংসদীয় গণতন্ত্র বা এদেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রতি অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধার প্রকাশ। প্রশ্ন ওঠে আইনসভার কাছে যৌথভাবে দায়িত্বশীল ও নির্বাচিত মন্ত্রিসভাকে অবজ্ঞা করে কেন্দ্রের মনোনীত রাজ্যপাল তাঁর স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাকে যথেচ্ছ করবেন এটা নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য কিনা। রাজ্যের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা রাজ্যপালের অবাধ ক্ষমতা ব্যবহারের উর্বর ক্ষেত্র হয়ে উঠবে এটা মোটেই অভিপ্রেত নয়। সংবিদান রচয়িতারা রাজ্যপালের অবাধ ক্ষমতা গ্রাহ্য করেছেন দেশের ঐক্যের কথা ভেবে, ঐতিহাসিকভাবে কেন্দ্র-রাজ্যকে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত করার বৃহত্তর স্বার্থে। কোন খণ্ডিত রাজনৈতিক স্বার্থ বা কেন্দ্রের শক্তি বৃদ্ধির কথা ভেবে নয়।

সম্ভবত এই কারণেই রাজ্যপালকে কেন্দ্রের এজেন্ট হিসাবে গণ্য করতে অনেকেই দ্বিধা করেন। নিরপেক্ষ বিচারে বলা হয় ঃ

(১) সংসদীয় গণতন্ত্র ও যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির সর্বস্বীকৃত প্রথা মেনেই রাজ্যপাল চলবেন গণতান্ত্রিক মানুষ রাজ্যের জনপ্রতিনিধি এবং গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীয় সরকার সকলেই এটা চান। রাজ্যপালের হঠকারী আচরণ যে, বিচার বিভাগও মেনে নিতে পারেনি উত্তর প্রদেশের দৃষ্টান্ত এ কথা প্রমাণ করে। সংবিধান রাজ্যপালকে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা দিলেও কার্যক্ষেত্রে রাজ্য মন্ত্রিসভাকে তিনি অগ্রাহ্য করতে পারেন না।

(২) একান্ত অস্বাভাবিক এবং অনিশ্চিত অবস্থায় রাজ্যপালের সক্রিয় হবার সুযোগ অবশ্যই আছে। মন্ত্রিসভাকে সতর্ক করা, সরকার ও প্রশাসন সম্পর্কে অবহিত হওয়া, রাজ্যের অসংযমী সরকারকে সংযমী ও সজাগ করার অধিকার রাজ্যপালের থাকতেই পারে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রের এজেন্ট হিসাবে নয়, রাজ্যের সাংবিধানিক অভিভাবক হিসাবেই রাজ্যপাল তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন, রাজ্য সরকারের সাথে সংঘর্ষের পথে না গিয়ে রাজ্য সরকারের বিবেক হিসাবে তিনি দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

(৩) রাজ্যের সামগ্রিক কাজকর্মের উন্নয়নে সামাজিক ন্যায়ের স্বার্থে রাজ্যপাল সাহস, সদিচ্ছা ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে কাজ করতে পারেন, ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারেন, নিতান্ত সিলমোহর তিনি নন এটাই আসল কথা। সুপ্রিমকোর্ট রাজ্যপালকে স্বাধীন সাংবিধানিক ভূমিকায় দেখতে চেয়েছে। ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণে এই দপ্তর চলবে না। সোলী সোরাবজী (Soli Sorabjee) মনে করেন রাজ্যপাল সন্ন্যাসীও হবেন না আবার রাজ্যের স্বার্থের অন্তরায় হিসাবেও কাজ করবেন না (Governor neither sage nor saboteur)। সারকারিয়া কমিশন (Sarkaria Commission) সাংবিধানিক দপ্তরের প্রধান হিসাবে রাজ্যপালকে মনে রাখতে হবে তিনি কেন্দ্রের অনুগত ব্যক্তি নন বা অধস্তন এজেন্ট নন। কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সুস্থ বোঝাপড়া গড়ে তোলার ক্ষেদেত্র তাঁর বিশেষ ভূমিকা আছে। সংবিধান রক্ষার শপথ বাক্যকে মাথায় রেখে রাজ্যের সেবা ও জনগণের কল্যাণে রাজ্যপাল নিজেকে নিয়োগ করবেন।

পরবর্তী অংশের আলোচনায় রাজ্য মন্ত্রিপরিষদ সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু ধারণা পাওয়া যাবে।

২৮.৬ রাজ্যের মন্ত্রিপরিষদ

রাজ্যপালের কার্য পরিচালনায় সাহায্য ও পরামর্শ দেবার জন্য প্রত্যেক রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি করে মন্ত্রিপরিষদ আছে [“There shall be a Council of Ministers with the Chief Minister at the head

to aid and advise the Governor in the exercise of this function....” Art 163(1)]। মন্ত্রি পরিষদ সম্পর্কে অন্যান্য যে সব কথা সংবিধানে আছে তা হল ঃ

(১) রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়োগ করবেন এবং অন্যান্য মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শমত রাজ্যপাল দ্বারা নিযুক্ত হবেন। রাজ্যপালের সন্তুষ্টির উপর মন্ত্রীদের কার্যকার নির্ভরশীল (১৬৪ (১) ধারা)।

(২) মন্ত্রিপরিষদ সমবেতভাবে রাজ্য বিধানসভার কাছে দায়িত্বশীল (১৬৪ (২) ধারা)।

(৩) নিজের দপ্তরের দায়িত্ব নেবার পূর্বে মন্ত্রীদের রাজ্যপাল শপথ বাক্য পাঠ করাবেন। এ ব্যাপারে তৃতীয় তপশিলের বিধি কার্যকর হবে। (১৬৪ (৪) ধারা)।

(৪) মন্ত্রিসভার সব সদস্যকেই রাজ্য আইনসভার সদস্য হতে হবে। আইনসভার সদস্য না হলে ৬ মাসের বেশি কেউ মন্ত্রীত্বে থাকতে পারবেন না (১৬৪ (৪) ধারা)।

(৫) রাজ্য আইনসভার আইন অনুসারেই মন্ত্রীদের বেতন ও ভাতা নির্ধারিত হবে। যেক্ষেত্রে আইনসভা এই বিষয়ে কিছু স্থির করবে না সেক্ষেত্রে সংবিধানে দ্বিতীয় তপশিল মেনেই মন্ত্রীদের বেতন ও ভাতা স্থির হবে (১৬৪ (৫) ধারা)।

প্রান্তলিপি *ঃ তৃতীয় তপশিলের বিধি অনুসারে রাজ্যের মন্ত্রীকে ঈশ্বরের নামে অথবা তাঁর ইচ্ছামতো বিশ্বস্তভাবে সংবিধানের প্রতি অনুগত থেকে দেশের সার্বভৌমিকতা ও সংহতি রক্ষা, সচেতনভাবে মন্ত্রী হিসাবে নিজ দায়িত্ব পালন এবং জনগণের স্বার্থে ভয়, ভীতি ও পক্ষপাতহীন ভাবে কাজ করার অঙ্গীকার গ্রহণ করতে হয় [Schedule III(V)] ।*

মন্ত্রিপরিষদের সৃষ্টি সরকার ও প্রশাসনের দায়িত্ব নির্ধারিতভাবে পালনের জন্য। অর্থ, স্বরাষ্ট্র, তথ্য, বিচার, শিল্প, পরিবহন, খাদ্য, কৃষি, জনস্বার্থ, পূর্ত—নানা ক্ষেত্রে মন্ত্রীদের নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করতে হয় সচিবালয়ের (Secretariat) সাহায্য নিয়ে। প্রতিটি মন্ত্রীদপ্তরেই সচিব ও অসংখ্যা কর্মচারী থাকেন। রাজ্যের সরকার সংবিদান অনুসারে পরিচালনা, দেশের নিরাপত্তা ও সংহতি সুরক্ষিত রেখে কাজ করা মন্ত্রীদের দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে অর্থাৎ সংবিধান অনুসারে রাজ্যের প্রশাসন পরিচালিত না হলে রাজ্যপাল এ বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে রিপোর্ট করতে পারেন। অবশ্য মন্ত্রীরা, বিধানসভার প্রতি আস্থাভাজন থেকেই কাজ করবেন। রাজ্যপালের সন্তুষ্টির উপর তাঁদের কার্যকাল নির্ভরশীল হলেও, সংসদীয় গণতন্ত্রের রীতি অনুসারে বিধানসভার আস্থা অর্জনই তাঁদের ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। মন্ত্রিপরিষদ গঠনের পেছনে আরেকটি উদ্দেশ্য হল, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সংযোগ রক্ষা। এক্ষেত্রে অবশ্য ক্যাবিনেট বিশেষ দায়িত্ব পালন করে। ক্যাবিনেট হল মন্ত্রিপরিষদের বিশিষ্ট ও প্রভাবশালী মন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত একটি ক্ষুদ্র পরিষদ। ত্রিস্তর মন্ত্রিসভার শুধুমাত্র ক্যাবিনেট মন্ত্রীরা এই পরিষদে থাকেন। রাষ্ট্রমন্ত্রী বা উপমন্ত্রীরা ক্যাবিনেটের সদস্য নন। মন্ত্রী পরিষদের দুটি বৈশিষ্ট্য হল—ঐক্যবদ্ধভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং কাজের গোপনীয়তা রক্ষা। মনে রাখা দরকার রাজ্যপাল স্ববিবেচনা অনুসারে কাজ করার অধিকার পেলেও, কার্যক্ষেত্রে শাসন পরিচালনা, আইন প্রণয়ন, সরকারি আয়-ব্যয় নির্ধারণ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব মন্ত্রিসভাই পালন করে।

মন্ত্রিপরিষদের দায়িত্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলি হল—(ক) নীতি-নির্ধারণ, (খ) আইন প্রণয়ন, (গ) শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ, (ঘ) আয়-ব্যয় নির্ধারণ এবং (ঙ) সমন্বয় সাধন। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যেমন তেমনি আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক ক্ষেত্রেও সরকারের কাজ দায়িত্বের ক্ষেত্র আজ বহু পরিমাণে বেড়ে গেছে। শুধুমাত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা বা পুলিশি দায়িত্ব পালনই নয়, আজকের যুগে সমাজকল্যাণকর ও জনকল্যাণকর কাজে রাজ্য সরকারকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে হয়। শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ, পূর্ত, কৃষি, শিল্প পরিবহন প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের কাজের সাফল্যের উপর

রাজ্য সরকারের সাফল্য নির্ভরশীল। প্রতিটি ক্ষেত্রে সফলভাবে কাজ করার জন্য সরকারকে বিপুল অর্থব্যয় করতে হয়। সংশ্লিষ্ট দপ্তরকেই আইনসভার কাজে আনুমানিক আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ, বাজেট অনুমোদন করানো সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কাজ। আইনসভা, প্রতিটি মন্ত্রণালয় এবং রাজ্যপালের সাথে সংযোগ রেখে মন্ত্রিসভাকে কাজ করতে হয় এবং এক্ষেত্রে ক্যাবিনেট এবং মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা অবশ্যই বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

এবার আসুন আমরা দেখি কোন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সাংবিধানিক অবস্থান ও ভূমিকা কী।

২৮.৭ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী

কেন্দ্রে মন্ত্রিপরিষদের প্রধান হিসাবে যেমন আছেন প্রধানমন্ত্রী, রাজ্য তথা প্রদেশের ক্ষেত্রে তেমনি মন্ত্রিপরিষদের নেতা হিসাবে থাকেন একজন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীকে অবশ্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতিমূর্তি (Replica) বলা যাবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে। কেন্দ্রের শাসনব্যবস্থার সঙ্গে রাজ্যের শাসনব্যবস্থার পার্থক্য আছে। কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী অনেকটাই স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন, রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিপরিষদের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করবেন সংবিধানের ৪২ ও ৪৪তম সংশোধনে এ কথা বলা হয়েছে। রাজ্যের ক্ষেত্রে রাজ্যপাল রাজ্য মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শমতো চলবেন এ কথা বলা হলেও এক্ষেত্রে রাজ্যপালের উপর কোন বাধ্যবাধকতা নেই রাজ্যের রাজ্যপাল তাঁর স্ব-বিবেচনা অনুসারে চলতে পারেন এবং অনেক ক্ষেত্রেই তিনি মুখ্যমন্ত্রী বা মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ ছাড়াই চলতে পারেন। রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন বা স্ব-বিবেচনামূলক ক্ষমতা সম্পর্কে সংবিধান সুস্পষ্টভাবে কিছু বলেনি, ফলে রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর এক্তিয়ার নিয়ে বিরোধের সম্ভাবনা থেকেই যায়। তবে বিশেষ কিছু ক্ষেত্র ছাড়া স্বাভাবিক অবস্থায় রাজ্যের শাসন ও প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু হলেন মুখ্যমন্ত্রী।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা বা ভূমিকার ক্ষেত্রে সাংবিধানিক ধারণা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করলে চলে না। পল ব্রাসের (Paul Brass)-এর মতো কোন কোন গবেষক-লেখক রাজ্য-রাজনীতির প্রবণতা, রাজ্যের সামাজিক-আর্থিক গড়ন, প্রাদেশিক-আঞ্চলিক প্রশ্ন, বিকেন্দ্রীকরণ, ভাষাগত ও জাতিগত সমস্যা ইত্যাদি বিষয়কে মাথায় রেখেই রাজ্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও বিচিত্র সমস্যার কথা মনে রেখেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা বিবেচনা করার কথা বলেছেন। প্রকৃতিগত ভাবে উত্তর প্রদেশ, বিহার, মহারাষ্ট্র, কেরালা, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব প্রতিটি রাজ্যের রাজনৈতিক ঐতিহ্য, সামাজিক সাংস্কৃতিক চাপ, আর্থিক অবস্থান এইসব সীমাবদ্ধতাকে সমানে রেখেই মুখ্যমন্ত্রীকে কাজ করতে হয়। রাজ্যবাসীর প্রত্যাশা, চাহিদা, সমস্যার কথা জানা, রাজ্যের আবেগকে গুরুত্ব দেওয়া, বোঝাপড়া ও সমন্বয়ের সামর্থ্য অবশ্যই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বের গুণ বলে বিবেচিত হবে। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁর ব্যক্তিত্বকেও সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে হবে। সংবিধান, কেন্দ্রীয় সরকার, জাতীয় সমস্যার বিষয়েও মুখ্যমন্ত্রী নীরব থাকতে পারেন না। মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষেত্রে একটি বিশেষ সমস্যা হল তাঁর নিয়োগের রাজনৈতিক প্রবণতা। সঠিক যোগ্য বক্তির দাবি গ্রাহ্য না করে, প্রাদেশিক সমস্যাকে মাথায় না রেখে অনেক ক্ষেত্রে অযোগ্য বা অ-জনপ্রিয় ব্যক্তিকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দলীয় উচ্চ-কর্তৃপক্ষ চাপিয়ে দেন। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত হবার ৬ মাসের মধ্যে রাজ্য আইনসভায় নির্বাচিত হয়ে আসার সাংবিধানিক ব্যবস্থাকে অনেকেই গণতান্ত্রিক মনে করেন না। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত এবং রাজ্যের রাজনীতির তৃণমূল স্তর থেকে উঠে আসবেন, তাঁর সমর্থনের একটি গণভিত্তি থাকবে, রাজ্য আইনসভার সংখ্যা গরিষ্ঠের আস্থা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হবেন এটা আশা করা যায়।

২৮.৭.১ মুখ্যমন্ত্রীর নিয়োগ ঃ সাংবিধানিক ব্যবস্থা ও বাস্তব অভিজ্ঞতা

সংবিধানের ১৬৪ ধারায় বলা হয়েছে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়োগ করবেন এবং অন্যান্য মন্ত্রীকে মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে নিয়োগ করেন। মুখ্যমন্ত্রীসহ মন্ত্রীদের কার্যকাল রাজ্যপালের সন্তুষ্টির উপর নির্ভরশীল। সাধারণত ৫ বছরের জন্য মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন। রাজ্য আইন সভায় সদস্য না হলে তাকে ৬ মাসের মধ্যে আইন সভার যে কোনো কক্ষে নির্বাচিত হতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগের সাংবিধানিক ব্যবস্থা যাই হোক না কেন বাস্তব অভিজ্ঞতা অন্যরকম। রাজ্য বিধানসভায় কোন দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলে রাজ্যপাল সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করবেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে এক্ষেত্রে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন রাজনৈতিক দলের সর্বোচ্চ স্তরে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। যে ক্ষেত্রে কোন দলের স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই সেক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ রাজ্যপালের স্ব-বিবেচনা কাজ করতে পারে। রাজ্যপাল যে অনেক ক্ষেত্রেই মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগে স্ব-বিবেচনাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেননি বহু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগে এই প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। বিধানসভার সদস্য নন এমন ব্যক্তি বা রাজ্যের বিধান পরিষদের সদস্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন। আবার রাজ্য বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণিত হয়নি, এমন ব্যক্তিও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন রাজ্য-রাজনীতিতে এমন দৃষ্টান্ত আছে।

২৮.৭.২ মুখ্যমন্ত্রীর কার্যাবলি

সংবিধানে স্পষ্ট করে বলা না হলেও মুখ্যমন্ত্রী কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। প্রথমত, তাকে রাজ্যপালের মুখ্য পরামর্শদাতা বলা যায়। রাজ্যপালের সঙ্গে মন্ত্রিপরিষদের যোগাযোগের মাধ্যম হলেন মুখ্যমন্ত্রী। স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ মতোই চলেন। সাংবিধানিক ভাবে রাজ্যপাল যে সব ক্ষমতা ভোগ করেন কার্যত সেইসব কাজের অধিকাংশই মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বেই প্রতিপালিত হয়য়। সংবিধানের ১৬৬ ধারায় বলা হয়েছে রাজ্যপালের নামেই রাজ্য সরকারের শাসনকার্য পরিচালিত হবে। আনুষ্ঠানিকভাবে রাজ্যপাল রাজ্য সরকারের শাসন পরিচালনার দায়িতেব থাকলেও, কার্যক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের শাসন পরিচালনার দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রীর সংবিধানের ১৬৭ ধারায় বলা হয়েছে ঃ (১) শাসনকার্য পরিচালনা এবং আইননের প্রস্তাব সম্পর্কে মন্ত্রিপরিষদের সব সিদ্ধান্ত রাজ্যপালকে জানানো মুখ্যমন্ত্রীর কর্তব্য। (২) রাজ্যপাল নিজে এইসব বিষয় সম্পর্কে সংবাদ চেয়ে পাঠাতে পারেন এবং মুখ্যমন্ত্রীকে সেই সংবাদ জানাতে হবে। (৩) মন্ত্রিপরিষদে বিবেচিত হয়নি এমন কোন বিষয় সম্পর্কে কোন মন্ত্রী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে রাজ্যপাল তা মন্ত্রিপরিষদের বিবেচনার জন্য দাবি করতে পারেন এবং এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীকে রাজ্যপালের ইচ্ছা অনুসারে তা মন্ত্রিপরিষদের কাছে উপস্থিত করতে হয়।

সংবিধানের ১৬৭ ধারায় নির্দেশিত এই তৃতীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে বিতর্ক আছে। কোন কোন মহলে দাবি করা হয় রাজ্যপাল এক্ষেত্রে যৌথ দায়িত্বের নীতিকে কার্যকর করতেই মন্ত্রিপরিষদে বিবেচিত হয়নি এমন বিষয় যাতে বিবেচিত হয় তার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে জানাতে পারেন এবং বিষয়টি মন্ত্রিপরিষদে তোলার ব্যবস্থা করতে পারেন। অনেক ক্ষেত্রেই ক্যাবিনেট বা মন্ত্রিপরিষদে সব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় না সময়ের অভাবে। রাজ্যপাল গৃহীত হয় নি অথচ গুরুত্বপূর্ণ এমন সিদ্ধান্ত বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন। দ্বিতীয় একদল মনে করেন রাজ্যপাল এইভাবে তাঁর ক্ষমতা ব্যবহার করলে মন্ত্রিপরিষদের কাজে হস্তক্ষেপ হতে পারে এবং যৌথ দায়িত্বের নীতি ক্ষুণ্ণ হতে পারে।

মুখ্যমন্ত্রীর দ্বিতীয় কাজ আইনসভায় উপযুক্ত নেতৃত্ব প্রদান। আইনসভার ভিতর সরকারি দলকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ, বিরোধী দলের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন, সরকারি বিল ও কাজের সমর্থনে বক্তৃতা দেওয়া, যৌথ দায়িত্বের নীতিকে কার্যকর করতে সহকর্মীর পক্ষে দাঁড়ানো মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ দায়িত্ব।

মুখ্যমন্ত্রীর তৃতীয় কাজ হল ক্যাবিনেটের নেতা হিসাবে ভূমিকা পালন। প্রধানমন্ত্রীর মতোই তিনি ক্যাবিনেটে সম পর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অগ্রগণ্য। মন্ত্রীদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন, মন্ত্রিসভার সভায় সভাপতিত্ব করা, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সংযোগ রক্ষা, ক্যাবিনেটে ঐক্য ও সংহতি রক্ষা মুখ্যমন্ত্রীর কাজ। সন্দেহ নেই মুখ্যমন্ত্রী হলেন ক্যাবিনেট তোরণের প্রধান স্তম্ভ (Key stone of the Cabinet Arch)। মুখ্যমন্ত্রী নেতৃত্ব, জনপ্রিয়তা, দুর্বলতা, উত্থান ও পতনের সঙ্গে ক্যাবিনেটের অবস্থান নির্ভরশীল। ক্যাবিনেটে তাঁর ভূমিকা পালনের উপরই নির্ভর করে সরকারি নীতির প্রচার, প্রসার ও সমন্বয়ে তিনি কী ভূমিকা পালন করেন। ক্যাবিনেটের মধ্যে বিতর্ক সৃষ্টি হলে তার সমাধান করা, গুরুত্বপূর্ণ নানা সিদ্ধান্তের উপর গভীর বিচার বিবেচনা, বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত তাঁর নেতৃত্বে ক্যাবিনেটই দিয়ে থাকে। প্রতিটি মন্ত্রীর কাজের উপর তাঁকে সতর্ক দৃষ্টি দিতে হয়। তাঁর নেতৃত্বেই ক্যাবিনেটের দায়িত্বশীলতা কার্যকর হয়। নেতৃত্বের দৃঢ়তা, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সামর্থ্য এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা পালনের নির্ধারক সন্দেহ নেই। মন্ত্রিসভার আইনগত ও রাজনৈতিক দায়িত্ব উভয় ক্ষেত্রেই তাঁকে নজর দিতে হয়। সরকার বা ক্যাবিনেটের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অভিযোগ থাকলে মুখ্যমন্ত্রীকেই তার জবাব দিতে হয়। ক্ষমতার অপব্যবহার, অতিমাত্রায় নিজের প্রতিপত্তি বজায় রাখা প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার নেতিবাচক প্রবণতা।

মুখ্যমন্ত্রীকে সরকারের নেতা হিসাবে (Leader of the Government) এবং সর্বোপরি রাজ্যের নেতা হিসাবে (Leader of the State) গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হয়। সরকারের কোন সিদ্ধান্তই মুখ্যমন্ত্রীর অজানা থাকতে পারে না। তাঁর বিজ্ঞ অভিমত, পরামর্শ ও অনুমোদন ছাড়া কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তাঁর মন্ত্রীবর্গ, প্রশাসক বর্গ, সচিবালয়ের কর্মচারী সততার সঙ্গে, যোগ্যতার সঙ্গে, ঐক্যবদ্ধভাবে রাজ্যের স্বার্থে কাজ করবেন এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীকেই সচেতন ও দায়িত্বশীল থাকতে হবে। সরকারের হয়ে নানা বিবৃতি তাঁকেই দিতে হয়। আইন সভার ভেতরে ও বাইরে সমালোচনার জবাবও তাঁকেই দিতে হয়। রাজ্য প্রশাসনের উৎসাহ, তৎপরতা ও সচলতার সূত্র হিসাবে তাঁকে অভিহিত করা চলে। রাজ্যের সমস্যা ও উন্নয়ন নিয়ে মন্ত্রীবর্গ, মুখ্যসচিব, রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষদের সদস্য সকলের সঙ্গেই প্রয়োজনীয় আলোচনা তাঁকে করতে হয়। রাজ্যের জন্য সুস্থ ও সবল সরকার উপহার দিতে সর্বস্তরেই তাঁকে আলোচনা চালাতে হয় এবং সঠিক কৌশল, পদ্ধতি ও প্রয়োগের বিচার-বিবেচনা তাঁকে করতে হয়। সন্দেহ নেই এক্ষেত্রে সীমান্তবর্তী রাজ্য, উপজাতি অধ্যুষিত প্রদেশ এবং অনুন্নত অঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রীদের দায়িত্ব বেশি। শুধুমাত্র প্রশাসনিক দায়িত্ব বা আর্থিক উন্নয়নের প্রশ্ন নয়, জাতিগত সমস্যা, সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন, শিক্ষা, ভাষাগত প্রশ্ন, উদ্বাস্তু সমস্যা, আদিবাসির বিশেষ প্রশ্ন, বিশেষ প্রাদেশিক প্রশ্ন নিয়েও মুখ্যমন্ত্রীকে ভাবতে হয়। সাম্প্রতিক কালে জল-বণ্টনের প্রশ্ন নিয়ে তামিলনাড়ু ও কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রীদের মতভেদ, সংরক্ষণের প্রশ্নে মুখ্যমন্ত্রীদের দৃষ্টিভঙ্গি, বিভিন্ন রাজ্যে উগ্রপন্থী ও নাশকতামূলক কার্যকলাপ, সরকারি স্তরে দুর্নীতি রাজ্য-রাজনীতিতে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব ও নেতৃত্বের প্রশ্নটিকে রাজনৈতিক গবেষক ও পর্যবেক্ষক মহলে বিশেষ কৌতূহল সৃষ্টি করেছে। রাজেদ্য রাজ্যে রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে মুখ্যমন্ত্রীর পরিবর্তনশীল ভূমিকা ও যোগ্য নেতৃত্বের প্রশ্নটি বর্তমানে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। সর্বভারতীয় ও জাতীয় প্রশ্নে প্রাদেশিক রাজনীতির ঊর্ধ্বে থেকে মুখ্যমন্ত্রী কী ভূমিকা নিতে পারেন এটিও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁর দলের নেতা হিসাবেও দায়িত্ব পালন করতে হয়। মুখ্যমন্ত্রীর যোগ্য নেতৃত্বে ও পরিচালনায় দলের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়। দলের নেতা হিসাবে দলীয় কর্মীদের উৎসাহিত করা, দলের কর্মসূচিকে সরকারি কর্মসূচির প্রয়োগে অগ্রাধিকার দেওয়া, বিরোধী দলের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখা মুখ্যমন্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। দলের নেতা হিসাবে আইন সভায় তাঁকে সুস্পষ্ট ভূমিকা পালন করতে হয়। মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি, নেতৃত্ব, সততা দলের সম্পদ বলে গণ্য হয়।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের জনপালন কৃত্যক, বিভিন্ন স্তরের আধিকারিক, জেলা প্রশাসন, পুর প্রশাসন, পঞ্চায়েত, প্রতিটি ক্ষেত্রের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলেন। উন্নয়নের প্রশ্নে বা রাজ্যের সার্বিক সমস্যা নিয়ে নানা কমিটি, কমিশন, বোর্ড, নিগম (Corporation) কাজ করে। এগুলির সঙ্গে সংযোগ রক্ষাও তাঁর কাজ। ব্যক্তিগত অভিরুচি বা স্বার্থের কথা না ভেবে সমষ্টিগতভাবে কাজ করা, সর্বস্তরে পরামর্শ নিয়ে চলা, জনমনে আস্থা অর্জন করা, বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করা মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বের ইতিবাচক দিক।

মনে রাখা দরকার দুর্বল মুখ্যমন্ত্রী অস্থায়ী সরকারের এবং রাজ্যের অস্থায়িত্বের প্রধান কারণ। বিগত দুই-দশকে ভারতবর্ষের রাজ্য-রাজনীতির প্রবণতা এ কথা বুঝতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। মুখ্যমন্ত্রী কতটা নিজ বুদ্ধি, বিচার-বিবেচনা মতো চলেন এবং কতটা দলের উচ্চ কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রভাবিত হন, এ প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বা কেন্দ্রীয় নেতৃবর্গের সম্পর্ক কেমন, কেন্দ্রে সরকারের ক্ষমতাসীন দলই রাজ্যে ক্ষমতায় আছে কিনা, রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে মতাদর্শগত বিরোধ আছে কি না, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা বিচারে এগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। রাজ্যে যদি একটি দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে সেক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর নিজস্ব সিদ্ধান্ত ও মতামত যতটা গুরুত্ব পাবে একটি বহুদলীয় মিশ্র বা যৌথ সরকারের (Coalition Government) মুখ্যমন্ত্রীর স্বাধীন মতামত ততটা গুরুত্ব নাও পেতে পারে। বর্তমানে ভারতবর্ষে রাজ্যে রাজ্যে বহুদলের মিলিত সরকার গঠনের প্রবণতাটিই লক্ষ করা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে সংযুক্ত দলগুলির সন্তুষ্টির কথা বা তাদের মতামতের কথা মুখ্যমন্ত্রীকে ভাবতেই হয়। কেন্দ্রের শাসকদল বা রাজ্যের শাসকদেলের অবস্থান ও রাজনৈতিক চরিত্র যাই হোক না কেন প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী উভয়ই সংযম ও দায়িত্বশীল থেকে কাজ করবেন, পরস্পরের প্রতি সাহায্য ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন এটাই আশা করা যায়।

২৮.৮ সারাংশ

শাসন বিভাগ হল রাজ্য সরকারের সবচেয়ে কর্মব্যস্ত বিভাগ। রাজ্যপাল হলেন রাজ্যের সর্বোচ্চ শাসন কর্তৃপক্ষ। তিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। কেন্দ্রে রাষ্ট্রপতির মতোই রাজ্যে রাজ্যপালের শাসন-সংক্রান্ত, আইন-সংক্রান্ত, অর্থ-সংক্রান্ত ও বিচার-সংক্রান্ত কার্যাবলি আছে। তবে যে অর্থে রাষ্ট্রপতিকে নিয়মতান্ত্রিক শাসক বলা চলে এবং এ ব্যাপারে সংবিধানেও স্পষ্ট ব্যাখ্যা আছে সেই অর্থে রাজ্যপালকে নিয়মতান্ত্রিক শাসক বলা যাবে কিনা এ নিয়ে সংবিধানবিদ ও রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক আছে। রাজ্য মন্ত্রিসভার পরামর্শমতো চললেও তাঁর স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা আছে। স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ব্যবহারের ক্ষেত্রে রাজ্যপাল মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ মেনে চলবেন কিনা এ ব্যাপারে সংবিধানে কিছু বলেনি। রাজ্যপালকে রাজ্যের নিয়মতান্ত্রিক শাসক বলা যাবে কিনা বা রাজ্যপাল কেন্দ্রের এজেন্ট হিসাবে ভূমিকা পালন করেন কিনা এ নিয়ে মতপার্থক্য আছে।

রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিপরিষদ আছে। মন্ত্রিপরিষদের নেতা হিসাবে মুখ্যমন্ত্রীকে রাজ্যপাল নিয়োগ করেন এবং অন্যান্য মন্ত্রীকে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শমতো নিয়োগ করেন। মন্ত্রিপরিষদ সমবতেভাবে রাজ্য বিধানসভার কাছে দায়িত্বশীল। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা যৌথভাবে এবং ব্যক্তিগত সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের দায়িত্ব পালন করেন। ঐক্যবদ্ধভাবে এবং গোপনীয়তার সঙ্গে তাঁরা দায়িত্ব পালন করেন। নীতি নির্ধারণ, আইন-প্রণয়ন, শাসন-বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ, আয়-ব্যয় নির্ধারণ—সব ক্ষেত্রেই মন্ত্রীদের দায়িত্ব পালন করতে হয়। সর্ব ভারতীয় ক্ষেত্রের মতো রাজ্যেও শাসন বিভাগের দায়িত্ব ক্রমবর্ধমান এবং এক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদকে তৎপর থাকতে হয়।

মুখ্যমন্ত্রী হলেন রাজ্যের প্রকৃত শাসকপ্রধান। রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকাকে সীমিত করে এ রকম একটি ধারণা থাকলেও রাজ্য-রাজনীতিতে মুখ্যমন্ত্রী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। রাজ্যপালের পরামর্শদাতা হিসাবে, ক্যাবিনেটের নেতা হিসাবে, সরকারের প্রধান হিসাবে, রাজ্যের নেতা হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তাঁকে পালন করতে হয়। দলের নেতা হিসাবে বা আইন সভায় সরকারের নেতা হিসাবে তাঁর ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজ্যের বিচিত্র সামাজিক-আর্থিক অবস্থান, রাজ্যের বিশেষ সমস্যা, রাজ্যের রাজনৈতিক পরিবর্তন সব কিছুই মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকাকে প্রভাবিত করে। মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিত্ব, ভাবমূর্তি, যোগ্যতা পদাধিকারীর ভূমিকা পালনের নির্ধারক।

২৮.৯ অনুশীলনী

(১) সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে নিম্নলিখিত বাক্যগুলি পুনরায় লিখুন । উত্তর করা হয়ে গেলে ৩.৬ অংশের উত্তরমালার সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

(ক) ভারতে রাজ্যের শাসন বিভাগের শীর্ষে আছেন (i) মুখ্যমন্ত্রী (ii) রাজ্যপাল।

(খ) রাজ্যপাল প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন/রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন।

(গ) রাষ্ট্রপতির/রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা আছে।

(ঘ) রাজ্যপাল মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শমতো চলতে বাধ্য/বাধ্য নন।

(ঙ) রাজ্যের মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা (i) রাজ্য বিধানসভা (ii) মুখ্যমন্ত্রী (iii) মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শমতো রাজ্যপালের দ্বারা নিযুক্ত হন।

(চ) রাজ্যের মন্ত্রিসভা লোকসভা/বিধানসভা/রাজ্যপালের কাজে যৌথভাবে দায়িত্বশীল।

(২) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির দু-এক কথায় উত্তর দিন। (৩.৬ অংশের উত্তরমালা দেখে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন।)

(ক) রাজ্যের রাজ্যপাল নির্বাচিত না নিযুক্ত?

(খ) রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার দুটি উদাহরণ দিন।

(গ) রাজ্যপালের জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা কী আছে?

(ঘ) রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দুটি ক্ষমতা উল্লেখ করুন।

(ঙ) রাজ্য মন্ত্রিসভায় যৌথ দায়িত্ব বলতে কী বোঝেন?

(৩) নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন। (অনধিক ৫০ শব্দের মধ্যে।)

(ক) নির্বাচিত রাজ্যপাল হলে সুবিধা বা অসুবিধা কী?

(খ) রাজ্যপালের আইন বিভাগীয় ক্ষমতা কী লিখুন।

(গ) মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতাগুলি কী কী? যে কোনো দুটি সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

(ঘ) মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে রাজ্যপালের সম্পর্ক লিখুন।

(ঙ) রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈশিষ্ট্য কী লিখুন।

(৪) অনধিক ১৫০ শব্দে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন।

(ক) রাজ্যের রাজ্যপালের ক্ষমতা বিষয়ে আলোচনা করুন।

(খ) রাজ্যপালের সঙ্গে মন্ত্রিপরিষদের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।

(গ) মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা ও ভূমিকার মূল্যায়ন করুন।

২৮.১০ উত্তরমালা

(১) (ক) ভারতে রাজ্যে শাসন বিভাগের শীর্ষে আছেন রাজ্যপাল।

(খ) রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন।

(গ) রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা আছে।

(ঘ) রাজ্যপাল মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শমতো চলতে বাধ্য নন।

(ঙ) রাজ্যের মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শমতো রাজ্যপালের দ্বারা নিযুক্ত হন।

(চ) রাজ্যের মন্ত্রিসভা বিধানসভার কাছে যৌথভাবে দায়িত্বশীল।

(২) (ক) রাজ্যের রাজ্যপাল নিযুক্ত (বা মনোনীত)।

(খ) রাজ্যপালের দুটি স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা হল ঃ (i) মহারাষ্ট্র অথবা গুজরাটের রাজ্যপাল বিশেষ অঞ্চলের উন্নতির স্বার্থে রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে স্বাধীন দায়িত্ব পেতে পারেন, (ii) রাজ্যপাল রাজ্যের সাংবিধানিক অচলাবস্থা সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে রিপোর্ট দিতে পারেন।

(গ) রাজ্যপালের জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা হল রাজ্যে সাংবিধানিক অচলাবস্থা সৃষ্টি হলে তা রাষ্ট্রপতিকে জানানোর ক্ষমতা।

(ঘ) রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দুটি ক্ষমতা হল—(i) তিনি রাজ্যপালের মুখ্য পরামর্শদাতা (ii) তিনি রাজ্য সরকারের নেতা।

(ঙ) রাজ্য মন্ত্রিসভায় যৌথ দায়িত্ব হল মন্ত্রিসভা তাদের কাজকর্মের জন্য বিধানসভার কাজে দায়িত্ব পালন করবেন। এই দায়িত্ব পালনের অর্থ হল বিধানসভায় ভোটাভুটি হলে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে হবে।

(৩) **উত্তর সংকেত ঃ** (ক) ৬৩ পৃষ্ঠা। (খ) ৬৪ পৃষ্ঠা। (গ) ৭২-৭৩ পৃষ্ঠা। (ঘ) ৬৭-৬৮ পৃষ্ঠা। (ঙ) ৭০ পৃষ্ঠা।

(৪) **উত্তর সংকেত ঃ** (ক) ৬৪-৬৬ পৃষ্ঠা। (খ) ৬৭-৬৯ পৃষ্ঠা। (গ) ৭২-৭৫ পৃষ্ঠা।

২৮.১১ গ্রন্থপঞ্জি

(১) Durga Das Basu : *Introduction to the Constitution of India (1999).*

(২) M. V. Pylee : *An Introduction to the Constitution of India (1995).*

(৩) S. L. Sikri : *Indian Government and Politics (1989).*

(৪) Dhirendranath Sen : *From Raj to Swaraj (1954).*

(৫) Subhas C. Kashyap (Ed.) : *Perspectives on the Constitution (1993).*

একক ২৯ ❐ রাজ্য আইনসভা

গঠন

২৯.১ উদ্দেশ্য
২৯.২ প্রস্তাবনা
২৯.৩ মূল আলোচনা ঃ রাজ্য আইনসভা
২৯.৩.১ রাজ্য আইন সভার গঠন
২৯.৩.২ রাজ্যে দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থা
২৯.৪ রাজ্য আইনসভার কার্যাবলি
২৯.৪.১ আইন প্রণয়ন
২৯.৪.২ অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা
২৯.৪.৩ মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা
২৯.৪.৪ রাজ্য আইনসভার অন্যান্য কাজ
২৯.৫ রাজ্য বিধানসভার স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার ও বিধান পরিষদের চেয়ারম্যান
২৯.৫.১ স্পিকারের কার্যাবলি
২৯.৫.২ স্পিকারের নিরপেক্ষতার প্রশ্ন
২৯.৫.৩ ডেপুটি স্পিকার
২৬.৬ রাজ্য আইনসভার সদস্যদের অধিকার ও সুযোগ সুবিধা
২৯.৭ রাজ্য আইনসভার বিরোধীদল
২৯.৮ রাজ্য আইনসভার আইন প্রণয়ন পদ্ধতি
২৯.৮.১ রাজ্যে আইন প্রণয়ন পদ্ধতি
২৯.৮.২ বিল পাসের বিভিন্ন পর্যায়
২৯.৮.৩ বেসরকারি বিল সম্বন্ধে পদ্ধতি
২৯.৮.৪ অর্থবিল পাশের বিশেষ পর্যায়
২৯.৮.৫ অন্যান্য অর্থ সংক্রান্ত বিল
২৯.৯ অর্থ বিষয়ক কার্য-পদ্ধতি
২৯.৯.১ রাজ্যের কমিটি ব্যবস্থা
২৯.১০ সারাংশ
২৯.১১ অনুশীলনী
২৯.১২ উত্তরমালা
২৯.১৩ গ্রন্থপঞ্জি

২৯.১ ❐ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি—

- ভারতীয় শাসনব্যবস্থার রাজ্য আইনসভা অর্থাৎ রাজ্যের বিধান মণ্ডলের গঠন ও কার্যাবলি বিষয়ে ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- রাজ্য আইনসভার মুখপাত্র হিসাবে স্পিকারের (বিধানসভা) সাংবিধানিক অবস্থান ও ভূমিকা কী সে বিষয়ে জানতে পারবেন।
- রাজ্য আইনসভার সদস্যদের অধিকার বা সুযোগ সুবিধা কী তা বিচার করতে পারবেন।
- রাজ্য আইনসভার বিরোধী দলের ভূমিকার মূল্যায়ন করতে পারবেন।
- রাজ্য আইনসভায় আইনপ্রণয়ন ও অর্থবিষয়ক কার্যপদ্ধতির ধারা বা গতিটি চিহ্নিত করতে পারবেন।

২৯.২ প্রস্তাবনা

ভারতের সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে যেমন পার্লামেন্টকে চিহ্নিত করা যায় তেমনি রাজ্যের আইনসভার কথাও বলতে হয়। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের সঙ্গে রাজ্য আইনসভার সাংবিধানিক অবস্থান ও ভূমিকা সম্পর্কে শিক্ষার্থী পাঠককে অবহিত হতে হবে এ কথা মনে রেখেই বর্তমান এককের অবতারণা। ভারতের পার্লামেন্টীয় ব্যবস্থার সাফল্য শুধুমাত্র ভারতের পার্লামেন্টের কার্যকলাপকেই সীমাবদ্ধ নয়, এক্ষেত্রে রাজ্য আইনসভাগুলিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে, কেন্দ্র-রাজ্য আইনগত বা আর্থিক সম্পর্ককে সুসংগঠিত করতে রাজ্য আইনসভার উদ্যোগ ও গতিশীলতার প্রশ্নটি সংবিদান প্রণেতাদের কাছে গুরুত্ব পেয়েছে। যদিও ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অনুসরণ এবং দেশের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও সংহতির কথা ভেবে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার ও আইনসভার কথাই তাঁদের মাথায় ছিল, ভারতের বিচিত্র স্বার্থের কথা বিবেচনা করে, প্রদেশগুলির আর্থ-সামাজিক সমস্যার দিকে তাকিয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির প্রয়োগের কথা ভেবে রাজ্যগুলিকেও সমানভাবে শক্তিশালী করা প্রয়োজন বলে তাঁরা মনে করেছেন। 'সুদৃঢ় ও শক্তিশালী রাজ্য, কেন্দ্রের শক্তির সহায়ক'—এই যুক্তিতে আস্থা রেখে রাজ্যের প্রশাসন ও আইনগত কাঠামোকে শক্তিশালী করতে চেয়েছেন সংবিধান প্রণেতারা। কেন্দ্রের পার্লামেন্টের ধাচে রাজ্যেও আইনসভার রূপ, কার্যপদ্ধতি বিষয়ে সংবিধানে সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে।

বর্তমান এককের আলোচনায় প্রথমেই রাজ্য আইনসভার গঠন, রাজ্যে আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষের সৃষ্টি বা অবলুপ্তির প্রশ্ন, আইনসভার কার্যকাল, আইনসভার সদস্যদের যোগ্যতা ইত্যাদি বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। রাজ্য আইনসভার কার্যাবলি এবং এক্ষেত্রে রাজ্য আইনসভার সঙ্গে কেন্দ্রের পার্লামেন্টের কোন পার্থক্য আছে কিনা এ বিষয়টিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেন্দ্রের লোকসভার স্পিকারের মতো রাজ্য বিধানসভার স্পিকাররে ভূমিকা বিষয়েও শিক্ষার্থীর কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক। রাজ্য আইনসভার সদস্যদের কেন্দ্রের আইনসভার সদস্যদের মতো অধিকার ও সুযোগ সুবিধা আছে। এ সম্পর্কে সংবিধানের আইন ও সংশোধনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। রাজ্যের আইনসভার বিরোধী দলের অবস্থান, আইন বিষয়ক ও অর্থ বিষয়ক কার্যপদ্ধতি,

কমিটি ব্যবস্থা সব ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় আইনসভার মতো পদ্ধতি ও প্রকরণগত মিল থাকলেও কতকগুলি ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী পাঠকের চোখে কিছু পার্থক্য ধরা পড়বে। আইন পাশের ক্ষেত্রে কতকগুলি রাজ্যে এক পরিষদ সম্পন্ন আইনসভা থাকায় শুধুমাত্র বিধানসভাই কার্যকরী ভূমিকা নেয়। আর একটি বিষয় হল রাজ্য আইনসভার দ্বারা পাশ করা বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য ধরে রাখার ব্যবস্থা।

২৯.৩ মূল আলোচনা ঃ রাজ্য আইনসভা

২৯.৩.১ রাজ্য আইনসভার গঠন

সংবিধানে রাজ্যের জন্য একই ধরনের সরকারের ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হলেও, রাজ্যের আইনসভার ক্ষেত্রে বড় ও ছোট রাজ্যের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। সংবিধানের ১৬৮ ধারায় বলা হয়েছে কোন কোন রাজ্যে আইনসভা গঠিত হবে রাজ্যপাল এবং বিধানসভা ও বিধান পরিষদ নিয়ে; আবার কতকগুলি রাজ্যের আইনসভা গঠিত হবে রাজ্যপাল এবং একটিমাত্র কক্ষ বিধানসভা নিয়ে। সংবিধান চালু হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত সংবিধানের ১৬৯ ধারার অনুসরণে এক্ষেত্রে যে পরিবর্তন ঘটেছে সেই মতো বিহার, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক ও উত্তর প্রদেশের আইনসভা দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট। জম্মু ও কাশ্মীরও ঐ রাজ্যের নিজস্ব সংবিধান মেনে আইনসভায় দ্বিকক্ষের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এ ছাড়া অন্যান্য সব রাজ্যের আইনসভা এককক্ষ বিশিষ্ট। যদিও এই সূচি স্থায়ী নয়। কারণ সংবিধানে দ্বিতীয় কক্ষের অবলুপ্তিও সৃষ্টি বিষয়ে একটি বিশেষ পদ্ধতি মেনেই সিদ্ধান্ত নেওয়া চলে। সংবিধানের ১৬৯ ধারা অনুসারে এই পদ্ধতিটি হল, যদি কোন রাজ্যের বিধানসভার মোট সদস্যদের অধিকাংশ এবং উপস্থিত ও ভোটপ্রদানকারী সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনে ঐ রাজ্যে বিধান পরিষদ লোপ বা গঠন করবার জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, তবে সংসদ সেই মর্মে আইন পাশ করতে পারবে। এই পদ্ধতি মেনেই ১৯৫৭ সালে অন্ধ্রে, বিধান পরিষদ গঠিত হয়েছে আবার ১৯৮৫ সালে ঐ পরিষদের অবলুপ্তি ঘটেছে। তামিলনাড়ুতে ১৯৮৬ সালে বিধান পরিষদের অবলুপ্তি ঘটানো হয় আবার ১৯৮৯ সালে বিধান পরিষদ পুনঃপ্রবর্তিত হয়। ১৯৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ ও পাঞ্জাবে বিধান পরিষদ অবলুপ্ত হয়।

বিশিষ্ট আইনজ্ঞ দুর্গাদাস বসু মনে করেন কোন কোন রাজ্যে আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে দ্বিতীয় পরিষদ থাকা ব্যয়বহুল ও অনাবশ্যক এই যুক্তিতে সংবিধানে দ্বিতীয় পরিষদ সৃষ্টি বা লোপের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে রাজ্য তার ইচ্ছামতো ব্যবস্থা নিতে পারে। অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু এই ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে ইচ্ছামতো পরিষদ সৃষ্টি বা অবলুপ্তি ঘটিয়েছে বা পুনঃপ্রবর্তন করেছে। এক্ষেত্রে রাজ্যের ইচ্ছা চূড়ান্ত হলেও পার্লামেন্টকেই বিধান পরিষদ আইন (Legislative Council Act) পাশ করে রাজ্যের ইচ্ছাকে বৈধতা দিতে হয়।

রাজ্যে বিধান পরিষদের গঠন সম্পর্কে সংবিধানে যে ব্যবস্থা আছে তা নিম্নরূপ ঃ

(১) রাজ্যের বিধানসভার আকার অনুসারেই বিধান পরিষদের আকার কী হবে তা স্থির করা হয়। সংবিধানের ১৭১ (১) ধারা অনুসারে রাজ্যের বিধান পরিষদ বিধানসভার মোট সদস্য সংখ্যার এক তৃতীয়াংশের বেশি হবে না আবার ৪০ এর কম হবে না।

(২) বিধান পরিষদের সদস্যদের মধ্যে (i) এক তৃতীয়াংশ মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা বোর্ড, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের দ্বারা; (ii) এক-তৃতীয়াংশ বিধানসভার সদস্যদের দ্বারা; (iii) এক-দ্বাদশাংশ গ্র্যাজুয়েটদের

দ্বারা, (iv) এক-দ্বাদশাংশ শিক্ষকদের দ্বারা নির্বাচিত হন এবং (v) বাকি সদস্যরা রাজ্যপাল দ্বারা চারুকলা, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সমাজসেবা, সমবায় আন্দোলনের প্রখ্যাত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্য থেকে মনোনীত হন। সাধারণত রাজ্যপালের মনোনয়ন মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শক্রমেই হয়। রাজ্যপালের মনোনয়ন ব্যাপারে আদালত কোন হস্তক্ষেপ করতে পারে না। (১৭১ (২) ধারা) পার্লামেন্ট বিধান পরিষদের গঠন বিষয়ে কোন আনি না করা পর্যন্ত বিধান পরিষদের গঠন বিষয়ে সংবিধান যা বলছে তা হল বিধান পরিষদ অংশত মনোনীত ও অংশত নির্বাচিত সংস্থা। পরিষদের নির্বাচন হবে পরোক্ষ পদ্ধতিতে এবং একক-হস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে। সাধারণ হিসাবমতো ৬ ভাগের ৫ ভাগ সদস্য নির্বাচিত এবং একভাগ রাজ্যপাল মনোনীত হন।

রাজ্য বিধানসভার গঠন বিষয়ে সংবিধানের ১৭০ ধারা মতো ব্যবস্থা হল ঃ

(১) রাজ্য বিধানসভার সদস্য সংখ্যা ৬০ এর কম ৫০০-এর অধিক হবে না। বিশেষ ব্যবস্থা হিসাবে সিকিম ও অরুণাচল প্রদেশের ক্ষেত্রে বিধানসভার সদস্য অন্যূন ৩০ এবং মিজোরাম ও গোয়ার ক্ষেত্রে ৪০ রাখা হয়েছে।

(২) ভৌগোলিক নির্বাচনী এলাকা (territorial constituency) থেকে সমানুপাতিক সম প্রতিনিধিত্বের নিয়ম অনুসারে প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে বিধানসভার সদস্যরা নাগরিকদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হবেন। প্রত্যেক জনগণনার পর পার্লামেন্ট ভৌগোলিক নির্বাচনী এলাকার পুনর্বিন্যাস হবে। ভোটাধিকারের ন্যূনতম বয়স হল ১৮।

(৩) বিধানসভার ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব অপর্যাপ্ত মনে হলে রাজ্যপাল ঐ সম্প্রদায় থেকে একজন সদস্য মনোনীত করতে পারেন (৩৩৩ ধারা)।এই সংরক্ষণের ব্যবস্থা সংবিধান চালু হবার পর প্রতিবার ১০ বছর করে বাড়িয়ে ৫০ বছর পর্যন্ত থাকবে বলে সংবিধানে ঘোষণা করা হয়েছে (৩৩৪ ধারা)। ৫০ বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পরও এই ব্যবস্থা চালু আছে।

> ***প্রান্তলিপি*** *ঃ আসামে ও নাগাভূমিতে বিধানসভায় তপশিলি উপজাতিদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে।আসামের বিধানসভায় স্বশাসিত জেলাগুলির জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে।*

রাজ্য বিধানসভার মেয়াদ ৫ বছর। কার্যকাল উত্তীর্ণ হবার পূর্বে একে ভেঙে দেওয়া যায়। আবার জরুরি অবস্থা ঘোষিত হলে রাষ্ট্রপতি এর সময়কাল প্রতিবারে ১ বছর করে বাড়িয়ে দিতে পারেন (১৭২ (১) ধারা)। বিধান পরিষদ স্থায়ী একে ভেঙে দেওয়া যায় না। প্রতি দ্বিতীয় বছরের শেষে পরিষদের এক-তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর নেবেন (১৭২(২) ধারা)।

বিধানসভার সদস্যরা নিজেদের মধ্য থেকে একজন স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত করবেন। বিধান পরিষদের সদস্যরা নিজেদের মধ্য থেকে একজন সভাপতি সহ-সভাপতি নির্বাচিত করবেন। লোকসভায় এবং রাজ্যসভায়ও একইভাবে স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার এবং সভাপতি ও সহ-সভাপতি থাকেন। রাজ্যসভার সভাপতির ক্ষেত্রে নিয়মটি ভিন্ন। উপরাষ্ট্রপতি পদাধিকার বলে রাজ্যসভার সভাপতি হন। রাজ্য আইনসভার উভয় কক্ষের নিজস্ব সচিবালয় (Secretariat) থাকবে এবং রাজ্য আইন দ্বারা সচিবালয়ের কর্মীদের নিয়োগ ও কাজের শর্ত নির্ধারিত হবে সংবিধানের ১৮৭ ধারায় এ কথা বলা হয়েছে। আইনসভা এক্ষেত্রে যতদিন কোন নিয়মনীতি

স্থির করবে ততদিন স্পিকারের পরামর্শ নিয়ে রাজ্যপাল আইনসভার সচিবালয়ের কর্মীদের নিয়োগ ও কাজের শর্ত স্থির করবেন। রাজ্য বিধান পরিষদ থাকলে রাজ্যপাল এ বিষয়ে বিধান পরিষদের চেয়ারম্যানের পরামর্শও গ্রহণ করবেন।

রাজ্য বিধানসভার সদস্যদের যোগ্যতা ঃ (i) ভারতীয় নাগরিকত্ব, (ii) ২৫ বছর বয়স, (iii) সংসদের আইন দ্বারা নির্দিষ্ট অন্যান্য যোগ্যতা। বিধান পরিষদের ক্ষেত্রে বয়সের সীমা ৩০ বছর (১৭৩ ধারা)। ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনে (The Representation of the People's Act, 1951) বলা হয়েছে, নিজে ভোটার না হলে কোন ব্যক্তি রাজ্য বিধানসভা বা বিধান পরিষদের সদস্য হতে পারেন না। সংবিধানের ১৯১ ধারায় রাজ্য বিধান মণ্ডলের সদস্যদের অযোগ্যতার শর্তগুলি নির্দিষ্ট হয়েছে। বলা হয়েছে আদালত কর্তৃক বিকৃত মস্তিষ্ক, দেউলিয়া (undischarged insolvent) ঘোষিত হলে, ভারত সরকার বা রাজ্য সরকারের কোন লাভজনক পদে নিযুক্ত থাকলে, ভারতের নাগরিক না হলে বা স্ব-ইচ্ছায় অন্য দেশের নাগরিক হলে বা অন্য দেশের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করলে কোন ব্যক্তি রাজ্য আইনসভার সদস্য হবার অযোগ্য বলে ঘোষিত হবেন। বিধান পরিষদের ক্ষেত্রে সভাপতি এবং বিধানসভার ক্ষেত্রে স্পিকারের কাছে লিখিতভাবে জানিয়ে কোন ব্যক্তি রাজ্য আইনসভার সদস্যপদ ত্যাগ করতে পারেন। এক্ষেত্রে বিধান পরিষদে সভাপতি এবং বিধানসভায় স্পিকার অনুসন্ধান করে দেখবেন পদত্যাগ স্বেচ্ছাকৃত (Voluntary) বা প্রকৃত (Genuine) কিনা। স্বেচ্ছাকৃত বা প্রকৃত না হলে পদত্যাগ পত্র গৃহীত হবে না। রাজ্য আইনসভার সদস্যপদ থাকা বা না থাক সংবিধানের ৫২ তম সংশোধন দ্বারা গৃহীত দলত্যাগ বিরোধী আইন (Anti-Defection Law) যথাযথ ভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তার উপর নির্ভরশীল। রাজ্য আইনসভার কোন সদস্য একই সঙ্গে একাধিক রাজ্যের আইনসভার সদস্য হতে পারেন না বা একই সঙ্গে রাজ্য আইনসভায় উভয় কক্ষের সদস্য হতে পারেন না। (১৯০ (১) ও (২) ধারা)।

২৯.৩.২ রাজ্যে দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থা

ভারতের পার্লামেন্টে দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থার পক্ষে/বিপক্ষে সংবিধানবিদরা যুক্তি-তর্কের অবতারণ করলেও, রাজ্যসভার অবলুপ্তি হয়নি। রাজ্যের ক্ষেত্রে সংবিধান প্রণেতারা দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থাকেই মেনে নিলেও উচ্চপরিষদ আইনসভার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে প্রত্যেক রাজ্যেই থাকবে এ রকম কোন অনমনীয় ব্যবস্থাকেও সমর্থন করেন নি। সাধারণভাবে দ্বিতীয় পরিষদের পক্ষে যে সব যুক্তি দেওয়া হয় রাজের্য আইনসভার ক্ষেত্রে সেগুলির গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু এ কথা অবশ্যই বিচার্য। দ্বিতীয় পরিষদ প্রথম পরিষদের অবাঞ্ছিত বা স্বেচ্ছাচারী কাজকর্মে বাধা সৃষ্টি করে, নাগরিক স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবে কাজদ করে, সংশোধনকারী কক্ষ হিসাবে প্রতি আইন গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে, নিম্নকক্ষের ভার বা বোঝা কমায়, জনমত গঠন ও রাজনৈতিক শিক্ষা বিস্তারের সহায়ক—এই যুক্তিগুলি ভারতের মতো দেশে রাজ্য আইনসভার ক্ষেত্রে যে গ্রহণযোগ্য নয় বহু গবেষক ও লেখক এ কথা মনে করেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির স্বার্থে কেন্দ্রে রাজ্যসভাকে মেনে নেওয়া হলেও রাজ্যে বিধান পরিষদের ক্ষেত্রে ও যুক্তি অচল। প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত, গণতান্ত্রিকভাবে গঠিত বিধানসভার কাজকর্মে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত ও মনোনীত একটি দ্বিতীয় কক্ষ প্রথম কক্ষের আইন হঠকারী ও বিপজ্জনক এই যুক্তিতে বাধা সৃষ্টি করুক অনেকের কাছেই এটা যুক্তিগ্রাহ্য মনে হয় না। ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ সেন দ্বিতীয় কক্ষের গঠনের পেছনে সুবিধাবাদ ও শ্রেণিস্বার্থের উপস্থিতি লক্ষ করে প্রশ্ন তুলেছেন কোন আনি হঠকারী বা বিপজ্জনক এই কক্ষ তা বিচার করতে পারে কী? বিপুল সংখ্যক মানুষের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত কক্ষের সিদ্ধান্তকে সংযমী ও বিজ্ঞতার নামে সংশোধন করার অধিকার এই কক্ষের সদস্যদের থাকতে পারে কী? প্রধানত মন্ত্রীদের নেতৃত্বে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিচক্ষণ ব্যক্তিদের

সহায়তায় প্রথম কক্ষে আইন প্রণয়ন হয়। প্রথম কক্ষের বিরুদ্ধে আইন সুবিবেচনা প্রসূত নয় বা মনোযোগ নিয়ে আইন পাশ হয়নি এ অভিযোগ খাটে না। ডঃ সেনের মতে রাজ্যের ক্ষেত্রে কক্ষের যুক্তি খাটে না। তবে সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতি বা উপজাতির স্বার্থে কোন কোন রাজ্যে এই কক্ষের কার্যকারিতা আছে।

অধিকাংশ রাজ্যেই বিধান পরিষদ নেই। যেসব রাজ্যে এই পরিষদের অস্তিত্ব আছে সেইসব রাজ্যের পরিষদের ভূমিকা তেমনভাবে চোখে পড়ে না। জনপ্রিয় বিধানসভার কাজে বাধা দেওয়া বা বিধানসভার সংশোধনী কক্ষ হিসাবে কাজ করার কোন দৃষ্টান্তই পরিষদ স্থাপন করে নি। বিপরীতভাবে পরিষদের কাজে বিধানসভার অন্ধ অনুকরণই লক্ষ্য করা গেছে। দ্বিতীয়ত, দ্বিতীয় কক্ষের বিলাসিতার স্বার্থে জনসাধারণের অর্থের অপব্যয় হোক বা দরিদ্র রাজ্যের ক্ষেত্রে জনকল্যাণের কাজে অন্তরায় ঘটুক অনেকেই এটা চান না। দ্বিতীয় কক্ষের অস্তিত্বের চেয়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজ কল্যাণের স্বার্থ জরুরি। তৃতীয়ত, ছোট ছোট রাজ্যের ক্ষেত্রে এই পরিষদ অপ্রয়োজনীয়। বড় রাজ্যের ক্ষেত্রেও (বিহার, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি) এই পরিষদকে রাজনৈতিক মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করা হয়, জনপ্রিয় কক্ষের কাজে বাধা ও বিরোধিতার অনিষ্টকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়—এই যুক্তিতে এই কক্ষের অবসান ঘটুক এটাই চাওয়া হয়। তবে পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে রাজ্যে রাজ্যে বহু দলের ক্ষমতায় আসা বা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের পৃথক রাজনৈতিক অবস্থানের বর্তমান প্রবণতার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যে দ্বিতীয় পরিষদের আবশ্যকতা বা উপযোগিতা থাকতে পারে, বাধা ও ভারসাম্যের ধারণাটি (Principle of Checks and Balance) কার্যকর হতে পারে বলে কোন কোন মহলে আশা করা যায়। বিজ্ঞ, জ্ঞানী ও নিরপেক্ষ বিধান পরিষদ রাজনীতির দূষিত আবহাওয়া থেকে রাজ্যবাসী ও সরকারকে মুক্ত রাখতে পারে বলেও আশা করা হয়।

তবে শুধুমাত্র সামাজিক মূল্য (Social value) বিচার করে, পরামর্শদানের ভূমিকার (Advisory role) ভূমিকার কথা মাথায় রেখে এই কক্ষের পক্ষে বিতর্ক করা ঠিক নয়। এই কক্ষের যদি কোন নিজস্ব উদ্যোগ গঠনমূলক ভূমিকা না থাকে তবে একে ব্যয়সাধ্য আলংকারিক বিলাসিতা (Costly ornamental luxury) ছাড়া অন্য কিছু বলা যাবে না।

পরবর্তী আলোচনা থেকে শিক্ষার্থী পাঠক রাজ্য আইনসভার কাজ ও ক্ষেত্র বিশেষে কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের সঙ্গে এর পার্থক্য কোথায় তা বিচার করতে পারবেন। রাজ্য আইনসভায় প্রথম ও দ্বিতীয় কক্ষের সাংবিধানিক সম্পর্ক কী সেটাও প্রসঙ্গত বিচার করা যেতে পারে।

২৯.৪ রাজ্য আইনসভার কার্যাবলি

কেন্দ্রে পার্লামেন্ট যে সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করে, রাজ্যে আইনসভার অনুরূপ দায়িত্ব বা ভূমিকা আছে। অধিকাংশ রাজ্যে এক পরিষদ সম্পন্ন আইনসভা থাকায় বিধানসভাই রাজ্য আইনসভা হিসাবে পরিচিত। উত্তর প্রদেশ, বিহার, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু প্রভৃতি রাজ্যে বিধান পরিষদ দ্বিতীয় কক্ষের দায়িত্ব পালন করে। রাজ্য আইনসভার দায়িত্বের প্রধান ক্ষেত্রগুলি হল ঃ (১) আইন প্রণয়ন, (২) অর্থ বিষয়ক কার্য, (৩) শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ। এছাড়া নির্বাচন, সংবিধান সংশোধন, প্রতিনিধিত্ব ও জনসংযোগের ক্ষেত্রে রাজ্য আইনসভার ভূমিকা আছে।

২৯.৪.১ আইন প্রণয়ন (Legislative function) ঃ

রাজ্যের আইনসভা বা বিধানমণ্ডল রাজ্য তালিকাভুক্ত যে কোনো বিষয়ে আইন প্রণয়নের অধিকার ভোগ করে। যুগ্ম তালিকাভুক্ত (Concurrent List) বিষয়েও রাজ্য আইনসভার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আছে। আইন

প্রণয়নের এই ক্ষমতা রাজ্য আইন সভায় (বা বিধান সভায়) অনন্য ক্ষমতা (Exclusive Power) হলেও এই ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ক্ষমতা এই অর্থে যে (i) রাজ্যের আইনসভা প্রণীত আইনের সঙ্গে যদি পার্লামেন্ট বা সংসদ প্রণীত আইনের বিরোধ দেখা দেয় তবে রাজ্যের আইনসভার অসঙ্গতিপূর্ণ অংশটি বাতিল হয়ে যায়। (ii) রাজ্যের আইনসভা প্রণীত বিল কোন কোন ক্ষেত্রে রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য পাঠাতে পারেন। রাষ্ট্রপতির অনুমোদন না পেলে বিলটি আইনে পরিণত হবে না। (iii) দুই বা ততোধিক রাজ্য আইনসভা যদি মনে করে রাজ্য তালিকাভুক্ত কোন বিষয়ে পার্লামেন্টের পক্ষে আইন প্রণয়ন বিধেয় তবে পার্লামেন্ট ঐ বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে। (iv) জাতীয় স্বার্থে (In the National Interest) পার্লামেন্ট রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে, তবে এক্ষেত্রে রাজ্যসভাকে দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে একটি প্রস্তাব নিতে হবে। (v) জরুরি অবস্থার সময় পার্লামেন্ট রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে। (vi) কোন সন্ধি বা চুক্তি সম্পাদন বা আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে ক্ষমতা বণ্টনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া কার্যকর হয় না। এক্ষেত্রে রাজ্যের স্বার্থ বা রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয় যুক্ত হলেও পার্লামেন্টের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকে। (vii) রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষিত হলে রাষ্ট্রপতির নির্দেশ বলে রাজ্য আইনসভার ক্ষমতা প্রযুক্ত হবে পার্লামেন্টের কর্তৃত্বে বা পার্লামেন্টের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে।

আইন প্রণয়নের কাজে অর্থ বিলের ক্ষেত্রে রাজ্য আইনসভার ক্ষমতা কেন্দ্রের আইনসভার ক্ষমতার মতোই। এক্ষেত্রে (i) রাজ্যের বিধান পরিষদে অর্থবিল উত্থাপিত হবে না। কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টেও রাজ্যসভায় অর্থবিল উত্থাপিত হয় না। (ii) রাজ্যসভার মতো বিধান পরিষদও অর্থবিলকে সংশোধন বা প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। দ্বিতীয় কক্ষ হিসাবে রাজ্যসভার মতোই বিধান পরিষদ নিম্নকক্ষের দ্বারা পাশ হওয়া বিলটির উপর কিছু প্রস্তাব (recommendation) দিতে পারে মাত্র। লোকসভার মতোই এক্ষেত্রে প্রস্তাবটি গ্রহণ বা বর্জন করার চূড়ান্ত ক্ষমতা বিধানসভার। বিধানসভা বিধান পরিষদের প্রস্তাব গ্রহণ না করলেও ধরা হবে বিলটি আইনসভায় পাশ হয়েছে এবং বিলটিকে রাজ্যপালের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে। ১৪ দিনের মধ্যে বিলটিকে বিধান পরিষদ যদি বিধানসভায় না পাঠায় সেক্ষেত্রেও আইনসভায় বিলটি পাশ হয়েছে ধরে নিয়ে রাজ্যপালের অনুমতির জন্য পাঠানো হবে। এক্ষেত্রে বিধান পরিষদের ক্ষমতা রাজ্যসভার মতো পরামর্শদান সভা বা বিলম্বকারী সভার অধিক কিছু নয়। (iii) অর্থবিলের ক্ষেত্রে উভয় কক্ষের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হলে উভয় সভার যৌথ অধিবেশন ডেকে বিরোধ মীমাংসার কোন ব্যবস্থা পার্লামেন্ট বা রাজ্য আইনসভার নেই।

অর্থবিল ছাড়া অন্যান্য বিলের ক্ষেত্রে পার্লামেন্ট এবং রাজ্য আইনসভার মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য আছে। অন্যান্য বিল আইনসভার যে কোনো কক্ষে উত্থাপন করা গেলেও পার্লামেন্ট ও রাজ্য আইনসভার মধ্যে পার্থক্যের ক্ষেত্রগুলি হল ঃ (i) পার্লামেন্টের ক্ষেত্রে উভয় কক্ষের মধ্যে বিলের মূল বা সংশোধিত রূপ নিয়ে ঐক্যমত্য হলে বিলটি পাশ হবে। উভয়কক্ষের মধ্যে ঐকমত্য না হলে অর্থাৎ রাজ্যসভা বিলটিকে প্রত্যাখ্যান করলে বা বিলটির সংশোধন চাইলে বা ৬ মাসের মধ্যে বিলটিকে ফেরত না পাঠালে রাষ্ট্রপতি উভয় সভার যুগ্ম অধিবেশন ডেকে বিষয়টির মীমাংসা করতে পারেন। রাজ্যের আইনসভার ক্ষেত্রে বিধান পরিষদের কোন ক্ষমতা (Co-ordinate Power) নেই। রাজ্য আইনসভায় বিধানসভার কথাই শেষ কথা বা বিধানসভার ইচ্ছাই চূড়ান্ত। সুতরাং এখানে উভয় সভার যৌথ অধিবেশন ডেকে বিরোধ মীমাংসার কোন ব্যবস্থা নেই। (ii) বিধানসভা প্রস্তাবিত বিলকে প্রত্যাখ্যান করা, সংশোধন করা বা তিন মাসের মতো সময়কাল পর্যন্ত ধরে রাখার ক্ষমতা বিধান পরিষদের থাকলেও

দ্বিতীয়বার বিলটি বিধানসভায় পাশ হলে এবং পুনরায় বিধান পরিষদে এলে বিধান পরিষদ বিলটিকে অগ্রাহ্য করতে বা সংশোধন করতে পারে না, তবে ১ মাস সময়কাল ধরে রাখতে পারে। এই সময় অতিবাহিত হবার পর উভয় কক্ষের সম্মতিতেই বিলটি পাশ হয়েছে ধরা হবে। (iii) লক্ষণীয়, বিধান পরিষদে উত্থাপিত কোন বিল পাশ হবার পর যদি বিধানসভায় আসে এবং বিধানসভা যদি বিলটির সঙ্গে সহমত পোষণ না করে বা বিলটি অগ্রাহ্য করে সেক্ষেত্রে বিলটির আর কোন গুরুত্ব থাকে না, বিলটি অসিদ্ধ হয়। কেন্দ্রে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আহুত উভয় সভার যুগ্ম অধিবেশন সাপেক্ষে রাজ্যসভার বিল পাশের ক্ষেত্রে কিছু ক্ষমতা থাকেই। বিধান পরিষদের ক্ষমতা এক্ষেত্রে নেই বললেই চলে।

উপরের আলোচনা থেকে পাঠক এ কথা অবশ্যই বুঝতে পারছেন আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিধান পরিষদের ক্ষমতা একান্তই গৌণ। বিধান পরিষদকে এক্ষেত্রে 'বাড়তি' বা 'অতিরিক্ত' (Surplusage) ছাড়া অন্য কিছু ভাবার অবকাশ নেই। অন্যদিকে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে পার্লামেন্টের তুলনায় রাজ্য আইনসভার অধিক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয় কক্ষ হিসাবে রাজ্যসভার ক্ষমতা বিধান পরিষদের তুলনায় যে অধিক তাতে কোন সন্দেহ নেই।

২৯.৪.২ অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা (Financial Powers)

রাজ্য আইনসভার অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা হল সরকারের করধার্য বা ব্যয় বরাদ্দের দাবির নিয়ন্ত্রণ বা অনুমোদন। রাজ্য আইনসভার অনুমোদন ছাড়া রাজ্যের বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব বা বাজেট পেশ করা যাবে না। অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা মূলত বিধানসভারই ক্ষমতা, বিধান পরিষদের ক্ষমতা এক্ষেত্রে নেই বললেই চলে। পূর্বেই আপনারা জেনেছেন অর্থবিল বিধান পরিষদে উত্থাপন করা যায় না। বিধানসভা প্রেরিত অর্থ বিল ১৪ দিনের মধ্যে বিবেচনা করে বিধান পরিষদে ফেরত পাঠাতে হয়। বিলের বিরোধিতা হলেও বা ফেরত না পাঠালেও বিধানসভা বিলটিকে অগ্রাহ্য করতে পারে না বা বিলে বাধাদান করতে পারে না। রাজ্যপালের সম্মতি পেলে ঐ বিল বিধান পরিষদের বিবেচনা ছাড়াই বা অসম্মতি সত্ত্বেও আইনে পরিণত হয়। সরকারি অর্থ-ব্যয় মঞ্জুরির ক্ষেত্রে বিধান পরিষদের কোন ক্ষমতা নেই। এটি একমাত্র বিধানসভার অনুমোদন সাপেক্ষ।

তবে বিধানসভার ব্যয়বরাদ্দ করার ক্ষমতাও পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা নয়। কতকগুলি ব্যয় আছে যা এর অনুমোদন সাপেক্ষ নয়। রাজ্যপাল, বিধানসভার স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, বিধান পরিষদের সভাপতি ও সহ-সভাপতি, হাইকোর্টের বিচারপতি প্রমুখের বেতন ও ভাতা, রাজ্যের ঋণ জনিত ব্যয় ইত্যাদি রাজ্যের সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য (Charged upon the Consolidated Fund of the State)। অন্যান্য ব্যয় অবশ্য রাজ্য বিধানসভার অনুমোদন সাপেক্ষ। রাজ্যপালের সুপারিশ ছাড়া বিধানসভার কাছে কোন ব্যয় বরাদ্দের দাবি করা যায় না। কর নীতি ও সরকারি ঋণপদ্ধতি নির্ধারণের ব্যাপারে অবশ্য বিধানসভায় পূর্ণ ক্ষমতা আছে।

অর্থসংক্রান্ত ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের ক্ষমতার সঙ্গে রাজ্য আইনসভার ক্ষমতার মিল থাকলেও পার্লামেন্টের যে এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার আছে তা বলাই বাহুল্য। প্রধানত ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনকে অনুসরণ করে কর এবং কর বহির্ভূত রাজস্বের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত ও পার্লামেন্টের আইন করার অধিকারকে সংবিধান প্রণেতারা গুরুত্ব দিয়েছেন। কর আরোপ করায় এবং আরোপিত করের ভাগ পাবার ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আইনসভার ক্ষমতা বেশি। আর্থিক ক্ষেত্রে রাজ্য আইনগত তালিকার তুলনায় কেন্দ্রের আইনগত তালিকার এলাকা বা গুরুত্ব বেশি। করের ক্ষেত্রে অবশিষ্ট ক্ষমতা (Residuary Power) কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের। ঋণ করার বা অনুদান

(Grants-in-aid) ক্ষমতা কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের হাতে ন্যস্ত। জরুরি অবস্থার সময় বা আর্থিক জরুরী অবস্থার পরিস্থিতিতে রাজ্য আইনসভার আর্থিক ক্ষমতা সীমাবদ্ধ।

২৯.৪.৩ মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা (Controlling the Council of Ministers)

রাজ্য আইনসভার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রণ করা। সংসদীয় গণতন্ত্রকে দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা (responsible government) বলা হয় এই অর্থেই যে আইনসভার জনপ্রিয় কক্ষের কাছে তাদের কার্যকলাপের জন্য রাজনৈতিক শাসন কর্তৃপক্ষকে (Political Executive) দায়িত্বশীল থাকতে হয়। ভারতের সংবিধানের ৭৫(৩) ধারায় যেমন বলা হয়েছে মন্ত্রিপরিষদ যৌথভাবে লোকসভার কাছে যৌথভাবে দায়িত্বশীল থাকবে, ঠিক একইবাবে সংবিধানের ১৬৪(২) ধারায় বলা হয়েছে মন্ত্রিপরিষদ রাজ্যের বিধানসভার কাছে যৌথভাবে দায়িত্বশীল ["The Council of Ministers shall be collectively responsible to the legislative Assembly of the State"—Art 164 (2)]। বিধানসভা নানাভাবে মন্ত্রিপরিষদের এই দায়িত্বশীলতাকে কার্যকর করে—প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, সরকার কর্তৃক আনীত বিল না মঞ্জুর, অর্থবরাদ্দের দাবি অস্বীকার, অনাস্থা প্রস্তাব ইত্যাদি। অনাস্থা প্রস্তাবের (No-Confidence Motion) ক্ষেত্রে স্পিকারের অনুমতিতে ভোটাভুটি হয়। ভোটে সরকার পক্ষের পরাজয় ঘটলে বা সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হলে মন্ত্রিদের একযোগে পদত্যাগ করতে হয়। মন্ত্রিপরিষদের একযোগে পদত্যাগ যৌত দায়িত্বের রীতি মেনেই ঘটে।

মনে রাখা প্রয়োজন সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে লোকসভায় যা যা রীতি আছে, বিধানসভার ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। রাজ্যসভার ভোটে জয় পরাজয় যেমন সরকারকে স্পর্শ করে না, বিধান পরিষদের ভোটে জয় পরাজয়ের তেমনি কোন মূল্য নেই। বিধান পরিষদের বিতর্ক, সমালোচনা সরকারকে সংযত রাখতে সাহায্য করে মাত্র। বিধানসভায় বিতর্ক, সমালোচনা, মুলতুবি প্রস্তাব (Adjournment motion), রাজ্যপালের বক্তৃতা বা বাজেটের উপর আলোচনা শুধুমাত্র সরকারের উপর নয়, রাজ্যের জনমতের উপরও প্রতিফলিত হয়।

জাতীয় জরুরি অবস্থা (National Emergency) ঘোষিত হলে অবশ্য বিধানমণ্ডল বা রাজ্য আইনসভা তার নির্ধারিত ভূমিকা পালন করতে পারে না, কারণ এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের আইনসভার ক্ষমতা খর্ব হয়। সাংবিধানিক অচলাবস্থার কারণেও (Breakdown of the Constitutional Machinery of the State) রাজ্য আইনসভায় ক্ষমতা সংকুচিত হতে পারে এমনকি রাজ্য আইনসভা ক্ষমতাহীন হতে পারে।

২৯.৪.৪ রাজ্য আইনসভার অন্যান্য কাজ (Other functions of State Legislature)

রাজ্য আইনসভার অন্যান্য কাজের মধ্যে আছে ঃ

(i) **নির্বাচনমূলক কাজ (Electoral function) ঃ** বিধানসভার সদস্যরা রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে নির্বাচকমণ্ডলীর (Electoral College) অংশ হিসাবে কাজ করেন। রাজ্যের বিধানসভার সদস্যরা রাজ্যসভার প্রতিনিধি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। রাজ্যের আইনসভায় বিধান পরিষদ (উচ্চকক্ষ বা দ্বিতীয় কক্ষ) থাকলে পরিষদের মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ বিধানসভার সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন। বিধানসভার সদস্যরা স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার এবং বিধান পরিষদের সদস্যরা সভাপতি ও সহসভাপতি নির্বাচন ও অপসারণে অংশগ্রহণ করে।

(ii) **সংবিধান সংশোধনের কাজ (Amendment of the Constitution) ঃ** রাজ্য আইনসভা সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব করতে পারে না। তবে যেসব ক্ষেত্রে রাজ্যের সঙ্গে একযোগে সংশোধন

প্রস্তাব পাশ হওয়া প্রয়োজন সেইসব বিশেষ ক্ষেত্রে (যেমন রাষ্ট্রপতির নির্বাচন, পার্লামেন্টে রাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন, ইউনিয়ন ও রাজ্যের মধ্যে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা বণ্টন, সুপ্রিমকোর্ট বা হাইকোর্ট সংক্রান্ত বিষয়) রাজ্য আইনসভার অনুমোদন প্রয়োজন। সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে রাজ্য আইনসভার ক্ষেত্র অবশ্যই পার্লামেন্টের তুলনায় সীমিত। কোন রাজ্যের এলাকা নির্বাচন বা পরিবর্তন সংক্রান্ত কোন প্রস্তাব থাকলে রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট রাজ্যের বিধানসভার কাছে সেই প্রস্তাব মতামতের জন্য পেশ করতে পারেন। রাজ্য আইনসভার সীমিত যে ক্ষমতা আছে তা অবশ্য একান্তভাবেই বিধানসভার, বিধান পরিষদের এক্ষেত্রে কোন ক্ষমতাই নেই।

(iii) রাজ্য আইনসভার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল আইনসভার বিতর্ক ও আলোচনার মাধ্যমে প্রতিনিধিসভা হিসাবে দায়িত্বপালন। জনসংযোগেও এর একটি ভূমিকা থাকে। বিধানসভার বিতর্কের মান, বিধায়কদের সভার পদ্ধতি ও রীতির প্রতি আনুগত্য, সভার পরিবেশ ও মর্যাদা রক্ষা সবকিছুই রাজ্য আইনসভার তথা বিধানসভার উৎকর্ষকে প্রকাশ করে। পার্লামেন্টের মতোই রাজ্য আইনসভার কার্যকলাপ রাজ্যে, সারা দেশে এমনকি দেশের বাইরেও জনমনে প্রভাব ফেলে। বিধানসভা যে জনপ্রতিনিধিদের হই-হট্টগোল বা তামাশার ক্ষেত্র নয়, নেহাত গল্প-গুজবের আসর নয়, গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রশ্ন, রাজ্যবাসীর সমস্যা বা সরকারি কাজকর্ম সম্পর্কে সচেতন ও সতর্ক সিদ্ধান্ত যে এই সভার আলোচনা বা বিতর্ক থেকেই গৃহীত হবে বিধায়কদের এ ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। অতীত বা বর্তমানের বহু দৃষ্টান্ত আছে যেখানে বিধানসভায় বিরোধীদল গঠনমূলক ভূমিকা পালন করেনি, রাজ্যপালের ভাষণে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে, সরকার ও বিরোধীদলের সদস্যদের মধ্যে কুৎসা, অভব্য আচরণ এমনকি হিংসাত্মক আচরণও লক্ষ করা গেছে। বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, ত্রিপুরা, তামিনলাডু, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র—কমবেশি সব রাজ্যেই বিধানসভার পরিবেশ কলঙ্কিত হবার নজির আছে।

(iv) রাজ্য আইনসভার (বিধানসভা) রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন (State Public Service Commission) অডিটর জেনালের ইত্যাদির রিপোর্ট পেশ করা যায়।

বিধানসভা ও বিধান পরিষদের সাংবিধানিক সম্পর্ক কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের উভয় পরিষদের সাংবিধানিক সম্পর্কের মতো তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, কারণ মাত্র ৪/৫টি রাজ্যের আইনসভায় দ্বিতীয় কক্ষ হিসাবে বিধান পরিষদের অস্তিত্ব আছে। বর্তমান এককের আলোচনা থেকে আপনাদের ধারণা হয়েছে বিধান পরিষদ আছে এমন সব রাজ্যে পরিষদের ক্ষমতা বিধানসভার তুলনায় তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। অর্থ বিষয়ক ব্যাপারে বা সরকারকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বিধানসভাই চরম ক্ষমতা সম্পন্ন। সাধারণ আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সুপারিশ করা বা আইনের প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করা ছাড়া বিধান পরিষদের কোন ক্ষমতা নেই। কেন্দ্রে যেমন লোকসভা বা রাজ্যসভার মধ্যে বিল পাশের ক্ষেত্রে মতবিরোধ হলে উভয় পরিষদের সম্মিলিত অধিবেশন (Joint Sitting) ডাকার ব্যবস্থা আছে, রাজ্যের ক্ষেত্রে সেরকম কোন ব্যবস্থা নেই। অর্থাৎ রাজ্যের ক্ষেত্রে বিধানসভার সাংবিধানিক মর্যাদা পরিষদের তুলনায় বেশি। অর্থবিল বা অর্থসম্বন্ধীয় বিল বিধান পরিষদে উত্থাপন করা যায় না। বিধান পরিষদের সুপারিশের জন্য পাঠানো এই ধরনের বিলকে নাকচ করা বা সংশোধন করার ক্ষমতাও পরিষদের নেই। বিধান পরিষদ সুপারিশসহ যে বিল পাঠায় তা গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান সম্পূর্ণ ভাবেই বিধানসভার এক্তিয়ারে পড়ে। প্রেরিত বিল ১৪ দিনের মধ্যে না পাঠালে ধরে নেওয়া হবে বিলটিতে উভয় পরিষদেরই সম্মতি আছে। অর্থ বিল ছাড়া অন্যান্য

বিলের ক্ষেত্রে বিধান পরিষদ বিধানসভা প্রেরিত কোন বিলকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে বা তিন মাসের মধ্যে ফেরত পাঠাতে পারে। তবে দ্বিতীয়বার পাঠানো বিল প্রত্যাখ্যান করার বা ১ মাসের বেশি ধরে রাখার ক্ষমতা বিধান পরিষদের নেই।

সংবিধানগতভাবে বিধান পরিষদ বিধানসভার অধীন না হলেও উভয় সভার সম্পর্ককে অধীনতামূলক সহযোগিতার সূত্রে আবদ্ধ সম্পর্ক (Principle of Sub-ordinate Co-operation) বলা চলে। বিধান পরিষদের সাংবিধানিক মর্যাদা বা তাৎপর্য যে তেমনভাবে স্বীকৃত নয় তার প্রমাণ পরিষদের দুর্বল গঠনপ্রণালী—একই সঙ্গে পরিষদকে নির্বাচিত, মনোনীত এবং বিভিন্ন স্বার্থের সমাবেশ ঘটেছে, এমন একটি সভায় পরিণত করা হয়েছে। পরিষদের সৃষ্টি বা অবলুপ্তির বিষয়টি সম্পূর্ণভাবেই বিধানসভার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে; অর্থাৎ বিধানসভা এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিলেই পার্লামেন্টের আইন অনুসারে বিধান পরিষদের সৃষ্টি হবে বা অবলুপ্তি ঘটবে। বিধান পরিষদের কাছে নয়, বিধানসভার কাছে মন্ত্রিসভা দায়িত্বশীল—এ ব্যাপারটিই বিধান পরিষদের দুর্বলতাকে প্রমাণ করে।

এবার আসুন আমরা লক্ষ করি রাজ্য আইনসভার গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী হিসাবে বিধানসভার স্পিকার (Speaker) কী ভূমিকা পালন করেন। স্পিকার ছাড়া ডেপুটি স্পিকার (Deputy Speaker) এবং বিধান পরিষদের সভাপতি (Chairman of Legislative Council) রাজ্য আইনসভার কার্য পরিচালনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

২৯.৫ রাজ্য বিধানসভার স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, বিধান পরিষদের চেয়ারম্যান

বিধানসভায় সভাপতিত্ব করেন স্পিকার বা অধ্যক্ষ (Speaker)। সভার কাজকর্ম যাতে সুষ্ঠুভাবে, সুশৃঙ্খলভাবে সম্পাদিত হয় সভার মর্যাদা সুরক্ষিত হয় সেটা দেখাই স্পিকাররে প্রধান কাজ। স্পিকারকে পার্লামেন্টীয় গণতন্ত্রে আইনসভার জনপ্রিয় কক্ষের সেবক হিসাবে অভিহিত করা যায়। আনিসভার প্রভু নয়, স্পিকার হবেন আইনসভার অনুগত দায়িত্বশীল আধিকারিক। বিধানসভার সদস্যগণের মধ্য থেকেই তিনি নির্বাচিত হন। নতুন বিধানসভা বসার পর প্রথম অধিবেশনেই স্পিকার নির্বাচন পর্ব সেরে ফেলতে হবে। সংবিধানের ১৭৮ ধারায় বলা হয়েছে প্রতিটি রাজ্যের বিধানসভা যত সত্বর সম্ভব সভার স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারকে বেছে নেবে। এই পদ দুটি শূন্য হবার সঙ্গে সঙ্গেই তা আবার পূর্ণ করা প্রয়োজন অর্থাৎ নতুন স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হবেন। স্পিকার নির্বাচনের জন্য বিধানসভার যে কোনো সদস্য নাম প্রস্তাব করতে পারেন। প্রস্তাবিত নামের পক্ষে সদস্যদের অধিকাংশ ভোট দিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি স্পিকার পদে নির্বাচিত হবেন। বিধানসভায় কোন বিশেষ দলের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলে ঐ দলের প্রস্তাবিত প্রার্থীই স্পিকার পদে সহজেই নির্বাচিত হবেন। যেক্ষেত্রে বিশেষ একটি দলের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই অথচ অন্যদলের সঙ্গে মিলিতভাবে সরকার গঠিত হয়েছে সেক্ষেত্রে জোট সরকারের (Front Government) সব দলের ঐকমত্যের ভিত্তিতেই কোন এক দলের প্রার্থীকে স্পিকার পদে নির্বাচিত করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে বিরোধী দলের সঙ্গে পরামর্শ করেও কোন সর্বসম্মত প্রার্থীকে স্পিকার মনোনীত করা যায়। এই রীতিটি ইংল্যান্ডের কমন্সসভার ক্ষেত্রে প্রচলিত। ইংল্যান্ডে সরকার ও বিরোধীদলের সর্বসম্মত প্রার্থীকেই স্পিকার পদে মনোনীত করা হয়। পূর্বতন স্পিকার যদি সভায় সদস্য থাকেন এবং স্পিকারপদে

পুনর্নির্বাচিত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তবে তাঁকেই সর্বসম্মতভাবে স্পিকার নির্বাচিত করা হয়। ইংল্যান্ডে পিছনের সারির কোন সদস্য স্পিকারের নাম প্রস্তাব করতে পারেন। ভারতে অবশ্য লোকসভা বা বিধানসভার ক্ষেত্রে স্পিকার নির্বাচনের এই প্রথা অনুসরণ করা হয় না। স্পিকার নির্বাচনে অভিজ্ঞতা বা নিরপেক্ষতার নীতি এদেশে গ্রহণযোগ্য নয়। বিগত দশকে লোকসভার গঠনে বা বিভিন্ন বিধানসভায় কোন একটি দলের স্থায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাব থাকায় এবং বিভিন্ন দলের মিলিত জোট সরকার গঠনের প্রবণতা থাকায় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেন্দ্রে বা রাজ্যে শক্তিশালী বিরোধী দল বা বিরোধীদের জোট থাকায় স্পিকার নির্বাচনের ক্ষেত্রে সর্বসম্মত প্রার্থী গ্রহণের প্রবণতা দেখা গিয়েছে। তবে পূর্বের স্পিকার বর্তমান সভায় নির্বাচিত হলেও স্পিকার পদপ্রার্থীর ক্ষেত্রে তার ইচ্ছা গুরুত্ব পায় নি।

লোকসভার স্পিকারের মতো রাজ্য বিধানসভার স্পিকার যাতে স্বীধান ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারেন তার জন্য সংবিধানে ব্যবস্থা আছে। **প্রথমতঃ** স্পিকার পদে নির্বাচিত হবোর পর যতদিন বর্তমান বিধানসভার আয়ু থাকবে ততদিনই স্পিকার তাঁর পদে থাকবেন। ইতিমধ্যে স্ব-ইচ্ছায় তিনি পদত্যাগ করতে পারেন। তাঁকে অপসারণ করা চলে তবে বিশেষ পদ্ধতি মেনেই তা করতে হবে। স্পিকারকে পদচ্যুত করতে হলে বিধানসভার সদস্যদের অধিকাংশের দ্বারা এই মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হওয়া প্রয়োজন। ১৪ দিনের নোটিশ ছাড়া এ রকম প্রস্তাব গ্রহণ করা যায় না। বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হলেও নতুন স্পিকার নির্বাচিত হবার পূর্ব পর্যন্ত পূর্বতন বিধানসভার স্পিকার তাঁর পদ ত্যাগ করবেন না (সংবিধানের ১৭৯ ধারা)। **দ্বিতীয়ত,** বিধানসভার সদস্য না হলে স্পিকার পদে থাকা সম্ভব নয়। **তৃতীয়ত,** স্পিকারের অপসারণের কোন প্রস্তাব সভার বিবেচনাধীন থাকা কালে স্পিকার সভার সভাপতি হিসাবে কাজ করতে পারেন না (১৮১ ধারা)। এই সময়ে সংবিধানের ১৮০ ধারা বলে ডেপুটি স্পিকার বা তাঁর অনুপস্থিতি সভার নির্ধারিত কোন সদস্য সভার কাজ পরিচালনা করবেন। এই সময় অবশ্য স্পিকার সভার বক্তব্য রাখতে পারেন বা সভার কাজে অংশ নিতে পারেন, এমনকি প্রাথমিক কিছু ক্ষেত্রে ভোটদানও করতে পারেন। **চতুর্থত,** সাধারণভাবে সভার শৃঙ্খলা রক্ষা বা কার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলা ছাড়া স্পিকার কক্ষের তর্কবিতর্কে অংশগ্রহণ করেন না। তবে ভোটাভুটির ক্ষেত্রে মীমাংসা না হলে তিনি নির্ণায়ক ভোট (Casting Vote) দিতে পারেন। **পঞ্চমত,** স্পিকারের বেতন ও ভাতা রাজের্য সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য (Charged on the Consolidated Fund of India)—অর্থাৎ বিধানসভার ভোটে স্পিকারের বেতন ও ভাতা নির্ধারিত হয় না।

২৯.৫.১ স্পিকারের কার্যাবলি (Functions of Speaker)

লোকসভার স্পিকারের যে সব ক্ষমতার কথা বর্তমান পর্যায়ের দ্বিতীয় এককের আলোচনা থেকে শিক্ষার্থী পাঠক জেনেছেন রাজ্য বিধানসভার স্পিকারের ক্ষমতা ও কার্যাবলির আলোচনায় সেই একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি লক্ষ করা যাবে। লোকসভার স্পিকারের মতোই রাজ্য বিধানসভার স্পিকারের কাজ হল বিধানসভার আলোচনা ও বিতর্ক নিয়ন্ত্রণ, সভার সদস্যদের অধিকার রক্ষা, বৈধতার প্রশ্নে মীমাংসা, অর্থবিল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া ইত্যাদি। এবার আসুন শ্রেণিবদ্ধভাবে বিধানসভার স্পিকারের কাজগুলি আমরা আলোচনা করি।

(১) বিধানসভার কার্য পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ ঃ বিধানসভার আলোচনা ও বিতর্ক নিয়ন্ত্রণ করা এবং সভার শৃঙ্খলা বজায় রাখা স্পিকারের প্রথম ও প্রধান কাজ। বিধানসভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্পিকার।

সভাপতি হিসাবে বিধানসভার আলোচনা ও বিতর্ক নিয়ন্ত্রণ, সভার নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষা স্পিকারের প্রধান দায়িত্ব হিসাবে বিবেচিত হয়। সংসদীয় গণতন্ত্রের ধারা অনুসারে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে বিতর্ক হয়, আলোচনা চলে, সিদ্ধান্ত হয় ও আইন পাশ হয়। আইনসভার সভাপতি হিসাবে স্পিকার নিরপেক্ষতা বজায় রেখে চলবেন এবং দেখবেন এই কাজগুলি যেন সঠিকভাবে সভার নিয়ম মেনে সম্পাদিত হয়। শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠের নয়, সংখ্যালঘিষ্ঠের মতামতের দিকে তাঁকে দৃষ্টি দিতে হবে, লক্ষ রাখতে হবে সকলেই যেন স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের সুযোগ পান, সভার কাজে যেন বিঘ্ন না ঘটে অথবা সভার নিয়মকানুনে যেন অপব্যবহার না হয়। বিধানসভার কর্মসূচি (agenda) স্থির করা, বক্তৃতার সময় নির্দিষ্ট করা, রাজ্যপালের বাণী পাঠ করা, বিভিন্ন প্রস্তাব বা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার গ্রহণযোগ্যতা বিচার সব কিছুই বিধানসভার সভাপতি হিসাবে স্পিকারের গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

(২) স্পিকার বিধানসভার মুখপত্র ঃ বিধানসভার মুখপত্র হিসাবে স্পিকার হলেন সরকার ও বিরোধীদল এবং আইনসভা ও রাজ্যপালের মধ্যে আদান-প্রদানের বা যোগাযোগের মাধ্যম। কোন বিষয়ে বৈধতার প্রশ্নে স্পিকারের মীমাংসা বা সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। আলোচনার দিন ধার্য, আলোচনার সময় স্থির, সঠিক ও নির্দিষ্ট সময়ে অর্থবিষয়ক কার্যাদি সমাপ্ত করা, আলোচনা বন্ধ বা চলার অনুমতি প্রদান, ভোট গ্রহণ, ভোটের ফলাফল ঘোষণা সবই স্পিকারের দায়িত্ব।

(৩) লোকসভার মতোই বিধানসভায় স্পিকারের মর্যাদা বিষয়ক কতকগুলি রীতি হল ঃ (ক) স্পিকার দাঁড়ালে সভার সদস্যদের আসন গ্রহণ করতে হয়। (খ) সভার সদস্যদের দাঁড়িয়ে উঠে স্পিকারকে সম্বোধন করতে হয় (সম্বোধনের ভাষা হল Mr. Speaker, Sir, মাননীয় অধ্যক্ষ বা স্পিকার মহাশয়)। (গ) বিশৃঙ্খল আচরণের জন্য স্পিকারের নির্দেশে সদস্যকে সভা ত্যাগ করতে হয়। (ঘ) নির্দেশ অমান্য করলে স্পিকার সদস্যের নাম উল্লেখ করলে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে অধিবেশনের বাকি সময়ের জন্য সভার আলোচনায় অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত করা যায়। (ঙ) বিশৃঙ্খলার কারণে কক্ষের কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিতে পারেন স্পিকার।

(৪) অর্থবিল সম্পর্কিত ক্ষমতা ঃ অর্থবিল সম্পর্কে স্পিকাররে বিশেষ ক্ষমতা আছে। সংবিধানের ১৯৯(৩) ধারায় বলা হয়েছে আইনসভায় উত্থাপিত কোন বিল অর্থবিল কিনা, এ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠলে বিধানসভার স্পিকার সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন এবং তাঁর সিদ্ধান্তই চরম সিদ্ধান্ত বলে বিবেচিত হবে। সংবিধানের ১৯৯ (৪) ধারায় বলা হয়েছে বিধান পরিষদে পাঠানোর সময় এবং রাজ্যপালের সম্মতির জন্য উপস্থিত করবার সময় প্রত্যেক অর্থবিল সম্পর্কে স্পিকারকে এই মর্মে প্রমাণপত্র স্বাক্ষর করতে হবে যে ঐ বিল অর্থবিল।

(৫) স্পিকারের অন্যান্য ক্ষমতা ঃ স্পিকারের অন্যান্য ক্ষমতার মধ্যে পড়ে ঃ

(ক) বিধানসভার বিভিন্ন কমিটি নিয়োগ। সভার কার্য সম্পর্কিত পরামর্শদান কমিটি (Business Advisory Committee), আবেদন কমিটি (Commiottee on Petitions), অধিকার সংক্রান্ত কমিটি (Committee on Privileges), নিয়ম সংক্রান্ত কমিটি (Committee on Rules) ইত্যাদি স্পিকার নিয়োগ করেন।

(খ) বিধানসভার সদস্যদের অধিকার ও অব্যাহতি সুরক্ষিত করা স্পিকারের কাজ।

(গ) সংবিধানের ৫২তম সংশোধন অনুসারে দলত্যাগের বিষয় নির্ধারণ করার দায়িত্ব স্পিকারের। এ ব্যাপারে ১০তম তপশিলে সংযোজিত (১৯৮৫) দলত্যাগ সম্পর্কিত ব্যবস্থা তিনি কার্যকর করতে পারেন।

২৯.৫.২ স্পিকারের নিরপেক্ষতার প্রশ্ন

স্পিকার বিধানসভার রক্ষক ও অভিভাবক। সরকার বা বিরোধী পক্ষের নয়, তিনি একান্তভাবেই বিধানসভার পক্ষে কাজ করবেন। সভার মর্যাদা রক্ষায় পূর্ণ দায়িত্ব তাঁর। তাঁর আচার-আচরণ, কাজকর্মে নিরপেক্ষতাই শেষ কথা. তবে কখনই তিনি সভার উপর প্রভুত্ব করকবেন না, সভার অনুগত সেবকের মতোই তাঁকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। আমাদের দেশে স্পিকারের নিরপেক্ষতা বিষয়ে ব্রিটেনের ঐতিহ্য গড়ে ওঠেনি। অসংশ্লিষ্টভাবে বা দলমতহীন ভাবে কাজ করা বা রাজনীতির উর্ধ্বে নিজেকে স্থাপন করার নজির এদেশে বিশেষ সৃষ্টি হয়নি। পূর্বতন স্পিকার রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ নিয়েছেন, পূর্বতন স্পিকারকে পুনর্বাচিত করা হয় নি, স্পিকারকে রাজনৈতিক অনুগ্রহ (Political Patronage) দেওয়া হয়েছে—এ রকম ঘটনা ভারতে বিরল নয়। রাজ্য-রাজনীতির জটিল ধাঁধায় স্পিকারকে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা দেওয়া হয় নি বা স্পিকার নিজেই পার্লামেন্টীয় ঐতিহ্য অনুসরণে ব্যর্থ হয়েছেন এমন ঘটনা কম নয়।

স্পিকারের দায়িত্ব নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হল ঃ

- ১৯৭৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পিকার বিজয় সিং নাহারের (Bijoy Singh Nahar) সভা অনির্দিষ্টকাল স্থগিত রাখার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। এক্ষেত্রে স্পিকার অজয়কুমার মুখার্জীর নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করা ও ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করার পর বিধানসভা ডাকার ঘটনাকে অসাংবিধানিক ও অবৈধ ঘোষণা করে সভা অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতবি করে দেন। বিধানসভার ক্ষমতাকে অতিক্রম করে স্পিকারের এই ঘোষণা আইনগতভাবে সঠিক কিনা এ প্রশ্ন সংবিধানবিদ মহলে উঠেছে।
- ১৯৮২ সালে কেরলের স্পিকার এস. সি. জোস (S. C. Jose) এবং ১৯৮৬ সালে ঐ একই রাজ্যের বিধানসভার স্পিকার ভি. এম. সুধীরণ (V. M. Sudheeran) রাজনৈতিক স্বার্থে নির্ণায়ক ভোট (Casting Vote) প্রদান করেছেন এই অভিযোগ উঠে।
- ১৯৬৮ সালে পাঞ্জাব বিধানসভার স্পিকার যোগীন্দর সিং মান (Jogindar Singh Mann) ক্ষমতার অপব্যবহার করে ঐ রাজ্যে তীব্র রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি করেছেন এবং পাঞ্জাব ও হরিয়ানার হাইকোর্টে তাঁর কার্যকলাপের বৈধতা নিয়ে মামলা উঠেছিল এবং বিষয়টি সুপ্রিমকোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছে।
- ১৯৭১ সালে তামিলনাড়ুতে বিধানসভার স্পিকার মাথিয়ালগন (K. Mathialagan) বা ১৯৮৭ সালে ঐ রাজ্যে বিধানসভার স্পীকার পাণ্ডিয়ান দুবারের (P. H. Pandian Dubare) কার্যকলাপের যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

২৯.৫.৩ ডেপুটি স্পিকার

স্পিকারের অনুপস্থিতিতে বিধানসভার স্পিকারের যাবতীয় কার্যকলাপ বা দায়িত্ব সম্পাদনের ভার পড়ে ডেপুটি স্পিকারের উপর। ডেপুটি স্পিকারের নিয়োগ, সুযোগ সুবিধা, মর্যাদা, অপসারণ সবকিছুই স্পিকারের মতোই। ডেপুটি স্পিকারের ক্ষেত্রেও স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন প্রত্যাশিত।

বিধান পরিষদের চেয়ারম্যান ঃ বিধান পরিষদের সভাপতি বা চেয়ারম্যানের ক্ষমতা ও মর্যাদা স্পিকারের মতোই। তবে যেহেতু বিধানসভার তুলনায় বিধান পরিষদের ক্ষমতা কম বিধান পরিষদের চেয়ারম্যানের ক্ষমতা স্বাভাবিকভাবেই সীমাবদ্ধ। অর্থবিল সম্পর্কে স্পিকারের যে ক্ষমতা আছে বিধান পরিষদের চেয়ারম্যানের সেই ক্ষমতা নেই।

রাজ্য আইনসভা সম্পর্কিত পরবর্তী আলোচনায় আসবে রাজ্য আইনসভার সদস্যদের অধিকার বা সুযোগসুবিধা সম্পর্কিত সাংবিধানিক ব্যবস্থা।

২৯.৬ রাজ্য আইনসভার সদস্যদের অধিকার ও সুযোগ সুবিধা

সংসদীয় গণতন্ত্রের ধারা মেনে জনপ্রতিনিধি হিসাবে কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্যদের যেমন কিছু অধিকার ও সুযোগ সুবিধার (Privileges and Immunities) কথা সংবিধানে বলা হয়েছে ঠিক একইভাবে রাজ্য আইনসভার জনপ্রতিনিধিদের অধিকার ও সুযোগ সুবিধার কথাও বলা হয়েছে। রাজ্য আইনসভার সদস্যদের অধিকার প্রদানের উদ্দেশ্য হল, স্বাধীনভাবে মর্যাদার সঙ্গে জনপ্রতিনিধি হিসাবে আইনসভায় তাঁরা দায়িত্ব পালন করবেন এবং নির্ভয়ে সরকারি কাজের বিচার বিবেচনা ও সমালোচনা করবেন। দায়িত্বশীল শাসনের প্রয়োজনেই এই অধিকার বা সুযোগ তাঁদের থাকবে। সংবিধানের ১৯৪(১) ও ১৯৪(২) ধারায় রাজ্য আইনসভার সদস্যদের যে দুটি অধিকারের কথা বলা হয়েছে সেগুলি হল রাজ্য আইনসভার অভ্যন্তরে সদস্যদের বাক্ স্বাধীনতার অধিকার (Freedom of Speech) এবং কাগজপত্র প্রকাশের অধিকার (Right of Publication)। ১৯৪ (১) ধারায় বলা হয়েছে বাক স্বাধীনতা ও কাগজপত্র প্রকাশের অধিকারের কথা। ১৯৪ (২) ধারায় বলা হয়েছে উভয় ক্ষেত্রেই সদস্য আদালতে অভিযুক্ত হবেন না। তবে আইনসভার নিয়ম মেনেই সদস্যরা এই অধিকার ভোগ করবেন, অন্যথা হলে স্পিকার তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। আইনসভায় প্রদত্ত বক্তৃতা কোন সদস্য যদি ব্যক্তিগতভাবে বাইরে প্রকাশ করেন সেক্ষেত্রে সাধারণ আইন মেনেই তাঁকে তা করতে হবে। স্পীকার বিতর্ক থেকে কোন অংশ বাদ দিলে বা তার প্রকাশ নিষিদ্ধ করলে সদস্য ঐ অংশ প্রকাশ করলে তাকে আইনসভার অবমাননার দায়ে শাস্তি পেতে হবে।

সংসদে সদস্যদের মতো বিধানসভা বা বিধানপরিষদের সদস্যদের অন্যান্য কী অধিকার ও সুযোগ সুবিধা থাকবে বা না থাকবে তা রাজ্য আইনসভাই স্থির করবে সংবিধানের ৪২˙ তম সংশোধনের (১৯৭৬) আগে পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই ছিল। ব্যবস্থা ছিল রাজ্য আইনসভা এই অধিকার স্থির না করা পর্যন্ত ব্রিটেনের কমন্সসভার নিয়মই চালু থাকবে অর্থাৎ কমন্সসভা বা তার কমিটির সদস্যরা যে অধিকার ভোগ করবেন রাজ্য আইনসভা ও তার কমিটির সদস্যরা সেই অধিকারই ভোগ করবেন। ৪২ তম সংশোধনে কমন্সসভার উল্লেখ তুলে দেওয়া হয় এবং বলা হয় প্রত্যেক কক্ষ ঠিক করবে অন্যান্য অথিকার কী হবে। বিধানসভার ক্ষেত্রে লোকসভা এবং বিধান পরিষদের ক্ষেত্রে রাজ্যসভার অধিকারের ব্যবস্থাই প্রযোজ্য হবে। ১৯৭৮ সালে ৪৪ তম সংবিধান সংশোধন আইন এনে বলা হয়েছ এই সংশোধনের আগে যে কক্ষ যে সব ক্ষমতা বা অধিকার ভোগ করত সেই কক্ষ সেই ক্ষমতা বা অধিকারই ভোগ করবে। আইনসভা আইন করে অধিকার নির্দিষ্ট করে দিতে পারে এ কথাও বলা হল। বর্তমানে অন্যান্য যে অধিকার রাজ্য আইনসভার সদস্যরা ভোগ করেন সেগুলি হল ঃ

(১) **গ্রেপ্তার না হবার স্বাধীনতা (Freedom from Arrest)** ঃ ব্রিটিশ কমন্সসভার সদস্যদের মতোই রাজ্য আইনসভার অধিবেশনের ৪০ দিন আগে থেকে অধিবেশন শেষ হবার ৪০ দিন পর পর্যন্ত

গ্রেপ্তারের হাত থেকে অব্যাহতি পাবেন। তবে আইনসভার পদ্ধতিগত নিয়ম (The Rules of Procedure) অনুসারে ফৌজদারী আইন (Criminal Law) বা নিবর্তনমূলক আটক আইনে (Preventive Detention Act) কোন সদস্যকে আটক করা হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে ঐ সংবাদ আইনসভার কাছে পাঠাতে হবে। পদ্ধতিগত নিয়মে এ কথাও বলা হয়েছে আইনসভার সংশ্লিষ্ট কক্ষের সভাপতির অনুমতি ছাড়া আইনসভার সীমানার মধ্যে কোন সদস্যকে গ্রেপ্তার করা যাবে না। আইনসভার অধিবেশন চলাকালীন কোন সদস্যকে আদালতে সাক্ষ্য দেবার জন্য ডাকা যায় না।

(২) **আইনসভার কক্ষে আগন্তুকদের উপস্থিতি নিষিদ্ধ করার অধিকার (Right to Exclude Strangers) ঃ** শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থেই আইনসভার কোন কক্ষ সভার আগন্তুকদের উপস্থিতি নিষিদ্ধ করতে পারে বা কক্ষ থেকে তাদের চলে যাবার নির্দেশ দিতে পারে।

(৩) **আভ্যন্তরীণ কার্যপদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত করবার অধিকার (Right to Control Internal Procedure) ঃ** আইনসভার কক্ষে কাজ কীভাবে চলবে, কোন পদ্ধতি মেনে চলবে কক্ষই তা স্থির করে এবং এ ব্যাপারে আদালতের কোন হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ।

(৪) **অবমাননার জন্য দণ্ড বিধানের অধিকার (Right to punish members or outsiders for breach of its privileges) ঃ** সভার অধিকারের বিরুদ্ধাচরণের অর্থই সভার অবমাননা (Contempt of the House) এবং তার জন্য সভার সদস্য বা বহিরাগত ব্যক্তির শাস্তি হতে পারে। অধিকারভঙ্গের বিষয়ে অনুসন্ধান করবে ও সুপারিশ করবে আইনসভার অধিকার সংক্রান্ত কমিটি (Committee on Privileges)। তিন ধরনের শাস্তি এক্ষেত্রে হতে পারে—(১) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কক্ষে হাজির করা ও তাকে তিরস্কার ও সতর্ক করা (admonition), (২) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জোর করে কক্ষে হাজির করে কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করা (reprimand) এবং (৩) কঠোর শাস্তি হিসাবে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কারাগারে পাঠানো।

সংসদের সদস্যদের মতোই রাজ্য আইনসভার সদস্যদের অধিকার বা সুযোগ-সুবিধাগুলিকে দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায় ঃ

ব্যক্তিগতভাবে সদস্যদের অধিকার	যৌথভাবে সদস্যদের অধিকার
১. গ্রেপ্তার না হবার স্বাধীনতা। ২. আদালতে সাক্ষ্য দেবার জন্য আদালতে হাজির হওয়া থেকে বিরত থাকার অধিকার (অধিবেশন চলাকালীন)। ৩. বাক্স্বাধীনতার অধিকার।	১. প্রকাশনার অধিকার। ২. আইনসভার কক্ষে আগন্তুকদের উপস্থিতি নিষিদ্ধ করার অধিকার। ৩. আভ্যন্তরীণ কার্যপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার। ৪. আইনসভার অসদাচরণ প্রকাশ করার অধিকার। ৫. আইনসভার অবমাননাতর জন্য দণ্ডদানের অধিকার।

রাজ্য আইনসভার অধিকার প্রশ্নে বহু ঘটনা এবং মামলার নজির আছে। প্রসঙ্গত একটি ঘটনা ও মামলার দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা যায়। ১৯৬৪ সালে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা সমাজতন্ত্রীদলের সদস্য ও কর্মী কেশব সিংহকে বিধানসভার অবমাননার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে ৭ দিনের কারাদণ্ড দেয়। কেশব সিংহ আইনসভার এই দণ্ডদানের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আবদেন করলে হাইকোর্ট শ্রীসিংহকে জামিনে মুক্তি দেবার আদেশ দেয়। বিষয়টি নিয়ে আইনসভা ও আদালতের মধ্যে বিতর্ক উপস্থিত হয়। বিধানসভা শ্রীসিংহের পক্ষে বিচারকারী দুই বিচারককে আইনসভা অবমাননার অভিযোগে সভায় উপস্থিত হবার নির্দেশ দেয়। হাইকোর্ট বিধানসভার এই প্রস্তাবের প্রয়োগ বন্ধ রাখার আদেশ দেয়। রাষ্ট্রপতি বিষয়টিতে সংবিদানের ১৪৩ ধারা অনুসারে সুপ্রিমকোর্টের অভিমতের জন্য প্রেরণ করলে সুপ্রিমকোর্ট যে অভিমত দেয় তার সারাংশ হল ঃ

> ভারতীয় সংবিধানের ১৯৪(৩) অনুচ্ছেদ অনুসারে আইনসভার অধিকারের পরিধি ও বিষয়বস্তু কি হবে বা না হবে, সংবিধানের অনুচ্ছেদের পরিপ্রেক্ষিতে তা স্থির করার ক্ষমতা আদালতের আছে। ("In construing the Act 194 (3) the Courts must have regard to other provisions of the constitution bearing on the same subject".--Supreme Court in re143 UP. legislature V. Judiciary, 1964)

সুপ্রিমকোর্টের অভিমত থেকে বিষয়টি স্পষ্ট সংবিধানের মৌলিক অধিকার ভঙ্গের জন্য আদালতে প্রতিকার পাবার অধিকার নাগরিকের আছে এবং এক্ষেত্রে আইনসভা আদালতের এক্তিয়ারের বাইরে নয়। দ্বিতীয়ত, সংবিধান প্রদত্ত অধিকার বলে আইনসভা নিজের অবমাননার অইভযোগে বিচারকদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারে না।

অনেকেই এ প্রশ্ন তুলেছেন আইনসভার ব্যাপক অধিকারে যৌক্তিকতা আছে কী? কর্তব্য পালনের জন্য আইনসভার কিছু অধিকার বা অব্যাহতি থাকতে পারে কিন্তু আইনসভার হাতে নিজের সুযোগ সুবিধা নির্ধারণের অবাধ ক্ষমতা থাকতে পারে না। আইনসভার বিরুদ্ধে যুক্তিসঙ্গত সমালোচনার অধিকার থাকতেই পারে। গণতান্ত্রিক শাসনের পক্ষে এটি স্বাস্থ্যকর। এর ফলে আইনসভা সতর্কভাবে কাজ করবে। আইনসভার স্বেচ্ছাচার ও অসংযমী আচরণ বন্ধ করার কিছু প্রতিষেধ থাকা বাঞ্ছনীয়। ভারতীয় প্রেস কমিশন (The Indian Press Commission 1954) উদ্ভূত অনিশ্চয়তা ও মতবিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে আইন পাশ করে আইনসভার অধিকার নির্দিষ্ট করে দেওয়ার পক্ষে যুক্তি দিয়েছে। আদালতের সিদ্ধান্ত নিয়ে যদি সমালোচনা হতে পারে তবে আইনসভার কার্যকলাপ নিয়ে, সুযোগ সুবিধা নিয়ে জনসাধারণ ও সংবাদ মাধ্যমে বিতর্ক হলে অসুবিধা কোথায় কমিশন এ প্রশ্নও রেখেছে।

এবার আমরা রাজ্য আইনসভায় বিরোধী দলের অবস্থান বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করতে পারি। রাজ্যে রাজ্যে আইনসভায় বিচিত্র দলীয় অবস্থানের দিকে তাকিয়ে বিরোধী দল সম্পর্কে এই আলোচনা শিক্ষার্থী পাঠকের কাছে অবশ্যই কৌতূহলপ্রদ হবে।

২৯.৭ রাজ্য আইনসভায় বিরোধী দল

সর্বভারতীয় রাজনীতিতে দলব্যবস্থার জটিল পরিবর্তনশীল বিন্যাসের দিকে তাকিয়ে ভারতীয় রাজনীতির গবেষকেরা এর কারণ অনুসন্ধান করেন এবং এই সিদ্ধান্তে আসেন আঞ্চলিক ভিত্তিতে গোষ্ঠী রাজনীতি ও নেতৃত্বের বিকাশ ও বহুদলীয় ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসারই এর কারণ। দুটি বা তিনটি সর্বভারতীয় দলের প্রভাব থাকা সত্ত্বেও

প্রতিটি রাজ্যেই আঞ্চলিক দলের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। আঞ্চলিক রাজনীতিতে জোট বা মহাজোট (alliance and grand alliance) গঠন, ব্যক্তিপূজার প্রবণতা (Personality Cult) এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক 'হাওয়ার' (Political Wave) কার্যকারিতা, দলত্যাগ ও নতুন রাজনৈতিক দলের উত্থান, আঞ্চলিক বিশেষ সমস্যা, পেশি শক্তি ও আর্থিক শক্তির চাপ সব কিছুই দলীয় রাজনীতির উপর প্রভাব ফেলেছে। বিগত দুই দশকে জাতীয় কংগ্রেস, ভারতীয় জনতা দল, জনতা দল সর্বভারতীয় রাজনীতিতে জাতীয় দল হিসাবে প্রভাব ফেললেও বেশকিছু আঞ্চলিক দলও নিজেদের গুরুত্বকে তুলে ধরেছে। এই দলগুলি কখনও সরকারি আবার কখনও বিরোধী মঞ্চে নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তির প্রমাণ রেখেছে। এই দলগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী), ডি. এম. কে, এ. আই. ডি. এম কে, তেলেগু দেশম, অসম গণপরিষদ, আকালী দল, শিবসেনা, সমাজতন্ত্রী দল প্রভৃতি। ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা, হরিয়ানা বিকাশ পার্টি, ত্রিপুরা উপজাতীয় যুব সমিতি, লোকদল, মেঘালয়ের পার্বত্য জনগোষ্ঠী, বিহারের রাষ্ট্রীয় জনতা দল, সমতা পার্টি, ইউনাইটেড জনতা পার্টি, ন্যাশনাল কনফারেন্স, কেরল কংগ্রেস, বি. এস. পি, মুসলিম লিগ, তামিলনাড়ুর তামিল মানিলা কংগ্রেস, পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস, সি. পি. আই, আর. এস. পি, ফলওয়ার্ড ব্লক গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক শক্তি হিসাবে পার্লামেন্টীয় ও রাজ্য আইনসভার নির্বাচনে নিজেদের শক্তির প্রমাণ রেখেছে। আঞ্চলিক দল হিসাবে মণিপুর পিউপিলস পার্টি, সিকিমে সিকিম সংগ্রাম পরিষদ, বিজু জনতা দল কম শক্তিশালী নয়।

রাজ্য আইনসভার বিরোধীদলের যে চিত্র আমরা পাই তার বিশেষত্ব হল ঃ (১) মতাদর্শগত অবস্থান অধিকাংশ ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় না, যদিও সমাজতন্ত্র, উদারগণতন্ত্র বা জাতীয়তাবাদের প্রতি আকর্ষণ কোন কোন দলের ক্ষেত্রে অবশ্যই আছে। (চ) জাতীয় সংহতির প্রশ্নে সরকারিভাবে ঝোঁক দেখালেও অধিকাংশ দল আঞ্চলিক, জাতিগত ও বর্ণগত সমস্যাকে গুরুত্ব দেয়। (৩) ধর্ম এবং ভাষাও আঞ্চলিক দলীয় রাজনীতির অন্যতম আকর্ষণ। (৪) বিশেষ নেতা বা নেতৃকেন্দ্রীক দলীয় বিন্যাস। (৫) রক্ষণশীলতা, স্থায়িত্বের অভাব, কর্মসূচিগত অনমনীয় নীতির অভাব, সংগঠনগত দুর্বলতা রাজ্যের দলীয় রাজনীতিতে তো বটেই বিরোধী দলের মধ্যেও স্পষ্ট। (৬) দলত্যাগ, দুর্নীতি, নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব, সুবিধাবাদ রাজ্যের দলীয় ও বিরোধী রাজনীতিতে প্রশ্রয় পায়। (৭) সংসদীয় রাজনীতিতে অর্থাৎ আইনপ্রণয়ন কাজে, প্রতিনিধিত্বের কাজে, পার্লামেন্টীয় কমিটিতে ভূমিকা পালন বা আইনসভার বিতর্কে বিরোধী দলের গঠনমূলক ভূমিকার অভাব আঞ্চলিক দলীয় রাজনীতির একটি বিশেষ দিক। (৮) জোট হলেও বিরোধী দলগুলির মধ্যে ভাষাদর্শগত পার্থক্য, রক্ষণশীলতা, সাম্প্রদায়িকতা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রবল।

রাজ্যে বিরোধী দলগুলির কর্মসূচিতে দেশের অখণ্ডতা ও সংহতি, ধর্মনিরপেক্ষতা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও স্থায়িত্ব, গণতন্ত্রের সুরক্ষা ইত্যাদি গুরুত্ব পেলেও আঞ্চলিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচি প্রাধান্য পেয়েছে। শ্রমজীবীদের স্বার্থ সংরক্ষণ, দুর্বল ও উপজাতিদের স্বার্থ সম্প্রসারণ, সংরক্ষণ, মাতৃভাষার প্রসার, বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, স্বায়ত্বশাসন, প্রশাসনিক দুর্নীতি রোধ, মানব অধিকার রক্ষা, ন্যায়বিচার, ভূমি-সংস্কার, আঞ্চলিক ক্ষেত্রে পরিকল্পানা, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস, বিচার ব্যবস্থার সংস্কার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার সম্প্রসারণ, গণবন্টন ব্যবস্থার প্রসার রাজ্যে বিরোধী দলের কর্মসূচিতে অগ্রাধিকার পেয়েছে। কর্মসূচির ক্ষেত্রে প্রগতিশীলতার বৈশিষ্ট্য থাকলেও রাজ্যে বিরোধী দল দায়িত্বশীল বিরোধী দল, প্রকৃত শাসনতান্ত্রিক বিরোধী দল হিসাবে নিজেদের প্রতিপন্ন করতে ব্যর্থ হয়েছে। সংসদীয় গণতন্ত্রে সুসংহত বিরোধী দল যে একান্ত প্রয়োজনীয় রাজ্য আইনসভার

বিরোধী দলের কার্যকলাপ বা ভূমিকা সে কথা প্রমাণ করতে পারে নি। বিরোধিতা, চাপ সৃষ্টিই বিরোধী দলের প্রধান লক্ষ্য নয়, আঞ্চলিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা ও দায়িত্বশীল মনোভাব নিয়ে বিরোধী দল ভূমিকা পালন করবে—এটাই রাজ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টির অনুকূল শর্ত।

বর্তমান এককের পরবর্তী আলোচনায় রাজ্য আইনসভায় আইন প্রণয়ন পদ্ধতি ও অর্থবিষয়ক কার্যপদ্ধতি কীরকম সে সম্পর্কে পাঠক কিছু ধারণা পারেন। এক্ষেত্রে পার্লামেন্ট ও রাজ্য আইনসভার মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই।

২৯.৮ রাজ্য আইনসভায় আইন প্রণয়ন পদ্ধতি

কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের মতোই রাজ্য আইনসভার প্রধান কাজ আইন প্রণয়ন। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনেই আইনসভার কাজ পরিচালিত হয়। পদ্ধতিগত যে সব নিয়ম এখানে অনুসরণ করা হয় তা হল বিলের শ্রেণিবিভাগ, বিল সিদ্ধ বা অসিদ্ধ বিষয়ক সাংবিধানিক বিধান, সাধারণ বিল পাশের নিয়ম ও বিভিন্ন পর্যায়, আইনসভার বিভিন্ন কক্ষের নির্ধারিত দায়িত্ব। প্রসঙ্গত বেসরকারি বিল, অর্থবিল পাশের নিয়ম ইত্যাদিও গুরুত্বপূর্ণ।

(ক) **বিল ও বিলের শ্রেণিবিভাগ ঃ** বর্তমান পর্যায়ের ২য় এককের আলোচনায় পাঠক জেনেছেন আইনের খসড়াকে বিল বলে। বিল দু ধরনের—জনস্বার্থ সম্পর্কিত ও ব্যক্তিগত বা বিশেষ স্বার্থ সম্পর্কিত বিল। জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিলকে সরকারি ও বেসরকারি—এই দুভাগে ভাগ করা যায়। সরকারি বিল উত্থাপন করে মন্ত্রীরা। বেসরকারি বিল উত্থাপন করতে পারেন মন্ত্রীরা বাদে পার্লামেন্টের যে কোনো সদস্য। সরকারি বিলের ক্ষেত্রে অনুমতির প্রয়োজন নেই। সরকারি গেজেটে এই বিল প্রকাশিত হয়। বেসরকারি বিলের ক্ষেত্রে অনুমতি প্রয়োজন। অনুমতি পেলে বিলটি গেজেটে প্রকাশিত হয়। সরকারি বিলকে আবার সাধারণ বিল ও অর্থবিল—এই দুভাগে ভাগ করা হয়।

(খ) **বিল অসিদ্ধ হওয়া বিষয়ে সংবিধানের নির্দেশ ঃ** রাজ্য আইনসভায় বিল পাশের ক্ষেত্রে যে সাধারণ নিয়মাবলি অনুসরণ করা হয় দুই-একটি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া কেন্দ্রীয় আইনসভার বিল পাশের সাধারণ নিয়মাবলিরই তা হুবহু অনুসরণ মাত্র। বিল অসিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে রাজ্য আইনসভার ক্ষেত্রে সংবিধানের বিধান হল—(১) রাজ্য আইনসভার কক্ষ বা দুটি কক্ষের অধিবেশন বন্ধ থাকলে বিবেচনাধীন কোন বিল অসিদ্ধ হবে না। (২) বিধানসভা পাশ করে নি এমন কোন বিল বিধান পরিষদের বিবেচনাধীন থাকলে বিধানসভা ভেঙে গেলে তা অসিদ্ধ হবে না। (৩) বিধানসভার বিবেচনাধীন আছে অথবা বিধানসভায় পাশ হাবর পর বিধান পরিষদের বিবেচনাধীন রয়েছে এমন কোন বিল কিন্তু বিধানসভা ভেঙে যাবার কারণে অসিদ্ধ হয়ে যায়। ১৯৬২ সালে পুরুসত্তমান বনাম কেরালা রাজ্য মামলায় সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের ব্যাখ্যা করে বলেছে, যে সমস্ত বিল রাজ্যপাল ও রাষ্ট্রপতির সম্মতির অপেক্ষায় তাঁদের বিবেচনাধীন আছে সেই সব বিল বিধানসভা ভেঙে গেলেও অসিদ্ধ হবে না।

২৯.৮.১ রাজ্যে আইন প্রণয়ন পদ্ধতি

রাজ্যের আইনসভায় আইন প্রণয়নের সাধারণ পদ্ধতি হল ঃ (i) অর্থ বিল ও অন্যান্য অর্থবিল (Money Bill and Other Financial Bills) ছাড়া অন্য বিল রাজ্য আইনসভার যে কোনো কক্ষে উত্থাপন করা যায়। (ii) দুই কক্ষের সম্মতি না থাকলে কোন বিল পাশ হবে না। (iii) সাধারণ নিয়মানুসারে বিধানসভা কর্তৃক গৃহীত কোন বিল বিধান পরিষদে পাঠানো হবে। বিধানপরিষদ যদি ঐ বিলকে প্রত্যাখ্যান করে বা ৩ মাসের মধ্যে বিল পাশ না করে বা এমনভাবে সংশোধন করে যা বিধানসভার অনুমোদন যোগ্য নয়, তাহলে বিধানসভা ঐ বিলকে আবার পাশ করে বিধান পরিষদে পাঠাবে। দ্বিতীয়বার পাশ হবার পর বিধান পরিষদ যদি বিলটিকে প্রত্যাখ্যান করে বা ১ মাসের মধ্যে সংশোধন করে বা বিধানসভার অনুমোদনযোগ্য নয় এমনভাবে সংশোধন করে তবে ধরে নেওয়া হয় বিলটি রাজ্য আইনসভার দুটি কক্ষই পাশ করেছে। আপনারা এর আগেই জেনেছেন কেন্দ্রে যেমন সংসদের দুটি কক্ষের মধ্যে সাধারণ আইন পাশের ক্ষেত্রে বিরোধ থাকলে ঐ বিরোধের মীমাংসা করার ব্যবস্থা আছে সংসদের যুক্ত অধিবেশন ডেকে (সংবিধানের ১০৮ ধারা অনুসারে) রাজ্যের আইনসভার ক্ষেত্রে এ রকম কোন যুক্ত অধিবেশন ডাকার ব্যবস্থা নেই। সংবিধানের ১৯৬ ও ১৯৭ ধারায় বিল উত্থাপন, পাশ, বিল পাশের ক্ষেত্রে বিধান পরিষদের সীমাবদ্ধতা বিষয়ে উপযুক্ত নিয়মাবলি নির্দিষ্ট হয়েছে।

২৯.৮.২ বিল পাশের বিভিন্ন পর্যায়

রাজ্য আইনসভায় বিল পাশের বিভিন্ন পর্যায়গুলি হল ঃ

(i) **বিল উত্থাপন ও বিলের প্রথম পাঠ ঃ** এই পর্বে বিল উত্থাপনের অনুমতির জন্য প্রস্তাব করা হয়। অনুমতি পেলে সংশ্লিষ্ট সদস্য বিলটি উত্থাপন করেন। উত্থাপনের পর বিলটিকে সরকারি গেজেটে প্রকাশ করা হয়। এই পর্যায়ে বিলের উপর কোন আলোচনা হয় না।

(ii) **বিলের দ্বিতীয় পাঠ ঃ** এই পর্যায়ে বিলের উপর আলোচনা ও বিতর্ক শুরু হয়, তবে বিলের বিভিন্ন ধারার বিশদ আলোচনা হয় না। বিল সম্পর্কে ভারপ্রাপ্ত সদস্য প্রস্তাব করেন বিলটি বিবেচিত হোক বা বিলটিকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হোক বা জনমত যাচাইয়ের জন্য বিলটিকে প্রচার করা হোক। বিলটির বিচার বিবেচনা চলে।

(iii) **কমিটি পর্যায় ঃ** এই পর্যায়ে বিলটির সংশোধন চেয়ে কমিটিতে বিশদ বিচার বিবেচনার জন্য আছে। কমিটি বিলের মূল উদ্দেশ্য বা নীতির পরিবর্তন করে না তবে বিলটি নিয়ে গভীর বিচার বিশ্লেষণ করে।

(iv) **রিপোর্ট পর্যায় ঃ** বিচার বিশ্লেষণের পর কমিটি তার রিপোর্ট প্রস্তুত করে। রিপোর্টটি ছাপা হয় ও রিপোর্ট ও সংশোধিত বিল সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হয়। রিপোর্ট পাবার পর বিলের ভারপ্রাপ্ত সদস্য তিনটি বিকল্প প্রস্তাব রাখতে পারেন—কমিটি প্রেরিত বিলটির বিচার বিবেচনা চলুক বা বিলটিকে পুনরায় কমিটিতে পাঠানো হোক বা জনমত গ্রহনের জন্য বিলটি প্রচারিত হোক। বিলটির বিচার বিবেচনার প্রস্তাব গ্রহণ করা হলে কমিটি প্রদত্ত রিপোর্ট বা সুপারিশ নিয়ে বিতর্ক চলে।

(v) **বিচার বিবেচনার পর্যায় ঃ** এই পর্যায়ে বিচার বিবেচনার প্রস্তাব ভোটে গৃহীত হবার পর বিলের

বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে আলোচনা চলে ও ভোট গ্রহণ করা হয়। বিলের সংশোধন প্রস্তাবও এই পর্যায়ে আসতে পারে।

(vi) **বিলের তৃতীয় পাঠ ঃ** বিচার বিবেচনার পর্যায় শেষ হলেও ভোট গ্রহণ পর্ব সমাপ্ত হলে বিলের তৃতীয় পাঠ শুরু হয়। বিলটিকে পাশ কার বা প্রত্যাখ্যানের প্রশ্নে চূড়ান্ত বিতর্ক চলে। সংশোধনের প্রস্তাব আসতে পারে এবং বিলটি সংশ্লিষ্ট কক্ষে পাশ হয়।

(vii) **অপর কক্ষের বিবেচনা ঃ** যে ক্ষেত্রে রাজ্য আইনসভার দুটি কক্ষ থাকে সেক্ষেত্রে একটি কক্ষে বিলটি পাশ হলে অপর কক্ষের বিবেচনার জন্য বিলটিকে পাঠানো হয়। অপর কক্ষ একই পদ্ধতি ও পর্যায় মেনে বিলটি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়। বিধানসভা প্রেরিত বিল বিধানপরিষদে এলে বিধানপরিষদ কী ব্যবস্থা নিতে পারে বা পরিষদের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা কোথায় এ ব্যাপারে আপনার আগেই জেনেছেন। বিধানপরিষদ বিধানসভা প্রেরিত বিলকে সংশোধন করে প্রথমবার ফেরত পাঠালেও দ্বিতীয়বার বিধানসভা প্রেরিত বিলকে অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা বিধান পরিষদের নেই।

(viii) **রাজ্যপালের সম্মতি ঃ** আইনসভায় বিল পাশের পর রাজ্যপাল সম্মতি দিলে বিলটি আইনে (Act) পরিণত হয়। রাজ্যপাল বিলে সম্মতি না দিলে আইনসভায় পুনর্বিবেচনার জন্য পাঠাতে পারেন। দ্বিতীয়বার আইনসভা বিলটি রাজ্যপালের কাছে পাঠালে রাজ্যপাল বিলটিতে সম্মতি দিতে বাধ্য থাকেন (২০০ ধারা)। রাজ্যপাল ইচ্ছা করলে নিজে সম্মতি বা অসম্মতি কোনটাই না জানিয়ে বিলটিকে রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য সংরক্ষিত করতে পারেন। বিলটিকে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির বিবেচনা চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হয়। বিলটিকে তিনি গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করতে পারেন (২০১ ধারা)।

২৯.৮.৩ বেসরকারি বিল সম্পর্কে পদ্ধতি

বেসরকারি বিলের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের আইনসভায় নিয়মই রাজ্যের আইনসভায় প্রযোজ্য। একইভাবে বিল উত্থাপনের অনুমতি চেয়ে প্রথমে ১ মাসের নোটিশ দিতে হবে। স্পিকার অনুমতি দিলে ১ মাসের কম সময়েও বিল উত্থাপনের সুযোগ থাকে। বিলটি আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট দিন ধার্য হয়। বিধানসভায় বেসরকারি বিল ও প্রস্তাব সংক্রান্ত কমিটি বিধানসভায় বিবেচনার আগে বিলটি পরীক্ষা করে, বিলের শ্রেণিবিভাগ করে এবং বিলের আলোচনার সময় ধার্য করে। বিলের উপরে কোন আপত্তি থাকলেও কমিটি তা পরীক্ষা করে। কমিটি বিধানসভার কাছে রিপোর্ট প্রদান করে।

২৯.৮.৪ অর্থবিল পাশের বিশেষ পদ্ধতি

পার্লামেন্টের মতো রাজ্য আইনসভায় অর্থ বিল সম্পর্কে বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। ভারতীয় সংবিধানের ১৯৯ ধারায় অর্থবিলের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের এই ধারা অনুসারে—(i) কোন কর ধার্য, বিলোপ, পরিহার ও পরিবর্তন বা নিয়ন্ত্রণ, (ii) রাজ্য কর্তৃক গৃহীত ঋণ বা জামিনের (Guarantee) নিয়ন্ত্রণ অথবা রাজ্য কর্তৃক গৃহীত বা গ্রহণীয় কোন আর্থিক দায়িত্ব সম্পর্কিত আইনের সংশোধন; (iii) রাজ্যের সঞ্চিত তহবিল (Consolidated Fund) বা আকস্মিকতা তহবিলের (Contingency Fund) জিম্মা (Custody), ঐ তহবিলে অর্থ প্রদান বা প্রত্যাহার; (iv) রাজ্যের সঞ্চিত তহবিল থেকে অর্থ বিনিয়োগ (appropriation); (v) কোন ব্যয় রাজ্যের সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য বলে ঘোষণা বা ঐ ধরনের কোন ব্যয়ের বৃদ্ধি; (vi) রাজ্যের সঞ্চিত তহবিল

বা রাজ্যের সরকারি গণিতক (Public account) খাতে অর্থপ্রাপ্তি বা ঐ ধরনের অর্থের জিম্মা বা নির্গম (issue); (vii) (i) থেকে (vi) পর্যন্ত বর্ণিত উপরোক্ত যে কোনো বিষয়ে প্রাসঙ্গিক (incidental) কোন বিষয় অর্থবিলের অন্তর্ভুক্ত।

অর্থের সঙ্গে সম্পর্কিত সব বিলই অর্থবিল নয়।১৯৯ ধারায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির বাইরে কোন বিল অর্থবিল নয়। জরিমানা বা কোন আর্থিক দণ্ড, লাইসেন্সের জন্য ফী বা পরিষেবার জন্য ফী দাবি বা প্রদান, কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন কর ধার্য, বিলোপ, পরিহার, পরিবর্তন বা নিয়ন্ত্রণ অর্থ বিলের মধ্যে পড়ে না।

রাজ্যে অর্থবিল পাশের ক্ষেত্রে বিশেষ পদ্ধতিগুলি (১৯৮ ধারা) হল ঃ (i) রাজ্য সরকারই অর্থ বিলের উদ্যোক্তা। (ii) রাজ্যপালের সুপারিশ ছাড়া অর্থবিল উত্থাপন করা যাবে না। (iii) বিধান সভাতেই অর্থবিল উত্থাপিত হবে এবং এ সম্পর্কে প্রমাণপত্র (Certificate) দেবেন বিধানসভার স্পিকার। (iv) যে সব রাজ্যের আইনসভায় দ্বিতীয় কক্ষ অর্থাৎ বিধান পরিষদ আছে সেইসব আইনসভায় বিধানসভা সুপারিশের জন্য বিধান পরিষদে অর্থবিল পাঠাতে পারে। বিধান পরিষদ সুপারিশ পাঠালেও অর্থবিলকে সংশোধন বা প্রত্যাখ্যান করতে পারে না।১৪ দিনের মধ্যে বিলটিকে সুপারিশ সহ বিধানসভায় ফেরত পাঠাতে হবে। বিধানসভা বিধান পরিষদের সুপারিশ গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই বিলুটি দুই কক্ষ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে বলে ধরা হবে। বিলটি ফেরত না পাঠালেও ধরা হবে উভয় কক্ষই বিলটি পাশ করেছে।

২৯.৮.৫ অন্যান্য অর্থ সংক্রান্ত বিল (Other Financial Bills)

সংবিধানের ১৯৯ ধারায় বর্ণিত (i) থেকে (vii) বিষয়গুলির সব বা যে কোনো বিষয় নিয়ে বিল রচিত হলে তাকে বলা হয় অর্থবিল। কোন বিল অর্থবিল কিনা সে বিষয়ে স্পিকারের প্রমাণপত্র শেষ কথা। অর্থবিলের ক্ষেত্রে কর বা ব্যয় সম্পর্কিত প্রস্তাব ছাড়া অন্য কিছু থাকে না। অন্যান্য অর্থ সম্বন্ধীয় বিলে এর বাইরের বিষয়ও থাকতে পারে। অন্যান্য অর্থ সংক্রান্ত বিল দু ধরনের। প্রথম শ্রেণির বিল হল সেইসব বিল যাতে অর্থবিলের বিষয়বস্তু ও অন্যান্য বিষয় উভয়ই থাকে। এই বিলকে বিধান পরিষদে উত্থাপন করা যায় না এবং উত্থাপনের জন্য রাজ্যপালের সুপারিশও প্রয়োজন হয়। অন্যান্য সাধারণ বিলের মতো এই অর্থ সংক্রান্ত বিল বিধানপরিষদ সংশোধন বা প্রত্যাখ্যান করতে পারে। দ্বিতীয়বার বিধানসভায় গৃহীত ও বিধান পরিষদে পাঠানোর পর বিধান পরিষদ বিরোধিতা করলেও এই বিল পাশ বয়। দ্বিতীয় শ্রেণির অর্থ সংক্রান্ত বিল হল সেই সব সাধারণ বিল যাতে অর্থবিলের বিষয়বস্তু থাকে না কিন্তু এই বিলকে আইনে পরিনত করে কার্যকর করতে গেলে সঞ্চিত তহবিল থেকে অর্থব্যয় করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এই বিল পাশের পদ্ধতি সাধারণ বিলের মতোই। বিধানমণ্ডলের যে কোনো সভায় এই বিল উত্থাপন করা যায় এবং এই বিলকে সংশোধন বা প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা বিধান পরিষদের আছে। সাধারণ বিলের থেকে এর পার্থক্য হল যে কোনো কক্ষ এই বিল উত্থাপন করলেও রাজ্যপালের সুপারিশ ছাড়া এর বিচার বিবেচনা করতে সমর্থ নয় (সংবিধানের ২০৭ ধারা)। অর্থবিল ভিন্ন অন্য বিলে রাজ্যপাল সম্মতি দিতেও পারেন নাও পারেন। রাজ্যপাল বিধানমণ্ডলের কক্ষদ্বয়ের কাছে পুনর্বিবেচনার জন্য বিলটি ফেরত পাঠাতে পারেন। দ্বিতীয়বার বিধানমণ্ডল বিলটি রাজ্যপালের কাছে পাঠালে রাজ্যপাল সম্মতি দিতে বাধ্য থাকেন। এক্ষেত্রেও রাজ্যপাল বিলটিকে রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য সংরক্ষিত করতে পারেন।

আইন পাশের মতোই রাজ্য আইনসভায় অর্থ বিষয়ক কার্যপদ্ধতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ বিষয়ে পৃথকভাবে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন।

২৯.৯ অর্থ বিষয়ক কার্য পদ্ধতি

সংবিধানের ২০২, ২০৩, ২০৪, ২০৫, ২০৬ ও ২০৭ ধারায় রাজ্য আইনসভার অর্থ বিষয়ক কার্য পদ্ধতি কী হবে সে কথা বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে রাজ্য আইনসভার কার্য পদ্ধতির সঙ্গে পার্লামেন্টের কার্যপদ্ধতির বিশেষ একটা পার্থক্য নেই। সাধারণভাবে ব্রিটেনের পার্লামেন্টের সাধারণ নিয়মগুলিকেই এক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়েছে। সাধারণ যে সব নীতিগুলি এক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয় তা হল—(১) আইনের ভিত্তি ছাড়া কর ধার্য বা সংগ্রহ করা যাবে না অর্থাৎ এক্ষেত্রে আইনসভার অনুমোদন বাঞ্ছনীয়। (২) কর ধার্য করা বা কর বৃদ্ধির ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবেই ভারত সরকারের। (৩) রাজ্যের সঞ্চিত তহবিল থেকে আইন ছাড়া সরকার অর্থ তুলতে পারে না অর্থাৎ এক্ষেত্রে আইনের অনুমোদন চাই। (৪) রাজ্যপালের সুপারিশ ছাড়া ব্যয় মঞ্জুরির দাবি করা যাবে না। (৫) অর্থ বিষয়ক কাজে জনপ্রিয় কক্ষই গুরুত্ব পায়। এর অর্থ রাজ্য আইনসভার অর্থ বিষয়ক কাজে বিধানসভার ভূমিকা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

আইনসভার অর্থ বিষয়ক কার্য পদ্ধতি বলতে প্রধানত বাজেট পাশকেই বোঝায়। বাজেট হল সরকারের বার্ষিক অর্থ বিবরণী যা আইনসভায় পেশ করতে হয় পরবর্তী আর্থিক বছর শুরু হবার আগেই। বাজেটে থাকে আগামী বছরের আয় ও ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব। ১ এপ্রিল থেকে সরকারের নতুন আর্থিক বছর শুরু হয়। সংবিধানের ২০২ (১) ধারায় বলা হয়েছে রাজ্যপাল প্রত্যেক আর্থিক বছর সম্পর্কে আনুমানিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বা 'বাৎসরিক অর্থবিবরণী' (annual financial statement) আইনসভার কক্ষ অথবা কক্ষদ্বয়ের নিকট পেশ করাবার ব্যবস্থা করবেন। সাধারণত অর্থমন্ত্রীই বাজেট পেশ করেন। বাৎসরিক অর্থ বিবরণীতে থাকে আনুমানিক ব্যয়ের হিসাব। আনুমানিক ব্যয় দুভাবে দেখানো হয়—(ক) রাজ্যের সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয় (The sums required to meet expenditure charged upon the consolidated Fund of the State) এবং (খ) রাজ্যের সঞ্চিত তহবিল থেকে অন্যান্য প্রস্তাবিত ব্যয় মেটাবার অর্থ (The sums required to meet other expenditure proposed to be made from the Consolidated Fund of the State) (২০২ (২) ধারা)। রাজ্যপালের বেতন ও ভাতা এবং এই দপ্তরের জন্য অন্যান্য ব্যয়, স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, বিধানসভার চেয়ারম্যান, ডেপুটি চেয়ারম্যানের বেতন ও ভাতা, হাইকোর্টের বিচারপতিদের বেতন ও ভাতার জন্য ব্যয়, সরকারি ঋণজনিত ব্যয় হল প্রথম শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ব্যয়—অর্থাৎ এই ব্যয়গুলি সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয়। এ ছাড়া অন্যান্য সরকারি ব্যয় হল দ্বিতীয় শ্রেণিভুক্ত অর্থাৎ এইসব ব্যয় প্রতি বছর বিধানসভার অনুমোদন সাপেক্ষ। এই ব্যয় বিধানসভার ভোট দ্বারা নির্ধারিত হয়।

বাজেট উপস্থাপিত হবার পর শুরু হয় বাজেটের সাধারণ আলোচনা। এই পর্বে সরকারি নীতি সম্পর্কে আলোচনা চলে ও বিভিন্ন বিভাগের কাজের উপর আলোচনা ও সমালোচনা হয়।

বাজেটের সাধারণ আলোচনার পর সরকার ভোটযোগ্য বিষয়গুলির **ব্যয়মঞ্জুরির** দাবি করে এবং এর উপর আলোচনা ও ভোট হয়। একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই আলোচনা শেষ করতে হবে। নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে ব্যয় সংক্রান্ত আলোচনা সমাপ্ত না হলে শেষ তারিখে স্পিকার গিলোটিন পদ্ধতি প্রয়োগ করে আলোচনা ছাড়াই ভোটের

সাহায্যে এইসব ব্যয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার ব্যবস্থা করেন। অনুমোদন সাপেক্ষ ব্যয়গুলি সম্পর্কে বিধানসভার ক্ষমতা হল ব্যয় হ্রাস বা প্রত্যাখানের ক্ষমতা, ব্যয়বৃদ্ধি বা নতুন ব্যয়ের প্রস্তাব বিধানসভা করতে পারে না। বিধানসভা ব্যয়হ্রাসের জন্য যে সব ছাঁটাই প্রস্তাব (Cut motion) আনে সেগুলি হল ঃ (১) নীতি অনুমোদন সংক্রান্ত ছাঁটাই (Policy cut) ঃ — এই প্রস্তাবে সরকারের ব্যয়ের দাবিকে ছাঁটাই করে ১ টাকায় আনার কথা বলা হয়। উদ্দেশ্য সরকারি নীতির দাবি নিয়ে আলোচনা। (২) ব্যয়সংক্ষেপ ছাঁটাই প্রস্তাব (Economy cut) ঃ এক্ষেত্রে সরকারের ব্যয়ের দাবিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কমাবার প্রস্তাব নেওয়া হয়। (৩) প্রতীক ছাঁটাই প্রস্তাব (Token cut) ঃ এই প্রস্তাবে কোন নির্দিষ্ট অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য সরকারের কোন ব্যয়ের দাবি সামান্য ছাঁটাই (১০০ টাকার মতো) করবার প্রস্তাব হয়।

বিধানসভায় ব্যয় মঞ্জুরির দাবি অনুমোদিত হবার পর যত শীঘ্র সম্ভব বিনিয়োগ বিল (Appropriation Bill) নামে একটি বিল পাশ করিয়ে নিতে হয়। বিনিয়োগ আইন হল অনুমোদিত ব্যয় ও সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয়—এই দুই শ্রেণির ব্যয় নির্বাহের জন্য রাজ্যের সঞ্চিত তহবিল থেকে সরকারকে অর্থ তোলার ক্ষমতা দেওয়ার জন্য প্রস্তাবিত হল। সংবিদানের ২০৪ ধারায় বিনিয়োগ বিল সম্পর্কে নির্দেশ আছে। বিনিয়োগ আইন প্রণয়নের সময় মঞ্জুর করা হবে এমন কোন ব্যয়ের পরিমাণ বা উদ্দেশ্য পরিবর্তন করা চলবে না বা সংশোধন আনা যাবে না।

যখন চলতি বছরের জন্য কোন বিষয়ে মঞ্জুরি করা হয়েছে এমন ব্যয় অপ্রচুর হয়ে পড়ে, অথবা অনুপূরক বা অতিরিক্ত ব্যয় করার প্রয়োজন হয় তখন সরকারকে ঐ ব্যয়ের হিসাব পেশ করে মঞ্জুর করিয়ে নিতে হয়। এই ব্যয় মঞ্জুরির প্রস্তাবকেই বলে অনুপূরক বা অতিরিক্ত অনুদান (Suulementary or additional grants)। চলতি আর্থিক বছরের মধ্যেই এই ব্যয়ের হিসাব বিধানসভায় অনুমোদিত হবে (সংবিধানের ২০৫ ধারা)।

বাৎসরিক আর্থিক বিবৃতি এবং বাৎসরিক বিনিয়োগ আইন আলোচনা ও পাশ হতে হতে নতুন বছর আরম্ভ হয়ে যায়। অথচ সংবিধান মেনে সরকারকে আইন অনুসারে অর্থ ব্যয় করতে হবে। এইজন্য সরকারকে অর্থব্যয়ের অনুমতি দিতেই হয়। গণনানুদান (Votes on Account) পাশ করে সরকারকে বিধানসভা এই অনুমতি দেয়। এর সঙ্গে বিনিয়োগ আইনও পাশ হয়। গণনানুদানের কথা সংবিধানের ২০৬ ধারায় বলা হয়েছে। এই ধারায় একথাও বলা হয়েছে অপ্রত্যাশিত বা অনিশ্চিত ব্যয় মেটানোর জন্য বিধানসভা প্রত্যায়ানুদানের মাধ্যমে সরকারকে অর্থ ব্যয়ের ক্ষমতা দিতে পারে (Votes on Credit)। চলতি বছরের কাজের ব্যয়ের মধ্যে পড়ে না এমন কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যয় বহনের জন্য আইনসভা সরকারকে ব্যতিক্রমানুদানের মাধ্যমে (Exceptional Grants) অর্থব্যয় করার ক্ষমতা দিতে পারে।

সব শেষে ২০৭ ধারায় বলা হয়েছে রাজস্ব আইনের কথা (Financial Bill)। সরকারের কর প্রস্তাবকে কার্যকর করা জন্য বাজেট পেশের সময়ই বিল আকারে রাজস্ব সম্পর্কিত প্রস্তাব উপস্থিত করতে হয়। কর বৃদ্ধি বা নতুন কর ধার্য করার জন্য সংশোধন এলে রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ছাড়া তা কার্যকর হয় না। কর হ্রাস বা বিলোপ সাধনের জন্য সংশোধন আনা যায়। রাজস্ব বিলের উপর সরকারি প্রস্তাব নিয়ে বিধানসভায় আলোচনার পর্যাপ্ত সুযোগ আছে। সাময়িকভাবে কোন কর বা শুল্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে সরকার সাময়িক কর সংগ্রহের আইন (Provisional Collection of Taxes Act) আনতে পারে।

লোকসভার মতো বিধানসভার অর্থের উপর নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হয় নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষক সরকারি গণিতক কমিটি ও আনুমানিক ব্যয় হিসাব কমিটির সাহায্যে। আগে ব্যবস্থা ছিল রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ক্রমে ভারতের নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষক স্থির করতেন কীভাবে রাজ্যের হিসাব স্থির হবে। ১৯৭৬ সালের ৪২তম সংশোধনে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়। বলা হয় আইনসভা যে উদ্দেশ্যে অর্থ মঞ্জুর করে তার সীমার মধ্যে থেকে সরকারি অর্থ ব্যয় হচ্ছে কিনা, শাসনবিভাগ আইন অনুসারে অর্থ ব্যয় করতে কি না নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষক (The Comptroller and Auditor General) আইনসভার পক্ষ থেকে তা পরীক্ষা করবেন। হিসাব পরীক্ষার পর তিনি রাজ্যপালের কাছে রিপোর্ট পেশ করবেন। ১৯৭৮ সালে ৪৪তম সংশোধনে স্থির হয় রাজ্যের হিসাব কীভাবে রক্ষিত হবে রাষ্ট্রপতি নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষকের পরামর্শক্রমে তা স্থির করে দিতে পারেন।

কেন্দ্রে লোকসভার মতো রাজ্যের বিধানসভাতেও সরকারি গণিতক কমিটি (Public Accounts Committee) ও আনুমানিক ব্যয় হিসাব কমিটি (The Estimates Committee) আইনসভার হয়ে রাজ্যের আয়-ব্যয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখে। **সরকারি গণিতক কমিটির** কাজ হল বিনিয়োগ হিসাব (Appropriation Accounts) ও অন্যান্য যে সব হিসাব বিধানসভায় উপস্থিত করা হয় সেই সব হিসাব এবং নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষকদের রিপোর্ট পরীক্ষা করা। কমিটি ব্যয় সংক্ষেপ, ব্যয়ের যৌক্তিকতা এবং আয়-ব্যয়ের নৈতিক মানের উন্নয়ন ও আর্থিক সমীচীনতার প্রশ্নে সুপারিশ করে। আনুমানিক ব্যয় হিসাব কমিটির কাজ হল সরকার যে ব্যয় করেছে তার হিসাব নিকাশ পরীক্ষা করা, সরকারি আনুমানিক ব্যয়ের হিসাব পর্যালোচনা করে ব্যয় সংক্ষেপের সুপারিশ পশ্চিমবঙ্গে ৯ জন সদস্য নিয়ে একটি সরকারি গণিতক কমিটি এবং ১৫ জন সদস্য নিয়ে আনুমানিক ব্যয় হিসাব কমিটি বিধানসভায় আছে। সদস্যরা এক বছরের জন্য সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে নির্বাচিত হন।

বর্তমান এককের সবশেষে শিক্ষার্থী পাঠক জানবেন রাজ্যের আইনসভায় কমিটি ব্যবস্থার অবস্থান ও ভূমিকা কী এবং রাজ্যে আইনসভার রীতি ও পদ্ধতিগুলি কী। রাজ্য আইনসভার কমিটি বা রীতি পদ্ধতি কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের কমিটি ও রীতিপদ্ধতির মতোই।

২৯.৯.১ রাজ্যের কমিটি ব্যবস্থা

কমিটি ব্যবস্থা আইনসভার কাজের ভার লাঘব করে, আইনসভার সময় বাঁচায় এবং আইনসভার কাজে দক্ষতা সৃষ্টি করে। বর্তমান পার্লমেন্টীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকারের একনায়কত্বের যে সুযোগ আছে কমিটি ব্যবস্থার সাহায্যে পার্লামেন্ট সেই প্রবণতাকে রোধ করে। পার্লামেন্টের মতো বিধানমণ্ডলেও কমিটিগুলি অর্থবিষয়ক কমিটি, সাধারণ কমিটি, আইন বিষয়ক কমিটি এইভাবে বিভক্ত। অর্থ বিষয়ক কমিটির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সরকারি গণিতক কমিটি, আনুমানিক ব্যয় হিসাব কমিটি ও সরকারি উদ্যোগাধীন (জন দায়িত্ব পালন) সংক্রান্ত কমিটি। সাধারণ কমিটির মধ্যে অন্যতম হল আবেদন সংক্রান্ত কমিটি (Committee on Petitions), কার্য পরিচালনা সংক্রান্ত পরামর্শদান কমিটি (Business Advisory Committee), নিয়মাবলি সংক্রান্ত কমিটি (Rules Committee), অধিকার সংক্রান্ত কমিটি (Committee on Privileges), সরকারি প্রতিশ্রুতি কমিটি (Committee on Government Assurance)। তপশিলি জাতি ও উপজাতি কল্যাণ সংক্রান্ত কমিটি (Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Tribes)। আইন সংক্রান্ত কমিটির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বিল সম্পর্কিত সিলেক্ট কমিটি (Select Committee on Bills)। কমিটির সদস্যদের স্পিকার

নিযুক্ত করেন। কোন কোন কমিটিতে স্পিকার নিজে সভাপতিত্ব করেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি কমিটির চেয়ারম্যানকেও মনোনীত করেছেন। কমিটিগুলির সদস্য সংখ্যা ৯ থেকে ১৩। অধিকাংশ কমিটির কার্যকালের মেয়াদ ১ বৎসর। সরকারি উদ্যোগাধীন প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত কমিটি, সরকারি প্রতিশ্রুতি কমিটিতে কোন মন্ত্রী সদস্য হতে পারেন না। সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় সরকারি কাজের পর্যালোচনা, সরকারি আয়-ব্যয়ের সমীক্ষা, বিলের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবেচনা, বিধানসভার সদস্যদের অধিকার রক্ষা, জনগণের আবেদন, সরকারি প্রতিশ্রুতি রক্ষা—এই সব গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি সঠিকভাবে হয় কিনা সেটা দেখার উদ্দেশ্যেই কমিটিগুলি কাজ করে।

রাজ্য আইনসভার রীতি পদ্ধতি ঃ পার্লামেন্টের মতোই রাজ্য আইনসভার অধিবেশন আহ্বান, স্থগিত রাখা, বিধানসভা ভেঙে দেওয়া, আইনসভার সদস্যদের শপথ গ্রহণ, স্পিকার নির্বাচন, রাজ্যপালের উদ্বোধনী ভাষণ, কোরাম, শৃঙ্খলার প্রশ্ন, প্রশ্ন, অতিরিক্ত প্রশ্ন, নানা প্রস্তাব, জিরো আওয়ার এইসব রীতিগুলি প্রচলিত। সংসদীয় ব্যবস্থাকে গতিশীল রাখতে, স্থায়িত্ব দিতে এই রীতিগুলির সঠিক প্রয়োগ ঘটবে এটাই বাঞ্ছনীয়।

২৯.১০ সারাংশ

জনপ্রতিনিধিসভা হিসাবে পার্লামেন্টের মতো রাজ্য আইনসভা গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্যের আইনসভাগুলির মধ্যে অধিকাংশই এক পরিষদসম্পন্ন। যেখানে আইনসভার দুটি পরিষদ আছে সেখানে দ্বিতীয় বা উচ্চতর কক্ষের নাম বিধানপরিষদ এবং নিম্নতর বা প্রথম কক্ষের নাম বিধানসভা। বিধার পরিষদের সদস্য সংখ্যা রাজ্য আইনসভার এক-তৃতীয়াংশের বেশি বা ৪০-এর কম হয় না। বিধানসভার সদস্য, গ্র্যাজুয়েট, শিক্ষক, স্বায়ত্ত্বশাসন মূলক সংস্থা প্রভৃতিদের দ্বারা বিধান পরিষদের সদস্যরা নির্বাচিত হন, রাজ্যপাল কয়েকজনকে মনোনীত করেন। বিধানসভার সদস্যরা প্রাপ্তবয়স্কের ভোটে নির্বাচিত। বিধানসভার সদস্য ৫০০-র বেশি ৬০ এর কম হবে না। পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার সদস্য ২৯৪। বিধানসভার স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার এবং বিধান পরিষদে সভাপতি ও সহ-সভাপতি নিযুক্ত হন। রাজ্যে বিধান পরিষদের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটেনি। সুতরাং এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলা কঠিন। রাজ্যে এর সাংবিধানিক তাৎপর্য সম্পর্কে অধিকাংশ লেখক সন্দেহ প্রকাশ করেন।

রাজ্য আইনসভার প্রধান কাজগুলি হল আইন প্রণয়ন, আর্থিক নিয়ন্ত্রণ, সরকারকে নিয়ন্ত্রণ। এ ছাড়া নির্বাচন, সংবিদান সংশোধন, প্রতিনিধিত্ব রাজ্য আইনসভার কাজ। দ্বিপরিষদ সম্পন্ন রাজ্য আইনসভায় বিধানসভাই মূল ভূমিকা পালন করে। অর্থ সংক্রান্ত বা সরকার নিয়ন্ত্রণে বিধান পরিষদের ক্ষমতা তেমন নেই। রাজ্য আইনসভার সদস্যরা সংসদ সদস্যদের মতোই অধিকার ও সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন। বাক্ স্বাধীনতা ও গ্রেপ্তার হবার বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংবিদান নির্দিষ্ট দুটি উল্লেখযোগ্য অধিকার। রাজ্য আইনসভার দলীয় ব্যবস্থা তেমন সুস্তিও নয়, বিরোধী দলের অবস্থান স্পষ্ট নয়। দলের বৈশিষ্ট্য বিচারের মতো বিরোধী দলের বৈশিষ্ট্য বিচারে প্রাদেশিকতা, জাতপাত, ধর্মের প্রভাব মতাদর্শগত অস্পষ্ট, গঠনমূলক বিরোধিতার অভাব লক্ষ করা যায়।

রাজ্যের আইনসভায় আইন প্রণয়নের একটি নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। আইনের প্রস্তাব বিল আকারে যে কোনো কক্ষে উপস্তিত করা যায়। অর্থবিল বিধানসভায় উত্থাপন করা চলে না। বিধান পরিষদ অর্থবিল প্রত্যাখ্যান করতেও পারে না। বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে রাজ্য আইনসভায় আইন পাশ হয়। রাজ্যপাল বিলে সম্মতি দেন বা বিল রাষ্ট্রপতির জন্য সংরক্ষণ করতে পারেন। অর্থবিলের জন্য বিশেষ পদ্ধতি আছে। অর্থবিল আর অর্থ সম্বন্ধীয় বিল

এক নয়। রাজ্য বিধানমণ্ডলে অর্থ বিষয়ক পদ্ধতির মূল কথা হল আইনের ভিত্তিতেই অর্থবিষয়ক কার্যপদ্ধতি পরিচালিত হবে। আইন ব্যতীত সঞ্চিত তহবিল থেকে অর্থ তোলা যাবে না। রাজ্যপালের সুপারিশ ছাড়া ব্যয় মঞ্জুরির দাবি করা যাবে না। অর্থ বিষয়ক কার্যপদ্ধতির প্রধান কথা হল বাজেট পাশ। বাজেট হল বাৎসরিক অর্থ বিবরণী। রাজ্যপাল এই বাজেট পাশের ব্যবস্থা করবে। অর্থ বিবরণীতে আনুমানিক ব্যয়ের হিসাব থাকবে। ব্যয় মঞ্জুরির দাবি, গণনানুদান, অতিরিক্ত অনুদান, বিনিয়োগ আইন, রাজস্ব আইন সব কিছুই অর্থবিষয়ক কার্য পদ্ধতির অঙ্গ। রাজ্য বিধানসভায় আয়-ব্যয়ের নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে ভারতের নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষক, সরকারি গণিতক কমিটি, আনুমানিক ব্যয় হিসাব কমিটি। রাজ্য আইনসভার কমিটি ব্যবস্থার মাধ্যমেই আইনসভার নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে। উল্লেখযোগ্য কমিটি হল কার্য পরিচালনা সংক্রান্ত পরামর্শদান কমিটি, বিল সংক্রান্ত সিলেকট কমিটি, অধিকার সংক্রান্ত কমিটি প্রভৃতি। পার্লামেন্টের মতো রাজ্য আইনসভার রীতি পদ্ধতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বিধানসভার সদস্যদের শপথ, স্পিকার নির্বাচন, রাজ্যপালের ভাষণ, সভার বিভিন্ন প্রস্তাব ইত্যাদি।

২৯.১১ অনুশীলনী

(১) সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে নিম্নলিখিত বাক্যগুলি পুনরায় লিখুন।

(ক) পশ্চিমবঙ্গের আইনসভা এককক্ষ বিশিষ্ট/দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট।

(খ) বিধানসভা/পার্লামেন্ট বিধান পরিষদ আইন পাশ করে।

(গ) রাজ্যপাল বিধানসভায়/বিধান পরিষদে কতিপয় সদস্যকে মনোনীত করেন।

(ঘ) বিধানসভার সদস্যরা প্রত্যক্ষভাবে/পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন।

(ঙ) বিধান পরিষদে অর্থবিল উত্থাপিত হয়/ হয় না।

(চ) রাজ্য আইনসভার দুটি কক্ষের বিরোধ মেটাতে উভয় কক্ষের যুগ্ম অধিবেশন ডাকার ব্যবস্থা আছে/নেই।

(ছ) বিধানসভার মুখপত্র হলেন স্পিকার/চেয়ারম্যান।

(জ) অর্থবিলের প্রমাণপত্র দেন রাজ্যের রাজ্যপাল/বিধানসভার স্পিকার/বিধান পরিষদের চেয়ারম্যান।

(ঝ) অর্থ সংক্রান্ত সব বিলই অর্থবিল/অর্থবিল নয়।

(ঞ) সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয় রাজ্য আইন সভার অনুমোদন সাপেক্ষ/অনুমোদন সাপেক্ষ নয়।

(২) দু-একটি বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন। ২.৬ অংশের উত্তরের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

(ক) রাজ্যের আইনসভার উচ্চ কক্ষের নাম কী?

(খ) বিধানসভার সদস্যদের যোগ্যতা কী?

(গ) ডেপুটি স্পিকারের কাজ কী?

(ঘ) রাজ্য আইনসভার দুটি মুখ্য কাজ কী?

(ঙ) রাজ্য আইনসভার সদস্যদের দুটি অধিকারের নাম উল্লেখ করুন।

(চ) রাজ্যের আইনসভার বিরোধী দলের দুটি বৈশিষ্ট্য কী?

(ছ) বিধানসভায় অর্থের উপর নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে যে কমিটি আছে সেই কমিটি দুটির নাম করুন।

(জ) রাজ্যে আইনসভার আইন সংক্রান্ত একটি কমিটির নাম করুন।

(৩) প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন (অনধিক ৫০টি শব্দের মধ্যে)।

(ক) রাজ্য আইনসভার গঠন পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

(খ) রাজ্য আইনসভার আইন বিষয়ক বা অর্থ বিষয়ক কাজ সম্পর্কে লিখুন।

(গ) শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রমে রাজ্য আইনসভার ভূমিকা কী?

(ঘ) রাজ্য আইনসভার সদস্যদের অধিকার ও অব্যাহতি বিষয়ে লিখুন।

(ঙ) রাজ্যের আইনসভার বিরোধীদলের বৈশিষ্ট্য কী?

(চ) রাজ্য আইনসভার কমিটিগুলির নাম করুন।

(৪) অনধিক ১৫০টি বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন।

(ক) রাজ্য আইনসভার কাজগুলি বর্ণনা করুন।

(খ) রাজ্য বিধানসভার স্পিকারের ভূমিকা আলোচনা করুন।

(গ) আইনসভার আইন প্রণয়ন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) রাজ্য আইনসভার অর্থ বিষয়ক কার্য পদ্ধতি আলোচনা করুন।

২৯.১২ উত্তরমালা

(১) (ক) পশ্চিমবঙ্গের আইনসভা এককক্ষ বিশিষ্ট।

(খ) পার্লামেন্ট বিধান পরিষদ আইন পাশ করে।

(গ) রাজ্যপাল বিধানসভায় কতিপয় সদস্যকে মনোনীত করেন।

(ঘ) বিধানসভার সদস্যরা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন।

(ঙ) বিধান পরিষদে অর্থবিল উত্থাপিত হয় না।

(চ) রাজ্য আইনসভার দুটি কক্ষের বিরোধ মেটাতে উভয় কক্ষের যুগ্ম অধিবেশন ডাকার ব্যবস্থা নেই।

(ছ) বিধানসভার মুখপত্র হলেন স্পিকার।

(জ) অর্থবিলের প্রমাণপত্র দেন বিধানসভার স্পিকার।

(ঝ) অর্থ সংক্রান্ত সব বিলই অর্থবিল নয়।

(ঞ) সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয় রাজ্য আইনসভার অনুমোদন সাপেক্ষ নয়।

(২) (ক) রাজ্যের আইনসভার উচ্চ কক্ষের নাম বিধান পরিষদ।

(খ) বিধানসভার সদস্যদের যোগ্যতা (i) ভারতীয় নাগরিকত্ব (ii) ২৫ বছর বয়স (iii) সংসদের আইন দ্বারা নির্দিষ্ট অন্যান্য যোগ্যতা।

(গ) ডেপুটি স্পিকার স্পিকারের অনুপস্থিতি বিধানসভার কার্য পরিচালনা করেন।

(ঘ) রাজ্য আইনসভার দুটি মুখ্য কাজ হল (i) আইন প্রণয়ন (ii) অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা অর্থাৎ অর্থের অনুমোদন।

(ঙ) রাজ্য আইনসভার সদস্যদের দুটি অধিকার (i) গ্রেপ্তার না হবার অধিকার (অধিবেশন আরম্ভ হবার ৪০ দিন আগে ও পরে) (ii) বাক্‌স্বাধীনতা ও কাগজপত্র প্রকাশের স্বাধীনতা।

(চ) রাজ্যের আইনসভায় বিরোধী দলের দুটি বৈশিষ্ট্য হল (i) আঞ্চলিক রাজনীতির প্রতি আকর্ষণ (ii) স্থায়িত্বের অভাব।

(ছ) বিধানসভায় অর্থের উপর নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে যে দুটি কমিটি আছে সেগুলি হল (i) সরকারি গণিতক কমিটি (ii) আনুমানিক ব্যয় হিসাব কমিটি।

(জ) রাজ্য আইনসভার আইন সংক্রান্ত একটি কমিটির নাম হল বিল সম্পর্কিত সিলেক্ট কমিটি।

(৩) **উত্তর সংকেত ঃ** (ক) ৮০-৮২ পৃষ্ঠা। (খ) ৮৪-৮৫ পৃষ্ঠা। অথবা ৮৫-৮৬ পৃষ্ঠা। (গ) ৮৬ পৃষ্ঠা। (ঘ) ৯২-৯৪ পৃষ্ঠা। (ঙ) ৯৫ পৃষ্ঠা (চ) ১০২ পৃষ্ঠা।

(৪) **উত্তর সংকেত ঃ** (ক) ৮৩-৮৬ পৃষ্ঠা। (খ) ৮৮-৯১ পৃষ্ঠা। (গ) ৯৬-৯৯ পৃষ্ঠা। (ঘ) ৯৯-১০২ পৃষ্ঠা।

২৯.১৩ গ্রন্থপঞ্জি

(১) Durga Das Basu : *Introduction to the Constitution of India (1999).*

(২) M. V. Pylee : *An Introduction to the Constitution of India (1995).*

(৩) S. L. Sikri : *Indian Government and Politics (1989).*

(৪) Dhirendranath Sen : *From Raj to Swaraj (1954).*

(৫) Subhas C. Kashyap (Ed.) : *Perspectives on the Constitution (1993).*

ভূমিকা

বর্তমান পর্যায়ে ভারতের শাসনব্যবস্থায় বিচার বিভাগের গঠন প্রণালী, কার্যাবলি ও ভূমিকা সম্পর্কে শিক্ষার্থী পাঠকের পরিচয় ঘটবে। পূর্ববর্তী পর্যায়গুলিতে কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগ সম্পর্কে শিক্ষার্থী পাঠক যেভাবে বিস্তৃত জানার সুযোগ পেয়েছেন, বর্তমান পর্যায়ে একইভাবে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সুপ্রিমকোর্ট এবং রাজ্যে ও স্থানীয়স্তরে যথাক্রমে হাইকোর্ট ও স্থানীয় আদালতগুলির অবস্থান কী সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যাবে। লর্ডস ব্রাইস যথার্থই বলেছেন, বিচার বিভাগের সামর্থ্য ও যোগ্যতা সরকারের মান নির্ধারণের প্রধান মাপকাঠি ("There is no better test of the excellence of a good government than the efficienty of its judicial system. Lord Bryce)। সন্দেহ নেই নাগরিক অধিকার সুরক্ষিত করতে, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় এবং সরকারি ক্ষমতায় অপব্যবহার রোধে বিচার বিভাগই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ, প্রতিষ্ঠানগত ব্যবস্থা। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিচার বিভাগের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল আইনের ব্যাখ্যা ও বৈধতা বিচার, বিরোধ, মীমাংসা, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত হিসাবে দায়িত্ব পালন করা। রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থায়িত্ব রক্ষা, সাংবিধানিক প্রশ্নে আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগকে পরামর্শ দেওয়াও বিচার বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। ভারতবর্ষে সুপ্রিমকোর্ট, হাইকোর্ট বা স্থানীয় আদালতগুলি নিজ নিজ ক্ষেত্রে এইসব দায়িত্ব পালন করবে এটাই স্বাভাবিক। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা যাতে সুরক্ষিত থাকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সেদিকেও নজর দেবে। ভারতেও এই প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান পর্যায়ে ভারতের বিচার বিভাগ সংক্রান্ত আলোচনায় এইসব বিষয়গুলিই বিবেচিত হবে।

বর্তমান পর্যায়ের এককগুলির বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থী পাঠকের সুবিধামত এইভাবে সাজানো হয়েছে ঃ

- **একক ৩০ ঃ** ভারতে বিচারব্যবস্থার সাধারণ কাঠামোটি কেমন সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর সুপ্রিমকোর্টের গঠন ও কার্যাবলি বিষয়ে একটি সাধারণ ধারণা দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত সুপ্রিমকোর্টের ভূমিকার একটি সাধারণ মূল্যায়ন করা হবে।
- **একক ৩১ ঃ** এককের বিষয়বস্তু হল বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা। ভারতবর্ষে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার পরিধি কতটা এবং এক্ষেত্রে সুপ্রিমকোর্টের এক্তিয়ার কী মার্কিন শাসনতন্ত্রের তুলনা টেনে সে বিষয়ে আলোচনা করার একটু সুযোগ শিক্ষার্থী পাঠক পাবেন।
- **একক ৩২ ঃ** এককে রাজ্যের আদালত হিসাবে হাইকোর্ট কী ভাবে গঠিত হয়, হাইকোর্টের এক্তিয়ার কী, হাইকোর্টের সাংবিধানিক ভূমিকা কী—এ বিষয়ে আলোচনা করা হবে।
- **একক ৩৩ ঃ** এককে ভারতের বিচারব্যবস্থার অধস্তন আদালতগুলির স্থান কী, এই আদালতের কী ভূমিকা পালন করে সে বিষয়ে আলোচনা করা হবে। এই এককের শেষে ভারতে শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের প্রসঙ্গটি নিয়ে যে বিতর্ক আছে তার উপর আলোকপাত করা হবে।

একক ৩০ ❒ সুপ্রিমকোর্ট ঃ গঠন ও ভূমিকা

গঠন

৩০.১ উদ্দেশ্য
৩০.২ প্রস্তাবনা
৩০.৩ মূল আলোচনা
৩০.৩.১ ভারতের বিচারব্যবস্থা ঃ গণপরিষদের ভাবনা
৩০.৩.২ ভারতের বিচারব্যবস্থার কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য
৩০.৩.৩ সুপ্রিমকোর্টের গঠন
৩০.৪ সুপ্রিমকোর্টের কার্যাবলি ও ভূমিকা
৩০.৪.১ সুপ্রিমকোর্টের ক্ষমতোর মূল্যায়ন
৩০.৫ সারাংশ
৩০.৬ অনুশীলনী
৩০.৭ উত্তরমালা
৩০.৮ গ্রন্থপঞ্জি

৩০.১ ❒ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি—

- ভারতের বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে গণপরিষদের ভাবনা কী ছিল সে সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- ভারতের বিচারব্যবস্থার কাঠামোটি কেমন সে বিষয়ে ধারণা লাভ করবেন।
- ভারতের সংবিধানে সুপ্রিমকোর্টের গঠনপ্রণালী সম্পর্কে কী বলা হয়েছে সে বিষয়ে জানতে পারবেন।
- সুপ্রিমকোর্টের কার্যাবলি ও ভূমিকা কী তা বিচার করতে পারবেন।

৩০.২ প্রস্তাবনা

ভারতের সংবিধানে একটি অখণ্ড বিচারব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে যার শীর্ষে আছে সুপ্রিমকোর্ট (Supreme Court)। রাষ্ট্র, সরকার বা সংবিধানের মান মর্যাদা বিচার বিভাগের কর্মদক্ষতা ও উৎকর্ষতার উপর অনেকটাই নির্ভরশীল। সন্দেহ নেই অখণ্ড বিচারব্যবস্থার শীর্ষস্থানীয় বিচারালয় হিসাবে এক্ষেত্রে সুপ্রিমকোর্টের ভূমিকাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সুপ্রিমকোর্টকে সামনে রেখেই সংবিধান প্রণেতারা এদেশে গণতন্ত্রের আদর্শ স্থাপন, নাগরিক অধিকার প্রসার, সমতো ও ন্যায় বিচারের এক সামাজিক নীতি প্রতিষ্ঠিত হোক এটা চেয়েছিলেন। সুপ্রিমকোর্ট যে সংবিধান প্রণেতাদের কাছে একটি দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান হিসাবে, সমাজের বিবেক হিসাবে মর্যাদা লাভ করেছিল, স্বাধীন ভারতের স্বীধান নাগরিকের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসাবে বিশেষভাবে গুরুত্ব লাভ করেছিল, গণপরিষদের বিতর্কে তা বার বার ধরা পড়েছে। বর্তমান এককে বিচারালয় সম্পর্কে গণপরিষদের ভাবনা কী ছিল, ভারতের

বিচারব্যবস্থার কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য কী সে সম্পর্কে প্রথমে আলোকপাত করা হয়েছে। সুপ্রিমকোর্টের গঠনগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি হল বিচারপতিদের নিয়োগ, কার্যকাল, বিচারপতিদের সংক্যা, বিচারপতিদের যোগ্যতা, সুযোগসুবিধা ইত্যাদি। প্রতিটি প্রশ্নেই সংবিধানের ধারা কী তার ব্যাখ্যা পাঠক বর্তমান এককের আলোচনায় পাবেন।

সুপ্রিমকোর্টের মূল এক্তিয়ার কী, কোর্টে আপিল এলাকা বা পরামর্শদান এলাকা বলতে কী বোঝায়, যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত হিসাবে সুপ্রিমকোর্টের এক্তিয়ার বা ক্ষমতো কী, সুপ্রিমকোর্টের ক্ষমতো বিষয়ে এগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কোর্টের নির্দেশ বা আদেশ জারির এলাকা কী, কোন কোন ক্ষেত্রে কোর্টের এলাকা প্রসারিত হতে পারে, অন্যান্য আদালতকে কোর্ট তার মামলা স্থানান্তর করতে পারে কিনা বা নিজের রায় ও নির্দেশ পরিবর্তন করতে পারে কিনা এসব প্রশ্নেও শিক্ষার্থী পাঠক বর্তমান এককের আলোচনা থেকে অবহিত হতে পারেন। সুপ্রিমকোর্টের অতিরিক্ত ক্ষমতো, নিজস্ব আইন প্রণয়নের ক্ষমতো, নিজস্ব সচিবালয় গঠনের অধিকার ইত্যাদি প্রশ্নেও সংবিধানের সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে। সুপ্রিমকোর্টের ক্ষমতোর বিশিষ্টতা এবং সীমাবদ্ধতা কোথায় এই আলোচনা দিয়ে বর্তমান এককের পাঠ শেষ হবে।

৩০.৩ মূল আলোচনা

৩০.৩.১ ভারতের বিচারব্যবস্থা ঃ গণপরিষদের ভাবনা

ভারতের বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে সংবিধান রচয়িতাদের ভাবনা কী ছিল এটি অত্যন্ত কৌতূহলপ্রদ আলোচনা। গ্র্যানভিল অস্টিন (Granville Austin) মনে করেন সংবিধানের বিচার সংক্রান্ত ধারা রচনার প্রশ্নে গণপরিষদের সদস্যরা আদর্শবাদের ভাবনায় লালিত হয়েছেন। বিচার বিভাগকে সমাজ বিপ্লবের এক হাতিয়ার হিসাবেই দেখতে চেয়েছেন তাঁরা। নাগরিক অধিকারের প্রসার, মানুষের মধ্যে সমতো বা সমাজ পরিবর্তনের যে ধারণা ঔপনিবেশিক শাসনে সম্ভব ছিল না, বিচার বিভাগকে সুসংগঠিত করে, দায়িত্বশীল করে ওই ভাবনাকে রূপ দেওয়া সম্ভব বলেই তাঁরা মনে করেছেন। ব্রিটিশ আমলে ভারতবাসীর জন্য আইন বা আদালত বলে কিছু ছিল না, আইন বা আদালত বলতে যা ছিল তা ঔপনিবেশিক শাসকের স্বার্থেই কাজ করেছে। ভারতের নতুন সংবিধানে এক্ষেত্রে পরিবর্তন আসুক, আদালত স্বাধীনতার অনুভবযোগ্য সাক্ষ্যপ্রমাণ (tangible evidence) হয়ে উঠুক এটাই তাঁরা আশা করেছেন। কংগ্রেস দলে এবং গণপরিষদের সভ্যদের মধ্যে আইনজ্ঞের সংখ্যা ছিল পর্যাপ্ত। এই আইনজ্ঞেরাই নিজের হাতে তাঁদের নিজস্ব বিচারব্যবস্থার নিয়ম সংকলন করুন গণপরিষদ মনে প্রাণে এই আদর্শকেই লালন করেছে। তিনটি বিষয়ের প্রতি গভীরভাবে নজর দিয়েছেন গণপরিষদের সদস্যরা—বিচারবিভাগের স্বাধীনতা, সুপ্রিমকোর্টের ক্ষমতো এবং বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার (Judicial Review) প্রশ্ন। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যদি বিচার বিভাগের আলোকবর্তিকা উজ্জ্বল রাখতে হয় তাহলে আদালতকে সব কিছু কলঙ্কের ঊর্ধ্বে রাখতে হবে, সবকিছু চাপ ও রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে হবে ("If the beacon of the judiciary was to remain bright, the courts must be above reproach, free from coercion and from political influence." Granivlle Austin)।

গণপরিষদের সদস্যরা মনে করেছেন স্বাধীন ভারতের ন্যায়বিচার এবং ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের স্বার্থে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ক্ষমতো। গণপরিষদ চেয়েছিল বিচার বিভাগের পর্যালোচনায় ক্ষমতো এবং সংবিধান সুরক্ষিত করার ক্ষমতোকে সংবিধানের সুনির্দিষ্ট রূপ দিতে। সুপ্রিমকোর্টের ব্যাপক

দায়িত্বের কথা মাথায় রেখে গণপরিষদের সদস্যরা সুপ্রিমকোর্টের ব্যাপক দায়িত্বের কথা মাথায় রেখে গণপরিষদের সদস্যরা সুপ্রিমকোর্টের প্রশ্নেই বেশি সময় দিয়েছেন এবং বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষেত্র কী হবে বা ওই ক্ষমতোর সীমাবদ্ধতা কোন কোন ক্ষেত্রে থাকবে সেই প্রশ্ন নিয়েই বিচার বিতর্ক করেছেন। সুপ্রিমকোর্টের ভূমিকার সাথে ব্যক্তির অধিকার এবং সমাজের দাবির বিরোধ ঘটতে পারে এ কথাও তাঁদের বিবেচনায় ছিল। হাইকোর্ট বা অধস্তন আদালত নিয়ে গণপরিষদের সদস্যরা ততটা সময় ব্যয় করেন নি। এ কথা সত্য গণপরিষদের সদস্যরা বিচারব্যবস্থার কাঠামো ও কার্যাবলি বিষয়ে ব্রিটিশ বিচারব্যবস্থায় নিয়ম-নীতি দ্বারা প্রভাবিত হলেও ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের সীমাবদ্ধ বিচারব্যবস্থার নীতিতে তেমন আস্থা দেখান নি। শুধুমাত্র সাংবিধানিক ক্ষেত্রে বিচার বিভাগের ক্ষমতোকে সীমাবদ্ধ না রেখে, নতুন যুগ ও স্বাধীন ভারতবর্ষের পরিবর্তিত অবস্থা ও চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিচারব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করার কথা ভেবেছিলেন তাঁরা। গণপরিষদ প্রধানত কেন্দ্রীয় (সর্বভারতীয়) আদালত হিসাবে সুপ্রিমকোর্ট এবং রাজ্যের আদালত হিসাবে হাইকোর্টের গঠন ও কার্যাবলি কী হবে এবং অন্যান্য পদ্ধতিগত প্রশ্ন নিয়ে ভেবেছিলেন। অখণ্ড বিচারব্যবস্থার নীতিতেই তাঁরা আস্থা রেখেছেন। মার্কিন শাসনতন্ত্রের মতো স্বতন্ত্র রাজ্যভিত্তিক আদালতের কথা ভেবে দ্বৈত বিচারব্যবস্থার কোনও ধারণাকে তাঁরা প্রশ্রয় দেননি।

এবার আমরা ভারতের বিচারব্যবস্থার কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করব।

৩০.৩.২ ভারতের বিচারব্যবস্থার কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য

ভারতের বিচারব্যবস্থার প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হল একটি অখণ্ড বিচারব্যবস্থার প্রচলন। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ধারা মেনে দ্বৈত বিচারালয়ের কোনও ব্যবস্থা এখানে নেই। ভারতে সফল নাগরিক একই বিচারব্যবস্থার অধীন। একই বিচারব্যবস্থা এখানে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য আইনের প্রশাসক, নির্বাহক বা অছি (administer or trust) হিসাবে কাজ করে। অখণ্ড এই বিচারব্যবস্থার সর্বোচ্চে আছে সুপ্রিমকোর্ট, এরপর ক্রমপর্যায়ে আছে রাজ্যের হাইকোর্ট ও অধস্তন আদালত (Subordinate Courts)। নীচের তালিকা (Table) থেকে ভারতের বিচারব্যবস্থার রূপটি আপনার বুঝতে পারবেন।

ভারতের বিচারব্যবস্থা

সুপ্রিমকোর্ট

রাজ্যের হাইকোর্ট

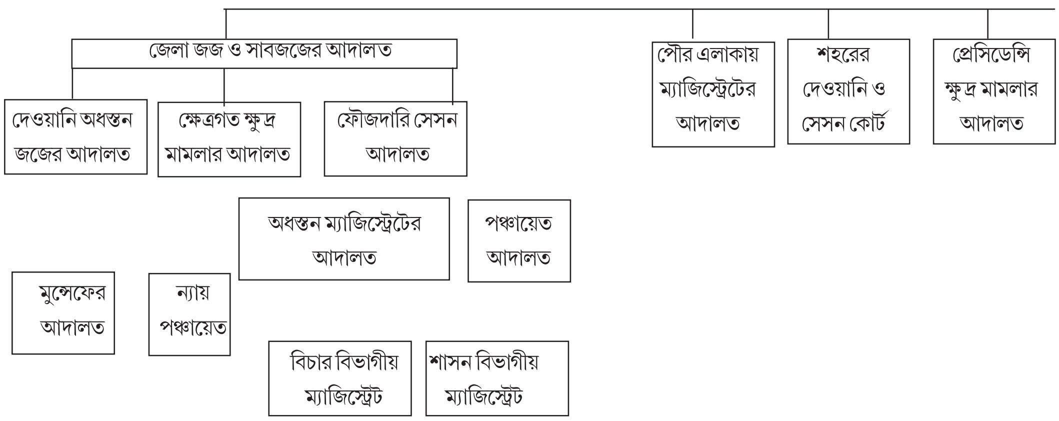

ওপরের টেবিলটি থেকে ভারতের বিচারব্যবস্থার স্তর বিন্যাসটি স্পষ্ট হয়েছে। সবচেয়ে উপরে আছে

সর্বভারতীয় আদালত হিসাবে সুপ্রিমকোর্ট। এর পর রাজ্যের হাইকোর্ট। রাজ্যের হাইকোর্টের নীচে জেলায় আছে জেলা জজ ও সাব জজের আদালত (District and Session Judge's Court) এবং পৌর এলাকায় আছে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত (Metropolitan Magistrate's Court), শহরের দেওয়ানি ও সেসন আদালত (City Ciovil and Session's Courts) এবং প্রেসিডেন্সি ক্ষুদ্র মামলার আদালত (Presidency Small Cause Court)। জেলা ও সেসন জজের আদালতের নীচে আছে অধস্তন বিচারকের দেওয়ানি আদালত (Subordinate judge's Civil Court), ক্ষেত্রগহত ক্ষুদ্র মামলার আদালত (Provisional Small Cause Court) ও ফৌজদারি সেসন কোর্ট (Criminal Court of Session)। দেওয়ানি অধস্তন জজের আদালতের নীচে আছে মুন্সেফের আদালত (Munsif's Courts) ও ন্যায় পঞ্চায়েত (Nyaya Panchayats)। ফৌজদারি সেসন কোর্টের নীচে আছে অধস্তন ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট (Subordinate Magistrate's Courts) ও পঞ্চায়েত আদালত (Panchayat Adalats)। অধস্তন ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টের নীচে আছে বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট (Judicial Magistrats) ও শাসন বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট (Executive Magistrates)। সর্বভারতীয় পর্যায় থেকে গ্রাম পর্যন্ত আদালত ব্যবস্থা ওপর থেকে নীচে পরিব্যপ্ত। রাজ্যে রাজ্যে আদালতের অবস্তানে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও সাধারণভাবে ভারতের বিচারব্যবস্থার কাঠামো ওপরের চিত্রটির মতো। দেশের আদালত ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ন্ত্রণ সুপ্রিমকোর্টের হাতে, রাজ্যস্তরে অধস্তন আদালতগুলির নিয়ন্ত্রণ হাইকোর্টের হাতে। নীচে স্তরে আদালতগুলি দেওয়ানি (Civil) ও ফৌজদারি (Criminal) এই দুইভাগে বিভক্ত। গ্রামে স্বায়ত্তশাসন আইন (Village Self-Government Acts) মেনে বিভিন্ন শাখা ও বেঞ্চ কোর্টগুলি গড়ে ওঠে।

আসাম, মিজোরাম, মেঘালয়, ত্রিপুরার মতো পার্বত্য ও উপজাতীয় এলাকায় (Hill and Tribal Areas) জেলা কাউন্সিল (Distict Council) ও প্রাদেশিক কাউন্সিল (Provincial Council) সৃষ্টি করে এদের হাতে কিছুর বিচার বিভাগীয় ক্ষমতো দানের ব্যবস্থা আছে। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির (Union Territories) জন্য পার্লামেন্ট আইন করে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করতে পারে অথবা ঐ অঞ্চলের কোন আদালত হাইকোর্ট হিসাবে পরিগণিত হবে তা ঘোষণা করতে পারে (২৪১ ধারা)। এই আইন প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান হাইকোর্টগুলি ঐ এলাকার বিচার কার্যের দায়িত্বে থাকবে। যেমন পঞ্জাব ও হরিয়ানার হাইকোর্ট চণ্ডিগড়ের হাইকোর্ট হিসাবে, কেরালা হাইকোর্ট লাক্ষাদ্বীপের হাইকোর্ট হিসাবে, পশ্চিমবঙ্গের হাইকোর্ট আন্দামান-নিকোবরের হাইকোর্ট হিসাবে, বোম্বাই হাইকোর্ট দাদরা ও নগর হাভেলির হাইকোর্ট হিসাবে কাজ করেন। দমন ও দিউ-এর হাইকোর্ট হিসাবেও বোম্বাই হাইকোর্ট কাজ করে। ১৯৬৬ সাল থেকে দিল্লির জন্য পৃথক হাইকোর্ট আছে। ভারতে বিশেষ ধরনের বিচারের জন্য কয়েকটি ক্ষেত্রে বিশেষ আদালত আছে। যেমন শিল্প-বিরোধ মেটাবার জন্য শিল্প আদালত (Industrial Courts and Tribunals) কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে বিবাদ-বিতর্ক মেটাতে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল (Administrative Tribunal) আছে। সাম্প্রতিককালে কোন কোন রাজ্যে ক্রেতা সুরক্ষা আদালত (Consumer's Protections Court) গড়ে উঠেছে। এইসব আদালত অবশ্য সংবিধান সৃষ্ট নয়।

বর্তমান এককের পরবর্তী আলোচনায় আমরা সুপ্রিমকোর্টের গঠন নিয়ে আলোচনা করব।

৩০.৩.৩ সুপ্রিমকোর্টের গঠন

সংবিধানের ১২৪ ধারায় বলা হয়েছে ভারতে একটি সুপ্রীমকোর্ট থাকবে। একজন প্রধান বিচারপতি এবং পার্লামেন্ট যতদিন বিচারপতির সংখ্যা বৃদ্ধি না করবে ৭ জন বিচারপতি নিয়ে সুপ্রিমকোর্ট গঠিত হবে। [There

shall be a Supreme Court of India consisting of a Chief Justice of India and until Parliamenent by law prescribes a large number, of not more than seven other judges - Art 124(1)] পার্লামেন্ট ১৯৫৬, ১৯৭৭ এবং ১৯৮৬ সালের আইন পাশ করে বিচারপতির সংখ্যা বৃদ্ধি করে। বর্তমানে প্রধান বিচারপতি সহ বিচারপতির সংখ্যা ২৬ (১+ ২৫)। ১৯৯৯ সালের ১৯শে এপ্রিল পর্যন্ত যে সব বিচারপতি সুপ্রিমকোর্টের সদস্য ছিলেন তাঁদের নাম হল ঃ এ. এস. আনন্দ (A. S. Anand), প্রধান বিচারপতি; এস. পি. ভারুচা (S. P. Bharucha), এস. বি. মজুমদার (S. B. Majumder), সুজাতা ভি. মনোহর (Sujata V. Manohar), জি. টি. নানাবতী (G. T. Nanavati), এস. সাগীর আহমেদ (S. Saghir Ahmad), কে ভেঙ্কটস্বামী (K. Venkataswami), বি. এন. কৃপাল (B. N. Kripal), জি. বি. পট্টনায়ক (G. B. Patnaik), এস. পি. কুরদুকার (S. P. Kurdukar), কে. টি. টমাস (K. T. Thomas), এম. জগন্নাথ রাও (M. Jagannath Rao), ভি. এন. খারে (V. N. Khare), ডি. পি. ওয়াধাওয়া (D. P. Wadhwa), এম. শ্রীনিবাস (M. Srinivasan), এস. রাজেন্দ্রবাবু (S. Rajendra Babu), এ. পি. মিশ্র (A. P. Mishra), এস. এস. এম. কাদরী (S. S. M. Quadri), এম. বি. শাহ (M. B. Shah), ডি. পি. মহাপাত্র (D. P. Mahapartra), ইউ. সি. ব্যানার্জী (U. C. Banerjee), আর. সি. লাহটি (R. C. Lahoti), এন. সন্তোষ হেগড়ে (N. Santosh Hegde), আর. পি. শেঠী (R. P. Sethi), এস. এন. ফুকন (S. N. Phukan)। বিচারপতিদের নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি। নিয়োগের আগে সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের যেসব বিচারপতিদের সঙ্গে তিনি পরামর্শ করা প্রয়োজন মনে করেন তাদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। সংবিধান এ কথাও বলেছে ভারতের প্রধান বিচারপতি ছাড়া অন্য বিচারপতিদের নিয়োগের ক্ষেত্রে সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতির সঙ্গে তিনি অবশ্যই পরামর্শ করবেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি সিনেটের পরামর্শ ও সম্মতি গ্রহণ করেন। ইংল্যান্ডে হাইকোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগ করে শাসন বিভাগ।

সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিরা ৬৫ বছর পর্যন্ত নিজ পদে বহাল থাকেন। অবশ্য ইতিমধ্যে তিনি লিখিতভাবে রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগ পত্র পেশ করতে পারেন। সাধারণত প্রমাণিতো অসামর্থ্য বা অসদাচারের জন্য বিচারপতিকে অপসারিত করা যায়। সংবিদানের ১২৪(৪) ধারা অনুসারে পার্লামেন্টের উভয় সভার মোট সদস্যদের অধিকাংশ এবং উপস্থিত ও ভোটপ্রদানকারী সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশের দ্বারা সমর্থিত আবেদনের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি কোনও বিচারপতিকে অপসারণ করতে পারেন।

> ***প্রান্তলিপি ঃ*** *সিনেট হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষ বা উচ্চ কক্ষ। ভারতসহ অধিকাংশ রাষ্ট্রে আইনসভার নিম্নকক্ষই শক্তিশালী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চকক্ষ সিনেটই প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠান। অনেক ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রপতিকে সিনেটের সম্মতি নিয়ে কাজ করতে হয়।*

সংবিধানের ১২৪ (৩) ধারা অনুসারে সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগের জন্য যোগ্যতা হল (i) ভারতের নাগরিকত্ব, (ii) অন্তত ৫ বছর হাইকোর্টের বিচারপতি বা ১০ বছর হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট হিসাবে কাজ করার অভিজ্ঞতা, (iii) রাষ্ট্রপতির মতে একজন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ হিসাবে পরিচিত হওয়া। বিচারপতিদের বয়সের ব্যাপারে নির্দিষ্ট কিছু বলা হয়নি। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধন (১৯৬৩) অনুসারে ১২৪(২) (ক) ধারা সংযুক্ত করে বলা হয়েছে সংসদ প্রণীত আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্বারা বিচারকদের বয়স স্থির হবে। ১২৪(৬) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, বিচারপতি হিসাবে দায়িত্ব নেবার আগে সংবিধানের তৃতীয় তপশিলের রীতি মেনে বিচারপতিদের রাষ্ট্রপতি অথবা তাঁর পক্ষে নিযুক্ত কোন ব্যক্তির কাছে শপথ গ্রহণ করতে হবে। সংবিধানের

প্রতি বিশ্বস্ত ও অনুগত থাকা, দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা, নিজের দায়িত্ব উপযুক্ত ও বিশ্বস্তভাবে নিজের সর্বোচ্চ সামর্থ্য, জ্ঞান ও বিচার অনুসারে নির্ভয়ে বিচারক হিসাবে দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার তাঁদরে করতে হয়। ১২৪ (৭) ধারায় বলা হয়েছে সুপ্রিমকোর্টের প্রাক্তন বিচারকের কোনও আদালত বা অন্য কোনও কর্তৃপক্ষের কাছে ওকালতি করার অধিকার নেই।

সংবিধানের ১২৫ ধারা অনুসারে দ্বিতীয় তপশিল নির্দিষ্ট বেতন, ভাতা এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বিচারপতিরা পাবেন। ১৯৮৬ সালে সংবিধানের ৫৬৪তম সংশোধনে বিচারপতিদের পূর্ব নির্দিষ্ট বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং সংসদে অন্যান্য সুযোগসুবিধা, অধিকার ও ভাতা স্থায়ীভাবে নির্ধারণ ও পরিবর্তনের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এই ক্ষমতা বলে সংসদ বিচারপতিদের ভাতা ও সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করে।

সংবিধানের ১২৬ ধারা বলে অনুপস্থিতি বা অন্য কোনও কারণে প্রধান বিচারপতির পদ শূন্য হলে রাষ্ট্রপতি বিচারপতিদের মধ্য থেকে একজন কার্যনির্বাহী প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করবেন।

সংবিধানের ১২৭ ধারা বলে সুপ্রিমকোর্টে প্রয়োজনে অস্থায়ী বিচারপতি (Adhoc Judges) নিয়োগের ব্যবস্থা আছে। ১২৮ ধারায় বলা হয়েছে রাষ্ট্রপতির সম্মতি নিয়ে প্রধান বিচারপতি সুপ্রিমকোর্ট বা প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের ফেডারেল কোর্টের প্রাক্তন কোনও বিচারপতিকে সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি হিসাবে কাজ করকবার অনুরোধ জানাতে পারেন।

সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা ঃ সুপ্রিমকোর্টের গঠন, বিচারপতিদের নিয়োগ, অপসারণ ইত্যাদি বিষয়ে সংবিধানের ব্যবস্থা সুপ্রিমকোর্টের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পেরেছে কিনা ও নিয়ে বিতর্ক আছে। এ সম্পর্কে কতকগুলি প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ ঃ

(১) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বিচারপতি নিয়োগ পদ্ধতি যুক্তিযুক্ত কিনা? শাসন বিভাগ বিচারপতি নিয়োগে প্রাধান্য পেলে বিচারালয়ের স্বাধীনতা বা নিরপেক্ষতা রাখা সম্ভব হবে কী?

(২) বিচারকদের নিয়োগে অভিজ্ঞতা ও সততার চেয়ে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব (শাসন বিভাগের ধ্যানধারণা, নীতি ও নির্দেশের প্রতি আনুগত্য) গুরুত্ব পেলে বিচারালয়ের স্বাধীনতা সুরক্ষিত থাকে না।

(৩) পার্লামেন্টের আবেদন ক্রমে বিচারপতিদের অপসারণ পদ্ধতিটি সঠিক নয়।

(৪) অবসর নেবার পর কোন বিচারপতিকে সুপ্রিমকোর্টে নিয়োগ করা হলে তার পক্ষে স্বাধীনভাবে বিচারকার্য সম্পাদন করা সম্ভব? আইন কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে অবসর গ্রহমের পর বিচারকদের নিয়োগের উপর বাধানিষেধ আরোপ করা উচিত ছিল। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের রাজ্যপাল এমনকি উপরাষ্ট্রপতি হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে। আইনজ্ঞের মন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করার রেওয়াজ এদেশে বহুল প্রচলিত।

সংবিধানের কতকগুলি ব্যবস্থা অবশ্য বিচারপতিদের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা সুনিশ্চিত করতে সাহায্য করে ঃ

(১) বিচারকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতির পরামর্শ গ্রহণ বাধ্যতামূলক।

(২) বিচারকদের অপসারণের সংসদীয় আবেদন সুপ্রিমকোর্টের ২ জন বিচারপতি এবং ১ জন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ নিয়ে গঠিত কমিটি অনুসন্ধান করে। কমিটি বিচারকদের বিরুদ্ধে অসামর্থ্য অসদাচারের অভিযোগের যৌক্তিকতা বিচার করে পার্লামেন্টে রিপোর্ট দিলেই বিচারকদের অপসারণের ব্যাপারটি গুরুত্ব পায়।

(৩) বিচারকদের বেতন ভাতা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পার্লামেন্ট তাদের পক্ষে অসুবিধাজনক এমন কিছু করবে না।

(৪) বিচারকদের বেতন ও ভাতা সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য অর্থাৎ পার্লামেন্টের ভোটে নির্ধারিত নয়।

(৫) পার্লামেন্টে বিচারকদের আচরণ নিয়ে আলোচনা চলবে না।

(৬) অবসর গ্রহণের পর সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিরা ভারতের অভ্যন্তরে কোনও বিচারালয়ে বা কর্তৃপক্ষের সমক্ষে ওকালতি করতে পারবেন না।

বর্তমান এককের পরবর্তী আলোচনায় সুপ্রিমকোর্টের ক্ষমতা, কার্যাবলি ও ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হল ঃ

৩০.৪ সুপ্রিমকোর্টের কার্যাবলি ও ভূমিকা

মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে ১৯২৮ সালে গঠিত সর্বদলীয় কমিটি যে খসড়া সংবিদান পেশ করেছিল, সেই খসড়া সংবিধানেই সর্বপ্রথম সুপ্রিমকোর্টের উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্রিটিশ প্রবর্তিত বিচারব্যবস্থার কাঠামোটিকে বজায় রেখে এই ব্যবস্থার সর্বোচ্চ একটি সুপ্রিমকোর্ট গঠনের সুপারিশ করা এবং সুপ্রিমকোর্টের হাতে যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রশ্নে কিছু মূল এলাকার (Original Jurisdiction) বিচার ও সংবিধান ব্যাখ্যার দায়িত্ব দানের কথা নেহরু রিপোর্টে বলা হয়েছে। আপিল আদালত এবং দেশের সর্বোচ্চ আদালত হিসাবে সুপ্রিমকোর্ট ভূমিকা পালন করবে, নেহরু কমিটির সুপারিশে এ কথাও ছিল। সাইমন কমিশন (১৯২৭) বা যৌথ পার্লামেন্টীয় কমিটির (Joint Parliamentary Committee, ১৯৩৩) আলোচনায় সুপ্রিমকোর্ট গঠনের প্রশ্নটি গুরুত্ব পেয়েছে। ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত সরকারি শ্বেতপত্রে (White paper) যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত ছাড়াও, হাইকোর্টের আপিল গ্রহণের জন্য সুপ্রিমকোর্ট গঠনের কথা বলা হয়েছে। ইংলন্ডের প্রিভি কাউন্সিলের বিচার বিভাগীয় কমিটির স্থান সুপ্রিমকোর্ট নেবে এই ধরনের সরকারি প্রস্তাব খারিজ করে যৌথ কমিটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত গঠনের প্রস্তাবকে গুরুত্ব দেয়। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে যৌথ কমিটির ধারণা প্রাধান্য পায় এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত গঠনের প্রস্তাব কার্যকর হয়। সাপ্রু কমিটির (১৯৪৫) যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের কাজকর্ম পর্যালোচনা করে, নতুন সংবিধানে এই আদালতকে আরও শক্তিশালী করার পরামর্শ দেয় এবং এর এলাকা সম্প্রসারিত করার প্রস্তাব দেয়। গণপরিষদের (Advisory Committee) সুপারিশের ভিত্তিতে পরবর্তীকালে সুপ্রিমকোর্ট গঠনের ভাবনা কার্যকর হয়। এই কমিটির উল্লেখযোগ্য সদস্যরা (বি. এ. রাউ, কে. এম. মুন্সী, কৃষ্ণস্বামী আয়ার, বি. এল. মিত্র, এস. ভদ্রচারিয়া প্রমুখ) অধিকাংশই ছিলেন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ। প্রধানত এদের উদ্যোগেই শেষপর্যন্ত সুপ্রিমকোর্ট ও তার কার্যাবলি বিষয়ে একটি স্থায়ী বোঝাপড়া হয়।

স্বাধীন ভারতবর্ষের সংবিধানে সুপ্রিমকোর্টের এলাকা ও ক্ষমতার (Jurisdiction and powers) কথা গুরুত্বের সঙ্গে বলা হয়েছে যা অন্যান্য অনেক দেশের সর্বোচ্চ আদালত এতটা গুরুত্ব পায়নি। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত (Federal Court), আপিল আদালত (a court of Appeal), সংবিধানের অভিভাবক (a guardian of the Constitution) এবং আইনের চূড়ান্ত ব্যাখ্যাকর্তা হিসাবে ভারতের সংবিধানে সুপ্রিমকোর্ট যে ভূমিকায় অবতীর্ণ পৃথিবীর অনেক দেশেই সর্বোচ্চ আদালতের সেই ক্ষমতা নেই। মার্কিন সংবিধানের সুপ্রিমকোর্টের

আপিল এলাকা নেই। আপিল গ্রহণের অবাধ ও বিস্তৃত এলাকার বিচারে ভারতের সুপ্রিমকোর্ট অতুলনীয়। মার্কিন সুপ্রিমকোর্টের ভারতের সুপ্রিমকোর্টের মতো সরকারকে পরামর্শ দেবার ক্ষমতাও নেই।

সংবিধান অনুসারে ভারতের সুপ্রিমকোর্টের চারটি প্রধান এলাকা আছে—মূল এলাকা (Original Jurisdiction), আপিল এলাকা (Appellate Jurisdiction), পরামর্শদান এলাকা (Advisory Jurisdiction) ও নির্দেশ, আদেশ, লেখ জারি করার এলাকা (Jurisdiction to issue directions, orders and writs)।

ক. মূল এলাকা ঃ সংবিধানের ১৩১ ধারায় সুপ্রিমকোর্টের মূল এলাকার কথা বলা হয়েছে। বৈধ অধিকারের প্রশ্ন জড়িত আছে এমন কোন বিবাদ যদি (ক) ভারত সরকার এবং এক বা একাধিক রাজ্যের মধ্যে বাধে অথবা (খ) একপক্ষে ভারত সরকার ও এক বা একাধিক রাজ্য এবং অন্যপক্ষে এক বা একাধিক রাজ্য—এই দুই পক্ষের মধ্যে বাধে, অথবা (গ) দুই বা ততোধিক রাজ্যের মধ্যে বাধে, সেক্ষেত্রে তার বিচার একমাত্র সুপ্রিমকোর্টের মূল এলাকাতেই হবে। অন্য কোনও আদালতে নয়।

সুপ্রিমকোর্টের মূল এলাকার উপর কিছু বাধানিষেধ আছে। সংবিধান চালু হবার আগে যে সব সন্ধি, চুক্তি, অঙ্গীকার, শর্ত সনদ, দলিল ইত্যাদি সম্পাদিত হয়েছে সেগুলি নিয়ে বিবাদ দেখা দিলে সুপ্রিমকোর্ট তার বিচার করতে পারবে না।

সুপ্রিমকোর্টের অনন্য এলাকায় যুক্তরাষ্ট্রের একক নয় এমন কোন পক্ষের অভিযোগ গৃহীত হবে না। কোনও ব্যক্তি নাগরিক ভারত সরকার বা রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলে তার বিচার সুপ্রিমকোর্টে হবে না, সাধারণ আইন অনুসারে সাধারণ বিচারালয়ে এই অভিযোগের বিচার হবে। আন্তঃরাজ্য জল বণ্টন সংক্রান্ত বিরোধ, অর্থ কমিশনের বিচার্য বিষয়, কেন্দ্র-রাজ্য ব্যয় সংক্রান্ত কোন বোঝাপড়া সুপ্রিমকোর্টের অনন্য এলাকায় পড়ে না।

খ. আপিল এলাকা ঃ সুপ্রিমকোর্টের আপিল এলাকা বেশ ব্যাপক। সংবিধানের ১৩২ থেকে ১৩৪ ধারায় সুপ্রিমকোর্টের আপিল এলাকা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সুপ্রিমকোর্ট তিন ধরনের আপিলের মীমাংসা করতে পারে—

(১) সংবিধানের ১৩২ ধারা অনুসারে কোনও মামলায় হাইকোর্ট যদি এই মর্মে সার্টিফিকেট দেয় যে এতে সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত আছে তবে হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিমকোর্টে আপিল করা চলে। হাইকোর্ট সার্টিফিকেট দিতে অস্বীকার করলে, সুপ্রিমকোর্ট যদি নিশ্চিত হয় সত্যিই মামলাটিতে সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত আছে তবে সুপ্রিমকোর্ট আপিল করবার বিশেষ অনুমতি (Supreme leave) দিতে পারে।

(২) ১৯৭২ সালের পূর্ব পর্যন্ত হাইকোর্টের সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে বিশেষ টাকার অঙ্কের দাবি দাওয়া বা প্রশ্নে সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত দেওয়ানি মামলা (Civil Suit) হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিমকোর্টে আপিল করে আনার ব্যবস্থা ছিল। সংবিধানের ৩০তম সংশোধন (১৯৭২) অনুসারে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করে গুণাগুণের ভিত্তিতে মামলাটির আপিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নতুন ব্যবস্থাটি হল হাইকোর্ট যদি এই মর্মে সার্টিফিকেট দেয় যে (১) মামলার সঙ্গে আইনের সাধারণ গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ প্রশ্ন জড়িত আছে, (২) হাইকোর্টের মতে প্রশ্নটির মীমাংসা সুপ্রিমকোর্টে হওয়া উচিত, তবে সুপ্রিমকোর্ট আপিল গ্রহণ করতে পারে (সংবিধানের ১৩৩ ধারা)।

(৩) সংবিধানের ১৩৪ ধারা অনুসারে ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রেও সুপ্রিমকোর্টে আপিল করা যেতে পারে।

তিনটি ক্ষেত্রে ফৌজদারি মামলার হাইকোর্টের রায়, ডিক্রি বা অন্তিম আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিমকোর্টে আপিল করা যেতে পারে ঃ (১) যে ক্ষেত্রে হাইকোর্ট কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির মুক্তির আদেশ বাতিল করে মৃত্যুদণ্ড দেয়, (২) যে ক্ষেত্রে হাইকোর্ট কোন মামলা নীচের আদালত থেকে নিজের হাতে তুলে নেয় এবং মামলার বিচার করে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেয়, (৩) যে ক্ষেত্রে হাইকোর্ট এই মর্মে সার্টিফিকেট দেয় যে মামলাটি সুপ্রিমকোর্টের কাছে আপিলযোগ্য।

এই তিন ধরনের আপিল সংক্রান্ত ক্ষমতা ছাড়াও সংবিধান সুপ্রিমকোর্টকে বিশেষ অনুমতির মাধ্যমে আপিল ক্ষমতা (Appeal by special leave) দিয়েছে। সংবিধানের ১৩৬ ধারা অনুসারে এই বিশেষ ধরনের আপিল ক্ষমতা হল, সুপ্রিমকোর্ট নিজ বিবেচনা অনুসারে ভারতের অন্তর্গত সব আদালতের সব রকমের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করবার বিশেষ অনুমতি প্রদান করতে পারে। তবে সামরিক আদালত বা ট্রাইব্যুনালের ক্ষেত্রে এই ক্ষমতা প্রযোজ্য নয়. বলা হয়েছে এটি সুপ্রিমকোর্টের একটি বিশেষ ক্ষমতা। সুপ্রিমকোর্ট এই ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারে যখন স্বাভাবিক ন্যায়ের নীতি (Principles of Natural Justice) লঙ্ঘিত হয়। আইনের কেন স্থায়ী প্রশ্ন বা জনস্বার্থের কোন দেওয়ানি মামলা বা ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে একান্ত ব্যতিক্রমী বা বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি হলেই সুপ্রিমকোর্ট বিশেষ অনুমতির মাধ্যমে আপিল করার অনুমতি দেয়। প্রীতম সিং বনাম রাষ্ট্র (১৯৫০), ইউনিয়ন বনাম সি. দামানি এবং কোম্পানি (১৯৮০) মামলাল সুপ্রিমকোর্ট বিশেষ ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের স্বার্থে, জনস্বার্থে আপিলের অনুমতি দিতে পারে বলে ঘোষণা করেছে।

গ. পরামর্শদান এলাকা ঃ রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন আইন বা তথ্য বিষয়ক এমন কোনও প্রশ্ন উঠেছে বা উঠতে পারে তবে তিনি সংবিধানের ১৪৩ ধারা অনুসারে এই ধরনের কোনও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে সুপ্রিমকোর্টের অভিমত নিতে পারেন। সুপ্রিমকোর্ট এক্ষেত্রে পরামর্শদাতা হিসাবে (In advisory capacity) এবং বিচার বিভাগীয় সামর্থ্য অনুসারে (In judicial capacity) তার অভিমত প্রদান করতে পারে। রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন প্রকৃতিগতভাবে বা জনস্বার্থে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তাহলে তিনি সুপ্রিমকোর্টের কাছে বিষয়টি নিয়ে অভিমত চাইতে পারেন। এক্ষেত্রে দু-পক্ষের মধ্যে কোনও মামলা নেই বা কোর্টের মতামত গ্রহণে সরকারের কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। সুপ্রিমকোর্টের মতামত এ ক্ষেত্রে রায় হিসাবে বিবেচিত হবে না। সরকারের কাছে এই মতামত গুরুত্ব পায় কারণ সরকারের তরফে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বা আইনগত ব্যবস্থা নেবার পূর্বে এই ধরনের প্রামাণিক অভিমতের (authoritative opinion) বিশেষ মূল্য আছে। সুপ্রিমকোর্টের কাছে মতামতের জন্য রাষ্ট্রপতি যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়. পাঠিয়েছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কেরালা শিক্ষা বিল (১৯৫৭৮), বেরুবাড়ি সংযুক্তি সম্পর্কে ভারত-পাকিস্তান চুক্তি কার্যকর করার বিষয় (১৯৬০), সমুদ্র শুল্ক বিষয়ে সংশোধন আইন (১৯৬৩), রাষ্ট্রপতি নির্বাচন (১৯৭৪), বিষয়ে অভিমত, বিশেষ আদালত বিল (১৯৭৮), কাবেরী জল বিরোধ ট্রাইব্যুনাল (১৯৯২), বাবরী মসজিদ সংক্রান্ত বিরোধ (১৯৯২) ইত্যাদি।

দ্বিতীয় আর এক ধরনের প্রশ্ন রাষ্ট্রপতি সুপ্রিমকোর্টের কাছে মতামতের জন্য পাঠাতে পারেন। চুক্তি, সন্ধি, অঙ্গীকারপত্র, সদন বা সংবিধান চালু হবার আগে থেকে কার্যকর আছে এমন কোনও বিবাদের বিচার করায় সুপ্রিমকোর্টের উপর নিষেধাজ্ঞা থাকলেও রাষ্ট্রপতি এইসব বিরোধেও ক্ষেত্রে সুপ্রিমকোর্টের অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ মতামত চাইতেই পারেন। সুপ্রিমকোর্টের ওই মতামত শুধুমাত্র পরামর্শদাতা হিসাবে নয়, বিচার বিভাগীয় বিশেষজ্ঞ মতামত হিসাবেই গুরুত্ব পায়।

ঘ. নির্দেশ, আদেশ বা লেখ জারি করার এলাকা ঃ সংবিধানের ৩২ ধারা অনুসারে নাগরিকের শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার আছে। সুপ্রিমকোর্ট এই অধিকার ভঙ্গ হলে নির্দেশ, আদেশ বা লেখ জারির মাধ্যমে এই অধিকার রক্ষা করতে পারে। অবরুদ্ধ ব্যক্তিকে আটক করার কারণ জানার জন্য সুপ্রিমকোর্ট বন্দি প্রত্যক্ষীকরণের (Writ of Habeas Corpus) আদেশ দেয়। কোনও ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান, আদালত বা সরকারকে নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য সুপ্রিমকোর্ট পরমাদেশ (Mandamus) জারি করে। নিজের আদালতকে নিজস্ব এক্তিয়ারের সীমা অতিক্রম না করার জন্য সুপ্রিমকোর্ট প্রতিষেধ (prohibition) জারি করে। কোনও বিশেষ পদের যোগ্য না হয়েও কোনও ব্যক্তি সেই পদের দাবিদার হলে সুপ্রিমকোর্ট অধিকার পৃচ্ছা (Quo-warranto) জারি করে তা অনুসন্ধান করে। নিম্ন আদালত ক্ষমতার সীমা লঙ্ঘন করলে সুপ্রিমকোর্ট তার সিদ্ধান্ত বাতিল করে উৎপ্রেষণ (Cereiorari) জারি করে। সংবিধানের ১৩৯ ধারা অনুসারেই সুপ্রিমকোর্টকে এইসব আদেশ নির্দেশ বা লেখ জারি করবার অধিকার দেওয়া হয়েছে।

সুপ্রিমকোর্টের অন্যান্য বিবিধ এলাকা বা ক্ষমতা আছে। এই সব ক্ষমতার মধ্যে পড়ে ঃ

(১) নিজের মর্যাদা ও ক্ষমতা যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেই উদ্দেশ্যে সুপ্রিমকোর্ট অভিলেখ আদালত (Court of Record) হিসাবে কাজ করবে। এক্ষেত্রে সুপ্রিমকোর্ট দেখবে সমস্ত প্রমাণ ও সাক্ষ্য যাতে সংরক্ষিত হয়। আদালত অবমাননার জন্য দণ্ড দেবার অধিকার সুপ্রিমকোর্টের আছে। (সংবিধানের ১২৯ ধারা)।

(২) আগেকার যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত কেন্দ্র-রাজ্য বিরোধ মীমাংসায় যে ক্ষমতা ভোগ করেছে সুপ্রিমকোর্টেরও সেই ক্ষমতা আছে। (১৩৫ ধারা)।

(৩) সুপ্রিমকোর্টে নিজের রায় বা আদেশের পুনর্বিবেচনা করতে পারে (১৩৭) ধারা।

(৪) পার্লামেন্ট বিশেষ আইন করে বা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বিশেষ বোঝাপড়ার ভিত্তিতে সুপ্রিমকোর্টের এলাকা বা ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারে (১৩৭ ধারা)।

(৫) সুপ্রিমকোর্ট উপযুক্ত মনে করলে ন্যায় বিচারের স্বার্থে কোনও মামলা হাইকোর্টের স্থানান্তর করতে পারে (১৩৯ ক ধারা—সংবিধানের ৪২ তম সংশোধন ধারা সংযোজিত)।

(৬) পার্লামেন্ট আইন করে সুপ্রিমকোর্টের হাতে সহায়ক বা অনুপূরক (Supplementary) ক্ষমতা দান করে সংবিধান অনুসারে কোর্টের ক্ষমতাকে আরও কার্যকর ভাবে ব্যবহার করার স্বার্থের (১৪০ ধারা)।

(৭) সুপ্রিমকোর্ট ঘোষিত আইন দেশের সব আদালতের ক্ষেত্রে অবশ্য পালনীয় (১৪১ ধারা)।

(৮) ন্যায় বিচারের স্বার্থে সুপ্রিমকোর্ট যে কোনো বিধান জারি করতে পারে এবং তা ভারত ভূখণ্ডে বলবৎযোগ্য। সুপ্রিমকোর্ট আদেশ করলে কোনও ব্যক্তি বা বস্তুকে আদালতে হাজির বা পেশ করতে হবে বিচার বা সাক্ষ্য প্রমাণের প্রয়োজনে (১৪২ ধারা)।

(৯) সমস্ত দেওয়ানি ও বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ সুপ্রিমকোর্টের কাজে সাহায্য ও সহযোগিতা করবে (১৪৪ ধারা)।

(১০) পার্লামেন্টের আইন মত ও রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নিয়ে আদালতের সব আইন-কানুন স্থির করা সুপ্রিমকোর্টের কাজ (১৪৫ ধারা)।

(১১) নিজস্ব আধিকারিক, কর্মী নিয়োগ, তাদের কাজের শর্ত স্থির করা সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও তাঁর নির্দেশ মতো অন্যান্য বিচারপতির দ্বারা স্থির হবে। কোর্টের প্রশাসনিক ব্যয় সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য (১৪৬ ধারা)।

সুপ্রিমকোর্টের এলাকায় আয়কর, শুল্ক আইন, আবগারি ও লবণ আইন জন প্রতিনিধিত্ব আইন (PRA) অ্যাডভোকেট আইন, একচেটিয়া করাবার ও অন্তরায় মূলক ব্যবসায় আইন (MRTP), আদালত অবমাননা আইন, উগ্রপন্থা ও বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রতিরোধ আইন (TDA) ইত্যাদি নানা বিষয়ের মামলা ও বিরোধের আপিল ও শুনানীর ব্যবস্থা আছে। রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন আইন (১৯৫২) বলে নির্বাচনী অভিযোগও সুপ্রিমকোর্টের কাছে এসেছে।

বর্তমান এককের পরবর্তী অংশের আলোচনা থেকে শিক্ষার্থী পাঠক ভারতের সুপ্রিমকোর্টের ক্ষমতার একটি সামগ্রিক মূল্যায়ন করতে পারবেন।

৩০.৪.১ সুপ্রিমকোর্টের ক্ষমতার মূল্যায়ন

সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতার বিচারে বলা যায় ভারতের সুপ্রিমকোর্ট একাধারে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত সর্বোচ্চ আপিল আদালত, নাগরিক অধিকারের রক্ষাকর্তা এবং সংবিধানের অভিভাবক। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত হিসাবে কেন্দ্র-রাজ্য ক্ষমতার ভারসাম্যবিধান বা কেন্দ্র-রাজ্যের মধ্যে উদ্ভূত অস্থিরতার (tension) অবসান ঘটানো সুপ্রিমকোর্টের অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ দায়িত্ব। আপিল আদালত হিসাবে শুধুমাত্র দেওয়ানি, ফৌজদারি বা সংবিধান সংক্রান্ত মামলার আপিল গ্রহণ বা মীমাংসার কাজই সুপ্রিমকোর্ট করে না, বহু বিচিত্র রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক সমস্যার শুনানী ও বিচারের দায়িত্ব সুপ্রিমকোর্ট করে। জনপ্রতিনিধিত্ব সংক্রান্ত মামলা থেকে শুরু করে আয়কর, আবগারি ও বহিঃশুল্ক ফাঁকি বা উগ্রপন্থা দমন বা আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংক্রান্ত বহু প্রশ্ন সুপ্রিমকোর্টের কাছে বিচারের জন্য এসেছে। অখণ্ড বিচারব্যবস্থায় শীর্ষ আদলত হিসাবে সুপ্রিমকোর্টের মতো এত কর্মব্যস্ত আদালত পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে দেখা যায় না।

গণপরিষদের বিতর্কে আলাদি কৃষ্ণস্বামী আয়ার (Alladi Krishnaswami Ayyar) বলেছেন ভারতের সুপ্রিমকোর্ট পৃথিবীর যে কোনও অংশের সুপ্রিমকোর্টের চেয়ে শক্তিশালী ("The Supreme Court of the Indian Union has more powers than any Supreme Court in any part of the world")। এস. এল. সিক্রি (S. L. Sikri) মতে, সুপ্রিমকোর্ট শুধুমাত্র ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ বিচার বিভাগীয় আদালত নয় (highest judicial tribunal in the Indian Republic), মুক্ত বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠান (the most powerful judicial institutions in the free world)। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত বা আপিল আদালত হিসাবে বা নাগরিক অধিকারের রক্ষাকবচ (safeguard) হিসাবে বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে বা নিজস্ব অসুবিধা ও দুর্বলতা কাটিয়ে সুপ্রিমকোর্ট নিজের সাংবিধানিক ভূমিকা পালন করেছে। মৌলিক অধিকার রক্ষার প্রশ্নে সুপ্রিমকোর্টের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। মৌলিক অধিকারের পরিধি সুপ্রিমকোর্টের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রসারিত হয়েছে। সংবিধানের মৌল চরিত্র যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সে ব্যাপারে বিচারবিভাগের

অবদান বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। সংবিধানের রক্ষক বা অভিভাবক হিসাবে সুপ্রিমকোর্ট যোগ্যতার সঙ্গেই তার দায়িত্ব পালন করেছে। রাজনৈতিক বিরোধের মীমাংসা বা সাংবিধানিক সংকটের অবসান ঘটাতে সুপ্রিমকোর্ট বহু সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছে। দায়িত্বের ক্ষেত্রে শাসন বিভাগ ও আইনবিভাগের দুর্বলতা যতই প্রকট হয়েছে ভারতীয় গণতন্ত্রে বিচার বিভাগ ততই সক্রিয় হয়ে উঠেছে। সন্দেহ নেই সুপ্রিমকোর্ট ভারতের পরিবর্তিত সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বহু নতুন অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞা পালনের হাতিয়ার হিসাবে নিজেকে উপস্থিত করতে সমর্থ হয়েছে। সাধারণ মানুষের কাছে সামাজিক-আর্থিক ন্যায়বিচার পৌঁছে দেবার প্রচেষ্টায় সুপ্রিমকোর্ট যে সব জনস্বার্থ মামলা গ্রহণ করেছে তা অবশ্যই অভিনব। রাজনৈতিক মূল্যবোধ রক্ষায়, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় শুদ্ধিকরণের কাজে এবং দুর্নীতি ও অপশাসনের বিরুদ্ধে সুপ্রিমকোর্টের ভূমিকা এবং জনস্বার্থবাহী মামলা গ্রহণে এর উদ্যোগ ন্যায় বিচারের বৃহত্তর স্বার্থে প্রশংসনীয়।

গোলকনাথ মামলা (১৯৬৭), ব্যাংক জাতীয়করণ (১৯৬৯), রাজস্ব ভাতা বিলোপ (১৯৭৯), ইত্যাদি মামলায় সুপ্রিমকোর্টের নির্ভীক ও নিরপেক্ষ ভূমিকা, শাহবানু মামলায় কোর্টের বলিষ্ঠ রায় অবশ্যই দৃষ্টান্তমূলক। তবুও সুপ্রিমকোর্টের ভূমিকার অপূর্ণতা বা তার নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। মূল এলাকা বা আপিল এলাকা সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিমকোর্টের ভূমিকা সব সময় পক্ষপাতহীন হয়নি, যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত হিসাবে রাজ্যের অধিকারের চেয়ে কেন্দ্রের প্রাধান্য রক্ষায় সুপ্রিমকোর্ট তৎপর হয়েছে বা নাগরিক অধিকার রক্ষায় সুপ্রিমকোর্টের বিচার সবক্ষেত্রে প্রগতিশীলতায় মানে উত্তীর্ণ হতে পারে নি এই অভিযোগ সমালোচকেরা করেছেন। কয়লাখনি অঞ্চলের অধিকার ও উন্নয়ন সংক্রান্ত মামলা (১৯৬১), শিল্প বিবাদ সংক্রান্ত বা রাষ্ট্রের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারমূলক আইন নিয়ে বিচারের ক্ষেত্রে সুপ্রিমকোর্ট রক্ষণশীল ও শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গিকে অতিক্রম করতে পারেনি। সংসদীয় গণতন্ত্রে বিচার বিভাগের অতিরিক্ত সক্রিয়তার প্রবণতা কতটা শোভন তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। বিচারকদের কাছে যে বিশ্বস্ততা বা দায়বদ্ধতা আশা করা হয়, ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে যে আস্থা বিচারকদের কাছে প্রত্যাশা করা হয় তা অনেক ক্ষেত্রেই পরিপূরণ হয় না। বিচার কার্যে বিলম্ব, বিচারকদের পক্ষপাতিত্ব, ন্যায় বিচারের অভাব বিচার বিভাগীয় দুর্নীতি এসব নিয়েও অভিযোগ আছে। বিচারকদের নিয়োগ বা নির্বাচন নিয়েও রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের প্রশ্ন উঠেছে। বিচার বিভাগের ক্ষমতাকে খর্ব করার প্রশাসনিক ও আইনগত প্রচেষ্টা নিয়েও সমালোচনা হয়েছে। ৪২ তম সংশোধনে বিচার বিভাগের ক্ষমতা খর্ব করে আইনবিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অনেকেই ভালো চোখে দেখেন নি। বিচার বিভাগের প্রতি শাসন বিভাগের ও আইন বিভাগের শ্রদ্ধা বা বিচার বিভাগ এবং শাসন বিভাগ ও আইনবিভাগের সম্পর্ক নিয়ে ভারতীয় রাজনীতির প্রবণতাটিও বিশেষ সুখকর নয়।

বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা (Judicial Review) এবং এক্ষেত্রে সুপ্রিমকোর্টের ভূমিকা কী বিষয়টি নিয়ে সংবিধানবিদ ও রাজনৈতিক মহলে গভীর বিতর্ক আছে। পরবর্তী এককের আলোচনা থেকে শিক্ষার্থী, পাঠক এ সম্পর্কে বিস্তৃত জানবার সুযোগ পাবেন।

৩০.৫ সারাংশ

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ একান্ত অপরিহার্য। আইনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগে, নাগরিক অধিকার রক্ষায় বিচার বিভাগের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ভারতবর্ষে গণপরিষদ বিচার বিভাগকে সমাজ বিপ্লবের হাতিয়ার হিসাবে দেখতে চেয়েছে। ন্যায় বিচারের কাজে বিচার বিভাগ সক্রিয় হোক, বিচার বিভাগ ঔপনিবেশিক স্বার্থের বাহক না হয়ে জনস্বার্থের অঙ্গীকারবদ্ধ হোক গণপরিষদের সদস্যরা এটাই চেয়েছিলেন।

স্বাধীন ভারতবর্ষে একটি অখণ্ড বিচারব্যবস্থার ধারণাকে সংবিধানে গ্রহণ করা হয়েছে। এই বিচারব্যবস্থার শীর্ষে আছে সুপ্রিমকোর্ট এবং পর পর্যায়ক্রমে আছে হাইকোর্ট ও নিম্ন আদালতগুলি। কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল পার্বত্য উপজাতীয় অঞ্চল ইত্যাদির জন্য বিশেষ আদালত ব্যবস্থা এবং বিশেষ ধরনের বিচারের জন্য বিশেষ বিশেষ আদালত সৃষ্টির কথাও সংবিধানে বলা হয়েছে।

ভারতের সুপ্রিমকোর্টের বর্তমান বিচারপতির সংখ্যা প্রধান বিচারপতি সহ ২৬। বিচারপতিরা ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত নিজ পদে বহাল থাকবেন। রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ করেন। প্রধান বিচারপতির পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়োগ করেন। সংবিধান বিচারপতিদের নিয়োগের যোগ্যতা ও তাদের অপসারণ পদ্ধতি ধার্য করেছে। সংবিধানে অস্থায়ী বিচারপতি নিয়োগের ব্যবস্থা আছে। সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের বেতন, ভাতা, সুযোগসুবিধা নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

ভারতের সুপ্রিমকোর্টের কাজের প্রধান এলাকা চারটি—মূল এলাকা, আপিল এলাকা, পরামর্শদান এলাকা এবং আদেশ, নির্দেশ বা লেখ জারি করার এলাকা। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে বা রাজ্যগুলির মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির দায়িত্ব সুপ্রিমকোর্ট লেখ মূল এলাকা অনুসারে। আপিল এলাকায় সংবিধানের ব্যাখ্যাসংক্রান্ত আপিল, দেওয়ানি মামলায় আপিল, ফৌজদারি মামলায় আপিল, বিশেষ অনুমতির মাধ্যমে সুপ্রিমকোর্ট আপিল গ্রহণ করে। পরামর্শদান এলাকা অনুসারে সুপ্রিমকোর্ট রাষ্ট্রপতির অনুরোধে আইন ও তথ্যঘটিত কোন বিশেষ প্রশ্নে সরকারকে অভিমত প্রদান করে। মৌলিক অধিকার বলবৎ করার জন্য সুপ্রিমকোর্ট বন্দি প্রত্যক্ষীকরণ, পরমাদেশ, প্রতিষেধ, অধিকার পৃচ্ছা, উৎপ্রেষণ ইত্যাদি ধরনের নির্দেশ, আদেশ বা লেখ জারি করতে পারে। সুপ্রিমকোর্টের ক্ষমতার অন্যান্য ক্ষেত্রগুলি হল ঃ অভিলেখ আদালত হিসাবে ভূমিকা, নিজের রায় বা আদেশের পুনর্বিবেচনা, ইউনিয়ন তালিকাভুক্ত বিষয়ে নিয়মকানুন রচনা ইত্যাদি। ভারতের অন্তর্গত সমস্ত বিচারালয়কে সুপ্রিমকোর্ট ঘোষিত আইন মেনে চলতে হয়।

৩০.৬ অনুশীলনী

(১) সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে বাক্যটি সম্পূর্ণ করুন।

(ক) সুপ্রিমকোর্টে (i) শুধুমাত্র স্থায়ী বিচারপতি নিয়োগের ব্যবস্থা আছে। (ii) স্থায়ী ও অস্থায়ী বিচারপতি নিয়োগের ব্যবস্থা আছে।

(খ) সুপ্রিমকোর্টের স্থায়ী বিচারপতির সংখ্যা বর্তমানে ৭/১৮/২৬।

(গ) সুপ্রিমকোর্টের অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়োগ করেন (i) রাষ্ট্রপতি (ii) প্রধান বিচারপতির পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি।

(ঘ) সুপ্রিমকোর্টের বিচারকদের বেতন, ভাতা ইত্যাদি কেন্দ্রীয় সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয়/লোকসভার অনুমোদিত ব্যয়।

(ঙ) ভারতের সুপ্রিমকোর্ট এমন এক বিচারালয় যার (i) কেবল মূল এলাকা আছে, (ii) কেবল আপিল এলাকা আছে, (iii) মূল ও আপিল উভয় এলাকাই আছে কিন্তু অন্য কোনও এলাকা নেই, (iv) মূল এলাকা, আপিল এলাকা, পরামর্শদান এলাকা এবং আদেশ, নির্দেশ ও লেখ জারির এলাকা আছে।

(চ) সুপ্রিমকোর্টের মূল এলাকায় চুক্তি, সন্ধি, সনদ ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিবাদের বিচার হতে পারে/পারে না।

(ছ) সুপ্রিমকোর্ট নিজের রায় বা আদেশের পুনর্বিবেচনা করতে পারে/পারে না।

(২) দু-একটি বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন ঃ

(ক) সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের দুটি যোগ্যতার উল্লেখ করুন।

(খ) সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের অপসারণের পদ্ধতি কী?

(গ) সুপ্রিমকোর্টের অনন্য (Absolute) এলাকা বলতে কী বোঝায়?

(ঘ) সুপ্রিমকোর্টে কোন্ ধরনের আপিল করা যায়?

(ঙ) সুপ্রিমকোর্টে 'বিশেষ অনুমতির মাধ্যমে আপিল' বলতে কী বোঝায়?

(চ) বন্দি প্রত্যক্ষীকরণ কাকে বলে?

(ছ) মার্কিন সুপ্রিমকোর্টের সঙ্গে ভারতের সুপ্রিমকোর্টের দুটি পার্থক্য লেখ।

(জ) ভারতের বিচারব্যবস্থার রূপটি কেমন?

(৩) অনধিক ৫০ শব্দে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর সংকেত দেখে নিজেই উত্তর করুন।

(ক) সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিগন কীভাবে নিযুক্ত ও অপসারিত হন?

(খ) সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের যোগ্যতা কী লিখুন।

(গ) সুপ্রিমকোর্টের মূল এলাকা সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

(ঘ) সুপ্রিমকোর্টের আপিল এলাকা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

(ঙ) সুপ্রিমকোর্টের পরামর্শদান এলাকা সম্পর্কে লিখুন।

(চ) সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা ভারতের সংবিধানে কীভাবে সুরক্ষিত হয়?

(৪) অনধিক ১৫০টি শব্দে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর সংকেত দেখে নিজেই উত্তরগুলি লেখার চেষ্টা করুন।

(ক) সুপ্রিমকোর্টের গঠন পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

(খ) সুপ্রিমকোর্টের কার্যাবলি আলোচনা করুন।

(গ) সুপ্রিমকোর্টের ভূমিকার একটি মূল্যায়ন করুন।

৩০.৭ উত্তরমালা

(১) (ক) সুপ্রিমকোর্টে স্থায়ী ও অস্থায়ী বিচারপতি নিয়োগের ব্যবস্থা আছে।

(খ) সুপ্রিমকোর্টের স্থায়ী বিচারপতির সংখ্যা বর্তমানে ২৬।

(গ) সুপ্রিমকোর্টের অনন্য বিচারপতিদের নিয়োগ করেন প্রধান বিচারপতির পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি।

(ঘ) সুপ্রিমকোর্টের বিচারকদের বেতন, ভাতা ইত্যাদি কেন্দ্রীয় সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয়।

(ঙ) ভারতের সুপ্রিমকোর্ট এমন এক বিচারালয় যার মূল এলাকা, আপিল এলাকা, পরামর্শদান এলাকা এবং আদেশ, নির্দেশ ও লেখ জারির এলাকা আছে।

(চ) সুপ্রিমকোর্টের মূল এলাকায় চুক্তি, সন্ধি, সনদ ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিবাদের বিচার হতে পারে না।

(ছ) সুপ্রিমকোর্ট নিজের রায় বা আদেশের পুনর্বিবেচনা করতে পারে।

(২) (ক) সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের দুটি যোগ্যতা হ'ল (i) ভারতীয় নাগরিকত্ব এবং (ii) রাষ্ট্রপতির বিচারে বিশেষ আইনজ্ঞ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ।

(খ) সংসদের দুই সভার মোট সদস্যসংখ্যার অধিকাংশ এবং উপস্থিত ও ভোট প্রদানকারী সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশ দ্বারা সমর্থিত অপসারণের একটি আবেদন রাষ্ট্রপতির কাছে পৌছলে সুপ্রিমকোর্টের বিচার পতিদের প্রমাণিত অসামর্থ্য ও অসদাচারের জন্য রাষ্ট্রপতি পদচ্যুত করতে পারেন।

(গ) সংবিধান অনুসারে মূল এলাকাটিই হল সুপ্রিমকোর্টের অনন্য এলাকা। কেন্দ্র-রাজ্য বা রাজ্য ও রাজ্যের মধ্যে বিরোধের মীমাংসা সুপ্রিমকোর্ট ছাড়া অন্য আদালতে হতে পারে না।

(ঘ) সুপ্রিমকোর্টে সংবিদানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত, দেওয়ানি ও ফৌজদারি আপিল করা যায়। সুপ্রিমকোর্ট নিজের বিবেচনায় বিশেষ অনুমতি দিলেও কোর্টের কাছে আপিল করা সম্ভব।

(ঙ) বিশেষ অনুমতির মাধ্যমে সুপ্রিমকোর্টের আপিল বলতে বোঝায় সুপ্রিমকোর্ট নিজের বিবেচনা মতো ভারতের সব বিচারালয়ের সব রকম রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার বিশেষ অনুমতি দিতে পারে। এক্ষেত্রে অনুমতি দেবার সময় সুপ্রিমকোর্ট দেখে স্বাভাবিক ন্যায়ের নীতি লঙ্ঘন করে কোন কাজ হয়েছে কিনা।

(চ) নাগরিক অধিকার লঙ্ঘিত হলে যে সব শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার ভারতের সংবিধানে স্বীকৃত আছে। বন্দি প্রত্যক্ষীকরণের আদেশ (Writ of habeas corpus) তারমধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। অবরুদ্ধ ব্যক্তিকে আটক করার কারণ জানার জন্য সুপ্রিমকোর্ট এই আদেশ বা নির্দেশ জারি করে।

(ছ) মার্কিন সুপ্রিমকোর্টের সঙ্গে ভারতের সুপ্রিমকোর্টের দুটি পার্থক্য হল (১) ভারতের সুপ্রিমকোর্টের মতো মার্কিন সুপ্রিমকোর্ট সর্বোচ্চ আপিল আদালত হিসাবে কাজ করে না। (২) মার্কিন সুপ্রিমকোর্টের ভারতের সুপ্রিমকোর্টের মতো পরামর্শ দান এলাকা নেই।

(জ) ভারতের বিচারব্যবস্থা হল অখণ্ড বিচারব্যবস্থা। এর শীর্ষে আছে সুপ্রিমকোর্ট এবং পর্যায়ক্রমে হাইকোর্ট ও অধস্তন আদালত।

৩০.৮ গ্রন্থপঞ্জি

(১) Durga Das Basu : *Introduction to the Constitution of India (1999).*

(২) B. R. Agarwala : *Our Judiciary (NBT, 1993).*

(৩) S. L. Sikri : *Indian Government and Politics (1989).*

(৪) Dhirendranath Sen : *From Raj to Swaraj (1954).*

(৫) Granville Austin : *The Indian Constitution : Cornerstone of a Nation (1966).*

একক ৩১ ❐ বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা

গঠন

৩১.১ উদ্দেশ্য

৩১.২ প্রস্তাবনা

৩১.৩ মূল আলোচনা

৩১.৩.১ বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা ঃ গণপরিষদে বিতর্ক

৩১.৩.২ বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা ঃ সংবিধানের অবস্থান

৩১.৪ ভারতের সংবিধান ও বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা

৩১.৪.১ বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা ঃ বাস্তব অভিজ্ঞতা ও অগ্রগতি

৩১.৫ সারাংশ

৩১.৬ অনুশীলনী

৩১.৭ উত্তরমালা

৩১.৮ গ্রন্থপঞ্জি

৩১.১ উদ্দেশ্য

বর্তমান এককটি পাঠ করলে আপনি—

- বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার অর্থ এবং ভারতে সুপ্রিমকোর্ট এই ক্ষমতা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাংবিধানিকভাবে এবং বাস্তবে কতটা গুরুত্ব পেয়েছে তা যাচাই করতে পারবেন।
- এই ক্ষমতা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভারতের সুপ্রিমকোর্ট কী ভূমিকা পালন করেছে তার বিচার ও মূল্যায়ন করতে পারবেন।
- প্রসঙ্গত বিশেষ কয়েকটি মামলায় সুপ্রিমকোর্ট কী ব্যাখ্যা দিয়েছে এবং এ সম্পর্কে রাজনৈতিক মহলে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে সেটি জানতে পারবেন।

৩১.২ প্রস্তাবনা

ভারতীয় সংবিধানে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার (Judicial Review) কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়নি। বিচার বিভাগের আইনের বৈধতা বিচারের ক্ষমতাকে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা বলে। এই অর্থে বিচার বিভাগের কাজ হল আইন বিভাগীয় বা শাসন বিভাগীয় কার্যকলাপ সংবিধান নির্দিষ্ট সীমারেখা লঙ্ঘন করছে কিনা তা দেখা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রিমকোর্টের এই ক্ষমতা যতটা ব্যাপক ভারতের ক্ষেত্রে ততটা নয়। ভারতে সংবিধানের প্রাধান্য এবং পার্লামেন্ট প্রণীত আইনের প্রাধান্য দুটিই স্বীকৃত। তবে পার্লামেন্ট এই আইনগত প্রাধান্য পেয়েছে সংবিধান বলে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মতো ভারতের পার্লামেন্ট সার্বভৌম সংস্থা নয়, অবাধভাবে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ভারতের পার্লামেন্টের নেই। আইনসভা সংবিধানের নির্দেশ অমান্য করলে তার বৈধতা বিচারের ভার আদালতের।

তবে এর অর্থ এই নয় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীমকোর্টের মতো ভারতের সুপ্রিমকোর্ট আইনসভা প্রণীত আইনের সমীচীনতা বিচার করতে পারে। বর্তমান এককে বিভিন্ন মামলার ভিত্তিতে সংসদের ক্ষমতার সঙ্গে সুপ্রিমকোর্টের বিরোধ এবং তা নিয়ে যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে সে প্রশ্নে একটি বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ আথেছ। শংকরী প্রসাদ মামলা (১৯৫২) গোলকনাথ মামলা (১৯৬৭), কেশবানন্দ ভারতীর মামলা (১৯৭৩), মিনার্ভা মিলের মামলা (১৯৮০) এক্ষেত্রে বিশেষভাবে বিচার্য। প্রসঙ্গত অন্যান্য মামলার উল্লেখও আপনারা এই এককের আলোচনায় পাবেন।

৩১.৩ মূল আলোচনা

৩১.৩.১ বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা ঃ গণপরিষদের বিতর্ক

'বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা' বলতে বোঝায় বিচার বিভাগ তথা আদালতের সেই ক্ষমতা যার বলে আইন সভা প্রণীত আইনের সাংবিধানিক বৈধতা বিচার করা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে এক্ষেত্রে বিচার বিভাগের ব্যাপক ক্ষমতা আছে।

'বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা' কথাটি ভারতীয় সংবিধানের কোথাও উল্লেখ করা না হলেও, ভারতের সুপ্রিমকোর্ট বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা বা সমীক্ষার ক্ষমতা ভোগ করে। গণপরিষদের অস্থায়ী কমিটি (Ad hoc Committee) সভায় সুপ্রিমকোর্টের এই ক্ষমতার যৌক্তিকতা নিয়ে সভার সদস্যরা একমত হয়েছিলেন। কমিটির রিপোর্টের প্রথম সুপারিশই ছিল, আইনের সাংবিধানিক বৈধতা বিচার করতে যে কোনো যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সুপ্রিমকোর্টের ক্ষমতা একান্ত বাঞ্ছনীয় ("A Supreme Court with jurisdiction to decide upon the constitutional validity of acts and laws can be regarded as a necessary implication of any federai scheme"- উদ্ধৃতিটির জন্য (Granville Austin, The Indian constitution cornerstone of a Nation)। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত (Federal Court) এই ক্ষমতা ভোগ করার ক্ষেত্রে তেমনভাবে ক্ষমতা পায়নি। অস্থায়ী কমিটির রিপোর্টে সুপ্রিমকোর্ট গঠনের প্রয়োজনীয়তার সপক্ষে বলতে গিয়ে আলাদি কৃষ্ণস্বামী আয়ার (Alladi Krishnaswami Ayyar) এবং কে. এম. মুন্সী (K. M. Munshi) সুপ্রিমকোর্টের বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতার পক্ষে জোরালো যুক্তি প্রদর্শন করেন। কে. এম. মুন্সী মনে করেন মৌলিক অধিকার রক্ষার স্বার্থে এবং আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি (Due process of law) অনুসরণের ব্যাপারটিকে নিশ্চিত করতে সুপ্রিমকোর্টকে এই ক্ষমতা দেওয়া দরকার। তিনি চেয়েছেন বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ব্যাপারটি সংবিধানে সরাসরিভাবে প্রতিষ্ঠিত হোক, শুধুমাত্র আইনের যথাবিহিত পদ্ধতির উল্লেখ করে নয়। মুন্সীর খসড়া সংবিধানে সুপ্রিমকোর্টকে আইনসভা প্রণীত আইনের সাংবিধানিক বৈধতা বিচারের ক্ষমতা দেবার সুপারিশ করা হয়েছে এবং ন্যায় বিচারের স্বার্থে সুপ্রিমকোর্টকে শক্তিশালী করার কথা বলা হয়েছে।

আলাদি কৃষ্ণস্বামী আয়ার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতাদানের ক্ষেত্রে সে দেশের সংবিধান প্রণেতাদের যুক্তিতর্ককে সামনে রেখে, কোনও দেশের লিখিত সংবিধান বা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার স্বার্থেই যে কেবল এই ক্ষমতার প্রয়োজন এ কথা স্বীকার করেন না। তাঁর বিচারে সুইজারল্যান্ড এমনকি ইংলন্ডের আইনগত ঐতিহ্যের পটভূমিতেও কোর্টের এই ক্ষমতার ন্যায্যতা যাচাই করা সম্ভব। আয়ার লক্ষ্য করেছেন

ইংল্যান্ডে পার্লামেন্টের আইনকে অবৈধ ঘোষণা করার কোনও ক্ষমতা আদালতের নেই এ কথা সত্য, কিন্তু এদেশের আদালত পার্লামেন্ট স্বীকৃত অন্য কোনও কর্তৃপক্ষের কার্যকলাপ পর্যালোচনা করতে পারে। ব্রিটিশ আইনে সীমিত ক্ষেত্রে আইনবিভাগীয় কার্যকলাপ বিচার বিভাগের এক্তিয়ারে আনার সমর্থন মেলে বলেও শ্রী আয়ার মনে করেন। আয়ারের বিশ্বাস ভারতের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ আইনের এই অনুশাসন প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং বিচার বিভাগকে সংবিধান ব্যাখ্যার ক্ষমতা দেওয়া যেতে পারে।

গণপরিষদের কেন্দ্রীয় সংবিদান কমিটি (Union Constitution Committee) অস্থায়ী কমিটির রিপোর্ট বিবেচনা করে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা সম্পর্কে তার নিজস্ব সুপারিশ পেশ করেছে। জওহরলাল নেহরু, মৌলানা আজাদ, গোবিন্দ বল্লভ পন্থ, জগজীবন রাম, বি. আর. আম্বেদকার, এ. কে. আয়ার, কে. এম. মুন্সী, কে. টি. শাহ ইত্যাদিদের নিয়ে গঠিত কেন্দ্রীয় সংবিধান কমিটি সংবিধানের নানা বিষয়ে বিতর্কে অবতীর্ণ হলেও প্রাথমিকভাবে সুপ্রিমকোর্টের এলাকা বা ক্ষমতা নিয়ে তেমনভাবে ভাবেনি। খসড়া সংবিধান রচনার পরেই এ বিষয়ে এই কমিটির উদ্যোগ লক্ষণীয়। সুপ্রিমকোর্ট বিষয়ে গণপরিষদের অস্থায়ী কমিটির সুপারিশ মেনেই, সুপ্রিমকোর্টের এলাকা বা নাগরিক অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে সুপ্রিমকোর্টের ব্যাপক ক্ষমতা নিয়ে কেন্দ্রীয় সংবিধান কমিটির কোন ভিন্নমত ছিল না। সামগ্রিকভাবে বিচারব্যবস্থাকে এবং সুপ্রিমকোর্টকে দেবত্বদান করা বা অবাধ ক্ষমতা প্রদানের কোনও ইচ্ছা তাঁদের ছিল না। বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ব্যাপারে মুন্সী বা আয়ারের অতিরিক্ত আবেগের কাছে নেহরু বা আম্বেদকর নতি স্বীকার করেন নি। নেহরু বা আম্বেদকর উভয়েই মনে করেছেন ভারতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিচার বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। সংবিধানের ব্যাখ্যাকর্তা বা নাগরিক অধিকারের রক্ষাকর্তা হলেও মার্কিন বিচার বিভাগের মতো এর স্থান সর্বোচ্চে থাকবে বা পূর্ণ আধিপত্য নিয়ে বিচার বিভাগ কাজ করবে নেহরু বা আম্বেদকার তা চান নি। মার্কিন সংবিধানে বিজচার বিভাগ যেমন আইনসভা প্রণীত আইনের সাংবিধানিকতা ও যথার্থ্যতা বিচার করতে পারে ভারতের ক্ষেত্রে তাঁরা চেয়েছিলেন সাংবিধানিক নির্দেশ বা বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করলে ভারতের বিচার বিভাগ আইন সভা প্রণীত আইন বাতিল করতে পারে কিন্তু সংবিধান নিরপেক্ষভাবে আইনের যথার্থতা মূল্যায়নের অধিকার তার নেই।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো রাষ্টপতিশাসিত ব্যবস্থা নয়, ভারতে আছে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা, যেখানে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের নিয়ে গঠিত একটি মন্ত্রিসভা সংসদের কাছে যৌথভাবে দায়িত্বশীল থেকে শাসনকার্য পরিচালনা করে। সংসদীয় শাসনতন্ত্রে সংসদীয় সার্বভৌমত্বকেই স্বীকার করতে হবে। তবে সংসদ সংবিধানের বাধ্যবাধকতা মেনেই চলবে এবং তার সীমারেখা লঙ্ঘন করবে না, এটা দেখার দায়িত্ব বিচার বিভাগের। ভারতের সংসদ যে ব্রিটেনের মতো সীমাহীন সার্বভৌমত্বের অধিকারী নয়, আবার ভারতের সুপ্রিমকোর্ট যে মার্কিন সুপ্রিমকোর্টের মতো অবাধ কর্তৃত্বের অধিকারী হবে না—ভারতে যে উভয়ের মাঝামাঝি এক অবস্থা বিরাজ করবে সংবিধান প্রণেতারা এটাই আশা করেছেন। সুপ্রিমকোর্টের ক্ষমতার উপর যে একটা বেষ্টন টেনে দেওয়া হবে, সম্পত্তির অধিকার বা ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর যে বিচার বিভাগের ক্ষমতা সীমিত থাকবে, জরুরি অবস্থার সময় যে বিচার বিভাগের অধিকার পর্যালোচনার ক্ষমতা নেই, যুক্তরাষ্ট্রীয় এলাকায় এর হস্তক্ষেপ যে অভিপ্রেত নয় কেন্দ্রীয় সংবিধান কমিটির সদস্যরা তাঁদের বক্তব্যে এ কথা প্রকাশ করেছেন। নেহরু বলেছেন জনগণের ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করে যে সংসদ তার সার্বভৌম ইচ্ছার উপরে সুপ্রিমকোর্ট বা কোনও বিচার বিভাগই তার বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। এ. কে. আয়ারেরও অভিমত ছিল, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই, কিন্তু বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতার বদ্ধমূল বিশ্বাস নিয়ে বিচার বিভাগকে আইন বিভাগ বা শাসন বিভাগের উর্দ্ধে স্থাপন করা

যুক্তিযুক্ত নয় (গণপরিষদের বিতর্ক)। বি. এন. রাউ বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার পক্ষে বললেও এই ক্ষমতাকে সংবিধানে নির্দিষ্ট করে দেবার পক্ষে বলেন নি। মৌলিক অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে আদালতের বিশ্বস্ততার উপর আস্থা রাখার কথা বলেছেন তিনি। আয়ার আশা প্রকাশ করেছেন বিচার বিভাগের সঙ্গে আইনবিভাগ ও শাসন বিভাগের কাজের ভারসাম্য ও সহযোগিতা থাকবে। প্যাটেল নিবর্তনমূলক আইন (Preventive Detention Act) প্রবর্তনের ক্ষেত্রে শাসন বিভাগীয় ক্ষমতার উপর বিচার বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ থাকুক এটা চাননি। প্যাটেল অবাধ ব্যক্তি স্বাধীনতার ধারণাকে সমর্থন করেননি। আইনের যথাবিহিত পদ্ধতির (Due process of law) আশ্রয়ে বিচারকেরা সংবিধানের অপব্যাখ্যা করতে পারেন এই আশঙ্কায় সতর্কভাবে বিচার বিভাগীয় ক্ষমতার প্রয়োগ ঘটুক এটাই তিনি আশা করেছেন (গণপরিষদের বিতর্ক)।

৩১.৩.২ বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা ঃ সংবিধানের অবস্থান

বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার প্রশ্নে ভারতীয় সংবিধানের অবস্থান ও বাস্তব পরিস্থিতি কী এটি বিচার করার আগে এ প্রশ্নে মার্কিন সংবিধানের অবস্থান কী শিক্ষার্থী পাঠক, সে প্রশ্নটিকে আগে যাচাই করে নিতে পারেন। মার্কিন সংবিধানে সুপ্রিমকেরার্টের বৈধতা বিচারের ক্ষমতা সংবিধানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। তবে এখানে সংবিধানের দুটি নির্দেশ লক্ষ্যণীয়। প্রথমত সংবিধানে ষষ্ঠ ধারায় (Art VI) বলা হয়েছে সংবিধান অনুসারে প্রণীত যুক্তরাষ্ট্রের আইন এবং যুক্তরাষ্ট্রের চুক্তিসমূহ হবে দেশের চরম আইন ("This Constitution, and the laws of the United States which shall be made in pursuance there of; and all Treaties made or which shall be made under the Authority of the United States, shall be the supreme law of the land...." Art VI)। দ্বিতীয়ত, সংবিধানের তৃতীয় ধারায় দ্বিতীয় ছেদ বা অংশে বলা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের আইন ও চুক্তি সংক্রান্ত সব বিবাদের ক্ষেত্রে বিচার বিভাগের ক্ষমতা থাকবে (The Judicial power shall extend to all cases, in law and Equity, arising under this constitution, the laws of the United States and Treaties made or which shall be made, under their authority; ....Art VI. Section 2)। সংবিধানের এই দুটি নির্দেশের অর্থ পরিষ্কার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধানই সর্বোচ্চ আইন। সংবিধান বিরোধী কোন কাজ অবৈধ এবং এই বৈধতা বিচারের এক্তিয়ার বিচার বিভাগের। বিচারবিভাগের হাতে বৈধতা বিচারের অধিকার সংবিধান প্রণেতারা দিতে চান নি এই কারণেই যে এই ক্ষমতা ক্ষমতা-স্বতন্ত্রীকরণের নীতিকে ব্যাহত করে। তবে অধিকাংশ মার্কিন সংবিধান বিশেষজ্ঞের মত হল সুপ্রিমকোর্টের বৈধতা বিচারের ক্ষমতা মার্কিন সংবিধানের প্রকৃতিতেই নিহিত। সংবিধান বিরোধী বলেই বিচার বিভাগ আইন বিভাগ বা শাসন বিভাগের কাজকে অবৈধ ঘোষণা করবে, অন্য কোনও কারণে নয়। শাসনের ক্ষেত্রে 'আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি' (Due process of law) অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা আদালত সেটাই দেখবে। ১৮০৩ সালে প্রধান বিচারপতি মার্শাল (Chief Justice Marshall) মারাবারী বনাম ম্যাডিসন (Marbury N. Madison) মামলায় সুপ্রিমকোর্টের বৈধতা বিচারের ক্ষমতার সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে বলেছেন ঃ

> "....... যে ক্ষেত্রে লিখিত সংবিধান দেশের সর্বোচ্চ আইন এবং বিচারকদের ঐ সংবিধান সংরক্ষণ করকবার শপথ নিতে হয় সেক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবেই বিচার বিভাগের অধিকার আছে আইনসভার প্রণীত আইনের বৈধতা বিচার করার এবং ঐ আইন সংবিধান বিরোধী হলে তাকে বাতিল করে দেবার।"

যুক্তরাষ্ট্রীয় সাংবিধানিক প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা সুপ্রিমকোর্টই করবে—এর অর্থ এটাই জাতীয় সংবিধান সব কিছুর উর্দ্ধে, আইন এবং সরকারি কাজকর্ম সংবিধান মেনেই চলবে বিচার বিভাগই এটা সুনিশ্চিত করবে।

সংবিধানের স্থায়িত্ব ও জীবনীশক্তিকে নিশ্চিয়তা দান করা বিচার বিভাগেরই কাজ। সুতরাং তার সমকক্ষ হলেও অন্যান্য বিভাগগুলি অর্থাৎ শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের কাজকর্মের সাংবিধানিক যৌক্তিকতা বিচারের অধিকার পরোক্ষে সংবিধানই বিচার বিভাগকে দিয়েছে। মার্কিন সংবিধানের দীর্ঘ ইতিহাসে বিচার বিভাগের এই ক্ষমতার প্রমাণযোগ্যতা ও প্রভাব যুগে যুগে ভিন্নরূপ নিলেও সংবিধান লঙ্ঘনের অভিযোগে সুপ্রিমকোর্ট বহু আইন ও শাসন বিভাগীয় কাজ বাতিল করেছে। সংবিধান ছাড়াও সন্ধি (Treaty), বিধিবদ্ধ আইন (Statute), সাধারণ আইন (Common) এগুলিও আইন বিভাগ বা শাসন বিভাগের কার্যকলাপে মর্যাদা পাবে। সেটা সুনিশ্চিত করাও বিচার বিভাগেরই দায়। সুপ্রিমকোর্টের ওয়াটার গেট সিদ্ধান্ত (Water gate decesion) বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ১৯৭৪ সালে সুপ্রিমকোর্ট রায় দেয় রাষ্ট্রপতি বিচারের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে পারেন না। (Supreme court in United States V. Nixon, 1974)। ইতিপূর্বে ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রপতি স্ট্রুম্যান (President Truman) যখন ইস্পাত কারখানাগুলিকে দখলের আদেশ দেন তখন সুপ্রিমকোর্ট তাকে সংবিধান বিরোধী ঘোষণা করেছে। মার্কিন সংবিধানের ৫ম সংশোধনে (the Fifth Amendment) বলা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি ছাড়া কোনও ব্যক্তিকে জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারবেন না। (No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamours crime, unless on a presentment or indictment of a Grand Jury ... non be deprived of life, liberty or property, whithout due process of law ...” Amendment V) বিচার বিভাগ (সুপ্রিমকোর্ট) দেখে আইনের পদ্ধতি যথাযথ কিনা, আইন স্বাভাবিক ন্যায়ের নীতিকে অনুসরণ করে কিনা। সুপ্রিমকোর্ট যে সবসময় বৈধতা বিচারের ক্ষমতাকে নির্দিষ্ট মানে প্রয়োগ করতে পেরেছে তা নয়। লকনার বনাম নিউ ইয়র্ক (Lochner Vs. New York, 1905) মামলায় সুপ্রিমকোর্ট কাজের সময় নিষিদ্ধ করে নিউ ইয়র্ক রাজ্য যে আইন পাশ করেছিল তাকে নিষিদ্ধ করে। এর তিন বছর পরে আর একটি মামলায় (Muller Vs. Oregon) সুপ্রিমকোর্ট পূর্ব রায় বদল করে ঐ আইনকে বৈধ ঘোষণা করে। আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতা কংগ্রেসের নেই ১৯১৮ সালের এক মামলায় (Hammer Vs. Dagen hart)) এই রায় দিলেও ১৯৪১ সালে অন্য একটি মামলায় (United States V. Darby) সুপ্রিমকোর্ট তার এই রায় উল্টে দিয়ে বলেছে কংগ্রেসের এই ক্ষমতা আছে।

মার্কিন সুপ্রিমকোর্টের বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা ব্যবহারের ক্ষেত্রে আদৌ সংবিধানের আইন সুরক্ষিত হয়েছে কিনা বা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিনা অথবা পরিবর্তিত রাজনীতি বা কায়েমি রাজনৈতিক অর্থনৈতিক স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিনা এ প্রশ্ন পাঠকের মনে উঠতে পারে। কিন্তু মার্কিন সংবিধানের বিচার বিভাগই যে সংবিধানের নিয়ামক, বৈধতা বিচারের ব্যাপক ক্ষমতা যে বিচার বিভাগের আছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

৩১.৪ ভারতের সংবিধান ও বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা

মার্কিন সংবিধন থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা নিয়ে এবং দেশের বাস্তব রাজনৈতিক পরিস্থিতি থেকে অভিজ্ঞতা নিয়েই সংবিধান প্রণেতারা ভারতীয় সংবিধানে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার স্থান কী হবে তা বিচার করেছেন। সম্ভবত বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর এ কথা বিবেচনা করেই বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার যৌক্তিকতাকে তাঁরা অস্বীকার করেন নি আবার এক্ষেত্রে সতর্কতার সঙ্গেই অগ্রসর হওয়া উচিত এ কথা তারা ভেবেছিলেন। মার্কিন

সংবিধানের মতোই বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার কথা সংবিধানে উল্লেখ করা না হলেও ভারতের সংবিধানে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার সুযোগ সীমিতভাবে সুপ্রিমকোর্টের আছে। সংবিধান অনুসারে কেন্দ্র ও রাজ্যের বিবাদ মীমাংসা, সংবিধান সংশোধনের যৌক্তিকতা বিচার, নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ, রাষ্ট্রের মৌলিক চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখা, সংবিধান নির্দিষ্ট সীমা মেনে আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগ কাজ করতে কিনা ইত্যাদি সুপ্রিমকোর্টের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে।

তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো ভারতেও বিচার বিভাগই সংবিধানের নিয়ামক, ভারতে আদালতের বৈধতা বিচারের ক্ষমতা ব্যাপক এ কথা বলা যাবে না। ভারতে এক্ষেত্রে বিচার বিভাগের স্থান ব্রিটিশ সংসদীয় ব্যবস্থা ও মার্কিন বিচার বিভাগীয় প্রাধান্য—এই দুটোর মধ্যবর্তী। ভারতীয় সংবিধানে মার্কিন সাংবিধানিক ব্যবস্থার মতো বিচার বিভাগকে সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া যায় নি তার কারণ সংসদীয় ব্যবস্থায় তা সম্ভব নয়। সংসদীয় ব্যবস্থায় জনপ্রতিনিধিসভা হিসাবে আইনসভার একটি নির্দিষ্ট স্থান বা মর্যাদা আছে। আইনসভার কাছে (যা জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে) মন্ত্রিসভা যৌথভাবে দায়িত্বশীল। দায়িত্বশীল শাসনের নিয়ম মেনে, জনগণের সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে এই ব্যবস্থায় জনপ্রতিনিধিসভা অর্থাৎ আইনসভার প্রাধান্যই স্বীকার করা হয়। ইংল্যান্ডে পার্লামেন্ট প্রণীত আইনই বৈধ। আইনের ত্রুট থাকলে, অপূর্ণতা থাকলে পার্লামেন্ট তাকে সংশোধন করবে, পূর্ণতা দেবে বিচার বিভাগের পার্লামেন্ট প্রণীত আইনকে অবৈধ ঘোষণা করার অধিকার নেই। ইংলন্ডের মতো ভারতেও সংসদীয় ব্যবস্থার এই বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার করা হয়েছে। তবে ইংল্যান্ডে ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে যে অপ্রতিহত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে বা আইনত পার্লামেন্টের উপর বাধানিষেধ স্থাপনের যেমন কোনও ব্যবস্থা নেই, আদালত যেমন পার্লামেন্ট রচিত আইনের বৈধতা সম্পর্কে কোনও প্রশ্নই তুলতে পারে না ভারতে সে রকম কোনও অনমনীয় ধারণা প্রযোজ্য নয়। ভারতে সংসদ ব্রিটেনের সংসদের মতো সীমাহীন সার্বভৌমত্বের অধিকারী নয়, সংসদকে এখানে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার সীমা মেনেই চলতে হয় এবং সংসদ এই সীমারেখা লঙ্ঘন করছে কিনা তা দেখার দায়িত্ব বিচার বিভাগের। মার্কিন বিচার বিভাগের মতো অবাধ কর্তৃত্ব ভারতের বিচার বিভাগের নেই। সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে সংসদেরই আইন প্রণয়নের যে এক্তিয়ার আছে, সংবিধান অনুসারে সংসদের যে সীমাবদ্ধতা আছে—সংসদ, সেই এক্তিয়ার ও সীমা মেনে চলছে কিনা বিচার বিভাগ শুধু এটুকুই দেখবে। সংবিধানে নির্দেশ অমান্য করে আইন প্রণয়ন করলে বিচার বিভাগ তাকে অবৈধ ঘোষণা করবে। আইনসভা প্রণীত আইনের যৌক্তিকতা বিচারের (Reasonableness) অধিকার (যেমন মৌলিক অধিকার বা সংবিধানের মূল কাঠামোর উপর আঘাত এলে) বিচার বিভাগের আছে, কিন্তু এর অর্থ এই নয় ভারতের বিচার বিভাগ আইনসভা প্রণীত আইনের ন্যায্যতা, নৈতিকতা বা নিয়মনিষ্ঠা নিয়ে প্রশ্ন তুলবে। সংবিধান নির্দিষ্ট বাধানিষেধের বাইরে থেকে আইনসভা কোনও কাজ করলে তার বিচারের ভার আদালতের নয়।

ভারতের সংবিধান আদালতের এলাকা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে আবার আদালতের সীমাবদ্ধতা কোথায় সেটাও নির্দিষ্টভাবে ঘোষণা করেছে। পূর্বের এককেই পাঠক জেনেছেন যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত হিসাবে সুপ্রিমকোর্টের মূল ও অনন্য এলাকা আছে, সর্বোচ্চ আপিল আদালত হিসাবে সংবিধান সংক্রান্ত, দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলায় সুপ্রিমকোর্টের রায়ই চূড়ান্ত, নাগরিক অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রেও আদালতের বিশেষ ভূমিকা আছে। আদালত অবমাননা বা আদলতের রায় উপেক্ষা করা সংবিধান অনুসারে গর্হিত অপরাধ। আদালতের পরামর্শ ও অভিমতও যে শাসন বিভাগ নিতে পারে সংবিধানে সে ব্যবস্থাও আছে। আদালত যাতে নির্ভীকভাবে, স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারে তার ব্যবস্থাও সংবিধানে আছে। সংবিধানের ১৩৮ ধারা অনুসারে সুপ্রিমকোর্টের এলাকা যে

বাড়ানো বা সম্প্রসারিত করা যাবে এরকম সম্ভাবনার কথাও সংবিধান উল্লেখ করেছে। তবে সংসদীয় গণতন্ত্রের কাঠামো মেনে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গড়া সংসদীয় ও দায়িত্বশীল শাসনের সাধারণ নিয়ম মেনেই চলবে এদেশের বিচারব্যবস্থা, অকাম্য বিচার বিভাগীয় হস্তক্ষেপ বা বিচার বিভাগীয় অতি-তৎপরতা ভারতের সংবিধানে বাঞ্ছনীয় বা অভিপ্রেত নয় এ কথা মনে রেখেই বিচার বিভাগকে চলতে হবে। সংসদীয় কাঠামোর সীমায় সৃষ্ট বিচার বিভাগ সংসদকে অতিক্রম করে যাবে এটা ঠিক নয়। সংবিধানের অভিভাবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বিচার বিভাগ নিজের প্রাধান্য বা প্রভাব সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করুক সংবিধান এটা চায় নি।

এবার আসুন আমরা দেখি সংবিধান প্রবর্তন হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষেত্রে কী অগ্রগতি ঘটেছে এবং এক্ষেত্রে বাস্তব অবস্থাটি কেমন।

৩১.৪.১ বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা ঃ বাস্তব অভিজ্ঞতা ও অগ্রগতি

বিশিষ্ট আইনজ্ঞ দুর্গাদাস বসু মনে করেন সংবিধান প্রবর্তন হবার পরবর্তীকালের ভারতবর্ষের একটি অসাধারণ কৃতিত্ব হল উচ্চ আদালতগুলির বিচার বিভাগীয় ক্ষমতার প্রয়োগ। তিনি মনে করেন, যতদিন নির্ভীকভাবে এবং কার্যকরভাবে আদালত এই ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারবে, ততদিন ভারতের গণতন্ত্র সুনিশ্চিত থাকবে, নানা দুর্বলতা সত্ত্বেও সংবিধান টিকে থাকবে ("The most remarkable achievement in post constitution India is the exercise of power of judicial review by the superior Courts. So long as this power is wielded by the courts effectively and fearlessly, democracy will remain ensured in India and with all its shortcomings, the constitution will survive." D. Basu)। সুপ্রিমকোর্টে (বা হাইকোর্টে) অধিকার রক্ষার আবেদন এবং কোর্টের লেখ বা আদেশের সংখ্যা প্রমাণ করে ভারতে সীমিত সরকার বা আইনের শাসন (Limited government or Government of laws) বর্তমান। বিগত পাঁচ দশকের খতিয়ান প্রমাণ করে সংবিধান নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনে—শাসন বিভাগের হাত থেকে নাগরিক অধিকার রক্ষায় নিপীড়নমূলক আইনের বিরুদ্ধে এমনকি নিজ সুবিধা বা স্বার্থ রক্ষায় অতি তৎপর আইন বিভাগের হাত থেকে ব্যক্তি বা বিচার বিভাগকে বাঁচাতে সুপ্রিমকোর্টের কৃতিত্ব অবশ্যই উল্লেখ করার মতো। বিচারযোগ্য বিষয়ের নিষ্পত্তিতে বা সাংবিধানিক প্রশ্নের মীমাংসায় বা সংবিধানের চরিত্র বজায় রাখতে এমনকি পরিবর্তিত সামাজিক আর্থিক পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে সংবিধানকে গতিশীল করে তোলার ক্ষেত্রে ভারতের বিচার বিভাগের ভূমিকা কৃতিত্বপূর্ণ। সুপ্রিমকোর্টের কৃতিত্বের খতিয়ান হিসাবে কয়েকটি বিশেষ মামলা ও সুপ্রিমকোর্টের রায়ের কথা এখানে তুলে ধরা হল ঃ

(১) **শঙ্করীপ্রসাদের মামলা (Shankari Prasad V. Union of India, 1952)**—এই মামলায় আবেদনকারীর পক্ষ থেকে যুক্তি ছিল ভারতের সংবিধানে ১৩(২) ধারায় যে 'আইনে'র কথা বলা হয়েছে সেই আইন বলতে সাধারণ আইন এবং সংশোধন উভয়ই বোঝায়। সংবিধানের ১৩ (২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে রাষ্ট্র মৌলিক আইন ক্ষুণ্ণ করে কোন আইন পাশ করতে পারবে না এবং এই আইন পাশ করা হলে তা বাতিল হয়ে যাবে। মামলাটির বিচার করে সুপ্রিমকোর্ট বলেছে 'আইন' বলতে রাষ্ট্রের সাধারণ আইনকেই বোঝায়, সংবিধান সংশোধন নয়। সুপ্রিমকোর্টের রায় ছিল সংসদ সংশোধনের দ্বারা মৌলিক অধিকার সহ, সংবিধানের যে কোনো অংশের পরিবর্তন করতে পারে। এই মামলায় সুপ্রিমকোর্ট সংসদের সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতাকে স্বীকার করেছে।

(২) **গোলকনাথ মামলা (Golaknath Vs. State of Punjab, 1967)**— এই মামলায় সুপ্রিমকোর্টের রায় সংসদের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করেছে। এই মামলার রায়ে ১৩ (২) অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে এর দ্বারা সাধারণ আইন ও সংবিধান সংশোধন উভয়কেই বোঝায়। সুপ্রিমকোর্টের রায় ছিল সংসদ ৩৬৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংবিধান সংশোধন করে মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করতে পারবে না। এই মামলার রায়ে শঙ্করীপ্রসাদ মামলার বিপরীত বক্তব্যই প্রকাশ পেয়েছে।

গোলকনাথ মামলার রায় যে বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল তার প্রতিক্রিয়া হিসাবেই ১৯৭১ সালে সংবিধানের ২৪ এবং ২৫ তম সংশোধন এনে সরকার সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে আইনসভায় ক্ষমতা বাড়াতে তৎপর হয়। কোর্টের তরফে যুক্তি ছিল মৌলিক অধিকারের উপর যখন তখন হস্তক্ষেপ করা যুক্তিযুক্ত নয়। সরকারের তরফে যুক্তি ছিল সরকারের পক্ষে সময়োপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বন বা প্রগতিশীল আইন পাশ করতেই সংবিধান সংশোধন জরুরি। সরকার বিচার বিভাগের বিরুদ্ধে রক্ষণশীলতার যুক্তি এনে বৃহত্তর নাগরিক স্বার্থেই ১৯৭১ সালে ২৪ তম সংশোধন আইন আনে। এই আইনে বলা হয় সংবিধানের যে কোনো অংশের সংশোধন, সংযোজন বা যে কোনো অংশ বর্জন করার ক্ষমতা পার্লামেন্টের আছে। ৩৬৮ ধারা বলে সম্পাদিত সংশোধনের ক্ষেত্রে ১৩ ধারা প্রযুক্ত হবে না। পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে গৃহীত হলে রাষ্ট্রপতি এই বিলে সম্মতি দেবেন। ২৫ তম সংশোধনে সংসদের ক্ষমতা আরও বাড়ানো হল। অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে এই সংশোধনে বলা হল নির্দেশমূলক নীতিকে কার্যকর করার জন্য (৩৯ (খ) ও (গ) ধারা) প্রণীত আইন ১৪ ধারায় সাম্যের অধিকার, ১৯ ধারায় স্বাধীনতার অধিকার এবং ৩১ ধারায় সম্পত্তির অধিকারের বিরোধী হলেও অবৈধ হবে না। বিচার বিভাগের ক্ষমতা সীমিত করে বলা হল আদালতে এই আইনের বৈধতা বিচার করা যাবে না।

(৩) **কেশবানন্দ ভারতীয় মামলা (Keshavananda Bharati V. State of Kerala, 1973)**—এই মামলায় সুপ্রিমকোর্ট পার্লামেন্টের মৌলিক অধিকার সংশোধনের ক্ষমতা স্বীকার করে নিলে সংবিধানের মৌলিক কাঠামো পরিবর্তনের ক্ষমতা নেই বলে রায় দেয়। এই মামলার রায় সংসদের ক্ষমতার প্রসারের যেমন বিরোধিতা করেছে তেমনি, বিচার বিভাগের সংবিধান নির্দিষ্ট ক্ষমতা রহিত করার ব্যবস্থাকে অবৈধ বলে ঘোষণা করেছে।

১৯৭৬ সালে ৪২ তম সংশোধনে সংবিধানের ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়। এই পরিবর্তনের একটি অন্যতম লক্ষ্য ছিল বিচার বিভাগের রায়কে অতিক্রম করা এবং সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের সামগ্রিক ও চরম ক্ষমতাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা। ৩৬৮ ধারা সংশোধন করে নতুন সংশোধনী আইনে (৩৬৮ (৫) ধারা) বলা হয় পার্লামেন্টের সংবিধান সংশোধন ক্ষমতার উপর কোনও বিধিনিষেধ থাকবে না। এ কথাও বলা হয় সংবিধান সংশোধনের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগেই আদালতে কোনও মামলা করা যাবে না। ৪২তম সংশোধনী আইনে ৫৯টি ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল প্রস্তাবনায়

> ***প্রান্তলিপি ঃ*** *৩৯(খ) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে রাষ্ট্রের নীতি হবে যে সমাজের সম্পদ এমনভাবে যেন বণ্টিত হয় যাতে সর্ব সাধারণের মঙ্গল হতে পারে। ৩৯(গ) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে রাষ্ট্রের নীতি এমনভাবে পরিচালিত হবে যাতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিচালনার ফলে মুষ্টিমেয়ের হাতে সম্পদ ও উৎপাদনের উপায়সমূহ পুঞ্জিভূত না হয় ও সাধারণের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে।*

পরিবর্তন, নির্দেশমূলক নীতির সংযোজন ও গুরুত্ববৃদ্ধি করে নীতিগুলিকে মৌলিক অধিকারের উপর স্থান দেওয়া, পার্লামেন্টকে জাতীয় স্বার্থবিরোধী কাজকর্ম বা সংগঠন নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা প্রদান, নাগরিকদের জন্য ১০টি মৌলিক কর্তব্যের উল্লেখ, রাষ্ট্রপতির মন্ত্রিসভার পরামর্শমতো কাজ করার বাধ্যবাধকতা, সুপ্রিমকোর্টের ক্ষমতার পরিবর্তন এবং হাইকোর্টের ক্ষমতা হ্রাস। সুপ্রিমকোর্টের ক্ষমতাকে সীমিত করে দেওয়া হল কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় আইনের ক্ষেত্রে। রাজ্য আইনের সঙ্গে কেন্দ্রীয় আইন যুক্ত থাকলে কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্রেই রাজ্য আইনের বৈধতা বিচারের ক্ষমতা সুপ্রিমকোর্টের থাকবে। কেন্দ্র বা রাজ্য আইনের বৈধতা বিচার করার ক্ষেত্রে কমপক্ষে সাতজন বিচারপতির উপস্থিতি আবশ্যক করা হল। একথাও বলা হল মোট বিচারপতির দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন ছাড়া সংশ্লিষ্ট আইনকে অবৈধ ঘোষণা করা যাবে না।

৪৩তম ও ৪৪তম সংবিধান সংশোধন আইনে (১৯৭৮) অবশ্য ৪২তম সংশোধনের আদেশগুলি বাতিল করে সংবিধানে পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে আনা হয়। ৪৪ তম সংশোধন আইনে অবশ্য কয়েকটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকারের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া, জরুরি অবস্থা ঘোষণার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কিছু শর্ত পূরণ করা, জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার মৌলিক অধিকার (সংবিধানের ২০ ও ২১ ধারা) বাতিলের ক্ষেত্রে সরকারের উপর সীমা আরোপ। রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিতর্ক মেটাতে সুপ্রিমকোর্টকে ক্ষমতা দান এবং হাইকোর্টের বন্দি প্রত্যক্ষীকরণ ধরনের লেখ জারির ক্ষমতাকে বহাল করা।

(৪) **মিনার্ভা মিল মামলা (Minerva Mills V. Union of India, 1980)**— মিনার্ভা মিল মামলায় ১৯৭৩ সালের কেশবানন্দ ভারতী মামলার রায়কেই সুপ্রিমকোর্ট সমর্থন করে। এই মামলায় সুপ্রিমকোর্ট মূল সংবিধান বিচার বিভাগকে যে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দিয়েছিল তাকেই ফিরিয়ে আনার পক্ষে রায় দেয়। ৪২তম সংশোধনের ৪ ধারায় (Section A) বলা হয়েছে নির্দেশমূলক নীতিকে রূপায়িত করার জন্য মৌলিক অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করার হলেও তা বৈধ হবে এবং আদালতে এই আইন নিয়ে প্রশ্ন তোলা যাবে না। মিনার্ভা মিল মামলার রায়ে ৪২তম সংশোধনের ৪ ধারাকে অবৈধ ঘোষণা করে বলা হয়েছে, আদালতের বিচারের ক্ষমতাকে রহিত করার এই সংশোধন সংবিধানের মৌল বৈশিষ্ট্যকে ক্ষুণ্ণ করেছে। ৪২ তম সংশোধনে সংসদের সংবিধান সংশোধনের অবাধ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার এবং আদালতের ক্ষমতা হ্রাস করার যে প্রচেষ্টা ছিল এই মামলার রায়ে সুপ্রিমকোর্ট তাকেও সংবিধানের মৌল কাঠামোর বিরোধী বলে অবৈধ ঘোষণা করেছে।

সংবিধান চালু হবার প্রথম ১৫ বছর পর্যন্ত বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার উদ্যোগ তেমনভাবে চোখে পড়ে না। সম্ভবত এর একটা বড় কারণ এই পর্বে সংবিধানের মূল চরিত্র বা কাঠামো নিয়ে প্রশ্ন ওঠেনি এবং পার্লামেন্ট ও বিচার বিভাগরে মধ্যে সংবিধান নিয়ে তেমন একটা বিতর্ক সৃষ্টি হয়নি। এই পর্বে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে মৌলিক অধিকারের উপর বাধানিষেধ আরোপ বা রাষ্ট্রের ক্ষমতা (পার্লামেন্টের এক্তিয়ার) বাড়াবার প্রচেষ্টা হলেও (এক্ষেত্রে প্রথম (১৯৫১), চতুর্থ (১৯৫৫), ষোড়শ (১৯৬৩) সংশোধন উল্লেখযোগ্য) সংবিধান সংশোধনের গতি ছিল ধীর এবং মূল সংবিধানের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যও ব্যাহত হয়নি। সুপ্রিমকোর্টও এই পর্বে পার্লামেন্টের সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন নি। শঙ্করীপ্রসাদ মামলার (১৯৫১) বা সজ্জন সিং মামলায় (Sajjan Singh V. State of Rajasthan, 1964) সুপ্রিমকোর্টের রায় পার্লামেন্টের পক্ষেই ছিল। দুটি যুদ্ধ এবং এই

পরিস্থিতিতে জরুরি অবস্থার প্রয়োগে ও মৌলিক অধিকারের উপর বাধা আরোপের উপযোগিতাকে এই সময়ে সাধারণভাবে অস্বীকার করা হয়নি।

১৯৬৭ সালের পরবর্তী সময় থেকেই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটতে থাকে। কেন্দ্রে ও রাজ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতার নব বিন্যাস, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের নতুন গতি, আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন দেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন আনে তার পরিপ্রেক্ষিতে সংবিধানের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণকে কেন্দ্র করে বিতর্ক ওঠে। সংবিধানের ১৩ ও ৩৬৮ ধারার ব্যবহার ও বিশ্লেষণ নিয়ে বিশেষ বিতর্ক শুরু হয়। ৩৬৮ ধারা অনুসারে পার্লামেন্ট সংবিধান সংশোধনের অধিকার আনুষ্ঠানিকভাবে লাভ করলেও এই অধিকারের প্রয়োগ করে পার্লামেন্টের বার বার সংবিধান সংশোধনের প্রবণতা বা সংবিধান সংশোধন করে নাগরিকের মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করার প্রবণতা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। পার্লামেন্টের এই ঝোঁকটি সংবিধানের পক্ষে ক্ষতিকর, সংবিধানের মূল কাঠামোর উপর আঘাত মনে করেই বিচার বিভাগ এগিয়ে এসেছে সংবিধানের চরিত্র বজায় রাখতে। বিচার বিভাগ শুধুমাত্র সংবিধান সংশোধনের পদ্ধতিগত ক্ষেত্রের (Procedural matters) লঙ্ঘন নিয়েই প্রশ্ন তোলেনি, পার্লামেন্টের সংবিধান সংশোধন আইন সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্যকে ক্ষুণ্ণ করেছে, সংবিধানের স্থায়ী চরিত্রকে ক্ষুণ্ণ করেছে—এ অভিযোগে পার্লামেন্টকে সীমিত করার প্রয়োজন মনে করেছে। গোলকনাথ মামলা (১৯৬৭) এবং এর পর একে একে কেশবানন্দ ভারতী মামলা (১৯৭৩), রাজস্থান রাজ্য বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন (১৯৭৭) মামলা, মিনার্ভা মিল মামলা (১৯৮০), এস. আর বোম্মাই বনাম ভারত রাষ্ট্র মামলা (১৯৯৪), কাউল বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন (১৯৯৫) মামলায় সুপ্রিমকোর্টের রায় পার্লামেন্টের ক্ষমতায় অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে বিচার বিভাগের প্রতিক্রিয়াকে ব্যাক্ত করে। কোর্টের বিচারে (১) সংসদকে সংবিধানের বাধানিষেধ মেনে চলতে হবে। (২) সংসদ যদি সংবিধানের ধারাকে প্রয়োগে তৎপরতা না দেখায়, তবে আদালতই প্রগতিশীল সমাজের চাহিদা মেনে সংবিধানের গতিশীলতা বজায় রাখবে। (৩) আদালতই হল সংবিধানের এক এবং চূড়ান্ত ব্যাখ্যাকার। (৪) সংবিধানের আদর্শকে বাস্তবায়িত করা সংবিধানকে রক্ষা করাই এর কাজ।

বিগত পাঁচ দশকে বিচার বিভাগ তার সংবিধান নির্দিষ্ট দায়িত্বকেই কৃতিত্বের সঙ্গে পালন করার চেষ্টা করেছে। বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার একটি অভিনব ঝোঁক হল বিচার বিভাগের সক্রিয়তা (Judicial Activism)। অধিকাংশ সংবিধান বিশেষজ্ঞ বিশেষতঃ বিচারক এইচ আর খান্না (H. R. Khanna), ননী পাল্কিওয়ালা (N. Palkhiwala), বি. আর. গজেন্দ্রগদকর (B. R. Gajendragadkhar), পি. এন. ভাগবতী (P. N. Bhagabati), দুর্গাদাস বাসু (Durga Das Basu) বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা ও বিচার বিভাগের সক্রিয়তার পক্ষে বলেছেন।

বিচার বিভাগের তৎপরতার একটি কারণ হতে পারে আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মতো এরও সাংবিধানিক মর্যাদা আছে এবং বিচার বিভাগের দায়িত্বও বড় কম নয়। সুশাসন বা গণতান্ত্রিক শাসনের প্রসারে বিচার বিভাগের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজনীয়। **দ্বিতীয়ত,** সংবিদানের ব্যাখ্যাকর্তা ও অভিভাবক হিসাবে সংবিধানের বিরোধী ও ক্ষতিকর শক্তিকে বাধা দেওয়া বিচার বিভাগের নৈতিক দায়িত্বও বটে। ক্ষমতায় অপব্যবহার হলে, সাংবিধানিক নিয়মে বাধা এলে, নৈতিকতা ও মূল্যবোধহীন রাজনীতি সংসদীয় গণতন্ত্র ও সংবিধানতন্ত্রের গতিকে রুদ্ধ করলে বিচার বিভাগকে নীরব থাকলে চলে না। দুর্নীতি ও অপশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে সাধারণ মানুষ আদালতের প্রার্থী হয়। জনস্বার্থেই বিচারের বাণী, ন্যায়দণ্ড উদ্যত। তৃতীয়ত, পরিবর্তিত সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিচার বিভাগেরগ নতুন দায়-দায়িত্ব আছে। বিচার ব্যবস্থার মান বৃদ্ধি, ন্যায় বিচারের বাধা অপসারণ, বিচার পদ্ধতির সংস্কার এসব প্রয়োজন এই নতুন দায়িত্বকে সফলভাবে পালন করার

জন্যই। ১৯৮২ সালে Judges Case এ বিচার ব্যবস্থাকে নব বিন্যস্ত করার আহ্বান করা হয়েছে বিচার বিভাগের দায়িত্ব ও উদ্যোগকে স্বাগত জানাতেই।

তবে বিচার বিভাগের পর্যালোচনা বা অতি-সক্রিয়তার (Over activism) প্রবণতাটি বিপজ্জনকও বটে। সংসদীয় গণতন্ত্রে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি, দায়বদ্ধ সরকার বড় না কয়েকজন বিশিষ্ট আইনজ্ঞকে নিয়ে গড়ে ওঠা বিচার বিভাগ বড়—এ প্রশ্নে বিতর্ক থাকবেই। তবে কতকগুলি ক্ষেত্রে বিচার বিভাগের হস্তক্ষেপ বা অনধিকার চর্চার বিরোধিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। একটি অভিযোগ হল সুপ্রিমকোর্ট সংবিধান রক্ষায় নামে রক্ষণশীলতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে, সংসদকে আর্থিক সামাজিক অধিকার কার্যকর করার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করছে এটা অভিপ্রেত নয়। দ্বিতীয়ত সংসদকে যদি বাধা নিষেধ মানতে হয় তবে আদালতের উপরও কিছু বাধানিষেধ বা নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত। পার্লামেন্টীয় স্বেচ্ছাচার অকাম্য কিন্তু বিচার বিভাগীয় হঠকারিতাও অবাঞ্ছনীয়। রাজনীতির স্বার্থে সংবিধানের যথেচ্ছ ব্যবহার সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে শুভ নয় আবার সংবিধান আইনজ্ঞের স্বর্গ (Lawyer's Paradise) হয়ে উঠুক এটাও ভারতীয় গণতন্ত্রের পক্ষে শুভ নয়। দুর্গাদাস বসু যথার্থই বলেছেন, গোলাপের যেমন কাঁটা আছে ভারতের সংবিধানতন্ত্রের ফুল বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার তেমনি কাঁটা আছে। বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার পক্ষে সুপ্রিমকোর্ট অভিনব নানা তত্ত্ব, 'মূল কাঠামো', 'মূল বৈশিষ্ট্য', 'ভাবীকালের উপযোগী বিচার' (Prospective Overruling)' 'অগণিত মৌলিক অধিকার' (unenumerated fundamental right) উপস্থিত করেছে, সংবিধানে যার কোনও ভিত্তি নেই ("If a rose has its thorns, so must Judicial Review—the flower of Indian constitutionalism,—have its thorns, as has been deminstrated by the fact that, during the last decade our Supreme Court has been evolving novel doctrines, such as that of basic structure or basic features or prospective overruling, unenumerated fundamental rights—the foundation for which is not apparent on the face of the constitution."—D. Basu)। দুর্গাদাস বসু মনে করেন বিচার বিভাগের এই প্রবণতা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন অন্যথা এটি দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সংশয় ও অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করবে, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগের তিক্ততা বাড়াবে এবং এই ক্ষমতা বাড়তে বাড়তে কোথায় যে এর সীমা তা অজানাই থেকে যাবে। পরিস্থিতি হয়তো এমনই হবে যে বিচার বিভাগই তার পরিবর্তন বা সংশোধন চাইছে, অথচ সংবিধান সংশোধনের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ পার্লামেন্টের এক্তিয়ারে।

৩১.৫ সারাংশ

বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা বলতে বোঝায় বিচার বিভাগের সেই ক্ষমতা যা বিচার বিভাগকে সংবিধান অনুসারেই আইন বিভাগ বা শাসন বিভাগের কাজের বৈধতা বিচার করতে সাহায্য করে। ভারতে সুপ্রিমকোর্টের এই ক্ষমতা আছে তবে তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদালতের মতো অতটা ব্যাপক নয়। গণপরিষদের অস্থায়ী কমিটির সভায় সুপ্রিমকোর্টকে এই ক্ষমতা দেবার পক্ষে বলা হয়। কে. এম. মুন্সী, আলাদি কৃষ্ণস্বামী আয়ার এই ক্ষমতার পক্ষে বিশেষভাবে সওয়াল করেন। গণপরিষদের কেন্দ্রীয় সংবিধান কমিটি অবশ্য এ ব্যাপারে সতর্কভাবে অগ্রসর হবার কথাই চিন্তা করেন। মার্কিন সংবিধানের সুপ্রিমকোর্টের বৈধতা বিচারের ক্ষমতা সংবিধানের স্পষ্টভাবে বলা না হলেও মার্কিন সংবিধানের প্রকৃতিতেই এই ক্ষমতার অস্তিত্ব আছে। সংবিধানই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বোচ্চ আইন এবং সংবিধান বিরোধী হলেই বিচার বিভাগ আইন বিভাগ বা শাসন বিভাগের কাজকে অবৈধ ঘোষণা করবে,

অন্য কোনও কারণে নয়।১৮০৩ সালে মাররাবী বনাম ম্যাডিসন মামলায় প্রধান বিচারপতি মার্শাল সুপ্রিমকোর্টের বৈধতা বিচারের ক্ষমতার যৌক্তিকতা কোথায় তা দেখান। সংবিধান লঙ্ঘনের অভিযোগে সুপ্রিমকোর্ট আইনসভা প্রণীত আইন বা শাসন বিভাগের কাজকে বাতিল করেছে মার্কিন শাসনব্যবস্থার ইতিহাসে তার বহু সাক্ষ্য আছে।

মার্কিন সংবিধানের মতই ভারতেও সংবিধানের কোথাও স্পষ্টভাবে বিচার বিভাগের বৈধতা বিচারের ক্ষমতার কথা বলা না হলেও, বিচার বিভাগ এই ক্ষমতা সীমিতভাবে ভোগ করে। ভারতের পার্লামেন্টীয় ব্যবস্থার রীতি মেনেই এখানে একদিকে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সংসদের কাছে দায়বদ্ধ সরকার শাসন পরিচালনায় উপযুক্ত ভূমিকা নেবে—এই ব্যবস্থা কার্যকর হয়। অন্যদিকে আইনবিভাগ ও শাসন বিভাগ যাতে সংবিধান সম্মতভাবে তাদের ভূমিকা পালন করে তা দেখার দায়িত্ব দেওয়া হয় বিচার বিভাগের হাতে। ভারতের সংবিধান চালু হবার পর থেকেই ভারতের উচ্চ আদালতগুলি এই ক্ষমতার প্রয়োগ করেছে। সংবিধান চালু হবার প্রথম পনের বছর সুপ্রিমকোর্টের এই ক্ষমতা ব্যবহার নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয় নি। ১৯৬৭ সালে গোলকনাথ মামলায় সুপ্রিমকোর্টের রায় সংসদের বিপক্ষে যাওয়ার পর থেকেই বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার প্রশ্নে সংসদ ও আদালতের বিতর্ক সৃষ্টি হয়। গোলকনাথ মামলার প্রতিবন্ধকতা দূর করতে সংসদ সংবিধান সংশোধন করে। সংবিধানের ২৪ ও ২৫তম সংশোধনের যৌক্তিকতা নিয়ে সুপ্রিমকোর্ট প্রশ্ন তোলে কেশবানন্দ ভারতীয় মামলায় (১৯৭৩)। এই মামলার রায়কে অতিক্রম করার জন্য সংসদ ১৯৭৬ সালে ৪২তম সংশোধন আইন পাশ করে। ১৯৮০ সালে সুপ্রিমকোর্ট মিনার্ভা মিল মামলায় এই সংশোধনের কোন কোন অংশ সংবিধানের মৌল বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ করেছে এই রায় দেয়। পরবর্তীকালে ৪৪ তম সংশোধনের মাধ্যমে ৪২তম সংশোধনের অনেকটাই প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। বিগত শতকের ৮০ এবং ৯০ এর দশকে বিচার বিভাগের সক্রিয়াত বা অতি-তৎপরতা ভারতের রাজনীতির একটি প্রবণতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রবণতাটি অবশ্যই বাঞ্ছনীয় নয়, সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে শুভ নয়। তবে বিচার বিভাগের উপর সম্পূর্ণভাবে এর দায় চাপানো যায় না। সংসদ ও শাসন বিভাগকে সংসদীয় গণতন্ত্রকে সুরক্ষিত করতে সংযত হতে হবে, সাধারণ মানুষের আস্থা পেতে আন্তরিকভাবে দায়দায়িত্ব পালন করতে হবে।

৩১.৬ অনুশীলনী

(১) সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে বাক্যটি সম্পূর্ণ করুন।

(ক) বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার কথা ভারতের সংবিধানে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে/হয়নি।

(খ) ভারতের/মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান বিচার বিভাগকে বৈধতা বিচারের ব্যাপক ক্ষমতা দিয়েছে।

(গ) শঙ্করীপ্রসাদ/গোলকনাথ মামলায় সুপ্রিমকোর্ট সংসদের সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতাকে অবৈধ ঘোষণা করেছে।

(ঘ) বিচার বিভাগের সক্রিয়তা বর্তমানে ভারতের রাজনীতির একটি বিশেষ প্রবণতা/স্বাভাবিক প্রবণতা।

(২) দু-একটি বাক্যে প্রশ্নগুলির উত্তর দিন ঃ

(ক) বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা বলতে কী বোঝেন?

(খ) কোন্ মামলায় ৪২তম সংশোধনী আইনকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল?

(গ) বিচার বিভাগের পর্যালোচনার প্রশ্নে ভারতের সংবিধানের অবস্থান কী?

(ঘ) সংবিধানের 'মূল কাঠামো' বলতে কী বোঝায়?

(ঙ) মিনার্ভা মিল মামলায় সুপ্রিমকোর্টের রায় কী ছিল?

(৩) অনধিক ৫০ শব্দে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন।

(ক) সংবিধান সংশোধনে সংসদের ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতে যে সব মামলা উঠেছে তার মধ্যে যে কোনো দুটির মূল বক্তব্য সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(খ) ভারতে বিচার বিভাগীয় অতি-তৎপরতা বলতে কী বোঝায়? দু-একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে আলোচনা করুন।

(গ) ভারতে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার পক্ষে যুক্তি নির্দেশ করুন।

(৪) অনধিক ১৫০টি শব্দে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন।

(ক) বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা বিষয়ে মার্কিন সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(খ) ভারতে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার উপর একটি টীকা লিখুন।

৩১.৭ উত্তরমালা

(১) (ক) বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার কথা ভারতের সংবিধানে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

(খ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান বিচার বিভাগকে বৈধতা বিচারের ব্যাপক ক্ষমতা দিয়েছে।

(গ) গোলকনাথ মামলায় সুপ্রিমকোর্ট সংসদের সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতাকে অবৈধ ঘোষণা করেছে।

(ঘ) বিচার বিভাগের সক্রিয়তা বর্তমানে ভারতের রাজনীতির একটি বিশেষ প্রবণতা।

(২) (ক) বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা বলতে বোঝায় বিচার বিভাগের সেই ক্ষমতা যার বলে বিচার বিভাগ আইন বিভাগ ও সরকারের ক্ষমতা সংবিধান সম্মত কিনা তা বিচার করে।

(খ) মিনার্ভা মিলস (১৯৮০) মামলায় ৪২ তম সংশোধন আইনকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল।

(গ) বিচার বিভাগের পর্যালোচনার প্রশ্নে ভারতীয় সংবিধানের অবস্থান ব্রিটিশ সংসদীয় সার্বভৌমত্ব ও মার্কিন বিচার বিভাগীয় প্রাধান্যের মধ্যবর্তী।

(ঘ) সংবিধানের 'মূল কাঠামো' হ'ল সংবিধানের মূল বিষয়বস্তু অর্থাৎ সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্য যেমন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা, ধর্ম নিরপেক্ষতা, কেন্দ্র-রাজ্য ক্ষমতা বণ্টন ইত্যাদিকে অক্ষুণ্ণ রাখা।

(ঙ) মিনার্ভা মিল মামলায় সুপ্রিমকোর্টের রায় ছিল সংসদ সংবিধান সংশোধনের দ্বারা সংবিধানের মৌল বৈশিষ্ট্যে ক্ষুণ্ণ করেছে এবং অবৈধভাবে আদালতের বিচারের ক্ষমতা (যা সংবিধানের মৌল বৈশিষ্ট্য বলে পরিচিত ক্ষুণ্ণ করেছে।)

৩১.৮ গ্রন্থপঞ্জি

(১) Granville Austin : *The Indian Constitution : Cornerstone of a Nation (1966).*

(২) Durga Das Basu : *Introduction to the Constitution of India (1999).*

(৩) S. N. Ray : *Judicial Review and Fundamental Rights (1974).*

(৪) M. V. Pylee : *Constitutional Government in India (1965).*

(৫) S. L. Sikri : *Indian Government and Politics (1989).*

একক ৩২ ❒ হাইকোর্ট ঃ গঠন ও ভূমিকা

গঠন

৩২.১ উদ্দেশ্য

৩২.২ প্রস্তাবনা

৩২.৩.১ হাইকোর্টের গঠন, বিচারপতিদের নিয়োগ, কার্যকাল, যোগ্যতা ইত্যাদি

৩২.৩.২ হাইকোর্টের বিচারপতিদের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা

৩২.৪ হাইকোর্টের কার্যাবলি

৩২.৪.১ হাইকোর্টের ভূমিকা

৩২.৫ সারাংশ

৩২.৬ অনুশীলনী

৩২.৭ উত্তরমালা

৩২.৮ গ্রন্থপঞ্জি

৩২.১ ❒ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি—

- রাজ্যের বিচারব্যবস্থার প্রকৃতি বিষয়ে জানতে পারবেন।
- হাইকোর্টের গঠন, বিচারকদের নিয়োগ পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- হাইকোর্টের ক্ষমতা ও ভূমিকা কী তা বিচার করতে পারবেন।

৩২.২ প্রস্তাবনা

বর্তমান পর্যায়ের আগের দুটি এককের আলোচনা থেকে আপনারা জেনেছেন ভারতের বিচারব্যবস্থা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দ্বৈত শাসনের নীতি মেনে দ্বৈত বিচারব্যবস্থার (Dual Judiciary) কোনও ধারা প্রবর্তন করেনি। ভারতবর্ষে রাজ্যে যে আদালত আছে তা এদেশের অখণ্ড বিচারব্যবস্থারই (Integrated Judiciary) অঙ্গ। ভারতের সংবিধানে অখণ্ড বিচারব্যবস্থার শীর্ষ বিচারালয় সুপ্রিমকোর্টের পরেই হাইকোর্টের স্থান। সংবিধানে হাইকোর্টের গঠন, এলাকা ইত্যাদি স্থির করে দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের বিচারপতিদের নিয়োগ, অপসারণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে কেন্দ্রের হাতেই ব্যাপক ক্ষমতা আছে। হাইকোর্ট বিষয়ে পার্লামেন্ট প্রয়োজনীয় সংশোধন হয়েছে এবং এ প্রশ্নে সংবিধানবিদ ও রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক হয়েছে। রাজ্যের আদালতের ক্ষেত্রেও বিচারকদের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সংবিধানের হাইকোর্টের দায়িত্ব-এলাকা বা দায়িত্ব নির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে।

এক্ষেত্রে সুপ্রিমকোর্টের সঙ্গে হাইকোর্টের এলাকার পার্থক্য আছে। সুপ্রিমকোর্টের মতো হাইকোর্টের মূল এলাকা নেই। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত হিসাবে সুপ্রিমকোর্টই দায়িত্ব পালন করে। হাইকোর্টের অবশ্য আপিল এলাকা, আদেশ নির্দেশ বা লেখ জারির ক্ষমতা আছে। অভিলেখ আদালত হিসাবে (Court of Record) এবং নীচের আদালতগুলির তত্ত্বাবধায়ক হিসাবেও হাইকোর্টের কাজ আছে। এ ছাড়া সুপ্রিমকোর্ট হাইকোর্টকে প্রয়োজনে কিছু কিছু ক্ষমতা স্থানান্তর (Transfer) করতে পারে।

৩২.৩ মূল আলোচনা

ভারতের বিচারব্যবস্থাকে অখণ্ড বিচারব্যবস্থা হিসাবে দেখা হলেও এই বিচারব্যবস্থায় কাঠামো দুটি স্তরে বিভক্ত ঃ উচ্চ আদালত এবং অধীনস্থ আদালত। উচ্চ আদালতের মধ্যে পড়ে সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্ট। গণপরিষদের বিতর্কে উচ্চ আদালত হিসাবে সুপ্রিমকোর্টের ভূমিকা বা বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার প্রশ্নটি যতটা গুরুত্ব পেয়েছে রাজ্যের আদালত হিসাবে হাইকোর্টের এলাকা কি হবে বা এর ভূমিকা কী—এই প্রসঙ্গ তেমনভাবে আলোচনায় আসেনি। তবে সংবিধান প্রণেতারা যে সুপ্রিমকোর্টের অনুপূরক (Supplementary) হিসাবেই হাইকোর্ট সম্পর্কিত ব্যবস্থার কথা সংবিধানে চেয়েছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। খসড়া সংবিধানের বিচারসংক্রান্ত ধারায় সুপ্রীমকোর্টের এলাকা, যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রশ্নে বা নাগরিক অধিকার রক্ষায় সুপ্রিমকোর্টের যুক্ত হওয়া বা ভারতের বিচারব্যবস্থার প্রশাসনিক বিষয় (বিচারকদের নিয়োগ, কার্যকাল, সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি) নিয়েই বিস্তরিত বলা হয়েছে এবং সুপ্রিমকোর্টের ধারাগুলিকেই হাইকোর্টের ক্ষেত্রে মোটামুটি অনুসরণের কথা বলা হয়েছে। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারালয় গঠনের প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সংবিধান কমিটি, প্রাদেশিক সংবিধান কমিটি, সাপ্রু কমিটি সুপ্রিমকোর্টের সঙ্গে হাইকোর্টের প্রসঙ্গও বিচার বিবেচনা করেছে সামগ্রিকভাবে, বিচারব্যবস্থার অখন্ডতা বা একরূপতা ধারার কথা মাথায় রেখেই। ইউনিয়ন সংবিধান কমিটির সুপারিশে বা প্রাথমিকভাবে খসড়া সংবিধানে হাইকোর্টের উল্লেখ ছিল না। ১৯৪৮ সালের নভেম্বরে খসড়া সংবিধান উপস্থিত করার সময় ড. বি. আর. আম্বেদকর, শা'দুল্লাহ (Saadulla) এন.এম. রাও এবং খসড়া সংবিধানের অন্যান্য বিশিষ্ট সদস্যবৃন্দ হাইকোর্ট বিষয়ে কিছু সংশোধনী এনে সুপ্রিমকোর্টের মতোই হাইকোর্টের গঠন ও এক্তিয়ার বিষয় ধারাগুলিকে সমান মর্যাদা দেবার প্রস্তাব করেন। ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বরে খসড়া সংবিধানে হাইকোর্ট বিষয় প্রস্তাব ও ধারাগুলি গৃহীত হয়। অখণ্ড বিচারব্যবস্থার ধারাকে মেনে নিয়েই সংবিধানে হাইকোর্টের স্থান নির্ধারিত হয়।

এবার আসুন আমরা দেখি হাইকোর্টের গঠন বিষয়ে সংবিধানের ব্যবস্থা হাইকোর্টের গঠনগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংবিধানের ধারাগুলি কী বলেছে।

৩২.৩.১ হাইকোর্টের গঠন, বিচারপতিদের নিয়োগ, কার্যকাল, যোগ্যতা ইত্যাদি

ভারতীয় সংবিধান অনুসারে হাইকোর্টের গঠনসংক্রান্ত বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ ঃ

(ক) প্রত্যেক রাজ্যে একটি করে হাইকোর্ট থাকবে (২১৪ ধারা)। তবে পার্লামেন্ট দুই বা ততোধিক রাজ্যের জন্য একটি সাধারণ হাইকোর্টের ব্যবস্থা করতে পারে (২৩১ ধারা)। বর্তমান ভারতের ২৫টি অঙ্গরাজ্যে ও ৭টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ১৮টি হাইকোর্ট আছে। নীচের সূচিতে হাইকোর্টের নাম,

সৃষ্টির বছর, এলাকা ও হাইকোর্ট কোথায় অবস্থিত এক নজরে তার একটি চিত্র শিক্ষার্থী পাঠকের পরিচিতির জন্য হাজির করা হল ঃ

নাম	সৃষ্টির সময়কাল	এলাকা	অবস্থান স্থল
এলাহাবাদ	১৮৬৬	উত্তরপ্রদেশ	এলাহাবাদ (লক্ষ্ণৌ বেঞ্চ সহ)
অন্ধ্রপ্রদেশ	১৯৫৪	অন্ধ্রপ্রদেশ	হায়দ্রাবাদ
বোম্বাই	১৮৬২	মহারাষ্ট্র, দাদরা ও নগর হাভেলি, গোয়া, দমন ও দিউ	বোম্বাই (নাগপুর, পানাজী ও আওরঙ্গাবাদ বেঞ্চ সহ)
কলকাতা	১৮৬২	পশ্চিমবঙ্গ এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	কলকাতা (পোর্টব্লেয়ার সার্কিট বেঞ্চ সহ)
দিল্লী	১৯৬৬	দিল্লী	দিল্লী
গুয়াহাটি	১৯৪৮	আসাম, মণিপুর, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড ত্রিপুরা, মিজোরাম ও অরুণাচল প্রদেশ	গুয়াহাটি (কোহিমা বেঞ্চ ও ইম্ফল, আগরতলা ও শিলং এর বেঞ্চ সহ)
গুজরাট	১৯৬০	গুজরাজ	আমেদাবাদ
হিমাচল প্রদেশ	১৯৭১	হিমাচল প্রদেশ	সিমলা
জম্মু ও কাশ্মীর	১৯৫৭	জম্মু ও কাশ্মীর	শ্রীনগর ও জম্মু
কর্ণাটক	১৮৮৪	কর্ণাটক	বাংগালোর
কেরালা	১৯৫৬	মধ্যপ্রদেশ	জব্বলপুর (গোয়ারিয়র ও ইন্দোর বেঞ্চ সহ)
মাদ্রাজ	১৮৬২	তামিলনাড়ু ও পণ্ডিচেরি	মাদ্রাজ
উড়িষ্যা	১৯৪৮	উড়িষ্যা	কটক
পাটনা	১৯১৬	বিহার	পাটনা (রাঁচি বেঞ্চ সহ)
পঞ্জাব ও হরিয়ানা	১৯৬৬	পঞ্জাব, হরিয়ানা ও চণ্ডীগড়	চণ্ডীগড়
রাজস্থান	১৯৫০	রাজস্থান	যোধপুর (জয়পুর বেঞ্চ সহ)
সিকিম	১৯৭৫	সিকিম	গ্যাংটক

উৎস ঃ D. D. Basu : Introduction to the Constitution of India (1990)

(খ) প্রত্যেক হাইকোর্ট প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্যল যে কজন বিচারপতি রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করা প্রয়োজন মনে করবেন সেই কজন বিচারপতি নিয়ে গঠিত (২১৬ ধারা)।

(গ) বিচারপতিগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। হাইকোর্টের বিচারপতি নিয়োগের সময় রাষ্ট্রপতি ভারতের প্রধান বিচারপতি এবং রাজ্যপালের সঙ্গে পরামর্শ করেন। অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গেও পরামর্শ করতে হয় * (২১৭ ধারা)।

(ঘ) হাইকোর্টের কাজের চাপ বৃদ্ধি পেলে (বা কাজ জমে থাকলে) রাষ্ট্রপতি অনধিক দুবছরের জন্য অতিরিক্ত বিচার (additional Judges) নিয়োগ করতে পারেন (২২৩ ধারা)। আবার প্রধান বিচারপতির পদ শূন্য হলে বা প্রধান বিচারপতি বা অন্য বিচারপতির অনুপস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি সাময়িকভাবে বিচারক (acting judges) নিয়োগ করতে পারেন (২২৪ ধারা)। স্থায়ী বিচারক কাজে যোগ দেবার পূর্ব পর্যন্ত সাময়িক বিচারকদের কাজ চালিতে যেতে হয়। অবশ্য ৬২ বছর বয়সের পর অতিরিক্ত বা সাময়িক বিচারক নিজ পদে কাজ করতে পারেন না।

(ঙ) বিচারপতিগণ ৬২ বছর পর্যন্ত পদে বহাল থাকেন। স্থায়ী অতিরিক্ত বা সাময়িক বিচররপতির পদ নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে শূন্য হতে পারে ঃ (১) তিনি যদি স্ব ইচ্ছায়, লিখিতভাবে রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগ পত্র পেশ করেন। (২) সুপ্রিমকোর্টের বিচারক হিসাবে যদি তাঁকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন বা অন্য হাইকোর্টে বদলি করেন (৩) অসদচারণ বা অসামর্থ্যের জন্য তিনি যদি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পদচ্যুত হন। বিচারপতির বয়স সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন উঠলে তার মীমাংসা রাষ্ট্রপতি করবেন সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের সঙ্গে পরামর্শ করে।

সংসদের প্রত্যেক পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যার অধিকাংশ এবং উপস্থিত ও ভোটপ্রদানকারী সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশের সমর্থনে বিচারপতির অপসারণের আবেদন রাষ্ট্রপতির কাছে এলে রাষ্ট্র অসদাচরণ এবং অসামর্থ্যের কারণে সংশ্লিষ্ট বিচারপতিকে পদচ্যুত করতে পারেন। হাইকোর্টের বিচারকদের পদচ্যুতির ব্যবস্থা সুপ্রিমকোর্টের বিচারকদের মতোই। ভোটাভুটির বিচারপতির অপসারণের একটি প্রস্তাব লোকসভায় কমপক্ষে ১০০ জন সদস্য বা রাজ্যসভার ৫০ জন সদস্যের স্বাক্ষরসহ রাষ্ট্রপতির কাছে যাবে স্পিকার বা চেয়ারম্যানের মাধ্যমে। সুপ্রিমকোর্টের ২ জন বিচারক ও ১ জন বিশিষ্ট আইনজ্ঞের এক কমিটি বিচারপতি অসদাচরণ ও অসামর্থ্যের বিষয়টি অনুসন্ধান করে একটি রিপোর্ট দিলে তবেই তার পদচ্যুতির জন্য সংসদে ভোটাভুটি হবে। সংবিধানে ২১৭(১) ধারা এবং বিচারক অনুসন্ধান আইন (১৯৬৮) মিলিত পদ্ধতিই হাইকোর্টের বিচারপতির পদচ্যুতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

(চ) সংবিধানের ৫৪ তম সংশোধন আইন (১৯৮৬) অনুসারে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারপতির বেতমন মাসে যথাক্রমে ৯০০০ এবং ৮০০০ টাকা। এ ছাড়া বিচারপতিরা অন্যান্য সুযোগ সুবিধা, অধিকার ও ভাতা পাবেন। সংসদ আইন দ্বারা এইসব সুযোগ সুবিধা স্থির করে দেবে। বিচারকদের পক্ষে অসুবিধা সৃষ্টি করে এইসব সুযোগসুবিধা ভাতা ইত্যাদির পরিবর্তন করা যাবে না (২২১ ধারা)। হাইকোর্টের বিচারপতিদের বেতন ও ভাতার জন্য ব্যয় রাজ্যের সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য (charged upon the consolidated fund of the State), অর্থাৎ এই ব্যয় বিধানসভার বাৎসরিক অনুমোদন সাপেক্ষ ব্যয় নয়।

(ছ) হাইকোর্টের বিচারপতি পদে নিয়োগের যোগ্যতা হল—(১) ভারতীয় নাগরিকত্ব, (২) অন্তত ১০ বছর ভারতের বিচার বিভাগের কোনও পদে অধিষ্ঠিত থাকা অথবা অন্তত ১০ বছর হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট হিসাবে বা দুই বা ততোধিক হাইকোর্টে একাদিক্রমে ১০ বছর অ্যাডভোকেট হিসাবে কাজ করার অভিজ্ঞতা (২১৭ (২) ধারা)।

সুপ্রিমকোর্টের মতো হাইকোর্টেও যাতে কোন বিশিষ্ট আইনজ্ঞকে (রাষ্ট্রপতির মতে) বিচারক হিসাবে নিয়োগ করা যায় সেইজন্য সংবিধানে ৪২তম সংশোধনে (১৯৭৬) একটি আইন আনা হয়েছিল। ৪৪তম সংবিধান সংশোধনে (১৯৭৮) এই আইন প্রত্যাহার করা হয়েছে।

(জ) সুপ্রিমকোর্টের মতো হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতিদের ওকালতি করা নিষিদ্ধ হয়েছে। সংবিধানের ২২০ ধারায় বলা হয়েছে সংবিধান প্রবর্তিত হবার পর কোন হাইকোর্টের বিচারপতি পদে নিযুক্ত ছিলেন এমন কোনও ব্যক্তি সুপ্রিমকোর্ট বা হাইকোর্ট ছাড়া অন্য আদালতে বা কর্তৃপক্ষের সামনে ওকালতি করতে পারবেন না।

(ঝ) সংবিধানের ২২২ ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি হাইকোর্টের কোনও বিচারপতিকে অন্য হাইকোর্টে স্থানান্তর (Transfer) করতে পারেন। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিচারককে তাঁর প্রাপ্য বেতন ও ভাতার সঙ্গে ক্ষতিপূরণ বাবদ অতিরিক্ত ভাতা (compensatory allowance) দিতে হবে (যতদিন পর্যন্ত পার্লামেন্ট এ বিষয়ে আইন করে কিছু স্থির করে)।

পরবর্তী আলোচনায় হাইকোর্টের বিচারপতিদের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা সম্পর্কে শিক্ষার্থী পাঠক কিছু ধারণা করতে পারবেন।

৩২.৩.২ হাইকোর্টের বিচারপতিদের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা

ভারতের সংবিধানে সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের মতো হাইকোর্টের বিচারপতিদের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা (Independence and Impartiality) বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। গণপরিষদের সদস্যরা বিচার বিভাগকে অধিকার ও ন্যায়বিচারের দুর্গ (Judiciary as a bastion of rights and Justice) বলেই বিবেচনা করেছেন এবং কেমনভাবে এই দুর্গকে ব্যক্তিস্বার্থ বা কায়েমি স্বার্থের হাত থেকে রক্ষা করা যায় সে কথা ভেবেছিলেন। গণপরিষদের সদস্যরা বিশেষ সতর্ক ছিলেন রাজনীতির এলাকা থেকে বিচার বিভাগকে বাইরে রাখতে। সংবিধানের ধারা দিয়েই তাঁরা এই দুর্গকে অক্ষত রাখতে চেয়েছেন। প্রাথমিকভাবে তাঁদের লক্ষ্য ছিল বিচারব্যবস্থার প্রশাসনিক দিকের প্রতি অর্থাৎ বিচারকদের কার্যকাল, বেতন, ভাতা, অবসরের বয়স এবং বিশেষভাবে তাঁদের নিয়োগ পদ্ধতির উপরই তাঁরা গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এই সমস্ত রুটিন মাফিক বিষয়গুলি ছাড়াও তাঁদের লক্ষ্য ছিল সরকারের ভিতরকার ও বাইরের শক্তির চাপ বা প্রভাবের হাত থেকে বিচার বিভাগকে রক্ষা করা। পি. এন. সাপ্রুর (P. N. Sapru) নেতৃত্বে গঠিত কমিটির রিপোর্ট এ ব্যাপারে গণপরিষদের সদস্যদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। বর্তমান সংবিধানে গৃহীত বিচারকদের নিয়োগ, বেতন, অপসারণ ইত্যাদির প্রশ্নে সাপ্রু কমিটির সুপারিশকেই গণপরিষদের সদস্যরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এ ব্যাপারে গণ পরিষদের অস্থায়ী কমিটির ভাবনা ছিল ভিন্ন। সাপ্রু কমিটি দলীয় রাজনীতি বা চাপের ঊর্ধ্বে রাখতে বিচারকদের নিয়োগ, ভাতা ইত্যাদির ব্যাপারে নির্দিষ্ট সাংবিধানিক আইন (Fixed Constitutional) প্রবর্তনের পক্ষে ছিল। অস্থায়ী কমিটি একটি বিচার বিভাগীয় আইন (Judiciary Act) দ্বারা বিচারকদের স্বাধীনতা বজায় রাখা সম্ভব বলে মনে করেছে। অবশ্য এ. কে. আয়ার, প্যাটেল, আয়েঙ্গার (M. A. Ayyangar) প্রমুখের মতামত ও সংশোধনও এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব পায়।

সুপ্রিমকোর্টের মতোই হাইকোর্টের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখতে সংবিধান বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ

(ক) একটি বিশেষ পদ্ধতির আশ্রয়েই হাইকোর্টের বিচারপতিদের অপসারণ করা যাবে। সংবিধানের ২১৮ ধারা অনুসারে এ ব্যাপারে পার্লামেন্টের নির্দিষ্ট কক্ষ ন্যূনতম সদস্যের স্বাক্ষর সহ প্রস্তাব সভার স্পিকার বা চেয়ারম্যানের কাছে রাখবে। এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে হাইকোর্টের বিচারপতির অসামর্থ্য বা অসদাচরণের বিষয়ে একটি কমিটি অনুসন্ধান করবে। পার্লামেন্টের উভয়সভার বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বিচারপতিকে পদচ্যুত করার প্রস্তাব গৃহীত হলে সংশ্লিষ্ট বিচারপতিকে রাষ্ট্রপতি অপসারণ করবেন।

(খ) হাইকোর্টের বিচারপতিদের বেতন ও ভাতা রাজ্যের সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য অর্থাৎ এর জন্য আইনসভার অনুমোদনের দরকার নেই (২০২(৩) (খ) ধারা)।

(গ) নিয়োগের পর আর্থিক জরুরি অবস্থার সময় ছাড়া বিচারকদের স্বার্থহানি করে তাদের প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা, ভাতা ইত্যাদির পরিবর্তন করা যায় না (২২১ ধারা)।

(ঘ) সংবিধানের ২২০ ধারায় বলা হয়েছে সংবিধান প্রবর্তিত হবার পর কোনও হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন এমন কোনও ব্যক্তি সুপ্রিমকোর্ট বা অন্য হাইকোর্ট ছাড়া অন্য কোনও আদালতে ওকালতি বা কাজ করতে পারবেন না।

বিচারকদের স্বাধীনতা সংবিধানগতভাবে কোনও কোনও দিক থেকে সুরক্ষিত হলেও হাইকোর্টের নিরপেক্ষতা সুনিশ্চিত হয়েছে এ কথা বলা যাবে না। গণপরিষদে আলাদি কৃষ্ণস্বামী আয়ার বলেছিলেন প্রাদেশিক রাজনীতির এলাকা থেকে দূরে রাখতে সংবিধান হাইকোর্টের উপর কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে চেয়েছে। এ কথাও ঠিক মার্কিন বিচারব্যবস্থার মতো রাজ্যের আদালত ব্যবস্থাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত থেকে পৃথক বা স্বাধীন রাখার কোনও ইচ্ছা ভারতের সংবিধান প্রণেতাদের ছিল না। হাইকোর্ট ভারতের রাজ্য আদালতের শীর্ষে অবস্থান করলেও হাইকোর্ট এদেশের অখণ্ড বিচারব্যবস্থার অংশ এবং ক্ষেত্রবিশেষে সুপ্রিমকোর্টের নিয়ন্ত্রণাধীন। সংবিধানে হাইকোর্টের উপর একাধিক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। এগুলি হল ঃ (ক) বিচারক নিয়োগ, বদলি ও অপসারণের ক্ষেত্রে এবং বিচারকদের বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিতর্ক দেখা দিলে কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ লক্ষণীয়। হাইকোর্টের বিচারকদের নিয়োগ, বদলি ও অপসারণের সিদ্ধান্ত কার্যকর হয় রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে। কেন্দ্রের আইনসভাই হাইকোর্টের বিচারপতিদের অপসারণের প্রস্তাব নেবে সংবিধানের ২২২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে রাষ্ট্রপতি বিচারকদের এক আদালত থেকে অন্য আদালতে বদলি করতে সমর্থ। এক্ষেত্রে তিনি ভারতের প্রধান বিচারপতির সম্মতি নিতে পারে। তবে এই সম্মতি গ্রহণ বাধ্যতামূলক নয়। (খ) হাইকোর্ট সৃষ্টি, হাইকোর্টের সংগঠন, দুই বা ততোধিক রাজ্যের জন্য একটি হাইকোর্ট গঠন বা হাইকোর্টের এলাকা বৃদ্ধি বা কমিয়ে দেবার ক্ষমতা পার্লামেন্টের।

হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারককে দু'বছরের অধিক রাখা বা অতিরিক্ত বিচারককে স্থায়ী করে নেওয়ার ব্যবস্থা, হাইকোর্টের বিচারকদের বয়স নির্ধারণের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্তই শেষ কথা বা হাইকোর্টের বিচারকদের বদলির ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত হাইকোর্টের নিরপেক্ষতাকে ক্ষুণ্ণ করে বলে অভিযোগ (খ) ৪২ তম সংবিধান সংশোধনে হাইকোর্টের ক্ষমতা ও স্বাধীনতাকে বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে। ভারতের আইন কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে হাইকোর্টের নিয়োগ পদ্ধতি ধর্মীয়, আঞ্চলিকতা, সাম্প্রদায়িকতার ঊর্দ্ধে নয়। ১৯৮১

সালে বিচারক সংক্রান্ত মামলার (Judge's Case) রায়ে হাইকোর্টের স্বাধীনতা, মর্যাদা বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। হাইকোর্টের বিচারপতিরা সুপ্রিমকোর্ট বা হাইকোর্ট ছাড়া অন্য কোনও আদালতে ওকালতি করতে পারবেন না এই ব্যবস্থাটি তাঁদের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার প্রতিকূল। অবসর গ্রহণের পর তাঁরা রাজনৈতিক, কূটনৈতিক পদে নিযুক্ত হতে পারেন অথচ অন্য আদালতে ওকালতি করতে পারেন না—এই ব্যবস্থা রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতাকে (Political patronage) প্রশ্রয় দেয় বলেও অনেকে মনে করেন।

এককের পরবর্তী অংশের আলোচনা হাইকোর্টের কার্যাবলি ও ভূমিকা।

৩২.৪ হাইকোর্টের কার্যাবলি

সুপ্রিমকোর্টের মতো অতটা স্পষ্টভাবে না হলেও সংবিধানে হাইকোর্টের কাজ কী তার উল্লেখ আছে। সংবিধানের বলা হয়েছে সংবিধান কার্যকরী হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে হাইকোর্টের যে সব অধিকার (বা ক্ষমতা) ছিল এখনও হাইকোর্ট সেই ক্ষমতাই ভোগ করবে। রাজ্যের হাইকোর্টের ক্ষমতা তার ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ হলেও পার্লামেন্ট আইন করে তা সম্প্রসারিত করতে পারে। সাধারণভাবে হাইকোর্টের সাংবিধানিক ক্ষমতাগুলি হল ঃ

(১) কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ হাইকোর্টের মূল দেওয়ানি মামলা বিচারের ক্ষমতা আছে। ১৯৭৩ সালের ফৌজদারি দণ্ড বিধি আইন (Criminal Procedure Code, 1973) অনুসারে হাইকোর্টের মূল ফৌজদারি ক্ষমতা নিষিদ্ধ হয়েছে।
নগর দেওয়ানি আদালতের (City Civil Court) হাতে দেওয়ানি মামলার দায়িত্ব থাকলেও, হাইকোর্ট উচ্চমূল্যের মামলাগুলির বিচার করে।

(২) দেওয়ানি ও ফৌজদারি—এই দুটি ক্ষেত্রে হাইকোর্টের আপিল এলাকা বর্তমান। দেওয়ানি ক্ষেত্রে হাইকোর্টে কোনও আপিল হলে তা হবে প্রথম বা দ্বিতীয় আপিল। জেলা বিচারকদের সিদ্ধান্ত এবং অধস্তন বিচারকদের অধিক মূল্যের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আইনগত বা ঘটনাগত প্রশ্নে আপিল করা চলে।

(৩) অধস্তন কোনও আদালত যদি তার নীচের কোনও আদালতের মামলায় মীমাংসা করে তবে তার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে দ্বিতীয়বার আপিল করা যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে আইন বা পদ্ধতিগত প্রশ্নেই হাইকোর্টে আপিল করা যাবে।

(৪) এলাহাবাদ, বোম্বাই, কলকাতা, মাদ্রাজ, পাটনা হাইকোর্টে আপিল করবার ক্ষমতা স্বত্বের (letters patent) ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থা অনুসারে হাইকোর্টে এক বিচারক বেঞ্চের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টেই আপিল করা যায়।

(৫) ফৌজদারি ক্ষেত্রে দায়রা বিচারক বা অতিরিক্ত দায়রা বিচারকের (Session Judge or Additional Session Judge) এমন কোনও রায়ের বিরুদ্ধে, যেখানে ব্যক্তিকে সাত বছরের বেশি সময়ের জন্য কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে, হাইকোর্টে আপিল করা চলে। এ ছাড়া বিশেষ কোনও মামলায় যেখানে সহকারী দায়রা বিচারক, মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট বা অন্য কোনও বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করা চলে।

(৬) হাইকোর্ট তার অধীনস্থ সব বিচারালয় ও ট্রাইব্যুনালের (Tribunal) উপর পর্যবেক্ষতের ভূমিকা পালন করতে পারে। হাইকোর্ট অধীনস্থ বিচারালয়ের কাছে রিটার্ন চাইতে পারে, তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার, অন্যায় বিচার ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিচারের সংশোধন চাইতে পারে; পুস্তক, নথিপত্র, হিসাবপত্র কীভাবে রাখতে হবে তার নির্দেশ দিতে পারে (২২৭ ধারা)। পরিবহন কর্তৃপক্ষ ভাড়া নিয়ন্ত্রক (Rent-controller) এবং অন্যান্য প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের উপরও হাইকোর্টের তদারকী ক্ষমতা আছে।

(৭) সংবিধানের ২২৬ ধারা অনুসারে হাইকোর্ট মৌলিক অধিকার রক্ষার্থে আদেশ, নির্দেশ, লেখ জারি করতে পারে। হাইকোর্টের বন্দি প্রত্যক্ষীকরণ, পরমাদেশ, প্রতিষেধ, অধিকার পৃচ্ছা, উৎপ্রেষণ—এই ধরনের লেখ, আদেশ বা নির্দেশ জারির অধিকার আছে।

(৮) সুপ্রিমকোর্টের মতোই রাজ্যের হাইকোর্ট অভিলেখ আদালত (Court of Record)। এই অর্থে হাইকোর্টে সমস্ত নথিপত্র রাখা হয়। এবং তা সাক্ষ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। নিজের অবমাননার জন্য হাইকোর্ট শাস্তি দিতে পারে (২১৫ ধারা)।

(৯) সমস্ত অধীনস্থ আদালতের উপর হাইকোর্টের নিয়ন্ত্রণ আছে। জেলা বিচারকদের নিয়োগ, কাজের স্থান নির্বাচন, পদোন্নতির ব্যাপারে রাজ্যপাল হাইকোর্টের পরামর্শ নেন (২৩৩ ধারা)। রাজ্যের বিচার বিভাগীয় কৃত্যকে (জেলা বিচারক বাদে) নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্যপাল রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সাথে হাইকোর্টেরও পরামর্শ নেবে (২৩৪ ধারা)। জেলা আদালত এবং তার নীচের আদালতগুলির নিয়োগ, পদোন্নতি ছুটির আবেদন ইত্যাদির ক্ষেত্রেও হাইকোর্টের নিয়ন্ত্রণ আছে (২৩৫ ধারা)।

(১০) হাইকোর্টের একটি প্রশাসনিক কাজও আছে। এটি হল কোর্টের কর্মচারী নিয়োগ এবং তাদের কাজ ও কাজের শর্তাবলি সম্পর্কিত নিয়মকানুন স্থির করা।

১৯৭৬ সালে ৪২ তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে পার্লামেন্ট কতকগুলি ক্ষেত্রে হাইকোর্টের ক্ষমতা সংকুচিত করতে চেয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—(১) হাইকোর্ট কোনও কেন্দ্রীয় আইনের বৈধতা বিচার করতে পারবেন না; (২) কমপক্ষে ৫ জন বিচারপতির উপস্থিতি ছাড়া হাইকোর্ট রাজ্য আইনের বৈধতা বিচার করতে পারবেন না; (৩) কেবলমাত্র বৈধ আইন অমান্য করা হলে বা কর্তৃপক্ষের পদ্ধতিগত অবৈধ আচরণের জন্য ক্ষতি হলে এবং প্রতিবিধানের অন্য ব্যবস্থা না থাকলে হাইকোর্ট লেখ, আদেশ বা নির্দেশ জারি করতে পারে, অন্য ক্ষেত্রে নয়; (৪) কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের নিয়োগ ও চাকরির শর্ত নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে তার মীমাংসা হবে প্রশাসনিক আদালতে (Administrative Tribunal); পার্লামেন্ট আইন করে এই ধরনের আদালত গঠন করতে পারবে এবং সরকারি চাকরি, রাজস্ব, জমিজমা ইত্যাদির বিরোধ মীমাংসা হবে এই আদালতে।

১৯৭৭ সালে সংবিধানের ৪৩তম সংশোধনে হাইকোর্ট কেন্দ্রীয় আইনের বৈধতা বিচারের ক্ষমতা আবার ফিরে পেয়েছে। ১৯৭৮ সালে ৪৪তম সংবিধান সংশোধনে হাইকোর্টের ক্ষমতার ক্ষেত্রে আবার পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

৩২.৪.১ হাইকোর্টের ভূমিকা

সুপ্রিমকোর্টের মতো হাইকোর্টের ভূমিকা অবশ্যই ততটা শক্তিশালী নয়। রাজ্যের হাইকোর্ট অখণ্ড বিচারব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবেই এবং সুপ্রিমকোর্টের অধীনস্থ আদালত হিসাবেই তার দায়িত্ব পালন করে। হাইকোর্টের রাজ্য আদালত হিসাবে কোনও স্বাধীন ক্ষমতা নেই। হাইকোর্টের উপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের আধিক্য আছে। সবচেয়ে বড় কথা হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত নয়, সুপ্রিমকোর্টের সহায়ক আদালত হিসাবেই হাইকোর্টের ভূমিকা।

হাইকোর্ট সম্পর্কে একটি প্রশ্ন ওঠে। বিচারকের সংখ্যা কম বলে এখানে মামলার নিষ্পত্তি বিলম্বিত হয়। মামলার সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হলেও মামলার নিষ্পত্তির সংখ্যা কম। এর ফলে হাইকোর্টে বহু বকেয়া মামলা জমে থাকছে। অধিকাংশ হাইকোর্টের বিচারকার্য সম্পাদনে তৎপরতার অভাব লক্ষণীয়। হাইকোর্টের বিতর্কিত সিদ্ধান্ত ও ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে দ্বিধাগ্রস্ততা নিয়েও রাজনৈতিক মহলে অভিযোগ আছে। হাইকোর্টের বিচারকদের নিয়োগ ও বদলির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভিযোগ এনে বলা হয় এর ফলে হাইকোর্টের বিচারকার্যে নিরপেক্ষতা থাকে না। নাগরিক অধিকার রক্ষায় বা প্রশাসনিক কাজের বিরুদ্ধে ন্যায় বিচারের প্রতিষ্ঠায় রাজ্যের হাইকোর্টের কৃতিত্ব তেমন একটা চোখে পড়ে না। তবে পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে রাজ্যের বিচারালয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার সক্রিয়তার পরিচয় রেখেছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে হাইকোর্টের হস্তক্ষেপকে বিচারালয়ের অতি-সক্রিয়তা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচন বিতর্ক নিয়ে এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রতিক্রিয়া, উত্তরপ্রদেশে সাংবিধানিক নিয়ম রক্ষার স্বার্থে এলাহাবাদ হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ বা পশ্চিমবঙ্গ সহ বিভিন্ন রাজ্য জনস্বার্থবাহী বিভিন্ন মামলা গ্রহণে হাইকোর্টের আগ্রহ রাজ্যস্তরে হাইকোর্টের তৎপরতার পরিচয় বহন করে।

৩২.৫ সারাংশ

হাইকোর্ট ভারতের অখণ্ড বিচারব্যবস্থার একটি অঙ্গ। রাজ্যের শীর্ষস্থানীয় আদালত বা উচ্চ আদালত বলে পরিচিত হলেও সুপ্রিমকোর্টের সহকারী আদালত হিসাবেই একে দায়িত্ব পালন করতে হয়। সংবিধান অনুসারে প্রত্যেক রাজ্যে একটি করে হাইকোর্ট থাকবে বলা হলেও পার্লামেন্ট আইন করে দুই বা ততোধিক রাজ্য এবং রাজ্যসংলগ্ন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য একটি হাইকোর্টের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রত্যেক হাইকোর্টের একজন প্রধান বিচারপতি প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারপতি থাকবেন। রাষ্ট্রপতিই বিচারপতিদের নিয়োগ করেন, তবে অন্যান্য বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে ভারতের প্রধান বিচারপতি ও রাজ্যপালের সঙ্গে তিনি পরামর্শ করেন। রাজ্যের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গেও তিনি পরামর্শ করতে পারেন। হাইকোর্টে অতিরিক্ত বিচারপতি, সাময়িক বিচারপতি নিয়োগের ব্যবস্থা আছে। পার্লামেন্টে বিশেষ পদ্ধতি মেনে বিচারপতিদের অপসারণ করা যায়। সংবিধানে বিচারপতিদের বয়স ও যোগ্যতা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

সংবিধানে বিচারপতিদের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার কথাও বলা হয়েছে। বিচারপতিদের অপসারণ ব্যবস্থা, আর্থিক সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা আছে বিচারপতিদের নিরপেক্ষতার স্বার্থেই। তবে অতিরিক্ত বিচারপতি নিয়োগ বা বিচারকের বদলির ব্যবস্থা হাইকোর্টের স্বাধীনতার পরিপন্থী বলেই মনে করা হয়।

হাইকোর্টের কোনও মূল এলাকা নেই। অভিলেখ আদালত, আপিল আদালত, অধীনস্ত আদালতের তত্ত্বধায়ক এবং নিয়ন্ত্রক হিসাবেই হাইকোর্ট প্রধানত তার দায়িত্ব পালন করে। ৪২তম সংবিধান সংশোধনে হাইকোর্টের এলাকা খর্ব করা হলেও, ৪৩ ও ৪৪তম সংবিধান হাইকোর্ট তার সংবিধান নির্দিষ্ট পূর্ব ক্ষমতা ফিরে পেয়েছে।

৩২.৬ অনুশীলনী

(১) সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে বাক্যটি সম্পূর্ণ করুন।

(ক) রাজ্যের হাইকোর্টের মূল এলাকা/আপিল এলাকা আছে।

(খ) হাইকোর্টের বিচারপতিরা ৬২/৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত নিজ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

(গ) কলকাতা/দিল্লী/মাদ্রাজ হাইকোর্ট আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের হাইকোর্ট হিসাবে কাজ করে।

(ঘ) হাইকোর্টের বিচারপতিদের অপসারমের প্রস্তাব গৃহীত হয় বিধানসভায়/সংসদে।

(ঙ) ৪২ তম/৪৩ তম/৪৪ তম সংবিধান সংশোধনী হাইকোর্টের ক্ষমতা খর্ব করেছে।

(চ) হাইকোর্ট লেখ বা আদেশ জারি করতে পারে/পারে না।

(ছ) হাইকোর্ট ফৌজদারি মামলার মূল বিচার/আপিল বিচার করে।

(২) একটি অথবা দুটি বাক্যে প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

(ক) হাইকোর্টের বিচারপতিদের কে নিযুক্ত করেন?

(খ) হাইকোর্টের বিচারপতিদের কোন্ অভিযোগে অপসারণ করা যায়?

(গ) হাইকোর্টে অতিরিক্ত বিচারপতি নিয়োগের ব্যবস্থা আছে কেন এবং কতদিনের জন্য?

(ঘ) হাইকোর্টের বিচারকদের বয়স সংক্রান্ত প্রশ্নের মীমাংসা হয় কীভাবে?

(ঙ) হাইকোর্টের বিচারকদের বেতন ও ভাতা কি রাজ্য বিধান সভার অনুমোদনযোগ্য?

(চ) কোন্ অর্থে হাইকোর্ট একটি অভিলেখ আদালত?

(ছ) কোন্ ক্ষেত্রে হাইকোর্ট নিম্নতম আদালতের মামলা নিজের হাতে তুলে নেয়?

(৩) অনধিক ৫০ শব্দে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন।

(ক) হাইকোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগ ও অপসারণ পদ্ধতি আলোচনা করুন।

(খ) হাইকোর্টের বিচারপতিদের যোগ্যতা সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

(গ) ভারতীয় সংবিধানে হাইকোর্টের স্বাধীনতা কীভাবে সুরক্ষিত হয়েছে?

(ঘ) হাইকোর্টের আপিল আদালত হিসাবে ভূমিকা কী সংক্ষেপে লিখুন।

(৪) **অনধিক ১৫০ শব্দে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর সংকেতের সাহায্য নিয়ে উত্তর করুন।**

(ক) হাইকোর্টের গঠনপ্রণালী বর্ণনা করুন।

(খ) হাইকোর্টের ক্ষমতা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩২.৭ উত্তরমালা

(১) (ক) রাজ্যের হাইকোর্টের আপিল এলাকা আছে।

(খ) হাইকোর্টের বিচারপতিরা ৬২ বছর বয়স পর্যন্ত নিজ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

(গ) কলকাতা হাইকোর্ট আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের হাইকোর্ট হিসাবে কাজ করে।

(ঘ) হাইকোর্টের বিচারপতিদের অপসারণের প্রস্তাব গৃহীত হয় সংসদে।

(ঙ) ৪২ তম সংবিধান সংশোধনী হাইকোর্টের ক্ষমতা খর্ব করেছে।

(চ) হাইকোর্ট লেখ বা আদেশ জারি করতে পারে।

(ছ) হাইকোর্ট ফৌজদারি মামলার আপিল বিচার করে।

(২) (ক) হাইকোর্টের বিচারপতিদের রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করেন?

(খ) অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের অভিযোগে হাইকোর্টের বিচারপতিদের অপসারণ করা যায়?

(গ) হাইকোর্টের কাজের চাপ বৃদ্ধি পেলে অতিরিক্ত বিচারপতি নিয়োগ করা যায়। ২ বছরের জন্য অতিরিক্ত বিচারপতি নিয়োগ করা যায়।

(ঘ) হাইকোর্টের বিচারপতিদের বয়স সংক্রান্ত প্রশ্নের মীমাংসা করেন রাষ্ট্রপতি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে।

(ঙ) হাইকোটের বিচারকদের বেতন ও ভাতা রাজ্য বিধান সভার অনুমোদনযোগ্য নয়।

(চ) অভিলেখ আদালত হিসেবে হাইকোর্ট নথিপত্র রক্ষা করে এবং তা সাক্ষ্যপ্রমাণের জন্য ব্যবহার করে। অভিলেখ আদালত হিসাবে হাইকোর্ট নিজ অবমাননার জন্য শাস্তিপ্রদানে সমর্থ।

(ছ) হাইকোর্ট যদি মনে করে মামলার সঙ্গে সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কোনও গুরুত্বপূর্ণ আইনগত প্রশ্ন জড়িত আছে তবে সেক্ষেত্রে নিম্ন আদালতের মামলা নিজেদের হাতে তুলে নিতে পারে।

৩২.৮ গ্রন্থপঞ্জি

(১) Granville Austin : *The Indian Constitution : Cornerstone of a Nation (1966).*

(২) Durga Das Basu : *Introduction to the Constitution of India (1999).*

(৩) B. R. Agarwala : *Our Judiciary (NBT, 1993).*

(৪) M. V. Pylee : *Constitutional Government in India (1965).*

(৫) S. L. Sikri : *Indian Government and Politics (1989).*

একক ৩৩ ❐ অধস্তন বিচারালয় (শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ)

গঠন

৩৩.১ উদ্দেশ্য
৩৩.২ প্রস্তাবনা
৩৩.৩ মূল আলোচনা
৩৩.৩.১ নিম্ন আদালতের গঠন ও কার্যাবলি
৩৩.৩.২ মীমাংসা আদালত বা ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে বিচার
৩৩.৩.৩ বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের পৃথকীকরণঞ্চ
৩৩.৪ সারাংশ
৩৩.৫ অনুশীলনী
৩৩.৬ উত্তরমালা
৩৩.৭ গ্রন্থপঞ্জি

৩৩.১ উদ্দেশ্য

বর্তমান এককটি পাঠ করলে আপনি—

- ভারতের বিচারব্যবস্থার নিম্নতন স্তরের বিচারালয়গুলির গঠন ও অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- নিম্ন বিচারালয়গুলির সাধারণ কার্যাবলি সম্পর্কে পরিচিত হতে পারবেন।
- সাধারণ আদালতের বাইরে অবস্থিত বিভিন্ন মীমাংসা আদালতগুলির (Tribunals) বিচারকার্যে কী ভূমিকা পালন করে সে বিষয়ে কিছু ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের ক্ষেত্রে ভারতে কী ব্যবস্থা আছে বা এ সম্পর্কে বিতর্কটি কি তা বিচার করতে পারবেন।

৩৩.২ প্রস্তাবনা

ভারতের অখণ্ড বিচারব্যবস্থার সর্বনিম্নস্তরে আছে বিভিন্ন নিম্ন বা অধস্তন আদালত। উচ্চস্তরে সুপ্রিমকোর্ট বা হাইকোর্ট এবং নিম্নস্তরে বিভিন্ন দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচারালয় নিয়েই ভারতের অখণ্ড বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত। যদিও বিকেন্দ্রীকরণের সাধারণ নীতি মেনেই নিম্ন আদালত ও স্থানীয় স্তরে বিচার নিষ্পত্তির ব্যবস্থা এদেশে আছে, সংবিধানের নির্দেশমতো স্থানীয় আদালতগুলির উচ্চ আদালত হাইকোর্টের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি মতোই কাজ করে। বর্তমান এককের আলোচনায় নিম্নস্তরে দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচারালয়গুলি কীভাবে সংগঠিত হয়, এই বিচারালয়গুলি বিবাদ মীমাংসা বা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কী দায়িত্ব পালন করে, স্থানীয় স্তরে

বিচারব্যবস্থা স্তরে স্তরে কীভাবে বিন্যস্ত তার একটি স্পষ্ট ধারণা শিক্ষার্থী পাঠক ভাবেন। অল্প মূল্যের মামলা বা ক্ষুদ্র মামলার বিচারের উদ্দেশ্যেই এই বিচারালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত। জেলা জজ, সাবজজ, মুন্সেফ ইত্যাদির দেওয়ানি বিচারকার্যে এবং দায়রা জজ, ম্যাজিস্ট্রেট ইত্যাদিরা ফৌজদারি বিচারকার্যে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে।

প্রসঙ্গত ভারতে বিভিন্ন মীমাংসা আদালতগুলির (Tribunals) এলাকা কী বা এগুলির গুরুত্ব কী সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় আলোচনা করা হবে। বিভিন্ন শিল্প ও প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালগুলি সম্পর্কেই এই অংশে সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে।

বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করা যায় কিনা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। ভারতের সংবিধানে প্রশ্নটি নির্দেশমূলক নীতি পর্যায়ে গুরুত্ব লাভ করেছে এবং কমবেশি প্রায় সব রাজ্যেই শাসন বিভাগের এলাকা থেকে বিচার বিভাগের এলাকাকে পৃথক করার ব্যবস্থা হয়েছে। নিম্ন আদালতগুলির গঠন ও কাজকর্ম সম্পর্কে বিবরণ ও ব্যাখ্যা দিয়েই শুরু হচ্ছে বর্তমান এককের মূল আলোচনা।

৩৩.৩ মূল আলোচনা

৩৩.৩.১ নিম্ন আদালতের গঠন ও কার্যাবলি

বর্তমান পর্যায়ের প্রথম এককে ভারতের অখণ্ড বিচারব্যবস্থার কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শিক্ষার্থী পাঠকের একটি সাধারণ ধারণা হয়েছে। শিক্ষার্থী পাঠক জেনেছেন ভারতের অখণ্ড বিচারব্যবস্থার সর্বোচ্চে আছে সুপ্রিমকোর্ট এবং এর পরে ক্রমপর্যায়ে আছে হাইকোর্ট ও নিম্ন আদালতগুলি (Subordinate Courts)। অধস্তন নিম্ন আদালতগুলি হাইকোর্টের নিয়ন্ত্রণে এবং অধীনে কাজ করে। গ্রামে ও শহরে বিভিন্ন দেওয়ানি ও ফৌজদারী বিচার-নিষ্পত্তির কাজে নিযুক্ত রয়েছে এই সমস্ত নিম্ন আদালতগুলি। অধস্তন বিচারালয়গুলির দিকে লক্ষ রাখলে বোঝা যাবে আমাদের দেশের বিচারব্যবস্থা কতটা ব্যাপক ও প্রসারিত।

ভারতের সংবিধান ২৩৩ থেকে ২৩৭ ধারায় নিম্ন আদালতগুলির সংগঠন ও কাজকর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে। সংবিধানে নিম্নতন আদালত বলতে সাধারণভাবে জেলা বিচারকের আদালত কথাটিই ব্যবহৃত হয়েছে। জেলা বিচারক বলতে সংবিধানে নগর দেওয়ানি আদালতের বিচারক (Judge of a city Civil Court), অতিরিক্ত জেলা জজ বা বিচারক (Additional district Judge), সহকারী জেলা বিচারক (Assistant district judge), ছোট মামলার আদালতের বিচারক (Judge of a small cause court), প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট (Chief Presidency Magistrate), দায়রা জজ (Session Judge), অতিরিক্ত দায়রা জজ (additional session Judge), এবং সহকারী দায়রা জজ (assistant session Judge) সমস্ত স্তরের বিচারকদেরই বোঝানো হয়েছে, (২৩৬ ধারা)। জেলা বিচারকগণ ছাড়া এক শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটও নিম্ন আদালতের কাজের সঙ্গে যুক্ত, সুতরাং তাদের ক্ষেত্রেও সংবিধানের এই অংশের (Chap VI, Part V) ধারাগুলি (২৩৩-২৩৭ ধারা) প্রযোজ্য। সুতরাং অধস্তন বা নিম্ন আদালত বলতে জেলা জজ ও এক শ্রেণির জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের (District Judge and District Magistrate's) আদালতকেই বোঝানো হয়েছে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বলতে বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটকেই বোঝায়।

নিম্নতন বা অধস্তন বিচারালয়গুলিকে দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়—দেওয়ানি আদালত (Civil Court) এবং ফৌজদারি আদালত (Criminal Court)। অধস্তন দেওয়ানি আদালতগুলির নিচ থেকে উপরে বিভিন্ন স্তর

হল পঞ্চায়েত আদালত, মুন্সেফের আদালত, অধস্তন জজের আদালত, জেলা জজের আদালত। কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি মহানগরের জন্য আছে নগর আদালত। অধস্তন ফৌজদারি আদালতগুলির নিচ থেকে উপরে অবস্থান এই রকম—পঞ্চায়েত আদালত, দায়রা জজের আদালত। কলিকাতার মতো মহানগরীতে ফৌজদারি বিচারের জন্য মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট। দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচারালয়গুলির গঠন ও এক্তিয়ারকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা চলে ঃ

ক. দেওয়ানি বিচারব্যবস্থা (Civil Courts) ঃ

(i) **পঞ্চায়েত আদালত (Panchayat Adalat) ঃ** পূর্বে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন আইন (Village self Government Act) অনুসারে দেওয়ানি বিচারের সর্বনিম্ন আদালত ছিল **ইউনিয়ন কোর্ট** (Union Court)। বর্তমানে (সংবিধান চালু হবার পর) রাজ্যের আইন অনুসারে ইউনিয়ন কোর্টের স্থানে গড়ে উঠেছে পঞ্চায়েত আদালত। ন্যায় পঞ্চায়েত (Nyaya Panchayat), গ্রাম কাছারি (Gram Katchery) নামেও কোনও কোনও রাজ্যে এই আদালতগুলি পরিচিত। প্রত্যেক গ্রাম বা একাধিক গ্রামের দেওয়ানি বিচার মীমাংসার জন্য এই আদালত থাকে। সামান্য অর্থের দাবিদাওয়ার মীমাংসা হয় এই আদালতে। সাধারণত এই আদালতের রায় চূড়ান্ত। বিশেষ কারণে এই আদালতের আদেশ বাতিল করে দিতে পারে পরবর্তী উচ্চ দেওয়ানি আদালত মুন্সেফের আদালত।

(ii) **ক্ষুদ্র মামলার আদালত (Small Causes Courts) ঃ** এই আদালতগুলি আছে বড় বড় শহরে। ছোট মামলার বিরোধ নিষ্পত্তির দায়িত্ব এই আদালতের। বিবাদের চূড়ান্ত মীমাংসার ক্ষমতা এই আদালতের থাকলেও হাইকোর্ট আইনের ভুল ব্যাখ্যার কারণে এই আদালতের রায় সংশোধন করতে পারে।

(iii) **মুন্সেফের আদালত (Munsiff's Courts) ঃ** ১০০০ টাকার মূল্যের মামলার (বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন মামলার ক্ষেত্রে ৫০০০ টাকার মূল্যের) বিচার হয় এই আদালতে। এই আদালত আছে মহকুমা ও জেলা শহরে (division and district towns)। মুন্সেফ হলেন এই আদালতের প্রধান বিচারক।

(iv) **অধস্তন জজের আদালত (Subordinate Judges Court) ঃ** এই আদালতের মুন্সেফের আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে প্রথম আপিল বা শুনানীর ব্যবস্থা আছে। এই আদালতে মূল ও আপিল বিচজার এবং বেশি অর্থের দাবিযুক্ত মামলার বিচার হয়।

(v) **নগর আদালত (City Courts) ঃ** কলিকাতা, বোম্বাইয়ের মতো বড় শহরেই এই আদালত আছে। কম মূল্যের দেওয়ানি মামলা বা বিশেষ ধরনের দেওয়ানি মামলার বিচার এই আদালতে হয়। উচ্চ মূল্যের দেওয়ানি মামলার বিচার হয় হাইকোর্টে। নগর আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করা চলে।

খ. ফৌজদারি বিচারব্যবস্থা (Criminal Courts) ঃ

(i) **পঞ্চায়েত আদালত (Panchayat Adalat) ঃ** গ্রামীণ স্বায়ত্বশাসন আইন (Village self Government Act) অনুসারে আগে ফৌজদারি বিচারের সর্বনিম্ন আদালত ছিল বেঞ্চ আদালত (Bench Courts) বর্তমানে রাজ্যের আইন অনুসারে গঠিত পঞ্চায়েত আদালতে (কোন কোন অঞ্চলে এটি ন্যায় পঞ্চায়েত বা কাছারি কোর্ট নামে পরিচিত) ফৌজদারি মামলার বিচারভার অর্পণ করা হয়েছে। পঞ্চায়েত আদালতকে কোনও কোনও রাজ্যে ফৌজদারি মামলার বিচারভার অর্পণ করা

হয়েছে। পঞ্চায়েত আদালতকে কোনও কোনও রাজ্যে ফৌজদারি মামলার সর্বনিম্ন আদালত হিসাবে অভিহিত করা হয়। সামান্য বা অতি সাধারণ মামলাগুলির বিচার হয় এই আদালতে।

(ii) **বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত (Judicial Magistrates Court)** ঃ ১৯৭৩ সালের ফৌজদারি পদ্ধতিগত নিয়মাবলি (Criminal Procedure Code, 1973) অনুসারে জম্মু ও কাশ্মীর বাদে সব রাজ্যেই ফৌজদারি মামলার একচেটিয়া বিচার হবে বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে। অধস্তন আদালত হিসাবে শহরাঞ্চলে বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত আছে। সর্বনিম্ন স্তরে (শহরে) **দ্বিতীয় শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটরা** এই আদালতে বিচার করেন। দ্বিতীয় শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারের বিরুদ্ধে প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটের বিচার বিভাগীয় আদালতে আপিল করা যায়। দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটের (বিচার বিভাগীয়) আদালতের উপরে আছে **দায়রা জজের আদালত** (Sessions Judge's court)। জেলার দায়রা জজ হলেন জেলা জজ (District Judge)। অনেক **জেলায় অতিরিক্ত দায়রা জজ** (additional Sessions Judge) বা **সহকারী দায়রা জজ** (Assistant Sessions Judge) থাকেন। আগে দায়রা জজ বা অতিরিক্ত বা সহকারী দায়রা জজ জুরির সাহায্যে বিচার (Trial by Jury) করতেন। ১৯৭৩৪ সালের ফৌজদারি পদ্ধতিগত নিয়ম বা বিধি অনুসারে জুরির সাহায্যে বিচারের এই ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট বা সহকারী দায়রা জজের রায়ের বিরুদ্ধে দায়রা জজের আদালতে আপিল করা যায়। দায়রা জজের বিচারের বিরুদ্ধে প্রধান বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে (Chief Judicial Magistrates Court) আপিল করা যায়। প্রধান বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট হলে জেলার ফৌজদারি বিচারের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। কলিকাতা ও অন্যান্য মেট্রোপলিটন শহরে ফৌজদারি মামলার বিচারের জন্য আছে মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত (Metropolitan Magistrates Court)। মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বেই এই আদালতে বিচারবিভাগীয় কাজ পরিচালিত হয়। প্রধান বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট বা দায়রা জজের আদালতে হাইকোর্টের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণেই তাদের বিচারবিভাগীয় দায়িত্ব সম্পন্ন করে।

অধস্তন আদালতের গঠন সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য সংবিধানে স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত, অধস্তন আদালতের বিচারকদের নিয়োগ, পদোন্নতি ইত্যাদির ব্যাপারে সংবিধানের ব্যাখা স্পষ্ট। অধস্তন দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতের বিচারকদের (মুন্সেফ, অধস্তন বিচারক, জেলা জজ, দায়রা জজ, অতিরিক্ত দায়রা জজ, বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট, মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট প্রমুখ) নিয়োগ, পদে স্থাপন, পদোন্নতি (Appointment, posting and promotion) হয় রাজ্যপালের নির্দেশ বলে। রাজ্যপাল অবশ্য এক্ষেত্রে হাইকোর্টের পরামর্শ গ্রহণ করেন (২৩৩ (১) ধারা)। অধস্তন আদালতের বিচারকদের যোগ্যতা হল, তারা ইতিমধ্যে কেন্দ্র অথবা রাজ্যে কোন সরকারি পদে যুক্ত থাকবেন না এবং অন্তত ৭ বছরের জন্য অ্যাডভোকেট অথবা ওকালতির কাজে যুক্ত থাকবেন (২৩৩ (২) ধারা)।১৯৬৬ সালে সংবিধানের ২০ তম সংশোধনের মাধ্যমে ২৩৩ ধারার পরিবর্তন করে ২৩৩ ধারা যুক্ত করে জেলাজজ বা বিচারকদের নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি এবং তাদের দেওয়া রায়কে বৈধ করার ব্যবস্থা হয় (Validation of appointment of and judgement delivered by certain district judges)।

দ্বিতীয়ত জেলাল জজ বাদে বিচার বিভাগীয় কৃত্যকে নিযুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিদের নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্যপাল রাজ্যের রাষ্ট্রকৃত্যকে কমিশনের (State Public Service Commission) সঙ্গে পরামর্শ করবেন (২৩৪ ধারা)।

তৃতীয়ত, জেলা আদালত ও তার নিচের আদালতগুলির পদে স্থাপন, পদোন্নতি ইত্যাদি সহ রাজ্যের বিচার বিভাগীয় কৃত্যকে নিযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ন্ত্রণভার ন্যস্ত হয়েছে হাইকোর্টের উপর (সংবিধানের ২৩৫ ধারা)।

৩৩.৩.২ মীমাংসা আদালত বা ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে বিচার

সত্তরের দশক থেকেই ভারতে প্রশাসনিক স্তরে নানা ধরনের বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য প্রশাসনিক আদালত বা ট্রাইব্যুনাল (Administrative Tribunal) নামে এক ধরনের আদালত গড়ে উঠেছে এবং এই আদালতকে দেশের সাংবিধানিক ব্যবস্থার স্থায়ী অংশ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের ৪২তম সংশোধনে (১৯৭৬) একটি পৃথক অংশ (Part XIVA) এবং এই অংশে একটি নতুন ধারা (৩২৩ ক) সংযোজন করে এই প্রশাসনিক আদালতগুলিকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দান করা হয়েছে। সংবিধানের ৩২৩ ক ধারায় বলা হয়েছে পার্লামেন্ট আইনরে মাধ্যমে প্রশাসনিক আদালত গঠন করবে প্রশাসনিক স্তরে (কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি এবং স্থানীয় সরকারি কর্মচারীদের নিয়োগ, চাকরির শর্তাবলি ইত্যাদি বিষয়ে), বিরোধ বা বিবাদ মীমাংসার উদ্দেশ্যে। কেন্দ্রে, প্রত্যেক রাজ্যে বা দুই বা ততোধিক রাজ্যের জন্য এই মীমাংসা আদালত সৃষ্টি, এই আদালতের এলাকা ও ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে দেওয়া, আদালতগুলির নিয়মকানুন, কার্যপদ্ধতি ও সীমা স্থির করে দেওয়া, সুপ্রিমকোর্ট ছাড়া অন্য বিচার বিভাগীয় আদালতকে এই আদালতগুলির এলাকায় হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ করা এবং আদালতগুলির কাজকর্মে গতি আনার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় ব্যবস্থা পার্লামেন্ট আইন করে করতে পারবে বলে সংবিধানে বলা হয়েছে।

সন্দেহ নেই সরকারের কাজের এলাকা যত বেড়েছে তার সঙ্গে গতি রাখতে লকরারের হাতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন এবং বিচার কার্য সম্পাদনের দায়িত্বও ছেড়ে দিয়ে হয়েছে। কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে জনকল্যাণের তাগিদে সরকার ও প্রশাসনের কাজের ক্ষেত্র যেমন বেড়ে যায় তেমনি সরকার ও প্রশাসনের সঙ্গে নাগরিকের বিরোধ বা বিবাদের ক্ষেত্রও সৃষ্টি হয়। কর আদায়, শিল্প পরিচালনা ও মজুরি, বহির্বাণিজ্য, ভূমি সংস্কার, সম্পত্তির সীমাম নির্ধারণ, খাদ্য উৎপাদন ও বণ্টন, আবগারি ও শুল্ক নীতি নানা প্রশ্নেই সরকাবা বা প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নাগরিকের বিরোধ বা বিবাদ সৃষ্টি হতে পারে। সাধারণ বিচারবিভাগীয় আদালতের হাতে এইসব বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষমতা না দিয়ে, প্রশাসনিক স্তরেই এইসব বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা থাকে। বিরোধ নিষ্পত্তির এই ব্যবস্থাকেই বলা হয় মীমাংসা আদালত বা ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে বিচার (Justice by Tribunal)। মীমাংসা আদালতগুলি যেহেতু বিচার বিভাগীয় আদালত নয়, প্রশাসনিক আদালত এবং এদের কাজ যেহেতু বিচার বিভাগের মতো তাই এই আদালতগুলিকে আধা বিচার বিভাগীয় সংস্থা (Auasi-judicial Authority) বলা হয়। এক্ষেত্রে প্রশাসনিক সংস্থা বিচার করে, বিচারের পদ্ধতি ও নিয়ম মেনে তবে বিচার বিভাগীয় পদ্ধতি বা মান এখানে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করা হয় না।

ভারতে ট্রাইব্যুনাল বা মীমাংসা আদালতগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল (Central Administrative Tribunal)। ১৯৮৫ সালের প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল আইন দ্বারা স্থাপিত এই ট্রাইব্যুনালের কাজ হল কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে সরকার বা প্রশাসনের বিবাদের মীমাংসা। এই

ট্রাইব্যুনালের প্রধান বেঞ্চ নতুন দিল্লিতে অবস্থিত। দিল্লি হল এর নির্ধারিত এলাকা। এই ট্রাইব্যুনালের শাখা আছে আমেদাবাদ, এলাহাবাদ, বাঙ্গালোর, কলকাতা, চণ্ডীগড়, কটক, এর্নাকুলাম, গুয়াহাটি, হায়দ্রাবাদ, জব্বলপুর, যোধপুর, মাদ্রাজ, নতুন বোম্বাই ও পাটনায়। রাজ্যেও সরকারি কর্মচারীদের বিবাদ মীমাংসার জন্য প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল আছে। প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের উপর সুপ্রিমকোর্ট ছাড়া অন্য কোনও আদালতের এক্তিয়ার নেই।

শিল্প বিবাদ সম্পর্কিত ট্রাইব্যুনাল (Industrial Tribunal) নির্বাচনী বিবাদ সংক্রান্ত ট্রাইব্যুনাল (Election Tribunal) আয়কর সংক্রান্ত বিবাদ মীমাংসার জন্য ট্রাইব্যুনাল (Income Tax Applellate Tribunal) রেলের ভাড়া ও শুল্ক সংক্রান্ত ট্রাইব্যুনাল (Railway Rates Tribunal) অন্যান্য ট্রাইব্যুনালগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

এই সমস্ত প্রশাসনিক বা অন্যান্য মীমাংসা আদালতগুলি গড়ে ওঠার মূল কারণ—(১) নাগরিক জীবনে সরকারি হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি; (২) প্রশাসনের ক্রমবর্ধমান বৈচিত্র্য ও জটিলতা; (৩) প্রশাসনিক বিবাদের নতুন নতুন ক্ষেত্র (যেমন 'পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন' 'উপযুক্ত ও সঠিক ভাড়া' 'যুক্তিসংগত ব্যবস্থা') ও নতুন নতুন সমস্যা সম্পর্কে সাধারণ আদালতের বিশেষজ্ঞ বা অভিজ্ঞ জ্ঞানের অভাব; (৪) নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি এবং সামাজিক ন্যায় বিচারের দাবি; (৫) দ্রুত বিচার নিষ্পত্তির দাবি; (৬) সহজলভ্য ও কম ব্যয়সাধ্য বিচার; (৭) বিচারক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকতা, জটিলতা ও নিয়মসর্বস্বতার নীতি পরিহার করে সরলতা, নমনীয়তার নীতিকে আহ্বান। প্রশাসনিক বা মীমাংসা আদালত এক অর্থে সাধারণ আদালতের বোঝাকেও হালকা করে।

তবে প্রশাসনিক বিচার বা মীমাংসা আদালতের মাধ্যমে বিচার আজকের দিনে আবশ্যক হলেও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই আদালত কতটা নিরপেক্ষভাবে, দায়িত্বশীলতার সাথে এবং সুনিশ্চিতভাবে বিবাদ মীমাংসার কাজে নিয়োজিত তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। প্রশাসনিক আদালত বা মীমাংসা আদালত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিচার বিভাগীয় আদালত ব্যবস্থার বিকল্প হতে পারে না। আইনের অনুশাসন (Rule of Law), স্বাভাবিক ন্যায় বিচারের নীতি (Principles of Natural Justice), জনমুখী দায়িত্বের নীতির (Public Accountability) দ্বারা এই বিচারালয় উদ্বুদ্ধ নয়। বিচার বিভাগীয় প্রশিক্ষণ বা অভিজ্ঞতা থাকে না বলে এই আদালতের বিচার পূর্ণাঙ্গ নয়। এইসব কারণেই সংবিধানের ১৩৬ ধারায় ট্রাইব্যুনালের বিচারের ঊর্ধ্বে সুপ্রিমকোর্টের বিচারকে স্থান দেওয়া হয়েছে। পূর্বতন অ্যাডভোকেট জেনারেল (Advocate General) এম. সি. শীতলবাদ (M. C. Setalvad) যথার্থই বলেছেন, প্রশাসনিক কাজকর্মের উপর পর্যালোচনার ক্ষেত্রে ঊর্ধ্ব আদালতের অগ্রগণ্যতা না থাকলে তা কখনই জনগণের আস্থাকে জাগ্রত করে না ("Any judicial review of administrative action in which the highest courts of the country are not the predominant authority, would not inspire public confidence." M. C. Setalvad)। আদালতের এলাকাকে সংকুচিত করে প্রশাসনের এলাকা বৃদ্ধির জন্য এদেশে আইন হয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে প্রশাসনিক আদালত—এই প্রবণতা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পক্ষে শুভ নয়। প্রশাসনিক আদালতের আবশ্যিকতা থাকতেই পারে, তবে তাদের খারাপ বা ত্রুটিপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলিকে দূর করতে হবে এবং আইনের অনুশাসন ও বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার অধীনে এনে এই আদালতগুলিকে গঠনমূলক ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।

বর্তমান এককের সর্বশেষ ও বিশেষ কৌতূহলপ্রদ আলোচনা ভারতে বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের পৃথকীকরণের প্রশ্ন।

৩৩.৩.৩ বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের পৃথকীকরণ

ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতি শীর্ষক অংশে (Part IV of the Indian Constitution) রাষ্ট্রের তথা সরকারের প্রতি সংবিধানের একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ নির্দেশ আছে। সংবিধানের ৫০ ধারা বলে এই নির্দেশটি হল 'রাষ্ট্র' সরকারি কার্যকলাপের ক্ষেত্রে বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক রাখতে পদক্ষেপ নেবে ("The state shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public Services of the state" Art 50)। সন্দেহ নেই এটি একটি নির্দেশমূলক নীতি এবং এই নীতি মানার ক্ষেত্রে সরকারের উপর কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। আম্বেদকারের ভাষায় নির্দেশমূলক নীতিগুলি নির্দেশ প্রদানের হাতিয়ার (Instruments of Instruction) মাত্র। নীতিগুলিকে কার্যকর করার জন্য আদালতের মাধ্যমে সরকারকে বাধ্য করা যাবে না। নীতিগুলি রাষ্ট্রের উপর কিছু দায়িত্ব চাপালেও, রাষ্ট্র কেবলমাত্র এই নীতিগুলির ভিত্তিতে কোনও আইন পাশ করতে পারে না। শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক রাখার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের উপর দায়িত্ব দেওয়া হলেও এই নীতিটিকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করার ব্যাপারে রাষ্ট্র তথা সরকারের তরফে তেমন কোনও তৎপরতা লক্ষ করা যায়নি। নীতিটি তাত্ত্বিক ঘোষণার স্তরেই আবদ্ধ ছিল, সাধু সংকল্প হিসাবেই প্রচার পেয়েছিল, কার্যে তেমনভাবে রূপায়িত হয়নি।

রাষ্ট্রকার্যে বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে আলাদা রাখার তাৎপর্য হল—(১) নীতিটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও শাসন কাঠামোর উন্নয়ন ও প্রসারের এক অপরিহার্য শর্ত। বিচার বিভাগ গণতান্ত্রিক শাসনকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত করে। বিচার বিভাগ স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে ভূমিকা পালনের সুযোগ পেলে গণতান্ত্রিক শাসনের উর্বর ক্ষেত্রে প্রশস্ত হবে। (২) বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করা হলে বিচার বিভাগ নাগরিক অধিকার রক্ষায় সচেতনভাবে উদ্যোগী হবে। সামাজিক ও রাজনৈতিক ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে। (৩) সংসদীয় গণতন্ত্রে শাসন বিভাগের বিশ্বাসযোগ্যতা ফিরিয়ে আনতে, দায়িত্বশীল শাসনের প্রসারে শাসন বিভাগকে উদ্বুদ্ধ করতে বিচার বিভাগই বিবেকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে।

সংবিধান চালু হবার পর দীর্ঘকাল এমনকি পরবর্তীকালের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেও বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করা বা বিচার বিভাগরে স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করার তেমন কোনও প্রবণতা ভারতে লক্ষ করা যায়নি। এক্ষেত্রে সরকারের স্লথগতিতার নানা কারণ আছে। **প্রথমত,** সংবিধান প্রণেতারাই চাননি সংসদের সার্বভৌম ইচ্ছার উপর বিচার বিভাগ তার বিচার প্রতিষ্ঠিত করুক। সংবিধানে বিচারকদের নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা হয়নি। বিচারপতিদের আর্থিক সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা হলেও তাঁদের নিরপেক্ষতা ও বিশ্বস্ততাকে সম্পূর্ণভাবে সুনিশ্চিত করা হয়নি। বিচার বিভাগরে উপর শাসন বিভাগীয় নির্দেশ ও প্রভাব অক্ষুণ্ণ আছে। **দ্বিতীয়ত**, সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে নানা সময়ে শাসন বিভাগ বিচার বিভাগের এলাকা তথা ক্ষমতা খর্ব করতে চেয়েছে। ৪২তম সংবিধান সংশোধন বিচার বিভাগের এলাকা তথা ক্ষমতা খর্ব করতে চেয়েছে। ৪২তম সংবিধান সংশোধন বিচার বিভাগের ক্ষমতাকে সংকুচিত করার এক রাজনৈতিক প্রয়াস হিসাবে চিহ্নিত। বিচার বিভাগকে অঙ্গীকারবদ্ধ করার (committed judiciary) রাজনৈতিক প্রচেষ্টাও রাজনীতিকদের তরফে ছিল। **তৃতীয়ত**, বিচার বিভাগীয় আদালতের পাশাপাশি প্রশাসনিক আদালত ও ট্রাইব্যুনাল গড়ে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সাধারণ আদালতের বিচার নিষ্পত্তির ক্ষমতা সংকুচিত করা হয়েছে। আইনের আদালতের সুবিধাজনক বিকল্প হিসাবে বিচার নিষ্পত্তির প্রশাসনিক পদ্ধতি ও

ব্যবস্থা ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ভারতের আইন কমিশন (Law Commission of India) এবং ভারতের আইন প্রতিষ্ঠানের (Indian Law Institute) প্রতিবেদনে এই আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। সরকারের স্ব-বিবেচনামূলক ক্ষমতা, বিচার-নিষ্পত্তির ক্রমবর্ধমান প্রভাব প্রতিপত্তি আইনের শাসনের পক্ষে ক্ষতিকর, বিপজ্জনক প্রবণতা।

ভারতীয় সংবিধানে শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ উভয়েরই এক বিশেষ স্থান আছে। এ কথা ঠিক শাসন বিভাগের অতিরিক্ত প্রভাব বা প্রাধান্য যেমন বাঞ্ছনীয় নয় আবার বিচার বিভাগের অতি সক্রিয়তাও কাম্য নয়। কোনও কোনও মহলে এমন অভিযোগও উঠেছে সামাজিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠানের নামে, জনস্বার্থবাহী মামলার নিষ্পত্তির নামে বিচার বিভাগ সকরার ও প্রশাসনের নিয়ন্ত্রক ও নির্দেশক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্ষমতা বিভাজন নীতিকে লঙ্ঘন করে শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ একে অপরের লোকায় অনুপ্রবেশ করুক, একের এলাকায় অপরের প্রবল অস্তিত্ব বিরাজ করুক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোর স্বার্থেই এটা অভিপ্রেত নয়। সম্ভবত এই কারণেই বিচার ও শাসন বিভাগের পৃথকীকরণের সাংবিধানিক নির্দেশ একটি ত্যন্ত কাম্য ব্যবসস্থা বলে সংবিধান বিশেষজ্ঞ ও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা মনে করেন।

তবে এই নীতিটিকে কার্যকর করার ব্যাপারে রাষ্ট্রের অগ্রগতি বা সাফল্য তেমন একটা নেই। শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের ব্যবস্থা সাংবিধানিকভাবে হয়নি। ৪২ তম সংবিধান সংশোধনের বিচার বিভাগের ক্ষমতা, বিশেষত হাইকোর্টের যে ক্ষমতা সংকোচনের ব্যবস্থা হয়েছিল ৪৩ ও ৪৪ তম সংবিধান সংশোধনের (১৯৭৮) মাধ্যমে সেই ব্যবস্থা বাতিল করা হয়েছে। তবে ৪২ তম সংশোধনে গৃহীত প্রশাসনিক আদালত স্থাপন এবং এই আদালতের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে (সরকারি চাকরি, রাজস্ব, জমিজমা প্রভৃতি) বিবাদ মীমাংসার সাংবিধানিক ব্যবস্থা ৪৪ তম সংশোধনে বাতিল হয়নি। ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রিমকোর্টে আপিলের ব্যবস্থা অবশ্য সংবিধানে স্বীকৃতি লাভ করেছে। প্রশাসনিক আদালতের খামখেয়ালী, অবিবেচনাপ্রসূত, অসলগ্ন বিচারের বিরুদ্ধে আইনের আদালতে প্রতিকার পাওয়া যাবে এই যুক্তিতেই সুপ্রিমকোর্টে প্রশাসনিক আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের ব্যবস্থা আছে। সন্দেহ নেই, সংবিধানের ৪৪ তম সংশোধন বা ১৩৬ ধারা অনুসারে সুপ্রিমকোর্টকে প্রশাসনিক আদালতের উপর রেখে ন্যায় বিচার প্রতিপালনের ব্যবস্থা বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করে এবং কিছুটা পরিমাণে হলেও শাসন বিভাগকে বিচার বিভাগের এলাকা থেকে বিরত রাখতে এবং বিচার বিভাগকে বিচারের কাজে যুক্ত থাকতে সাহায্য করে।

শাসন বিভাগকে বিচার বিভাগের এলাকা থেকে সরিয়ে আনায় সাংবিধানিক ব্যবস্থা ততটা স্পষ্ট নয়, এ ব্যাপারে অগ্রগতিও একান্তই মন্থর। রাজ্যে রাজ্যে এক্ষেত্রে কিছু অগ্রগতি হলেও পদ্ধতিগত বৈচিত্রের দরুন ব্যবস্থাটি গ্রহণে তেমন সাফল্য অর্জিত হয়নি। সম্ভবত এই কারণেই ১৯৭৩ সালে এক্ষেত্রে একটি অখণ্ড বা একরূপ কেন্দ্রীয় আইন এনে শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের ব্যবস্থাকে আংশিকভাবে হলেও কার্যকর করার দরকারি প্রচেষ্টা হয়েছে। ১৯৭৩ সালের ফৌজদারি বিধি (The Criminal Procedure Code, 1973) অনুসারে শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের এলাকা পৃথক করা হয়েছে। এই বিধি অনুসারে জেলাস্তরে ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতার বিভাজন ঘটেছে। পূর্বে মাজিস্ট্রেট শাসন বিভাগীয় ও বিচার বিভাগীয় উভয় ক্ষমতাই ভোগ করতেন। ১৯৭৩ সালের ফৌজদারি বিধি অনুসারে (১) বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট পদটি সৃষ্টি হয়েছে; (২) বিচার বিভাগীয়

ম্যাজিস্ট্রেটকে বিচার বিভাগের অংশ বলে গণ্য করা হয়েছে এবং হাইকোর্টের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে (৩) বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে বিচারকার্য সম্পাদনের দায়িত্ব দান করা হয়েছে এবং (৪) শাসন বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটকে রাজ্য সরকারের অধীনে আনা হয়েছে এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও অপরাধ প্রতিরোধেও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে শাসন বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটকে। (৫) কলিকাতা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজের মতো মেট্রোপলিটান শহরে (প্রেসিডেন্সি শহরে) মেটোরপলিটান ম্যাজিস্ট্রেটের (Metropolitan Magistrates) হাতে ফৌজদারি মামলার নিষ্পত্তির দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে এবং মেট্রোপলিচটান ম্যাজিস্ট্রেটও হাইকোর্টের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রমের অধীন। ১৯৭৩ সালের ফৌজদারি বিধি অনুসারে হাইকোর্টের ফৌজদারি মামলার মূল বিচার হাইকোর্টে হয় না, বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট ও মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতেই ফৌজদারি মামলার মূল বিচার হয়। জেলার ফৌজদারি আদালতের প্রধান হলেন প্রধান বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট (Chief Judicial Magistrate) এবং প্রেসিডেন্সী বা মেট্রোপলিটান শহরের ফৌজদারি আদালতের প্রধান হলেন মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট (Chief Metropolitan Magistrate)।

৩৩.৪ সারাংশ

অধস্তন আদালতগুলি ভারতের অখণ্ড বিচারব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ। ভারতে বিচারবিভাগকে একটি পিরামিডের সঙ্গে তুলনা করা বলা চলে এর উল্লম্বী ঊর্ধ্ব বিন্দুটি হল সুপ্রিমকোর্টের অবস্থান এবং নীচের সমতল অনুভূমিক রেখাটিতে অধস্তন আদালতগুলির অবস্থান। অধস্তন আদালতগুলি দেওয়ানি ও ফৌজদারি— এই দুই অংশে বিভক্ত। ন্যায় পঞ্চায়েত, মুন্সেফ আদালত, সাব জজের আদালত, জেলা জজের আদালত নগর আদালতে দেওয়ানি মামলার বিচার হয়। ন্যায় পঞ্চায়েত, বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত, দায়রা জজের আদালত, প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে ফৌজদারি বিচারের কাজ চলে। দেওয়ানি আদালতে অল্প মূল্যের বিরোধ, ছোট ছোট মামলার বিচার হয়। এখানে নীচের আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে ঊর্ধ্ব আদালতে আপিল করা চলে। অধস্তন ফৌজদারি আদালতে জেলা স্তরে বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট ও শহরে মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট হলেন ফৌজদারি আদালতের প্রধান বিচার বিভাগীয় অধিকর্তা।

ভারতে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল, শিল্প ট্রাইব্যুনাল এবং অন্যান্য ট্রাইব্যুনাল আছে। কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের কেন্দ্রীয় বেঞ্চ দিল্লিতে অবস্থিত এবং শাখা বেঞ্চগুলি ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে প্রসারিত।

শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের কথা ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতিতে বলা হলেও এ ব্যাপারে সরকারের তরফে তেমন অগ্রগতি হয়নি। বিচার বিভাগের এলাকা থেকে শাসন বিভাগকে পৃথক করার সপক্ষে নানা যুক্তি দেওয়া হলেও এক্ষেত্রে কাজ তেমন এগোয়নি। বরং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও এলাকাকে খর্ব করার অভিযাগ উঠেছে। বিচার বিভাগীয় অতি তৎপরতা নিয়েও শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের তরফে প্রশ্ন উঠেছে। ১৯৭৩ সালের ফৌজদারি বিধির মাধ্যমে জেলা স্তরে ও মেট্রোপলিটান শহরে বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব

স্বাধীনভাবে বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট ও মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে ন্যস্ত হয়েছে এবং এদের হাইকোর্টের অধীনে আনা হয়েছে। শাসন বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব ও এলাকা রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণেই নির্ধারিত হয়।

৩৩.৫ অনুশীলনী

(১) সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে নিম্নলিখিত বাক্যগুলি পুনরায় লিখুন।

(ক) অধস্তন আদালতগুলি ভারতের অখণ্ড বিচারব্যবস্থার অংশ/অংশ নয়।

(খ) মুন্সেফের আদালতে/দায়রা আদালতে ফৌজদারি মামলার নিষ্পত্তি হয়।

(গ) প্রত্যেক জেলায়/বড় বড় শহরে আছে নগর দেওয়ানি আদালত।

(ঘ) কলিকাতা শহরে ফৌজদারি মামলার বিচারের জন্য আছে বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত/প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত।

(ঙ) বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণভাব ন্যস্ত রয়েছে হাইকোর্টের/রাজ্য সরকারের উপর।

(চ) কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের প্রধান বেঞ্চে দিল্লি/কলকাতা/মাদ্রাজে অবস্থিত।

(ছ) প্রশাসনিক আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা চলে হাইকোর্টে/সুপ্রিমকোর্টে।

(জ) বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের পৃথকীকরণ ঘটেছে সংবিধানের আইন/পার্লামেন্টের ফৌজদারি বিধি অনুসারে।

(ঝ) কর সংক্রান্ত বিরোধের বিচার হয় সাধারণ আদালতে/ট্রাইব্যুনালে।

(ঞ) বর্তমানে শাসন বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের বিচার সংক্রান্ত ও শাসন সংক্রান্ত /শুধুমাত্র শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা আছে।

(২) দুই একটি বাক্যে প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

(ক) দুটি নিম্ন আদালতের নাম করুন।

(খ) দুটি দেওয়ানি নিম্ন আদালতের নাম করুন।

(গ) দুটি ফৌজদারি নিম্ন আদালতের নাম করুন।

(ঘ) ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে বিচার বলতে কী বোঝেন?

(ঙ) কোন্ আইন বলে বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের পৃথকীকরণ সম্পন্ন হয়েছে?

(চ) নিম্ন আদালতগুলির প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ করে কোন্ সংস্থা?

(ছ) নিম্ন আদালতের বিচারকদের যোগ্যতা কী?

(জ) নিম্ন আদালতের বিচারকদের নিয়োগ কীভাবে হয়?

(৩) অনধিক ৫০ বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন।

(ক) নিম্ন আদালতের দেওয়ানি বিচারালয়গুলি সম্পর্কে লিখুন।

(খ) নিম্ন ফৌজদারি আদালতের উপর টীকা লিখুন।

(গ) ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে বিবাদ মীমাংসার কী ব্যবস্থা ভারতে আছে?

(ঘ) কী অর্থে বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করা যুক্তিযুক্ত?

(ঙ) জেলা জজের আদালত ও বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতের উপর টীকা লিখুন।

(৪) অনধিক ১৫০টি বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন।

(ক) নিম্ন আদালতগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে টীকা লিখুন।

(খ) মীমাংসা আদালত বা ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে বিচারের যে ব্যবস্থা ভারতে আছে তাঁর উপর আলোচনা করুন।

(গ) বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের পৃথকীকরণ সম্পর্কে সাধারণ বিতর্কটি উপস্থিত করে ভারতে এ সম্পর্কে কী ব্যবস্থা আছে তা আলোচনা করুন।

৩৩.৬ উত্তরমালা

(১) (ক) অধস্তন আদালতগুলি ভারতের অখণ্ড বিচারব্যবস্থার অংশ।

(খ) দায়রা জজের আদালতে ফৌজদারি মামলার নিষ্পত্তি হয়।

(গ) বড় বড় শহরে আছে নগর দেওয়ানি আদালত।

(ঘ) কলিকাতা শহরে ফৌজদারি মামলার বিচারের জন্য আছে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত।

(ঙ) বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রভার ন্যস্ত হয়েছে হাইকোর্টের উপর।

(চ) কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক আদালতের প্রধান বেঞ্চ দিল্লিতে অবস্থিত।

(ছ) প্রশাসনিক আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা চলে সুপ্রিমকোর্টে।

(জ) বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের পৃথকীকরণ ঘটেছে পার্লামেন্টের ফৌজদারি বিধি অনুসারে।

(ঝ) কর সংক্রান্ত বিরোধের মীমাংসা হয় সাধারণ ট্রাইব্যুনালে।

(ঞ) বর্তমানে শাসন বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের শুধুমাত্র শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা আছে।

(২) (ক) জেলা জজের আদালত ও প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত হল দুটি নিম্ন আদালত।

(খ) মুন্সেফের আদালত ও জেলা জজের আদালত হল দুটি নিম্ন দেওয়ানি আদালত।

(গ) দায়রা জজের আদালত ও বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত হল দুটি নিম্ন ফৌজদারি আদালত।

(ঘ) সাধারণ বিচার বিভাগীয় আদালতের বাইরে প্রশাসনিক আদালতে বা ট্রাইব্যুনালে বিচারের যে ব্যবস্থা থাকে তাকে বলে ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে বিচার।

(ঙ) ১৯৭৩ সালের ফৌজদারি বিধি বলে বিচার বিভাগ ও শাসনবিভাগের পৃথকীকরণ ঘটেছে।

(চ) নিম্ন আদালতগুলির প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণভার হাইকোর্টের হাতে ন্যস্ত।

(ছ) নিম্ন আদালতের বিচারকদের যোগ্যতা হল (১) তাঁরা ইতিমধ্যে কেন্দ্র অথবা রাজ্যে কোনও সরকারি পদে যুক্ত থাকবেন না; (২) অন্তত ৭ বছরের জন্য অ্যাডভোকেট বা ওকালতির কাজে যুক্ত থাকবেন।

(জ) নিম্ন আদালতের বিচারকদের নিয়োগ করেন রাজ্যপাল হাইকোর্টের পরামর্শ নিয়ে।

৩৩.৭ গ্রন্থপঞ্জি

(১) Durga Das Basu : *Introduction to the Constitution of India (1999).*

(২) M. V. Pylee : *Constitutional Government in India (1965).*

(৩) Dhirendranath Sen : *From Raj to Swaraj (1954).*

(৪) Amreshwar Avasthi and Shriram Maheswari : *Public Administration (Latest edition).*

(৫) M. C. Jain - Kagzi : *The Constitution of India, 2 Vols. (1988).*